আন্তর্জাতিক সম্পর্ক
দক্ষিণ এশিয়া ও বাংলাদেশ
তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণ

আবুল কালাম

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক দক্ষিণ এশিয়া ও বাংলাদেশ
তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক দক্ষিণ এশিয়া ও বাংলাদেশ

তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণ

ড. আবুল কালাম

প্রফেসর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা একাডেমী ঢাকা

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র ১৪০৬/নভেম্বর ১৯৯৯

বাএ ৩৯৭৮

মুদ্রণ সংখ্যা : ১২৫০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
সমাজবিজ্ঞান, আইন ও বাণিজ্য উপবিভাগ

প্রকাশক
গোলাম মঈনউদ্দিন
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রণ
কাশবন মুদ্রায়ণ
১ ভিতরবাড়ি লেন
নবাবপুর, ঢাকা

প্রচ্ছদ
মামুন কায়সার

মূল্য
একশত পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র

ANTARJATIK SAMPARKA, DAKSHIN ASIA O BANGLADESH : TATTWIYA DRISHTIKON (INTERNATIONAL RELATIONS, SOUTH ASIA AND BANGLADESH : A THEORETICAL PERSPECTIVE) by Dr. Abul Kalam. Published by Gholam Moyenuddin, Director, Textbook Division, Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First edition-November 1999. Price : Taka : 145.00 Only

ISBN 984-07-3987-5
www.pathagar.com

ভূমিকা

সমকালীন জ্ঞান ও গবেষণা অনুশীলনের ক্ষেত্রে একটি চিত্তাকর্ষক বিবর্তন ঘটেছে। এ চিত্তাকর্ষক দিকটি হলো বিশ্বের বৃহত্তর সামাজিক গোষ্ঠী, দল-উপদল, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংগঠিত জনসমষ্টি বা জাতীয় রাষ্ট্রের-কার্যক্রম ও আচরণ সম্পর্কে পুনঃআগ্রহের সঞ্চার। এই নবতর প্রয়াসের লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্ব জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন পর্যায়ে, এসব জাতীয় রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেসব শক্তি ও প্রভাব কাজ করছে সেসবের প্রকৃতি এবং অবস্থা অনুধাবন বা উপলব্ধি করা। এই জ্ঞানান্বেষণ প্রক্রিয়ার ফলে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নতুন অধিতব্য বিষয়-আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বর্তমানে এই বিষয় শুধু পাঠ্য বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে নি, স্বীকৃতি পেয়েছে একটি স্বতন্ত্র অধ্যয়ন এবং জ্ঞান-গবেষণার বিষয় হিসেবেও। শুধু তাই নয়, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সমকালে ক্রমশ সার্বিকভাবে পূর্ণতা লাভ করে চলেছে, এতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে জ্ঞানতত্ত্বের গভীরতা ও জটিলতা।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ের কাজ হচ্ছে আন্তঃরাষ্ট্র সম্বন্ধে সমকালে বিশ্ব পর্যায়ে যা' কিছু ঘটে চলেছে সে সম্পর্কে জানা। বিশ্বে কি ঘটছে? বিশ্বে যুদ্ধ-দ্বন্দ্বের প্রক্রিয়া চলে আসছে। চলছে শান্তি প্রয়াসও। বিশ্বে ঘটে চলছে বিদ্রোহ ও বিপ্লব, চলছে উন্নয়ন এবং অনুন্নয়নের রাজনীতিও। বর্তমান বিশ্বে গড়ে উঠেছে অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সংগঠন। এসব সংস্থা ও সংগঠনের কর্মকাণ্ড বহুমুখী। সমগ্র বিশ্বে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে ঘটনার পর ঘটনা, দেখা দিচ্ছে বহু ধরনের ভয়-ভীতি বা হুমকি। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে নতুন জ্ঞানচর্চার কাজ হচ্ছে এসব বহুবিধ কর্মকাণ্ড ও ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করে পুঞ্জীভূত জ্ঞানের আহরণ ও সম্প্রসারণ।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানুষের সম্পর্কে পরিবর্তনশীল ধারা পরিলক্ষিত হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। এই পরিবর্তনের প্রকৃতি বুঝার উদ্দেশ্যে পণ্ডিত ও

www.pathagar.com

বিশ্লেষকেরা চেষ্টা করে আসছেন বহুকাল থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তরকালে আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিমণ্ডলে যেসব পরিবর্তন ঘটে আসছে সেসবের অর্থবহও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদানকল্পে প্রশংসনীয় উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা চলে। এই উদ্যোগ ও প্রয়াসের মধ্যে রয়েছে চলমান ঘটনাপ্রবাহ ও পরিবর্তনের ধারা পর্যালোচনা করা এবং এর সঙ্গে সমষ্টিগতভাবে আন্তর্জাতিক বিষয়াদির প্রকৃত রূপ উদ্‌ঘাটন করা। ফলে এক্ষেত্রে অনেক যুক্তি, তর্ক ও বিতর্কের প্রক্রিয়া সঞ্চারিত হয় এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ের তত্ত্বীয় উন্নয়নে নতুন নতুন ধারাপ্রবাহ পরিলক্ষিত হয়। এসব তত্ত্বের পর্যালোচনা করে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে চিন্তা ও জ্ঞান সম্ভবত সমৃদ্ধ করা চলে।

প্রকৃতপক্ষে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নের পাঠক্রম ও প্রকৃতি ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়ে চলছে। এর কারণ হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে সংযোজিত অনেক নতুন উপাদানের বিষয় উল্লেখ করা চলে। যেমন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈপ্লবিক উন্নয়ন, উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের ক্রম অবসান, নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়, নতুন আন্তর্জাতিক মূল্যবোধের উদ্ভব এবং ক্ষেত্র বিশেষে, পুরনো মূল্যবোধের দানা বেঁধে ওঠা এবং সর্বোপরি, আন্তর্জাতিক বিষয়াদি সম্পর্কিত চিন্তা ও জ্ঞান সুসংহতকল্পে ধারণাগত ও তত্ত্বীয় প্রয়াসের সমন্বয় সাধনের ইচ্ছা বা অভিলাষ।

বস্তুত, সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়েরও উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের আচার-আচরণ ও রীতিনীতির সার্বিক দিক যথার্থ চিত্তাকর্ষক ও উপযোগী করে অধ্যয়ন করা। এ প্রসঙ্গে স্বাভাবিক প্রশ্ন হয়—মানুষ যা 'কিছু করে থাকে তা' কেন করে বা তার কারণ কি? কি কি বিকল্প ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় মানুষ প্রয়াসী হতে পারে বা কি ধরনের কর্মপন্থা মানুষ গ্রহণ করতে পারে? অন্য কথায়, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক হচ্ছে মানুষ নিজকে জানার প্রয়াসের অংশবিশেষ। এ বিষয়ে অধ্যয়নের আরেকটি বিশেষ বাস্তব কারণও হয়েছে—তাহলো পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞদের গবেষণালব্ধ ও বিশেষজ্ঞসুলভ জ্ঞানকে প্রাসঙ্গিক করা বা নীতি প্রণয়ন ও নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

www.pathagar.com

কিন্তু সমকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অত্যন্ত জটিলরূপ ধারণ করেছে। উনিশ শতক অবধি পররাষ্ট্র সম্পর্ক প্রধানত ব্যবসা-বাণিজ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত ছিল। বিশ শতকে এই বিষয় ক্রমশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, যোগাযোগ ও সংস্কৃতি, শিক্ষা ও আদর্শ, রাজনীতি ও অর্থনীতি, সমাজনীতি ও জীবন-দর্শন প্রভৃতি দিকে দৃষ্টি বিস্তৃত করে। কূটনীতি ও পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কিত বিষয়াদি যে কি ব্যাপক হারে সরকার ও প্রশাসনে বিস্তার লাভ করেছে তা' ব্রিটিশ দৃষ্টান্ত থেকে কিছুটা প্রকাশ পাবে। ১৮২১ সনে ক্যাসেল্‌রী যখন ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দফতরে কর্মচারী ছিল মাত্র ২৮ জন। ১৯৭৩ সনে এ সংখ্যা উন্নীত হয় ১০,৪০০ জনে। অন্যান্য ব্রিটিশ মন্ত্রণালয়ে একই ধরনের কাজে নিয়োজিত কর্মচারীদের ধরা হলে মোট সংখ্যা দাঁড়াতো ২০,০০০ জনে।[১] আন্তর্জাতিক সিস্টেমেও রাষ্ট্রের সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে যায়। ১৮১৫ সনে জার্মানী ও ইতালীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোসহ মাত্র ২৩টি রাষ্ট্রের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক সিস্টেম গঠিত ছিল। বর্তমানে এ সংখ্যা ১৮৫-এ উন্নীত হয়েছে। এভাবে আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ডে ক্রমান্বয়ে ব্যাপকতা ও জটিলতা সৃষ্টি হয়ে চলেছে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে এই ধরনের ব্যাপক জটিলতার মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয় পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ক সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান না করতে পারলেও নীতি নির্ধারণে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক তাত্ত্বিকের পক্ষে সুনির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণে দিক-নির্দেশনা প্রদান সম্ভব হয় অতি কদাচিৎ। কেননা তত্ত্ব বলতে কঠোর অর্থে যা' বুঝায় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে সেই ধরনের তত্ত্ব আদৌ উদ্ভাবিত হয়েছে কিনা সন্দেহ। বরং আজো আন্তর্জাতিক অঙ্গণে যে-কোনো দ্বন্দ্ব বা সংকট দেখা দিলে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক তাত্ত্বিক ও বিশেষজ্ঞ, রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও বিশ্ব নেতৃবর্গ নির্বিশেষে সবাইকে অনেকটা হতবুদ্ধি হতে হয়, এমন কি প্রশ্ন জাগে, তত্ত্বগুলো কোথায় গেল?

এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয়ও প্রণিধানযোগ্য। যে আর্থ-সামাজিক বা রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতের ভিত্তিতে তত্ত্বীয় ধারণা

১. Trevor Taylor, "Introduction : The Nature of International Relations," in Trevor Taylor (ed.) *Approaches and Theory in International Relations.* (London and New York : Longman 1978). পৃ. ২

www.pathagar.com

রচিত হয় তা' যতই স্পষ্ট হোক না কেন সেই ধারণার ভিত্তি তেমন ব্যাপকতর নয় বা সুনিশ্চিতভাবে সব ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য যথোপযুক্ত নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে যে, সমকালীন আন্তর্জাতিক আচরণে নিবারণ তত্ত্ব ব্যাপক যৌক্তিকতা ভিত্তিক বলে বিবেচিত এবং এর প্রভাবও ব্যাপক। কিন্তু এ তত্ত্ব যতই যুক্তি ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক হোক না কেন আন্তর্জাতিক আচরণে অযৌক্তিক উপাদানের অভাব নেই এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য দুর্ঘটনার প্রসঙ্গ উড়িয়ে দেয়া যায় না। তাই আন্তর্জাতিক সম্পর্কে নিবারণ তত্ত্ব শান্তি সুনিশ্চিত করতে পারে এরূপ সম্ভবত দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে বলা যায় না। দক্ষিণ এশিয়ার পারমাণবিক অসংঘটনের পটভূমিতে কাশ্মীরকে ঘিরে ভারত-পাকিস্তান অঘোষিত সীমান্ত যুদ্ধ এমন পরিস্থিতির প্রমাণ বহন করে।

এসব কারণে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে তত্ত্বের প্রকৃতি এবং এর সীমাবদ্ধতা নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। এমন কি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয় অধ্যয়নের যথার্থ পদ্ধতি কি হবে তা' নিয়ে এখনো মতভেদ রয়েছে। এসব বিতর্ক ও মতভেদের পেছনে মূলত রয়েছে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক তত্ত্ব ও গবেষণামূলক অনুসন্ধানের লক্ষ্য নিয়ে অনিশ্চয়তা। এই অনিশ্চয়তা নিরসন করতে হলে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়কে অভিজ্ঞতা প্রসূত জ্ঞানান্বেষণের বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, মানুষের সমষ্টিগত অভিজ্ঞতাকে ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তত্ত্বীয় জ্ঞান সম্পর্কিত সমাধানের পথ খুঁজতে হবে, নির্ধারণ করতে হবে এসব তত্ত্বীয় জ্ঞানের সুস্পষ্ট সীমারেখা।

কিন্তু বর্তমান পর্যায়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ের মৌল উদ্দেশ্য হচ্ছে তত্ত্বীয় ধারণা, প্রকল্প ও মডেল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা যাতে আন্তর্জাতিক আচরণ ও আন্তঃরাষ্ট্র কর্মকাণ্ড বা আন্তঃক্রিয়ার বিশেষ বিশেষ প্রশ্নে বিশ্লেষণমূলক, সুনির্দিষ্ট চিন্তাসুলভ কাঠামো ও মতামত গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

পরিশেষে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয় অধ্যয়নের একটি নৈতিক এবং বাস্তব প্রয়োজনের দিকও রয়েছে– অনেকে একে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিক বলে মনে করে থাকেন। এতে সমষ্টিগতভাবে মানব জাতির অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা হয়। এসবের মধ্যে রয়েছে চিহ্নিত করা যুদ্ধদ্বন্দ্বের কারণ, রয়েছে কিভাবে এসবের নিয়ন্ত্রণ করা চলে, নিবারণ

www.pathagar.com

করা চলে সহিংস প্রক্রিয়া বা কিভাবে এসবের প্রতিবিধানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা যায় শান্তি।

পূর্বেই বলা হয়েছে, সমকালীন বিশ্বে যুদ্ধদ্বন্দ্ব ও শান্তির বিষয়াদিই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ের একমাত্র অনুসন্ধান বা বিচারের বিষয় নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বহুবিধ পরিবর্তনশীল ধারা পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। এর মধ্যে রয়েছে বিশ্বের রাজনৈতিক মানচিত্রের পরিবর্তন ও আদর্শিক বিবর্তন, উত্তরোত্তর জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং এর ফলশ্রুতিতে খাদ্যাভাব, বিশ্বে ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে কাঁচামালের সম্ভাব্য অভাব, বিশ্ব অর্থনীতির আপেক্ষিক স্থিতি ও উন্নয়ন লাভের প্রয়াস, বিশ্বের পরিবেশ ও প্রতিবেশগত হুমকি এবং এসব ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করা। আঞ্চলিকতা, উপ-আঞ্চলিকতা এবং এসব পর্যায়ে সহযোগিতা, জাতীয় ও বহুমাত্রিক নিরাপত্তা, জাতীয়, ভাবমূর্তি ও কৌশলগত দর্শন প্রভৃতি।

অবশ্য এ ধরনের একটি মাত্র গ্রন্থে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সার্বিক বিষয়াদি নিয়ে বিশ্লেষণমূলক বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়। বর্তমান গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সাম্প্রতিককালে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে যুদ্ধদ্বন্দ্বের বিষয়ে ধারণাগত ও তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞান-গবেষণার যে প্রয়াস চলে আসছে তার কিছু কিছু অংশ সমকালীন বিশ্বের বাস্তব ঘটনা প্রবাহ ও সমস্যার নিরিখে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে দক্ষিণ এশিয়া ও বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীর ওপর। কিন্তু তার পূর্বে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ের প্রাথমিক কতিপয় প্রশ্নের সমাধা হওয়া প্রয়োজন। এসবের মধ্যে রয়েছে 'আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সংজ্ঞাগত রূপ ও অধিতব্য বিষয় হিসেবে এর বর্তমান অবস্থা', 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বিশ্লেষণ পর্যায় সংক্রান্ত সমস্যা, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষণে প্রতিযোগী তত্ত্বীয় পদ্ধতি' প্রভৃতি সম্পর্কিত প্রশ্নাদি। গ্রন্থের প্রথম থেকে তৃতীয় অধ্যায় পর্যন্ত এসব বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কিত গবেষণা পদ্ধতি এবং তত্ত্বীয় রূপ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায়সমূহে আলোচিত হয়েছে আন্তঃরাষ্ট্র বিষয়ক কিছু কিছু সমস্যা। এসবের মধ্যে রয়েছে 'পরাশক্তি ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্র সম্পর্ক', 'পরাশক্তি ও মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি', 'মস্কো ও মধ্যপ্রাচ্য', 'কম্যুনিস্ট প্রতিবন্ধী সম্পর্ক,' 'প্রলম্বিত যুদ্ধ ও পার্শ্বভাগ তত্ত্ব, ভিয়েতনাম যুদ্ধে হ্যানয়ের প্রতিরক্ষা রণকৌশল', 'ভারত ও দক্ষিণ এশীয় সহযোগিতা', 'উপ-আঞ্চলিকতা ও বাংলাদেশের উন্নয়ন কূটনীতি',

www.pathagar.com

'বাংলাদেশের নিরাপত্তা ; তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ ও বাস্তব 'পরিপ্রেক্ষিত', 'নারীর নিরাপত্তা ঃ তত্ত্বীয় সংযোগ ও বাংলাদেশের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত', এবং পরিশেষে 'জাতীয় ভাবমূর্তি, মহিমান্বিত ঐতিহ্য, কৌশলগত দর্শন ও বাস্তবতা ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত'।

গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধগুলোতে বিশ্লেষণের প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের তত্ত্বীয় ফ্রেম বা কাঠামো ব্যবহার করা হয়েছে। সপ্তম ও একাদশ অধ্যায়ে মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সম্পর্কের বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়েছে সিস্টেম ফ্রেম। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রধানত দ্বান্দ্বিক ফ্রেমের ব্যবহার করে ভিয়েতনামের অভিজ্ঞতার আলোকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরাশক্তির হস্তক্ষেপ প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করা হয়েছে। অষ্টম, নবম, দশম ও দ্বাদশ অধ্যায়ে কৌশলগত চিন্তাধারার আলোকে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক আচরণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

'উপ-আঞ্চলিকতা ও বাংলাদেশের উন্নয়ন কূটনীতি' শীর্ষক প্রবন্ধে আঞ্চলিকতা তত্ত্বের অনুরূপ উপ-আঞ্চলিকতা ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশসহ পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ার সাম্প্রতিককালীন উন্নয়ন কূটনীতির ধারা পর্যালোচনা করা হয়েছে। নিরাপত্তার তত্ত্বীয় ধারণার বহুমুখী ও বহুমাত্রিক রূপরেখা বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তার সমকালীন বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে 'বাংলাদেশের নিরাপত্তা ঃ তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ ও বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত' শীর্ষক নিবন্ধে। একই ধরনের কাঠামো ব্যবহার করে বাংলাদেশের জনগণের বিশেষ অধিকারহীন নারী সম্প্রদায়ের নিরাপত্তাহীনতার বিষয় আলোচিত হয়েছে 'নারীর নিরাপত্তাঃ তত্ত্বীয় সংযোগ ও বাংলাদেশের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত' শীর্ষক নিবন্ধে।

গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধ 'জাতীয় ভাবমূর্তি, মহিমান্বিত ঐতিহ্য, কৌশলগত দর্শন ও বাস্তবতা ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত'। এতে তত্ত্বীয় রূপরেখার সমন্বিত বা সংমিশ্রিত পদ্ধতি ব্যবহারের প্রয়াস মেলে। ভাবমূর্তি মূলত মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ সম্বলিত যা' জাতীয় পর্যায়ে কি ধরনের অভিব্যক্তি ঘটাতে পারে তার অন্বেষণ করা হয়। কৌশলগত দর্শন ছাড়া কোনো জাতি দিক-নির্দেশনা লাভ করতে পারে না। এ সকল দৃষ্টিকোণের সমন্বয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের বর্তমানকালীন জাতীয়

www.pathagar.com

জীবনে পরিলক্ষিত সমস্যা ও সংকট থেকে উত্তরণে বিভিন্ন প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

গ্রন্থের নামকরণ ও সূচিপত্রে সংযোজিত সকল প্রবন্ধের সার্বিক শ্রেণী বিভাজন সম্পর্কে সর্বশেষে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। বর্তমান গ্রন্থের বেশির-ভাগ প্রবন্ধই বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত লেখকের পূর্বের বই 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ঃ তত্ত্বীয় ও বাস্তব রূপ' থেকে নেয়া। কিন্তু বিগত দশকব্যাপী তত্ত্বীয় বিশ্লেষণ ও বাস্তব সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তাই পুরনো গ্রন্থের প্রতিটি প্রবন্ধ-ই নতুন ঘটনা প্রবাহের আলোকে পরিমার্জিত ও বর্ধিত হয়েছে।

বইয়ের নামকরণ পরিবর্তনের কারণ অন্যত্র। পুরনো গ্রন্থে প্রবন্ধ ছিল দশটি; বর্তমানে এর সঙ্গে আরো ছয়টি প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে। এর একটি হচ্ছে, 'মস্কো ও মধ্যপ্রাচ্য'। এটিও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বৃহত্তর পরিমণ্ডল সম্পর্কিত। পূর্বে লেখকের সম্পাদিত 'সমকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে' সংকলিত প্রবন্ধটি বর্তমানে পরিমার্জিত ও বর্ধিত আকারে এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

দ্বাদশ থেকে ষোড়শ অধ্যায় পর্যন্ত সংযোজিত প্রবন্ধগুলো গ্রন্থটিকে নতুন নামকরণে লেখককে উদ্বুদ্ধ করে। কেননা এ সকল প্রবন্ধে প্রধানত দক্ষিণ এশিয়ার অন্তঃআঞ্চলিক ও বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতি ও কৌশলগত সম্পর্কের বিষয়াদি পর্যালোচনা করা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। এর মধ্যে একমাত্র দ্বাদশ অধ্যায়, 'সমকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতি' থেকে নেয়া এবং প্রবন্ধটি ভারতের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতিতে সাম্প্রতিককালে পরিলক্ষিত বিভিন্ন অভিব্যক্তির আলোকে ব্যাপকভাবে সংবর্ধিত হয়েছে। অন্য চারটি প্রবন্ধ একেবারে নতুনভাবে লিখিত এবং সবগুলোতেই দক্ষিণ এশিয়া ও বাংলাদেশের বিভিন্ন বিষয়াবলী বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে তত্ত্বীয়/ ধারণাগত দৃষ্টিকোণ থেকে। প্রধানত এ কারণে বইটির নামকরণে দক্ষিণ এশিয়া ও বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	:	আন্তর্জাতিক সম্পর্কে সংজ্ঞাগতরূপ ও অধিতব্য বিষয় হিসেবে এর বর্তমান অবস্থা	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বিশ্লেষণ পর্যায় সংক্রান্ত সমস্যা	১৪
তৃতীয় অধ্যায়	:	আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ প্রতিযোগী তত্ত্বীয় পদ্ধতি	২৫
চতুর্থ অধ্যায়	:	যুদ্ধ ও শান্তি : গবেষণা পদ্ধতি ও তত্ত্বীয়রূপ	৩৬
পঞ্চম অধ্যায়	:	পরাশক্তি ও ক্ষুদ্ররাষ্ট্র সম্পর্ক	৬৫
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	পরাশক্তি সম্পর্ক, নিবারণ তত্ত্ব ও যুদ্ধ সম্প্রসারণ	১০৪
সপ্তম অধ্যায়	:	পরাশক্তি ও মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি	১৩১
অষ্টম অধ্যায়	:	মস্কো ও মধ্যপ্রাচ্য	১৫৪
নবম অধ্যায়	:	মস্কো– বেইজিং হ্যানয় : কম্যুনিস্ট প্রতিবন্ধী সম্পর্ক থেকে স্বাভাবিক পর্যায়ে উত্তরণ	১৭৮
দশম অধ্যায়	:	প্রলম্বিত যুদ্ধ ও পার্শ্বভাগ তত্ত্ব : ভিয়েতনাম যুদ্ধে হ্যানয়ের প্রতিরক্ষা রণকৌশল ও সমকালীন ধারাবাহিকতা	২১২
একাদশ অধ্যায়	:	আঞ্চলিকতা, সিস্টেম তত্ত্ব ও দক্ষিণ এশিয়া	২৩১
দ্বাদশ অধ্যায়	:	ভারত ও দক্ষিণ এশীয় সহযোগিতা	২৫৭
ত্রয়োদশ অধ্যায়	:	উপ-আঞ্চলিকতা ও বাংলাদেশের উন্নয়ন কূটনীতি	২৮৭
চতুর্দশ অধ্যায়	:	বাংলাদেশের নিরাপত্তা : তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ ও বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত	৩১৯
পঞ্চদশ অধ্যায়	:	নারীর নিরাপত্তা : তত্ত্বীয় সংযোগ ও বাংলাদেশের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত	৩৫৮
ষোড়শ অধ্যায়	:	জাতীয় ভাবমূর্তি, মহিমান্বিত ঐতিহ্য, কৌশলগত দর্শন ও বাস্তবতা : বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত	৩৭০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

আন্তর্জাতিক সম্পর্কে সংজ্ঞাগতরূপ ও অধিতব্য বিষয় হিসেবে এর বর্তমান অবস্থা

সংজ্ঞাগতরূপ

"আন্তর্জাতিক সম্পর্ক" বিষয়ে যে কোনো জ্ঞান বা অন্তঃদৃষ্টি লাভ করতে হলে প্রথমে বুঝতে হবে এর সংজ্ঞাগতরূপ কি, জানতে হবে এ বিষয়ের বর্তমান অবস্থা কি ধরনের? এ প্রশ্নের সঙ্গে আরো তিনটি প্রশ্ন বিজড়িত। প্রথমত, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে কি কি অধ্যয়ন করা হয় ? দ্বিতীয়ত, এ বিষয়ে কি কি ক্ষেত্র বা প্রসঙ্গ নিয়ে অনুসন্ধান প্রাসঙ্গিক ? তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়কে একটি অধিতব্য বিষয় বলা চলে কি ?

উপর্যুক্ত তিনটি প্রশ্নই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এর যে কোনো একটির উত্তরের প্রয়াসে স্বাভাবিক কারণে অন্যটির প্রসঙ্গও এসে পড়ে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সংজ্ঞা নিয়ে কিছুটা মৌলিক বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। কেননা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়কে কেন্দ্র করে অনেকে 'আন্তর্জাতিক রাজনীতি', আন্তর্জাতিক বিষয়', 'বিশ্ব রাজনীতি', 'পররাষ্ট্র বিষয়', 'পররাষ্ট্র সম্পর্ক', 'আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক', 'বৈদেশিক আঞ্চলিক অধ্যয়ন', প্রভৃতি বচন ব্যবহার করে আসছেন। এ বিষয়ের সংজ্ঞা নির্ধারণেও একই ধরনের বিচিত্র ধারা পরিলক্ষিত হয়। অনেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে রাষ্ট্র বা জাতীয় সীমানার বাইরে গড়ে ওঠা সম্পর্করূপে উপস্থাপিত করে থাকেন। আর কেউ কেউ মনে করেন, রাষ্ট্রের বাহ্যিক সম্পর্ক প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি বা অবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। আবার অনেকে এরূপ বক্তব্য রাখেন যে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক মূলত এ সব রাষ্ট্রের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বা নাগরিকদের নিয়েই। পরিশেষে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে কেউ কেউ তুলে ধরেন আন্তর্জাতিক সামাজিক আচরণের অভিব্যক্তি হিসেবে। কেননা, এ দৃষ্টিকোণ থেকে, এ বিষয়ে একটি রাষ্ট্রের ব্যক্তিবিশেষ বা জনগোষ্ঠীর কর্মকাণ্ড প্রভাবিত করে আরেকটি দেশের সমরূপ ব্যক্তিবিশেষ ও জনগোষ্ঠীকে।

প্রকৃতপক্ষে উপর্যুক্ত বিভিন্ন সংজ্ঞায় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সাম্প্রতিক বহুমুখী কর্মকাণ্ড, পাঠক্রম, গবেষণা, আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ পায়। তবু 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' বচন দু'টোতে এর যথার্থ সংজ্ঞা নিহিত। কেননা এতে

www.pathagar.com

পারস্পরিক বিনিময় বা লেনদেনের ভাব বিজড়িত। এর অন্তর্নিহিত কথাই হচ্ছে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা। স্পষ্টতই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সার্বিক আগ্রহ চলছে যোগাযোগ, বিনিময়, মিথস্ক্রিয়া বা আন্তক্রিয়াকে ঘিরে।[১]

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিভিন্নমুখী আগ্রহ

আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে তুলনা করা হয় একটি চীনা ধা ধা বা 'পাজল-বাক্সের' ('Puzzle-box') সঙ্গে, যে বাক্সের ঢাকনা খুললেই হতবুদ্ধি হতে হয়;[২] কেননা এ বাক্সের প্রতিটি ঢাকনা খোলার পর দেখা দেয় আরেকটি ঢাকনা এবং প্রতিটি ঢাকনাকে ঘিরে যেন রয়েছে কিছু রহস্য। বস্তুত, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে আজকাল মোটামুটি এ ধরনের বহুবিধ কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন ঘটে যে, অনেক সময় গবেষণা ও পর্যবেক্ষককে হতবুদ্ধি বা বিহ্বল হতে হয়। এসবের মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ ও দ্বন্দ্ব, সাহায্য ও সহযোগিতা, উন্নয়ন ও অনুন্নয়নের প্রসঙ্গ, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও বিনিময় কর্মপন্থা, আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও শান্তিচুক্তি, আন্তর্জাতিক ভয়-ভীতি ও হুমকি, ব্যবসায়িক ও বাণিজ্যিক লেনদেন, বহুজাতিক সংস্থা ও করপোরেশনের কর্মকাণ্ড, আন্তর্জাতিক খেলাধুলা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিক উন্নয়ন, যোগাযোগ ও সম্মেলন, প্রমোদ-ভ্রমণ ও পর্যটন সম্পর্কিত বিষয়াদি, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সংগঠনের সম্মেলন বা সভা, এবং ধর্মীয় উপাসনা ও মিশনারি কর্মকাণ্ডের আয়োজন, পরিবেশ ও প্রতিবেশগত হুমকি প্রভৃতি। এসব বহুবিধ ও বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ডের সার্বিক রূপ বা সমষ্টিগত অভিব্যক্তি নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে চলে আসছে তত্ত্বীয় জ্ঞানলাভের প্রয়াস। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ের একজন পণ্ডিত তাই উল্লেখ করেন যে, এ বিষয়ে একদিকে যেমন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রভাব দেখা যায় তেমনি পরিলক্ষিত হয় নৈতিক দর্শনের প্রভাব।[৩]

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত কার্যকলাপ ও ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান জগতের অন্যান্য আরো অনেক শাখা-প্রশাখা বা বিষয়ে পড়াশোনা ও ভাবনা-চিন্তা করা হয়ে থাকে। এসব প্রতিষ্ঠিত বিষয়ের মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, আইন প্রভৃতি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত কর্মকাণ্ড ও ঘটনা প্রবাহ নিয়ে এভাবে চিন্তা ও জ্ঞান অনুসন্ধানের ব্যাপারে অনেক সমরূপ প্রয়াস বা বৈকল্পিক ভাবধারা দেখা যায়। বিশেষ করে উল্লেখ করা চলে যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়াদি নিয়ে কূটনৈতিক ইতিহাসবিদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বহুকাল থেকে বিশ্লেষণ ও গবেষণাকর্ম চালিয়ে আসছেন। প্রশ্ন হতে পারে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিতদের তাহলে নতুনভাবে উপস্থাপন করার মতো কি আছে?

www.pathagar.com

জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার উন্নয়ন হয়ে আসছে অনেকটা বিবর্তিত ধারায়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ ধারার ব্যতিক্রম ঘটে নি। আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে নিয়ে চিন্তা ও জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বিগত কয়েক শতক থেকে বেশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনের ধাপ বা পর্যায় চিহ্নিত করা চলে। এসব ধাপ অতিক্রম করার পর এই বিষয় বর্তমান পর্যায়ে উন্নীত হয়। এসবের মধ্যে রয়েছে ধ্রুপদী পর্যায় ; কূটনৈতিক ইতিহাসের পর্যায় ; চলতি বা সমকালীন ঘটনাপ্রবাহ পর্যালোচনা পর্যায়; আন্তর্জাতিক আইন ও সংগঠন পদ্ধতি ; এবং পরিশেষে, সম্প্রতিককালের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা ধারণাগত তত্ত্বীয় পর্যায়।

ধ্রুপদী পর্যায়

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে প্রাচীন গ্রিক লেখক থ্যুকিডাইডিস (Thucydides)-এর 'পেলোপোনোশিয়ান যুদ্ধ' ('The Peloponnessian war') শীর্ষক গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা চলে। এ গ্রন্থের পর এ বিষয়ে কৌটিল্য লিখেন 'অর্থশাস্ত্র', সনফু লিখেন 'Art of war' এবং আরো লিখেন, যদিও অনেক পরে, মেকিয়াভেলি (Machiavelli) 'দ্য প্রিন্স (The Prince'), 'দি আর্ট অব ওয়ার' ('The Art of War') দাঁতে (Dante) 'বিশ্ব সরকার সম্পর্কে (or `World Government') ষোড়শ-সতেরো শতকের ফরাসী ধর্মগুরু এমেরিক ক্রুসে (Emeric Cruce) জ্যঁ জাক রুশো (Jean Jacque Rousseau) সতেরো ও আঠারো শতকের ফরাসি গণপ্রচারক আবে দ্যা স্যা পিয়ের (Abbe de Saint Pierre), ইংল্যান্ডের জেরেমী ব্যানথাম (Jeremy Bentham) এবং জার্মানীর ইম্যানুয়েল কান্ট (Immanuel Kant) প্রমুখ জ্ঞানসাধক। এসব মহান চিন্তাবিদ সামাজিক স্থিতিশীলতার পাশাপাশি বিশ্বশান্তি সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থাপিত করেন। রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ এবং কালে রাষ্ট্র পরিচালনা সম্পর্কিত জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান রীতিবদ্ধ ও বিজ্ঞানভিত্তিক রূপ লাভ করে। অবশ্য ধ্রুপদী লেখা ও সাহিত্যের মাধ্যমে এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ কোনো তত্ত্বীয় উন্নয়ন ঘটে নি, যেমন তত্ত্বীয় উন্নয়ন ঘটে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রে। বিশ শতকের পূর্বে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক বিষয়াদি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের লেখায় তত্ত্ব বা ধারণা অনেকখানি অস্ফুট থাকে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন কি ভাবের অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয় বা আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কিত চিন্তাধারা দার্শনিকদের দর্শনে বিক্ষিপ্তভাবে স্থান লাভ করে।[৪] তবু আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে ধ্রুপদী লেখা ও সাহিত্যের অবদান অনস্বীকার্য। তত্ত্বীয়/ধারণাগত ভাব ধ্রুপদী পর্যায় থেকে শুরু হয়।

www.pathagar.com

আধুনিক পর্যায়

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে মৌলিক পরিবর্তনের ধারা পরিলক্ষিত হয় বিশ শতকে। এই শতকে কূটনৈতিক ইতিহাস, সমকালীন ঘটনাপ্রবাহের পর্যালোচনা এবং আন্তর্জাতিক আইন ও সংগঠনের ব্যবহারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে অধ্যয়নের প্রচেষ্টা চালানো হয়। এই তিনটি পদ্ধতির মধ্যে কূটনৈতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ প্রথমে উল্লেখ করতে হয়। এই পদ্ধতির প্রাধান্য ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষাবধি।

কূটনৈতিক ইতিহাস এই সময় আন্তর্জাতিক সম্পর্কে একচেটিয়া পদ্ধতিরূপে বিবেচিত হলেও এর সীমাবদ্ধতাও ছিল উল্লেখযোগ্য। একদিকে এ পদ্ধতিতে যেমন সমকালীন বা চলতি ঘটনাবলী উপেক্ষা করা হতো অন্যদিকে সত্যরূপে উপস্থাপিত ঘটনা প্রবাহের সন-তারিখ তুলে ধরা বা বর্ণনামূলক ধারা বিবরণের মাধ্যমে অন্তর্নিহিত পরম সত্য বা সার্বজনীন নীতিমালার প্রতি অবহেলা প্রদর্শিত হয়। ফলে এই পদ্ধতি দ্বারা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধারণাগত বা তত্ত্বীয় জ্ঞানার্জন সম্ভব হয় নি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে চিন্তা ও জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে দু'টো নতুন ভাবধারা পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। এ দু'টো ভাবধারা প্রায় একই সময়ে প্রভাব রেখে চলে, দু'টোই অবদান রেখে চলে পাশাপাশি। এ দু'টোর প্রথমটি হচ্ছে চলতি ঘটনার বিশ্লেষণ পদ্ধতি, আর এ সময়কার আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জ্ঞান লাভ প্রক্রিয়ায়। দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে আন্তর্জাতিক আইন ও সংগঠন পদ্ধতি।

চলতি ঘটনা বিশ্লেষণ পদ্ধতি

চলতি ঘটনার বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহারের প্রধান কারণ ছিল কূটনৈতিক ইতিহাস পদ্ধতির ব্যর্থতা মূল্যায়ন, এর সংশোধন বা এ পদ্ধতি ব্যবহারের সমস্যা নিরসন করা। কিন্তু এতে ঐতিহাসিক পদ্ধতির ব্যর্থতার পরিমার্জন ও সমস্যার কিছুটা নিরসন হলেও এ পদ্ধতির উপযোগী দিকগুলো সংরক্ষিত হয় নি। তার মানে, এতে অতীতের ধারা বা ইতিহাসলব্ধ জ্ঞান অবহেলিত হয়। এছাড়া, ঐতিহাসিক পদ্ধতির মতই চলতি ঘটনার বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে এ সুচিন্তিত তত্ত্বীয় বা রীতিবদ্ধ ভিত্তির দারুণ অভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে ইতিহাসের সামাজিক ঘটনাবলীর মধ্যে যোগসূত্র এবং ভবিষ্যৎ বা ভাবীকালের সম্ভাব্য আন্তর্জাতিক আচরণ সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানভিত্তিক পুঞ্জীভূত চিন্তা ও জ্ঞানের সমাবেশ করা সহজ হয় নি।

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক আইন ও সংগঠন পদ্ধতি

একই সময়ে ব্যবহৃত দ্বিতীয় পদ্ধতি ছিল আন্তর্জাতিক আইন ও সংগঠন পদ্ধতি। এই পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিষয়াদি সম্পর্কিত চিন্তা ও জ্ঞানকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার প্রয়াস চলে। এ জাতীয় প্রয়াসের সূচনা হয় জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠালগ্নে। এই সময়ে বিশ্ব সংগঠনের সৃষ্টির ফলে অনেকের মনে এরূপ প্রত্যয় জন্মে যে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত দায়-দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে আন্তর্জাতিক সমস্যার নিরসন ঘটাতে পারে। কিন্তু বিশ্ব সমাজকে নিছক আন্তর্জাতিক আইন ও সংগঠনের বেড়াজালে আবদ্ধ করে শান্তি সুনিশ্চিত করা যেমন নিরর্থক, তেমনি শুধুমাত্র আইনগত ও সাংগঠনিক পদ্ধতির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিষয়ের সার্বিক জ্ঞান লাভও কঠিন। কেননা, এ পদ্ধতিতে রাষ্ট্রের বাস্তব বা প্রকৃত আচরণের দিক উপেক্ষা করা হয়, যেমন উপেক্ষিত হয় শক্তিসাম্যের মত আন্তর্জাতিক রাজনীতির ঐতিহ্যগত কূটকৌশল। বলাবাহুল্য, এ জাতীয় ঐতিহ্যিক আচরণ বা কূটকৌশলের মূল্যায়ন ছাড়া আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মৌলিক বা অন্তর্নিহিত ভাবধারা বুঝা যায়।[৫]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তরকালীণ বিবর্তন

পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি বেং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কারণে আন্তর্জাতিক বিষয়ে পূর্বে ব্যবহৃত পদ্ধতি সম্পর্কে সন্দেহ ও সংশয় দেখা দেয়। কেননা যে কোনো জ্ঞান-পদ্ধতির যথার্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিরূপিত হয় এর উপযোগিতা ও প্রাসঙ্গিকতার মাপকাঠিতে। কূটনৈতিক ইতিহাস, চলতি ঘটনার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা আন্তর্জাতিক আইন ও সংগঠন পদ্ধতি ব্যবহার সত্ত্বেও বিশ্বসমাজ উপর্যুপরি মহাযুদ্ধ বা বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট হয়, মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন রূপে প্রতিভাত হয়। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তরকালে আন্তর্জাতিক বিষয়াদি নিয়ে নতুনভাবে অনেক চিন্তা-ভাবনা করা হয়।

১৯৪০-এর দশকের শেষপাদ থেকে আন্তর্জাতিক আচরণ ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিষয় সম্পর্কে ধারণাগত ও তত্ত্বীয় জ্ঞান উপস্থাপিত হয়। এ প্রয়াস ক্রমশ প্রসার লাভ করে পরের দশকে। পঞ্চাশের শেষপাদ থেকে সমাজবিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা-প্রশাখার অনুকরণে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে রীতিবদ্ধভাবে অনেক চিন্তা ও গবেষণাকর্মে প্রযুক্ত জ্ঞানতত্ত্ব সমাবেশ করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। এ সময়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আন্তর্জাতিক আচরণের তিনটি বিশেষ দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করে ঃ

www.pathagar.com

১. সর্বত্র পররাষ্ট্র নীতির অন্তর্নিহিত উপাদান ;

২. পররাষ্ট্র নীতির আচরণে ব্যবহৃত পদ্ধতি ;

৩. আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব-কলহ নিরসন বা সমাধানের উপায়।

বিশ্ব সম্পর্কে উপর্যুক্ত ক্ষেত্রে চিন্তা ও জ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্য কিন্তু বিভিন্ন দেশের পররাষ্ট্র নীতির প্রশংসা বা নিন্দা করা হয়। বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্ব পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় আচরণ মূল্যায়ন করা বা আন্তর্জাতিক সম্পর্কে তত্ত্বীয় জ্ঞান অর্জন করা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানভিত্তিক তত্ত্বীয় উন্নয়ন সাধনকল্পে প্রশংসনীয় উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা চলে আসছে। অবশ্য আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি সাধারণ তত্ত্ব উন্নয়ন এখনো সুদূরপরাহত। তবু একথা বলার অবকাশ নেই যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সূচি ও প্রকৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এ পরিবর্তন কোনো স্বতঃপ্রবৃদ্ধ ধারায় আসে নি। এর পেছনে রয়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের উদ্ভূত অনেক নতুন উপাদান। এসব উপাদানের মধ্যে রয়েছে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার শক্তিকাঠামোতে পরিবর্তিত ধারা, উপনিবেশবাদের ক্রম অবসান, নতুন দেশ ও জাতির উদ্ভব বা জাতীয় স্বাধীনতা লাভ, বিশ্বে রাষ্ট্রের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি, নতুন আন্তর্জাতিক মূল্যবোধের সঞ্চার এবং পুরনো আদর্শের প্রতি পুনরায় নিষ্ঠা প্রদর্শন এবং, সর্বোপরি, আন্তর্জাতিক বিষয়ে তত্ত্বীয় জ্ঞান লাভের প্রতি গভীরতর আকর্ষণ, নিষ্ঠা বা আগ্রহ।

আন্তর্জাতিক সমাজে অব্যাহত দ্বান্দ্বিক অবস্থা, নিরাপত্তার অন্বেষা, উন্নত অস্ত্রশস্ত্রের প্রযুক্তি প্রভৃতির কারণে বিশেষভাবে রণনীতি, শান্তি, নিবারক পন্থা, নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র সংবরণ বা নিয়ন্ত্রণের মতো প্রশ্নে আলাপ-আলোচনা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাশাপাশি ধারণাগত জ্ঞানলাভেরও প্রয়াস চলে আসছে। পণ্ডিত ও বিশ্লেষকেরা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সিস্টেম ও প্রক্রিয়া নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে আসছেন। যেমন তাঁরা প্রয়াসী হয়েছেন জানতে যে, আন্তর্জাতিক সিস্টেম কি। দ্বি-মেরুকেন্দ্রিক না কি বহুমেরুকেন্দ্রিক ; মৈত্রী ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে চলমান আন্তর্জাতিক রাজনীতির ধারাও বুঝতে তাঁরা প্রয়াসী হন ; সাহায্য, সহযোগিতা ও সংহতির প্রক্রিয়া কি করে ত্বরান্বিত হতে পারে ; কেউ কেউ বুঝতে প্রয়াসী হন উপনিবেশবাদ অবসানের ফলে আফ্রো-এশিয়া ও লাতিন আমেরিকায় নতুন নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের প্রভাব বা এসব রাষ্ট্রের সম্ভাবনা ; অনেকে আবার উন্নয়ন, উন্নয়নশীল, উন্নয়নকামী ও অনুন্নয়নের নীতিমালা নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে আসছেন, এমন কি এই আদর্শিক দ্বিধা বা আদর্শগত দ্বন্দ্বের যুগে আন্তর্জাতিক নীতি-দর্শন বা আর্থনীতিক সম্পর্কের মতো সমস্যা নিয়েও অনেকে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করে থাকেন।

www.pathagar.com

আবার কেউ ভাবছেন কি করে সমকালীন পরিবেশ ও প্রতিবেশগত হুমকি মোকাবিলা করা যায়।

অবশ্যি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়ের এসব হচ্ছে সাম্প্রতিককালের আগ্রহ। এসব সমকালীন সমস্যা ছাড়াও আন্তর্জাতিক সম্পর্কে আধুনিক ইতিহাসের চিরাচরিত আন্তর্জাতিক বিষয়াদি কিন্তু উপেক্ষিত নয়। ঐতিহাসিক উপাদান সম্বলিত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গবেষণাকর্মে প্রতিফলিত হয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা চলে যে, ডেভিড সিঙ্গার এবং রিচার্ড রোজেনক্রন্স এর মত লেখকেদের কিছু কিছু গ্রন্থ।[৬] এমন কি আন্তর্জাতিক সংগঠন ও আদালতে উপস্থাপিত বা বিবেচ্য বিষয়াদিও বর্তমানে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ের আওতাধীন বলে নেয়া হয়। অবশ্য আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয় আইনের উর্ধ্বে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কে পারিপার্শ্বিক প্রভাব ও বাস্তব ঘটনা প্রবাহের চলমান গতিধারা বা বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদানের প্রয়াস চলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে তত্ত্বীয় পরিবর্তন ঘটে তিন পর্যায়ে।

ক. প্রথমত ছিল বাস্তববাদী তত্ত্ব, যে তত্ত্বের সূত্রপাত ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে। এ তত্ত্বের প্রথম প্রবক্তা ছিলেন নিকোলাস স্পাইকম্যান। যুদ্ধোত্তরকালে এ তত্ত্বের নতুন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় হ্যান্স মরগ্যানথু'র ("Politics Amogn Nations") শীর্ষক গ্রন্থে। এ গ্রন্থ ১৯৪৮ সনে প্রথম প্রকাশিত হলেও প্রায় পুরো এক দশকব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে যে কোনো চিন্তা বা জ্ঞানচর্চায় এর প্রভাব ছিল অতি সুদূরপ্রসারী।

খ. ১৯৫০-এর দশকের শেষপাদ থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গবেষণায় চলে 'বিহেভিওরাল' বা ব্যবহারিক দশক' ('Behavioural Decade')। এই দশকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের অনুকরণে ধারণাগত ফ্রেম ও তত্ত্বীয় কাঠামো প্রয়োগ করার প্রয়াস চলে, উপস্থাপিত হয় অনেক নতুন প্রকল্প ও তত্ত্ব। ব্যবহারিক দশকের তত্ত্বের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মোর্টন কাপলান ও চালর্স ম্যাকল্যালেণ্ড এর সিস্টেম্‌স তত্ত্ব, স্নাইডার, নর্থ ও ব্রোডীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ তত্ত্ব, মাইকেল হা'সের কার্যকর তত্ত্ব, কার্ল ডয়েসের সামাজিক যোগাযোগ তত্ত্ব, জর্জ লিস্কার ভারসাম্য তত্ত্ব, টমাস শেলিং-এর দ্বন্দ্ব তত্ত্ব, কেনিথ বল্ডিং এবং হোয়ান গাল্টুং-এর শান্তি তত্ত্ব প্রভৃতি।

গ. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে উপর্যুক্ত তত্ত্বীয় বিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটে চলে পুরো ষাট-এর দশকব্যাপী। এই ব্যবহারিক দশকের পর ব্যবহারিক দশক উত্তরকালে তত্ত্ব ও তত্ত্বীয় বা ধারণাগত কাঠামো নিয়ে আরো ব্যাপক

www.pathagar.com

পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে আসছে। এই পর্যায়ে সব প্রচেষ্টা ও প্রয়াসের লক্ষ্য হচ্ছে প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক সমস্যা বা বিষয়াদি নিয়ে প্রাসঙ্গিক তত্ত্ব ও পদ্ধতির ব্যবহারে সঠিক ধারার প্রবর্তনে নিশ্চয়তা বিধান করা, বিশেষ করে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যদ্বাণী করার দক্ষতা লাভ করা। এসব উদ্দেশ্য সাধনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত শাখা থেকে উপযুক্ত ধারণা, পদ্ধতি বা পন্থা ধার করে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গবেষণা ও অধ্যয়নে উন্নততর ধারা প্রবর্তনের প্রক্রিয়া চলে, বিভিন্ন ইউনিট ও পর্যায় চিহ্নিত করে আপেক্ষিকভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপনের প্রচেষ্টাও চলে। আরো প্রয়াস চলে সনাতনপন্থী মূল্যবোধভিত্তিক চিন্তা-চেতনা এবং ব্যবহারিক পরিমাণগত তত্ত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের এবং পরিশেষে, তত্ত্ব ও রাষ্ট্রীয় নীতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়াসও চলে।

ঘ. ১৯৮০ -এর শেষপাদ থেকে সমকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্কে অতি দ্রুত, এমন কি নাটকীয় পরিবর্তনের ধারা পরিলক্ষিত হয়। প্রাকৃতিকভাবে পরিবেশ ও প্রতিবেশগত ক্ষয়ক্ষতির আশংকা ও হুমকি ব্যাপকরূপ ধারণ করে – প্রকৃতিদত্ত উপাদানসমূহ দ্রুত বিদূষিত হতে থাকে, এসব উপাদানের উত্তরোত্তর ঘাটতি বৃদ্ধির ফলে এসব নিয়ে আন্তঃরাষ্ট্রিক কলহের সম্ভাবনা বেড়ে চলে, এমন কি আমাদের গ্রহ পৃথিবীর অস্তিত্ব নিয়ে ভীতির উদ্রেক ঘটে। রাজনৈতিক সামরিক ও কৌশলগতি দিক থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের রূপান্তর হয় আরো নাটকীয়। বিশেষ করে বিশ্বের দ্বিতীয় সেরা পরাশক্তি ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতিভূ বলে পরিচিত, কম্যুনিস্ট জোটের ধারক ও বাহক খোদ সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ তোলপাড়, কম্যুনিস্ট আদর্শ পরিহার এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙ্গন ও বিপর্যয় প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সম্পর্কিত চিন্তার জগতকে ব্যাপকভাবে নাড়া দেয়। এ সময় থেকে ব্যবহারিক দশক ও ব্যবহারিক উত্তরকালীন সময়ের তত্ত্বীয় রূপরেখা, কাঠামো, মডেল প্রভৃতি ভিত্তিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। ফলে সংযোজিত হয় নতুন নতুন বিশ্লেষণী ভাবধারা। এতে মূল জিজ্ঞাসা হচ্ছে তথাকথিত আধুনিকতা-কেন্দ্রিক। কেননা নতুন বিশ্ব সভ্যতা ও সম্পর্কের ধারা সূচিত হয়–দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পর যে সভ্যতার ধারা প্রবাহ ছিল আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন ও বিকাশ ভিত্তিক। স্নায়ুযুদ্ধকালীন পুরো সময়কালে জ্ঞান-গবেষণার ধারা বলা চলে সেই আধুনিকতার স্পর্শমণ্ডিত। কিন্তু জ্ঞান-গবেষণার সেই আধুনিক ও বিজ্ঞানজাত ধারা আদৌ কি বুঝাতে সক্ষম হয়েছে আসন্ন পরিবেশ ও প্রতিবেশগত হুমকি প্রসঙ্গে? কিংবা সক্ষম হয়েছে কি ভবিষ্যদ্বাণী রাখতে যে কোনোরূপ প্রত্যক্ষ যুদ্ধ ছাড়াই একটি পরাক্রমশালী সামরিক ও কৌশলগত শক্তির ভাঙ্গন ও বিপর্যয় ঘটবে?

www.pathagar.com

এসব কারণে স্নায়ুযুদ্ধকালীন বিভিন্নতর 'আধুনিক' বিশ্লেষণী ধারার পরিবর্তে বর্তমানে, স্নায়ুযুদ্ধত্তোরকালে, জোর দেয়া হচ্ছে আধুনিকতা-উত্তরকালীন জ্ঞান-গবেষণার ওপর। এতে আধুনিককালের জ্ঞান-গবেষণার ধারা পরিহার করার কথা বলা হয় নি, কিন্তু বস্তুনিষ্ঠতার পাশাপাশি বিষয়গত উপাদান বা বিশ্লেষকের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ সংযোজনের ওপর জোর দেয়া হয়। এর অর্থ হচ্ছে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সমন্বিত বা সর্বদিক্‌গত গবেষণা পদ্ধতির প্রয়োগ। বস্তুত, আধুনিক-উত্তরকালীন যুগে উত্তরোত্তর বস্তুগত দৃষ্টিকোণের পাশাপাশি আত্মজ-বা নৈতিক দৃষ্টিকোণের উপরও জোর দেয়া হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কি কটি অধিতব্য বিষয় ?

দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে পশ্চিমী বিশ্বের কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয় স্বতন্ত্রভাবে বা পৃথক বিভাগে পড়ানো শুরু হয়। ঐ সময় থেকেই এরূপ একটি উদ্দেশ্যমূলক বিতর্কের অবতারণা করা হয় যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে কি একটি পৃথক বা স্বতন্ত্র বিষয় বিবেচনা করা সঠিক হবে? বিশ্বের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে একটি পৃথক বিষয় হিসাবে আজো পড়ানো হয় না। অনেক ক্ষেত্রে এ বিষয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান কিংবা ইতিহাস বিভাগের পাঠক্রমের অংশ হিসাবে পড়ানো হয়। কেননা অনেকের ধারণা, এতে অনেক সময়, প্রয়াস ও অর্থের অপচয় থেকে নিষ্কৃতি মেলে। প্রকৃতপক্ষে এ প্রসঙ্গে বিভাগ বা বিষয়গত ঈর্ষা-বিদ্বেষের ভাব থাকা অমূলক নয়। কোনো প্রতিষ্ঠিত বিষয় বা বিভাগের স্থলে নতুন নতুন বিষয় বা বিভাগের সংযোজন করার প্রস্তাব প্রতিষ্ঠিত বিষয়/বিভাগের বিশেষজ্ঞদের অনেকেই বিরোধিতা করে থাকেন।

কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় কোনো বিভাগ বা বিষয় একেবারে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে স্যার আলফ্রেড জিম্মার্ন অক্সফোর্ডে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি মনে করেন যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক হয়তো একেবারে একটি অভিন্ন বিষয় নয়, কিন্তু "এতে অভিন্ন দৃষ্টিকোণের কারণে বহু বিষয় সমন্বিত রূপ লাভ করে"।[৭]

বস্তুত, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিশ্চিতভাবে হচ্ছে "আন্তঃবিষয়" দৃষ্টিভঙ্গি প্রসূত। এই দৃষ্টিভঙ্গি সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের মতো আন্তর্জাতিক সম্পর্কেও বর্তমান। অবশ্য বলা বাঞ্ছনীয় যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের যে কোনো বাস্তব গবেষণা একই সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানভিত্তিক ও ইতিহাসধর্মী, কেননা এতে অতীত ও বর্তমান সরকারসমূহের সামরিক, অর্থনীতিক,

www.pathagar.com

রাজনৈতিক ও সামাজিক নীতির পাশাপাশি বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক শক্তির সংখ্যা, তাদের কর্তৃত্ব, ধন-সম্পদ প্রভাব প্রতিপত্তির পরিধি নিরূপণ করা হয়। এসব উপাদান নিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিরোধ চলে আসছে।[৮] এভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক যথার্থ-ই আন্তঃবিষয়ক রূপ পরিগ্রহ করে।

কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে একটি পৃথক বা স্বতন্ত্র বিষয়রূপে বিবেচনা করা চলে না। আন্তর্জাতিক সম্পর্কে রয়েছে তার নিজস্ব পৃথক বিষয়সূচি যা অন্যান্য বিষয়ের পাঠ্যসূচি থেকে ভিন্নতর। এতে আন্তর্জাতিক আচরণ ও ব্যবহার বিধির ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়। অতীতের ঘটনাপ্রবাহের ভিত্তিতে এতে শুধু অনুসিদ্ধান্ত গৃহীত হয় না, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদান মেলে বর্তমানের এবং এসবের ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কেও নীতিগত বক্তব্য রাখা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ রিচার্ডসন, সিঙ্গার, স্মল, রাসেট, ডয়েস, আলিসন, রোজনক্রেন্স প্রভৃতি লেখকদের গবেষণাকর্ম ও বিশ্লেষণ প্রসূত গ্রন্থাদির প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে। এসব প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব ছাড়াও বিশ্বের প্রায় সব দেশে একদল সচেতন পণ্ডিত ও গবেষক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রকৃতি ও সীমারেখা চিহ্নিতকরণে সচেষ্ট ; তাঁরা চাচ্ছেন একটি অধিতব্য বিষয়রূপে এর প্রতিষ্ঠা বং তারা তাঁদের গবেষণালব্ধ পুঞ্জীভূত জ্ঞান ও সমকালীন আন্তর্জাতিক নীতি বা ব্যবহারের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানেও সক্রিয়।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও জ্ঞানের অন্যান্য শাখা

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করা চলে যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ের বর্তমান বিবর্তিত পর্যায়ে একে সংশ্লিষ্ট বা সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য বিষয় থেকে ভিন্নরূপে উপস্থাপন করা চলে। প্রথমত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়কে এখনো অনেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অংশবিশেষ বলে মনে করে। কেননা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ব্যবহৃত জ্ঞানান্বেষণের সব পদ্ধতি ও কলাকৌশল, ধারণাগত মডেল ও বিশ্লেষণী কাঠামো, তত্ত্বীয় অঙ্গীকার ও প্রকল্প প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ের জ্ঞান-অনুসন্ধান নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।[৯] তবু দু'টি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রধানত একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা হয়ে থাকে। এতে সরকারের গঠন ও কর্মকাণ্ড প্রভৃতি বিষয় নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়, কেননা একটি রাষ্ট্রের সরকার সেই দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী। পক্ষান্তরে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে রাষ্ট্রের বা রাষ্ট্র ছাড়া বিশেষ বিশেষ দল, গোষ্ঠী, এমন কি ব্যক্তিবিশেষের নীতিগত আচার-আচরণের প্রসঙ্গ নিয়ে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ উপস্থাপন করে থাকে। তাই

www.pathagar.com

এটা বলা অযৌক্তিক হবে না যে, বিষয়গত প্রকৃতি ও পরিধির দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ভিন্ন বা স্বতন্ত্র।

দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক আইন ও সংগঠন বিষয়ের ভিন্নতর প্রকৃতি ও পরিধি উল্লেখ করা চলে। এতে আন্তর্জাতিক বিবাদ, বিচার, ন্যায়-অন্যায় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা বা সংগঠন সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক প্রশাসনিক বিষয়াদিও এর আওতার মধ্যে। কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয় আন্তর্জাতিক আইন, ন্যায়-অন্যায় বিধি বা প্রশাসনিক ব্যবস্থার সীমিত পরিসীমা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক আচরণের সার্বিক দিক নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা তত্ত্বীয় জ্ঞান উপস্থাপন করে থাকে।

তৃতীয়ত, কূটনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পার্থক্যও তুলে ধরা যেতে পারে। কূটনৈতিক ইতিহাসে অতীতের কূটনৈতিক ঘটনা প্রবাহ বা দলিলের সম্যক পরিচয় মেলে বটে, কিন্তু এ কাজে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিগত নিয়মবিধি মেনে চলা হয় না। এতে কোনোরূপ ধারণাগত ফ্রেম বা তত্ত্বীয় কাঠামোর ব্যবহারও হয় না কিংবা ভবিষ্যদ্বাণী করার প্রসঙ্গ এতে অবান্তর।

কূটনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উভয় বিষয় ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। কূটনৈতিক ইতিহাসের জ্ঞানের গভীরতা ও অভিজ্ঞতা ছাড়া আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তাত্ত্বিক ভিত দাঁড় করানো কঠিন। কেননা অতীতের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে পাশ কেটে শুধুমাত্র বর্তমান বা ভবিষ্যতের ওপর ভিত্তি করে কোনো তত্ত্ব সম্পূর্ণ হয় না। একইভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে সাম্প্রতিককালে ব্যবহৃত বিশ্লেষণী রূপরেখা, তত্ত্বীয় কাঠামো, ধারণাগত দৃষ্টিকোণ ইতিহাসের অধ্যয়নকে নীতিবদ্ধ রূপ দিতে পারে, করতে পারে অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত। এসব ছাড়া ইতিহাসের অসংখ্য ঘটনার অন্তরালে বিশ্লেষকের কাঙ্ক্ষিত পরম সত্য বিলীন হয়ে যেতে পারে, ঐতিহাসিকের ইতিহাস চিন্তা হতে পারে নিরর্থক।

পরিশেষে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ের সঙ্গে কৌশলগত বিজ্ঞান বা বিদ্যা, পরিবেশ বিজ্ঞান ও উন্নয়ন সম্পর্কিত জ্ঞান-গবেষণার সম্পর্কের বিষয় উত্থাপন করা যেতে পারে। এক দশক পূর্বেও শেষোক্ত এ তিনটি বিষয়কে সম্পূর্ণ আলাদা বিষয় বলে ধরা হতো, কিন্তু স্নায়ুযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর এসব বিষয় উত্তরোত্তর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত বিষয় বলে বিবেচিত। কৌশলগত বিদ্যা ইদানীং নিছক সামরিক কলাকৌশল বা হুমকি-পাল্টা হুমকি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকে না। শান্তিকালীন সময়েও আন্তঃরাষ্ট্রিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কি হওয়া উচিত এবং কি করণীয় এসবও কৌশলগত

www.pathagar.com

বিজ্ঞান বা বিদ্যার লক্ষ্য। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও কৌশলগত সম্পর্ক পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি কাছাকাছি।

একইভাবে বিশ্বে পরিবেশগত হুমকি ও অনুন্নয়ন সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধির কারণে পরিবেশগত বিষয় এবং অর্থনীতি বিষয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সঙ্গে অধিকতর সম্পৃক্ত হচ্ছে। বস্তুত এর কারণ হচ্ছে এসব বিষয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উপর্যুপরি শীর্ষ ও মন্ত্রী-কর্মকর্তা পর্যায়ে সম্মেলন এবং বিভিন্নমুখী কর্মসূচি গ্রহণ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চিন্তা-চেতনা, লেনদেন ও কর্মকাণ্ডের প্রবাহ যে সব বিষয়ে প্রসার লাভ করে সেসব বিষয়ে স্বাভাবিকভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়েরও বিস্তার ঘটে।

উসংহার

এটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি বা তত্ত্বীয় কাঠামোর ব্যবহার এবং ভবিষ্যৎ ধারা-প্রবাহ সম্পর্কে নীতিগত বক্তব্য উপস্থাপনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক একটি স্বতন্ত্র অধিতব্য বিষয় হিসেবে আপন স্থান অধিকার করে। এতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৃথকভাবে সঙ্গতি রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে যোগাযোগ বা লেনদেন সম্পর্কিত বিষয়, তাদের পারস্পরিক সম্পর্কে পরিলক্ষিত ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা, তাদের আন্তক্রিয়া প্রসূত পরিস্থিতি বা উদ্ভূত অবস্থা, ঘটনাবলী নিয়ে রীতিবদ্ধ চিন্তা ও জ্ঞানের সমাবেশ করা হয়।[১০] অবশ্যি প্রসঙ্গত এটাও উল্লেখ করা সমীচীন যে, জ্ঞান-গবেষণার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক হচ্ছে একটি পরিবর্তনমুখী বিষয়; এর পরিবর্তনের ধারা হচ্ছে খোদ বিশ্ব সম্প্রদায় বা আন্তর্জাতিক সমাজের পরিবর্তনের ধারার অনুরূপ। কেননা উভয়ক্ষেত্রে পরিবর্তন মানব আচরণের পরিবর্তনশীল ধারার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত।

তথ্যনির্দেশ

১. Charles A. Mc Clelland, *Theory and the Inernational System* (New York : The Macmillan Co 1960).

২. ঐ

৩. James E. Dougherty and R obert. L. Platzgraff, Jr., *Contending Theories of International Relations* (Pheladelphia, New York and Toronto : J.B. Lippircott Company, 1971),পৃ. ১ - ৭.

৪. ঐ. দ্রষ্টব্য.

৫. ঐ পৃ. ৪.

www.pathagar.com

৬. দ্রষ্টব্য, ঐ.

৭. উদ্ধৃত, ঐ, পৃ. ৮.

৮. Raymond Aron, "What is A Theory of International Relations?" in Massannat and Abcarian (eds.) *International Politics : Introductory Reading* (New York : Charles Scribner's Sons, 1970), পৃ. ১ - ৭.

৯. Eorge S. Massanna and Gilbert Abcarian (eds.) "Introductional" in *International Politics : Introductory Readings* (New York : Charles Scribner's Sons, 1970).

১০. McClelland, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭.

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বিশ্লেষণ পর্যায় সংক্রান্ত সমস্যা

ভূমিকা

সমাজবিজ্ঞানের যে কোনো শাখার মতো আন্তর্জাতিক সম্পর্কেও বিশ্লেষণ পর্যাপ্ত সমস্যা বর্তমান। বস্তুত, বিশ্লেষণ পর্যায় সংক্রান্ত সমস্যা পাঠক বা গবেষককে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নের বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি হতে বাধ্য করে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে এ জাতীয় সমস্যা উত্থাপনের মাধ্যমে নিছক শব্দগুচ্ছের চাকচিক্য প্রদর্শন করা হয় না। বরং এ ধরনের সমস্যা পর্যালোচনা বা বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে গবেষণা ও অনুসন্ধান সমস্যার রূপ বা প্রকৃতি প্রকাশ পায়, অবকাশ মেলে সমস্যার সহজ ও স্বাভাবিক সমাধান খুঁজে বের করার। প্রকৃতপক্ষে, বিশ্লেষণ পর্যায় সংক্রান্ত সমস্যার মূল্যায়ন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নের বাস্তব পদক্ষেপগুলো চিহ্নিত করে সঠিক পন্থা অবলম্বনে সাহায্য করে।

সমাজবিজ্ঞানের উপাদান

একটি বিশ্লেষণধর্মী মডেলের প্রয়োজনীয় উপকরণ পর্যালোচনা করা হলে স্বাভাবিকভাবেই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ের মতো জটিল অধিতব্য বিষয়ের বিশ্লেষণ ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ অনিবার্য হয়ে পড়ে। কেননা যুক্তিভিত্তিক বা বিজ্ঞানসম্মত একটি বিষয়ের তিন ধরনের গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে।

প্রথমত, এরূপ বিষয়ের উচ্চমাত্রার সঠিক বর্ণনা দেয়ার ক্ষমতা থাকতে হবে, একটি পূর্ণাঙ্গ, অবিবৃত চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস মেলবে এতে, এই বিষয়ে থাকতে হবে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য ও বাস্তবতা এবং ঘটনার ধারা-প্রবাহের সঙ্গে যোগসূত্র বা সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টা, কার্যকরহীনতা প্রভাব থাকবে না, নিরূপণ করবে যথার্থতা।

উপর্যুক্ত প্রসঙ্গ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দ্বিতীয় উপাদানের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এ দিকটি হলো বিশ্লেষণ প্রদানের ক্ষমতা। এর অর্থ হলো গবেষণা বা তদন্তাধীন বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে বন্ধন বা যোগসূত্র সম্পর্কে ব্যাখ্যা

www.pathagar.com

প্রদান করা। এ জাতীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যথার্থ বা বিশদ হলেই চলবে না। এটা হতে হবে সহজ, সরল ও সুস্পষ্ট।

তৃতীয়ত হচ্ছে ভবিষ্যদ্বাণী প্রদানের ক্ষমতা। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মতো একটি সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে এ জাতীয় ক্ষমতা অর্জন করার প্রস্তাব শুধু সঙ্গতই নয়, বরং এর প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও অনস্বীকার্য। প্রশ্ন হতে পারে, চলমান ঘটনাপ্রবাহের আলোকে বা পরিবর্তনশীল মানবিক বা সামাজিক আচরণের প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যৎদ্বাণী কিভাবে করা চলে? এটা হতে পারে সম্ভাব্য ঘটনাপ্রবাহের প্রেক্ষাপটে, উদ্ভূত পরিস্থিতির ভিত্তিতে। যেমন, বলা হয় "যদি এরূপ হয় তবে ঐরূপ হতে পারে।" অথবা একটি রাষ্ট্র কোনো একটি বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টি করলে এও বলা চলে কি যে তার ফলশ্রুতিতে বা পরিণামে ঘটবে বিশেষ বিশেষ ঘটনা? আবার প্রশ্ন হতে পারে, ভবিষ্যদ্বাণী প্রদানের প্রক্রিয়া কিরূপ হতে পারে? উত্তরে কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। যেমন একটি চলন্ত গাড়ির একসিলেরাটেরারে চাপ দিলে গাড়ির বেগ বৃদ্ধি পায়। অথবা কারও ওপর ঘুষি হাঁকলে প্রতিপক্ষ পাল্টা ঘুষি হাঁকতে পারে বা ভীত হয়ে সরে যেতে পারে।[১] আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে একই ধরনের দৃষ্টান্ত এসে যায়। যেমন একটি জাতি বা রাষ্ট্র সামরিক হুমকি বা আগ্রাসন কিংবা আক্রমণের সম্মুখীন হলে কোনো পর্যায়ে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখাতে বা পালা ব্যবস্থা নিতে পারে– তা নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে।

এ পর্যায়ে প্রশ্ন দাঁড়ায় এ জাতীয় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সবচেয়ে উত্তম বর্ণনা, ব্যাখ্যা বা ভবিষ্যদ্বাণী করার পন্থা সুনিশ্চিত করা যায় কিভাবে? অন্যান্য প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো গবেষণা বা তদন্তাধীন একটি বস্তু, প্রসঙ্গ বা ব্যাপার নিয়ে বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা চলে। যে কোনো পাণ্ডিত্য বা বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাহ-ই হচ্ছে নিয়ম। অর্থাৎ গবেষণা ও তদন্তে নিয়োজিত যে কোনো ব্যক্তি সমগ্র বিষয় বা আংশিক বিষয়াদি নিয়ে অনুসন্ধান করতে পারেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে বলা চলে যে, তদন্তকারী যেমন নিখিল বিশ্বকে নিয়ে অনুসন্ধান চালাতে পারেন তেমনি বিশ্বের ক্ষুদ্রতর অংশ নিয়েও গবেষণা বা তদন্ত করতে পারেন। প্রয়োজন হাচ্ছে পর্যাপ্ত/কাঠামো সুচিন্তিতভাবে চিহ্নিত করা।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ের সীমারেখা

প্রকৃতপক্ষে, 'অতিকায়' ও 'পাতি' বা 'বড়-ছোট' ('Macro' and 'micro') বিশ্লেষণ পর্যায় নিয়ে অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের মতো সামাজিক বিজ্ঞানের সব বিষয়ে বিতর্ক চলে আসছে বহুদিন ধরে। এ

www.pathagar.com

বিতর্কের মূল লক্ষ্য হচ্ছে গবেষণা বা অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে পর্যায় বা স্তর চিহ্নিত করা – গবেষক কি যৌথ কিংবা সমষ্টিগত শক্তিকাঠামোতে তার অনুসন্ধানের প্রয়াস প্রসারিত করবে, না কি ব্যক্তিমানুষের কর্মকাণ্ডের পর্যায়ে তার তদন্ত সীমিত রাখবে? অন্যান্য প্রায় সব বিষয়ে এ নিয়ে বিতর্ক অনেকখানি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং এ প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলো চিহ্নিত করে অনেক ক্ষেত্রে সম্ভাব্য পর্যায় নির্ধারণ করা হয়।

কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বিশ্লেষণ পর্যায় সংক্রান্ত সমস্যা বহুদিন উত্থাপিত হয় নি। এমন কি ১৯৪০-৫০-এর দশকের দিকে যখন 'বাস্তববাদ' ও 'আদর্শবাদের' মধ্যে বেশ বিতর্কের অবতারণা করা হয় তখনো এ সমস্যা আলোচিত হয় নি। বস্তুত এটা বলা অমূলক হবে না যে, বহুকাল আন্তর্জাতিক সম্পর্কে গবেষণা বা অনুসন্ধানে নিশ্চিত বা কোনো স্থির নির্ধারিত পর্যায় ছিল না। অবশ্যি অনেকে রাষ্ট্র বা জাতিকে প্রায় তাঁদের অনুসন্ধানের নির্ভেজাল লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেন। তবু এখনো আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অনেক গবেষণা কর্মের জটিলতায় পাঠককে হতবুদ্ধি হতে হয় যে, এরূপ কর্মের লক্ষ্যের সীমা বা পরিসীমা কি সমগ্র সিস্টেম, না কি আন্তর্জাতিক সংগঠন, অঞ্চল, বা কোনো শক্তিসংঘ মৈত্রী ব্যবস্থা, জাতির ঊর্ধ্বে কোনোরূপ সমিতি, না কি চাপ সৃষ্টিকারী কোনো জনগোষ্ঠী, দল, শ্রেণী, মুৎসুদ্দি বা ব্যক্তিবিশেষের প্রভাব?

ডেভিড সিঙ্গার ও বিশ্লেষণ পর্যায়সংক্রান্ত সমস্যা

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হবে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেও যখন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যয়ন ও গবেষণা ক্রমশ প্রসার লাভ করে তখনো এ বিষয় পর্যায় সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করা হয় নি। এতে এর জ্ঞান-গবেষণার ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে দুর্বলতা প্রকাশ পায়। ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাধারণভবে তত্ত্বীয় উন্নয়নের ব্যাঘাত ঘটে। ১৯৫০-এর দশকের দিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে তত্ত্বীয় ধ্যান-ধারণা বলতে অনেকে বুঝেন অনুমানসিদ্ধ সভ্যতার ধারা যা' উপস্থাপন করেন আর্নল্ড টয়েনবি, 'বাস্তবতাবাদ' যার মুখ্য প্রবক্তা ছিলেন হ্যানস মরগেনথু, মোর্টন কাপল্যানের সিস্টেম মডেল, জর্জ মডেলস্কী'র সামাজিক মডেল 'কৃষি সমাজ' (Agrari'a) বা আর্থনীতিক মডেল 'শিল্প সমাজ' ('Industria') এবং উইলিয়াম রাইকারের 'রাজনৈতিক শক্তিসংঘ' ('Political Coalition') প্রভৃতি।[২] কিন্তু রীতিবদ্ধভাবে আন্তর্জাতিক আচরণের বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যায়ক্রমিক তত্ত্বীয় জ্ঞানলাভের প্রয়াস ছিল দুলর্ভ। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এ জাতীয় তত্ত্বীয় দুর্বলতা পর্যবেক্ষণ করে প্রথিতযশা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক জে. ডেভিস সিঙ্গার ১৯৬১ সনে

www.pathagar.com

প্রথম বারের মতো এ বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্যাদি সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত করার প্রয়াস পান।[৩] এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সঠিক উপাত্ত সংগ্রহে যথার্থ পন্থা অবলম্বন করা, অনুসন্ধানের বিষয় বিবেচনা করা, সংশ্লিষ্ট 'চলকসমূহ'কে (Variables) বাছাই করা এবং নিয়মমাফিক যথার্থ উপসংহারের পৌঁছা।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ পর্যায সংক্রান্ত সমস্যা চিহ্নিতকরণে মৌলিক দিশারীর ভূমিকা পালন সত্ত্বেও সিঙ্গারের ধারণাগত ফ্রেমে কিছুটা দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমত, তিনি 'সাব-সিস্টেম' ('Subsystem') ও 'জাতি-রাষ্ট্র' ('Nation-state')-এ দু'পর্যায়ের সংমিশ্রণে বিভ্রান্তি ঘটান। কেননা জাতি-রাষ্ট্রকে তিনি সরাসরি সাব সিস্টেমের পর্যায়ে টেনে আনেন।

দ্বিতীয়ত, তাঁর বিশ্লেষণ পর্যায় সংক্রান্ত সমস্যা চিহ্নিতকরণে তিনি পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণে অভ্যন্তরীণ রাজনীতির যোগসূত্র স্থাপনে ব্যর্থতার পরিচয় দেন বা এ জাতীয় যোগসূত্রের অবমূল্যায়ন করেন। একই সঙ্গে এও বলা চলে, পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়নে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবিশেষের ভূমিকাকে তিনি রাষ্ট্রের বা জাতির যৌথ সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্যের সঙ্গে অভিন্নরূপে উপস্থাপন করেন। অবশ্যি সিঙ্গার তাঁর পর্যায় চিহ্নিতকরণে সম্ভাব্য ভুলভ্রান্তির কথা নিজেও স্বীকার করেন এবং তাঁর পরিকল্পিত ফ্রেমের উন্নয়নের সুপারিশ করেন।[৪]

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ পর্যায়

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ের চিরায়িত ধারণার ভিত্তিমূলে রয়েছে পররাষ্ট্র নীতি, আর অভ্যন্তরীণ নীতি যেখানে শেষ হয় সেখান থেকেই সূচিত হয় পররাষ্ট্র নীতি। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত কাঠামো শূন্যতা ওপর গড়ে ওঠে না, দেশের ভেতর ও বাইরের পরিবেশ ও প্রতিবেশের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী গৃহীত হয় সকল সিদ্ধান্ত।[৫]

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ের অধ্যয়ন ও গবেষণায় বর্তমানে মোটামুটি পাঁচটি বিশ্লেষণ পর্যায় চিহ্নিত করা চলে ঃ

১. সিস্টেম পর্যায়;
২. সাবসিস্টেম পযায়;
৩. জাতীয় রাষ্ট্র পর্যায়;
৪. অভ্যন্তরীণ রাজনীতির যোগসূত্র পর্যায়;
৫. সিদ্ধান্তগ্রহণ পর্যায়ে ব্যক্তিবিশেষের ভূমিকা।

www.pathagar.com

১. সিস্টেম পর্যায়

এ হচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়ন ও গবেষণায় সবেচেয়ে ব্যাপকতর ও বিশদ পর্যায়। এ পর্যায়ের মাধ্যমে সমগ্র আন্তর্জাতিক সিস্টেম নিয়ে অনুসন্ধান চলে। এতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সব আন্তক্রিয়া, সব কার্যকলাপ ও পারিপার্শ্বিকতা নিয়ে অনুসন্ধান করা হয়। এ পর্যায়ে (ক) শক্তিসংঘের সৃষ্টি ও অবসান, (খ) শক্তি সংগঠনের বারংবার প্রকাশ ও স্থিতি, (গ) আন্তর্জাতিক সিস্টেমের স্থিতি বা স্থায়িত্ব, স্থিতিহীনতা ও পরিবর্তন, (ঘ) আন্তর্জাতিক সিস্টেমের পারিপার্শ্বিক অভিব্যক্তি প্রভৃতি পর্যালোচনা বা নিরূপণ করা হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সিস্টেম পর্যায়ের যথাযথ ব্যবহার বা প্রয়োগ করা হলে সমগ্র আন্তর্জাতিক সম্পর্কে সার্বিক বিশদ দিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যেতে পারে।

সিস্টেম বিশ্লেষণ পর্যায় ব্যাপকতর ও বিশদ রূপ পরিগ্রহ সত্ত্বেও এ পর্যায়ে কিছু কিছু সমস্যা দেখা যায়। প্রথমত, এ বিশ্লেষণ পর্যায়ে জাতীয় রাষ্ট্রের ওপর আন্তর্জাতিক সিস্টেমের প্রভাব অতিরঞ্জিত করে দেখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় ; পক্ষান্তরে এতে জাতীয় রাষ্ট্রের ভূমিকা, আন্তর্জাতিক সিস্টেমের ওপর এর পাল্টা প্রভাব অনেকখানি উপেক্ষিত হয়। ফলে এ পর্যায়ে একটি স্থিরনির্দিষ্ট বা পূর্বপরিকল্পিত ধারা পরিলক্ষিত হয়, সিস্টেমের অংশবিশেষ বা নিম্নস্তর পর্যায়ের স্বতন্ত্র বা স্বাধিকারভিত্তিক কর্মকাণ্ড হয় অবহেলিত।

দ্বিতীয়ত, সিস্টেম পর্যায়ে জাতীয় রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতিতে অধিকমাত্রায় সদৃশ বা সমরূপ ধারা রয়েছে বলে ধরে নেয়া হয় ; এতে কোনোরূপ বৈসাদৃশ্য, বৈচিত্র্যের প্রবণতা বা বহুরূপা অস্তিত্বের স্বীকার করা হয় না। ফলে এ মডেলে জাতীয় রাষ্ট্রকে 'কালো বাক্সবন্দি' ও 'বিলিয়ার্ড বলের' অনুরূপ ধারণায় রূপান্তরিত করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে গভীর পার্থক্য বা বৈচিত্র্য ধারা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সিস্টেম পর্যায়ের বিশ্লেষণে সব জাতীয় রাষ্ট্রকে সমরূপ চরিত্রের আবরণে উপস্থাপন করা হয়।

তৃতীয়ত, সিস্টেম বিশ্লেষণ পর্যায়ে একটি জাতীয় রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে পরিলক্ষিত বহুমুখী ও পরিবর্তনশীল খুঁটিনাটি বিষয়গুলো প্রায় সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করা হয়। কেননা এ মডেলে বিস্তৃত বস্তুর দিক প্রত্যক্ষ করার মতো পদ্ধতিগত সূক্ষ্মতা নেই। এ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান বলে কোনোরূপ ধারণাগত কাঠামো বা তত্ত্ব উপস্থাপন করা হলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের শুধুমাত্র বাহ্যিক আচরণের কতিপয় দিক তুলে ধরা যেতে পারে, এর সার্বিক অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় না।

www.pathagar.com

চতুর্থত, সিস্টেম পর্যায়ের বিশ্লেষণ ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা আপেক্ষিকভাবে সীমিত এবং এ ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে তত্ত্বীয় বক্তব্য অনেকটা সাধারণ বা সার্বিক রূপ উপস্থাপন করতে পারে মাত্র। এ প্রসঙ্গে বিচার্ড রোজনক্রন্স এবং মোর্টন কাপলানের মতো সিস্টেম বিশ্লেষকের ধারণাগত কাঠামো বা তত্ত্বের বিষয় উল্লেখ করা চলে।[৬]

২. সাব-সিস্টেম পর্যায়

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে তত্ত্বীয় সম্পর্ক বিষয়ে তত্ত্বীয় গবেষণার মূল লক্ষ্য হচ্ছে একটি সর্বব্যাপী একক তত্ত্বের উদ্ভাবন এবং এরূপ প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে বটে, কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এতো ব্যাপক যে এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বীয় অভিজ্ঞতা লাভ প্রায়শ দুরূহ এবং একক তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় এর সার্বিক রূপ কখনো প্রকাশ করা যাবে কি না সন্দেহ।[৭] বস্তুত, সমককালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বহু ধরনের সত্তা, জনগোষ্ঠী, দল, উপদল ও সংস্থা গড়ে উঠছে। এ সবের মধ্যে রয়েছে আঞ্চলিক, নিরাপত্তা, মৈত্রী ব্যবস্থা বিষয়ক উপাদান, আর্থনীতিক, উৎপাদক, উৎপাদিত বা ভোগ্যপণ্য গ্রাহক, রণনৈতিক ও আদর্শগত সত্তা বা জোট উপজোট। এসব আন্তর্জাতিক সিস্টেমেরই বিভিন্ন ভাব-অভিব্যক্তিরূপে প্রকাশ পাচ্ছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এসব হচ্ছে বৃহত্তর সিস্টেমের অব্যাহত উপাদান বা অংশবিশেষ। সাব-সিস্টেম পর্যায়কে আবার বৃহত্তর সিস্টেম পর্যায় ও ক্ষুদ্রতর ব্যক্তি পর্যায়ের সমঝোতামূলক মধ্যবর্তী পর্যায়রূপেও উপস্থাপন করা যেতে পারে।

সাব-সিস্টেম বিশ্লেষণ পর্যায়ে অনুসন্ধানের লক্ষ্য হচ্ছে এভাবে দেখা যে দু'টো বা ততোধিক সাব-সিস্টেম কি করে আন্তক্রিয়ায় বিজড়িত হয়, কি করে একে অপরের সীমা-পরিসীমায় হস্তক্ষেপ করছে, কি করে প্রতিটি সদস্য ইউনিটের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের সমন্বয় সাধন করছে, কি করে মৈত্রী সম্পর্ক গড়ে উঠছে, পণ্যদ্রব্য উৎপাদন বা বন্টন সংস্থা ও কার্যকর সংস্থা-সংগঠনসমূহের কর্মকাণ্ড কিরূপ প্রভৃতি বিষয়াদি। চার্লস ম্যাকল্যালেণ্ড এর ধারণাগত কাঠামো প্রদান করেন। ব্রুস এম. রাসেট এর পরিমাণগত ও অভিজ্ঞতা প্রসূত দিক নিয়ে পরীক্ষা–নিরীক্ষা করেন। বাইণ্ডার ও মাইকেল ব্রেচার যথাক্রমে মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সত্তার সংজ্ঞা ও পরিচয় নির্ধারণে সাব-সিস্টেম বিশ্লেষণ পর্যায় ব্যবহার করেন। এতে সিস্টেম বিশ্লেষণ পর্যায়ের দুর্বলতার কিছুটা উপসর্গ থাকলেও এটা বলা সঙ্গত হবে যে, উচ্চতম পর্যায়ে ও নিম্নতর পর্যায়গুলোর অতিরঞ্জন প্রবণতা বা সম্ভাব্য বিকৃতি এর ব্যবহারের মাধ্যমে এড়ানো যেতে পারে।[৮]

www.pathagar.com

৩. জাতীয় রাষ্ট্র পর্যায়

আন্তর্জাতিক সম্পর্কে জাতীয় রাষ্ট্র মৌলিক বা প্রধান কার্যকারক রূপে অভিহিত। পশ্চিমী জগতে যেখানে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা শুরু হয় সেখানে জাতীয় রাষ্ট্রকে মুখ্য ভূমিকায় দেখানো হয় এবং কালে সব গ্রন্থ ও লেখা-লেখিতে ভূমিকা বারংবার পুনরুল্লেখিত হয়। এই বিশ্লেষণ পর্যায় গ্রহণের ফলে কতকগুলো তাৎপর্যপূর্ণ সুবিধার বিষয় উল্লেখ করা চলে। যেমন ঃ

প্রথমত, জাতীয় রাষ্ট্র বিশ্লেষণ পর্যায়ের ব্যবহারের ফলে আন্তর্জাতিক সিস্টেমের বিভিন্ন কার্যকারকদের মধ্যে পার্থক্য বা বৈসাদৃশ্য তুলে ধরা সম্ভব হয়। এ পর্যায়ে তুলনার সুবিধে হলো, এ তুলনা সার্বিক বা মোটামুটি না করে বিশেষ বিশেষ বা নির্দিষ্ট দিক নিয়ে আপেক্ষিকভাবে তুলে ধরা যায়।

দ্বিতীয়ত, এর ব্যবহারের ফলে ভ্রান্তিমূলক সমরূপ বৈশিষ্ট্য বা চরিত্র দাঁড় করানোর প্রবণতা এড়ানো সম্ভব হতে পারে।

তৃতীয়ত, এ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে বিজড়িত বিষয়াদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার-বিবেচনা করা যেতে পারে।

চতুর্থত, জাতীয় রাষ্ট্র বিশ্লেষণ পর্যায়ের ব্যবহারে জাতীয় নীতির সার্বিক আদর্শ, উদ্দেশ্য বা অন্তর্নিহিত কারণ উদঘাটন করা সম্ভব হতে পারে। এক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা কতখানি তাদের পররাষ্ট্র নীতি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য চিহ্নিত করেন বা এসব বাস্তবায়নের তৎপর এবং সক্রিয় হন তা মূল্যায়ন করা যেতে পারে। এ পর্যায়ে আন্তর্জাতিক আচরণ কতখানি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বা বিশেষ বিশেষ রণনৈতিক স্বার্থোদ্ধারের কাজে ব্যাপৃত তা নির্ধারণ করা সম্ভব হতে পারে।

পঞ্চমত, জাতীয় রাষ্ট্র বিশ্লেষণ পর্যায়ে ব্যবহারের মাধ্যমে যে প্রক্রিয়ায় জাতীয় লক্ষ্যসমূহ নির্দিষ্ট বা বাছাই করা হয়, বা এসব প্রক্রিয়ায় যে যে উপাদান প্রবিষ্ট হয় এবং যে সব প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থেকে সেসবের উদ্ভব হয়– এসব প্রভৃতির পটভূমি ও পররাষ্ট্র নীতির চলকে এসবের বহিঃপ্রকাশ বা অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা প্রদান করা সম্ভব হতে পারে।

ষষ্ঠত, জাতীয় রাষ্ট্র পর্যায়ের বিশ্লেষণ ব্যবহারের ফলে পররাষ্ট্র নীতির প্রতীতি সম্পর্কিত বা বাহ্য ব্যাপার সংক্রান্ত সব সত্তা বা বস্তু (Phenomenological issues) এবং এ ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত সব আচরণ ব্যাখ্যা করা সম্ভব হতে পারে। এ প্রসঙ্গে বস্তুগত উপাদান ও বিষয়গত বা আত্মজ উপাদানের পাশাপাশি জাতীয় রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি প্রভৃতি কারণে জাতীয়

www.pathagar.com

আচরণে বিভিন্ন বা বিচিত্রমুখী, এমন কি প্রায়শ তাদের পরস্পরবিরোধী অঙ্গীকার ('Assumption') নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা যেতে পারে। এসবের মধ্যে রয়েছে (ক) প্রকৃতিগত পারিপার্শ্বিক অবস্থার বাস্তবতা ; (খ) এসব বাস্তবতার প্রত্যক্ষজ রূপ ; (গ) পদ্ধতিগত পক্ষপাতিত্ব বা অনুরাগ ; যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে যে, একটি জাতির ওপর বৈদেশিক শক্তির প্রভাব এবং এর সাধারণ পররাষ্ট্র নীতিগত আচরণের সম্পর্কের প্রতি অবজ্ঞা অথবা যে সব মাধ্যম ব্যবহার করে বৈদেশিক উপাদানসমূহ পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণে প্ররোচিত করে সে সবের উপেক্ষা-এ জাতীয় প্রসঙ্গ পর্যালোচনা করাই ; (ঘ) প্রশ্ন তোলা যেতে পারে–জাতীয় রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষজ চিন্তাধারা জাতীয় পররাষ্ট্র নীতির অভিজ্ঞতায় কতখানি প্রকাশ পায়? (ঙ) পরিশেষে প্রশ্ন হতে পারে–একটি জাতি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিমণ্ডলে কি একটি কার্যকারক সামাজিক সংস্থা, স্বয়ং একটি ঐক্যবদ্ধ সত্তা, না কি ব্যক্তিমানুষ ও প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির সমন্বয়ে সংগঠিত একটি সমষ্টিগত অভিব্যক্তি মাত্র? সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান হিসেবে যারা অভিজ্ঞতা, ধারণা বা প্রত্যক্ষণ সহকারে প্রতীতি সম্পর্কিত বিমূর্ত ভাব ব্যক্ত করতে পারে তারা আদৌ প্রাসঙ্গিক কিনা তাও এ পর্যায় ব্যবহারে দেখা যেতে পারে।[৯]

উল্লেখ্য, জাতীয় রাষ্ট্র বিশ্লেষণ পর্যায়ের ব্যবহার অত্যন্ত সতর্কতা সহকারে, সুচিন্তিতভাবে করা প্রয়োজন। অসতর্কতা বা অসাবধানতাবশত এর প্রয়োগ করা হলে বিকৃত ধরনের বা উল্টো সিদ্ধান্ত, অতিরঞ্জিত উপসংহার, অতিমাত্রায় পৃথকীকরণ, সীমিত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে ইন্ধন যোগাতে পারে বা সংকীর্ণতার আবেশ স্পর্শ করতে পারে। এতে সঠিক ধারণাগত বা তত্ত্বীয় উন্নয়ন ব্যাহত হতে পারে। একমাত্র পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সমরূপ ধারা প্রকাশ পাবে, বারংবার তুলনা ও সাদৃশ্য রূপ মূল্যায়নের মাধ্যমে তাত্ত্বিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত হতে পারে।

৩. অভ্যন্তরীণ রাজনীতির যোগসূত্র পর্যায়

এই বিশ্লেষণ পর্যায়ে জাতীয় সংক্রান্ত রাষ্ট্রের বৈদেশিক কর্মকাণ্ড ও পররাষ্ট্র নীতির গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে দেখা হয় কি করে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রথা ও ব্যবস্থা আন্তঃরাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্ব ও বিবাদের মূলে ইন্ধন যোগায় এবং কি করে নেতৃবর্গ পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়নে রাজনৈতিক শক্তি সঞ্চয় করেন, কি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর বিষয়ে রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্রিয় হন, কর্মতৎপর হন আন্তর্জাতিক বিষয়ে। রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি ও অভ্যন্তরীণ নীতির মধ্যে এরূপ বন্ধন বা যোগসূত্রের প্রসঙ্গ প্রথম তুলেন জেমস এন. রোজনৌ তাঁর "Lingkage Politics" শীর্ষক গ্রন্থে। পরে অনেকে এই

www.pathagar.com

বিশ্লেষণ পর্যায়ের সূত্র ধরে গবেষণা কর্মে তৎপর হন। দৃষ্টান্ত হিসেবে জোনাথান উইল-কেনফেল্ড-এর সম্পাদিত গ্রন্থের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে।[১০]

৪. সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে ব্যক্তি বিশেষের ভূমিকা

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক যেহেতু বৃহত্তর সমষ্টিগত সত্তা নিয়েই প্রধানত অনুসন্ধান করে থাকে সেহেতু ব্যক্তিবিশেষের ভূমিকা এক্ষেত্রে মৌলিক রূপে দেখা হয় না। তবু বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত বহু ব্যক্তিত্ব এবং বিভিন্ন জাতীয় রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়নে কিছু কিছু নেতৃবৃন্দ যথাক্রমে সনদ বা সাংবিধানিক ধারার কারণ ছাড়াও সম্ভবত নিজ নিজ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য মণ্ডিত ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাব রাখতে পারেন। এসব সম্ভাব্য ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ পর্যায় ব্যক্তিমানুষের বিশেষ ভূমিকার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে পারে না। এ জাতীয় বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ কোরাল বেল-এর 'Kissinger and Diplomacy of Detente' শীর্ষক গ্রন্থের প্রসঙ্গ' উল্লেখ করা চলে।

আপেক্ষিক উপযোগিতা

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণার বর্তমান পর্যায়ে এটা বলা মুশকিল যে উপরিউক্ত পাঁচটি বিশ্লেষণ পর্যায়ের মধ্যে কোনোটি বেশি আপেক্ষিকভাবে উপযোগী। সম্ভবত বিভিন্নমুখী তত্ত্বীয় ও ধারণাগত উন্নয়নের জন্য সব পর্যায়ের-ই কিছু না কিছু ইতিবাচক অবদান থাকতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে, যে কোনো সময়ের আন্তর্জাতিক সিস্টেমকে ভালোভাবে বুঝতে হলে ঐ সময়ের আন্তক্রিয়া এবং সেই সম্পর্কিত সব তত্ত্বীয় মূল্যায়ন অনুধাবন করতে হবে।[১১] তবু বর্ণনামূলক গুণাবলীর দিক বিবেচনা করলে সিস্টেম পর্যায় অধিকতর বিশদ ও সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরতে পারে। এ পর্যায় ব্যাপকতা, গভীরতা ও অন্তর্নিহিত ভাব বা রূপ ভালোভাবে উপস্থাপন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে নিম্নতর বিশ্লেষণ পর্যায়সমূহের অবদান আপেক্ষিকভাবে কম। পক্ষান্তরে, ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নতর পর্যায়গুলো অধিকতর ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিভিন্ন প্রক্রিয়া এবং বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলাফল উপস্থাপনের ক্ষেত্রে নিম্নতর পর্যায়সমূহ মূল্যবান অবদান রাখতে পারে। ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্পর্কে সম্ভবত সব বিশ্লেষণ পর্যায়ের মাধ্যমে কোনোরূপ বক্তব্য রাখা চলে যা হবে হৃদয়গ্রাহী বা তাৎপর্যপূর্ণ। তবে সাধারণত কজন নীতিনির্ধারক 'X-Y' পরিস্থিতির দিকে অধিকতর আগ্রহী।

www.pathagar.com

তার মানে, নীতি নির্ধারকেরা সাধারণ তত্ত্বের চাইতে বিশেষ বিশেষ অবস্থা বা পরিস্থিতি এবং এ সবের মধ্যে নিহিত তাত্ত্বিক বিষয়ে অধিকতর আগ্রহী। অন্যদিকে, পণ্ডিত, গবেষক ও বিশ্লেষকদের আগ্রহ অধিকতর নিবদ্ধ সিস্টেম ও সাব-সিস্টেম বিশ্লেষণ পর্যায়ের দিকে।

কোন্ বিশ্লেষণ পর্যায়ের গুরুত্ব বেশি?

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অনুসন্ধান ও গবেষণার উপর্যুক্ত পাঁচটি বিশ্লেষণ পর্যায়ের মধ্যে কোনো বিশেষ একটির প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দেয়া সম্ভবত কঠিন হবে। কেননা এই গুরুত্ব নির্ভর করবে গবেষক বা বিশ্লেষকের আগ্রহ বা মনমানসিকতার ওপর। নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা চলে যে, প্রতিটি বিশ্লেষণ পর্যায়ের কিছুটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, ভিন্নতর অন্তঃদৃষ্টি গঠনে ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে বুঝা বা অনুধাবনে সহায়তা করতে পারে, সাহায্য করতে পারে তত্ত্বীয় আলোকে সমষ্টিগত জ্ঞান-ভাণ্ডার গড়ে তুলতে। কিন্তু এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, যে কোনো অনুসন্ধান বা গবেষণাকর্মের মৌলিক, সম্ভবত প্রাথমিক পদক্ষেপ হবে তার বিশ্লেষণ সংক্রান্ত পর্যায়ের সমস্যা চিহ্নিত করে এর চূড়ান্ত সমাধান সুনিশ্চিত করা।

অবশ্যি গবেষক বা বিশ্লেষক তাঁর গবেষণা বা বিশ্লেষণের লক্ষ্য ও পদ্ধতিগত অভিরুচি অনুযায়ী যে কোনো পর্যায় গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু বিশ্লেষণের মাঝপথে কিছুতেই তিনি তাঁর পর্যায়ের মূলধারা পরিবর্তন করতে পারেন না। কেননা তাঁকে মনে রাখতে হবে প্রয়োজনীয় যুক্তিযুক্ত বর্ণনা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যদ্বাণী করার মতো তত্ত্বীয় কাঠামোর কথা। এছাড়া, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সমকালীন জ্ঞান-গবেষণা অনুশীলনের ধারার দিকেও নজর দিতে হবে। এ ধারায় রয়েছে এমন অভিজ্ঞতালব্ধ দৃষ্টিভঙ্গি ও উপাত্ত সংগ্রহের প্রক্রিয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ যাতে জ্ঞানের যথার্থ সমন্বয় ঘটানো সম্ভব হতে পারে, জ্ঞান পুঞ্জীভূত রূপ লাভ করে এবং ঘটবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে তত্ত্বীয় উন্নয়ন।

তথ্যনির্দেশ

১. J. David Singer "The level of Analysis Problem in International Relations, in J. David Singer (ed.) *Qualitative International Politics: Insights and Evidence*, পৃ. ৩৮ - ৩৭.

২. James E. Dougherty and Robert L.Platbraff, Jr. *Contending Theories of*

www.pathagar.com

International Relations (Philadelpai, New York and Tororto : J.B. Lippincott Company, 1971) পৃ. ১৯.

৩. Singer "The Level of Analysis Problem in International Relations." প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪.

৪. ঐ. পৃ. ৪৫.

৫. H.A. Kissinger, "Domestic Structure and Foreign Policy." in Massannat and Abcarian (ebs) প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪.

৬. Maassannat and Abcarian, প্রাগুক্ত, পৃ ১-২.

৭. ঐ, পৃ. ৪০-৪২.

৮. Normamn J. Padelford et al *The Dynamics of International Politics*, 3rd edn. (New York : Macmillan,. 1976) পৃ. ৩৪, ৪২ - ৪৩.

৯. Singer, "The Level of Analysis Problem in International Relations," প্রাগুক্ত,

১০. Massannat and Abcarian (eds) প্রাগুক্ত, পৃ. ৩.

১১. Padelford, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৪

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ প্রতিযোগী তত্ত্বীয় পদ্ধতি

ভূমিকা

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যয়নে বিশ্লেষণ পর্যায়সংক্রান্ত সমস্যা পর্যালোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে কি কি বিষয়ের অনুসন্ধান বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে তা নিরূপণ করা অথবা যে বস্তু, ব্যাপার বা উপাদান নিয়ে এতে অনুসন্ধান করা হবে তা চিহ্নিত করা। কিন্তু রীতিবদ্ধভাবে গবেষণা বা অনুসন্ধান করতে হলে আরেকটি বিষয়ের দিকেও দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন—তাহলো কিভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে অনুসন্ধান বা গবেষণা পরিচালনা করা হবে, অর্থাৎ কি পদ্ধতি ব্যবহার করে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হবে, সংগ্রহ করা হবে উপাত্ত ও তথ্যাদি এবং কি প্রক্রিয়ায় সাজানো হবে এসব। বিশ্লেষণ পর্যায়সংক্রান্ত সমস্যার মতো এ ক্ষেত্রেও সমস্যা বিদ্যমান, কেননা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গবেষণায় তত্ত্বীয় পদ্ধতির ব্যবহার করা চলে। এসবের মধ্যে পাঁচটি প্রধান প্রধান পদ্ধতির বিষয় উল্লেখ করা যায় ঃ (১) ঐতিহাসিক পদ্ধতি; (২) সিস্টেম পদ্ধতি; (৩) আদর্শ-মূল্যবোধভিত্তিক পদ্ধতি; (৪) নীতি বিজ্ঞান পদ্ধতি; (৫) সমন্বিত পদ্ধতি।

ঐতিহাসিক পদ্ধতি

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা হিসেবে ইতিহাসের কাছে অনেকখানি ঋণী, কেননা, মোর্টন ক্যাপল্যানের কথায়, ইতিহাস হচ্ছে "এক মহাপরীক্ষাগার যেখানে সকল আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়।"[১] বস্তুত ইতিহাস আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নের সনাতন বা চিরাচরিত অথচ প্রয়োজনীয় পদ্ধতি। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে অতীতের নীতিগত ধারা, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, অতীতের চিন্তাধারা, উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত, ঐতিহাসিক মৈত্রী ও দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক, লেনদেন বা আচার ও আচরণের মাধ্যমে গড়ে ওঠা আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের নীতিমালা, কূটনৈতিক ব্যবহারের ঐতিহ্য প্রভৃতির দিগদর্শন মেলে। ঐতিহাসিক পদ্ধতি সঠিক সাক্ষ্য বহন করে একটি রাষ্ট্রের নীতিকে বিঘোষিত আদর্শ ও লক্ষ্য কি, আর সেই রাষ্ট্রের বাস্তব ব্যবহারে ঐ

www.pathagar.com

আদর্শ ও উদ্দেশ্যে কতখানি প্রতিফলিত হয়ে থাকে। এমন কি ঐতিহাসিক পদ্ধতি রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়া, জনমত ও দল ও উপদলের বিশেষ বিশেষ স্বার্থ ও উদ্দেশ্য, অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতির মধ্যে সম্পর্ক, বৈদেশিক সম্পর্কের কারণ ও ফলাফল প্রভৃতি নির্ণয়ে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, ঐতিহাসিক পদ্ধতির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরা সম্ভব। বস্তুত, কোনো একটি বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করে গবেষক ও বিশ্লেষকেরা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সার্বিক ধারা তুলে ধরতে পারেন না, কিংবা নীতি নির্ধারকেরাও বুঝতে পারেন না যে উদ্ভূত নতুন নতুন পরিস্থিতিতে কিরূপ পন্থা গ্রহণ করা যেতে পারে বা ভিন্নতর অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন পক্ষের সঙ্গে কি ধরনের সম্পর্ক স্থাপনে নীতি গ্রহণ সমীচীন হবে।

দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিক পদ্ধতি অতীত ঘটনাপ্রবাহ, অতীত ব্যবহরিক ধারা, অতীতে প্রদর্শিত অভিলাষ ও আগ্রহের ভিত্তিতে সম্ভাব্য কর্মপন্থা গ্রহণের দিক-নির্দেশনা দিতে পারে হয়তো, কিন্তু পরিবর্তিত সময় ও কালের প্রেক্ষাপটে, বিশেষ করে সমকালীন প্রযুক্তিক বিপ্লব ও বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের রূপ-প্রকৃতি অতি দ্রুত রূপান্তরিত হয়ে চলছে। এ পরিবর্তন সম্প্রসারিত হয়েছে আর্থনীতিক, সামরিক কৌশলগত, আদর্শগত, এমন কি ব্যক্তিমানুষের প্রভাব প্রতিপত্তির ক্ষেত্রেও। এসব ক্ষেত্রে পররাষ্ট্র নীতির সনাতন বা চিরাচরিত অভিজ্ঞতা এখন সম্ভবত পূর্ববর্তী কালের মতো ততখানি হৃদয়গ্রাহী, এমন কি গ্রহণযোগ্য নয়।

তৃতীয়ত, ঐতিহাসিক পদ্ধতির ওপর অধিকমাত্রায় নির্ভরশীলতার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। কেননা প্রত্যেক যুগের লেখক ও ঐতিহাসিকেরা লিখে চলেছেন নিজ নিজ ইতিহাস, কিন্তু একইসঙ্গে বা পরবর্তী সময়ে উপস্থাপিত হয় ভিন্ন মতাবলম্বী বা সংশোধনবাদী ইতিহাস। পরবর্তীকালে এসব ঐতিহাসিকেরা অন্যদের ভুল-ভ্রান্তি তুলে ধরতে তৎপর হন, তুলে ধরেন পরিবর্তিত ধারা। এসব ভিন্নমুখী ঐতিহাসিক চিন্তা-চেতনা থেকে ইতিহাসের সুনির্দিষ্ট, স্থায়ী গতিধারার দারুণ অভাব পলিলক্ষিত হয়।[২]

উপর্যুক্ত পর্যালোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হবে যে, ঐতিহাসিক পদ্ধতি এখনো প্রয়োজনীয়, কিন্তু সমকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সার্বিক প্রেক্ষাপট জানার জন্য এই পদ্ধতি যথেষ্ট নয়। বিশেষ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা নীতি প্রণয়নের কলাকৌশল, কূটচালের প্রেক্ষাপট, কৌশলগত আন্তক্রিয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পদ্ধতির ব্যবহারে সার্বিক চিত্র মেলে না। এতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আংশিক পরিচয় মেলে মাত্র। এ পদ্ধতি ব্যবহারের

www.pathagar.com

মাধ্যমে অতীতকে জানা গেলেও বর্তমান কাল এবং অনাগত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পুঞ্জীভূত জ্ঞান উপস্থাপন করার কাজ দুরূহ হয়।

সিস্টেম সম্বন্ধীয় পদ্ধতি

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অনুসন্ধান ও গবেষণায় সিস্টেম পদ্ধতি ব্যবহারের কারণ হচ্ছে এমন কিছু ধারণা যে, এতে রয়েছে বেশ সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য রূপ, রয়েছে নিয়মমাফিক স্থিতি ও শৃংখলা। রাষ্ট্র-ব্যবস্থা কিভাবে সংগঠিত ও পারস্পরিকভাবে সংযুক্ততার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তিনটি সিস্টেম সম্বন্ধীয় প্রতিযোগী মডেল ব্যবহৃত হয়ে থাকে ঃ

ক. শক্তিসাম্য (Balance of power) ঃ সিস্টেম পদ্ধতিতে সবচেয়ে পুরানো ও স্থায়ী মডেল হচ্ছে শক্তিসাম্য। এই মডেল অনুযায়ী প্রায় সমরূপ ক্ষমতা ও শক্তি-সামর্থ্য সম্মত কয়েকটি শক্তির অবস্থান থাকতে হবে। আঠারো ও উনিশ শতকে এ জাতীয় সিস্টেমের অবস্থান সম্পর্কে ঐতিহাসিক হ্যাসেল এবং ওয়েকম্যান লিখেন। এই সিস্টেমের পূর্বশর্ত বা ধারণামূলে রয়েছে শক্তিভিত্তিক আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক, কেননা, এ মডেলে রাষ্ট্রই হচ্ছে মৌল কার্যকারক। এ মডেলের দ্বিতীয় পূর্বশর্ত হচ্ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অবস্থান এবং বড় ধরনের যুদ্ধের অনুপস্থিতি। তৃতীয়ত, এ মডেল অনুযায়ী রাষ্ট্রনায়ক ও কূটনীতিবিদরা রাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারক হিসেবে এমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন যে তাঁরা শক্তির ভারসাম্য যুক্তিযুক্ত ও সুকৌশল সম্বলিত পন্থা হিসেবে অবলম্বন করে থাকেন।

সম্ভবত কিছু কিছু ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত প্রদানের মাধ্যমে শক্তিসাম্য মডেলের চলমান প্রক্রিয়া তুলে ধরা যেতে পারে। ওয়েকম্যানের বিশ্লেষণে, উনিশ শতকে ফরাসি আধিপত্য বা কর্তৃত্বে ভাঙ্গন ধরে সিস্টেমে তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তিতে, চীন ও জাপান ভারসাম্য বিধানের ভূমিকা পালন করে। গ্রেট বৃটেন নতুন শক্তি সঞ্চয় করে ইউরোপে ভারসাম্য বিধান করে। এই নবলব্ধ ক্ষমতার মূলে ছিল তার দ্বীপ ভূমিতে অবস্থান, তার উন্নত সচল, সশস্ত্র ও সামুদ্রিক শক্তি এবং বহির্বিশ্বে তার ব্যাপক প্রভাব ও উপস্থিতি।

শক্তিসাম্য সিস্টেমের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা সত্ত্বেও এটা বলা সমীচীন হবে যে, এই সিস্টেমের প্রকৃতি অনেকখানি প্রতারণাধর্মী। আঠারো ও উনিশ শতকের ইউরোপে একটি অপেক্ষাকৃত মুৎসুদ্দি শ্রেণী পররাষ্ট্রনীতির প্রণয়নে কর্তৃত্ব লাভ করে। তৎকালীন কূটনৈতিক চালের খেলা তাঁরা বুঝতেন এবং পারস্পরিকভাবে তাঁরা কূটচালের নীতিমালা প্রয়োগ করতেন। কিন্তু সমকালীন বিশ্বে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ব্যাপকতা ও প্রসারের কারণে পূর্বের কূটনীতি ও পররাষ্ট্র নীতির ধারা প্রয়োগ করা কঠিন। কেননা ভারসাম্য বা সমতা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান শুধু পরিবর্তিত হয় নি, পরিবর্তন আনতে পারে এরূপ রাষ্ট্র বা কার্যকারকদের সংখ্যাও অকল্পনীয় হারে বেড়েছে।

www.pathagar.com

তবু একথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনায়কবৃন্দ শক্তি স্বার্থের ভিত্তিতে নীতি প্রণয়ন করে থাকেন এবং এরূপ উদ্দেশ্য সাধনে প্রণীত নীতির ভিত্তি হচ্ছে রাষ্ট্রের শক্তি-সামর্থ্য। শক্তিসাম্য মডেলের এ জাতীয় মৌলিক ধারণা সম্ভবত এখনো সঠিক বলে বিবেচিত।

খ. মেরুকেন্দ্রিক মডের (Polarity) ঃ এই মডেল প্রকৃত অর্থে হচ্ছে শক্তিভিত্তিক মডেলেরই আরেক রূপ বা অভিব্যক্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তরকালে মেরুকেন্দ্রিক মডেলে পরিবর্তন আরোপ করা হয় বিভিন্ন পর্যায়ে। যেমন 'কঠোর দ্বিমেরু কেন্দ্রিক' ('tight bipolar'), 'শিথিল দ্বিমেরু কেন্দ্রিক' ('loose bipolar') ত্রিমেরু কেন্দ্র (tripolar) 'এবং 'বহুমেরু কেন্দ্রিক' ('Multipolar') কঠোর দ্বিমেরু কেন্দ্রিক মডেলে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির শক্তি পরীক্ষার প্রশ্ন বিজড়িত, অনেক সময় মুখোমুখি পর্যায় থেকে উভয়ে পরস্পরের শক্তির সমতা বা ভারসাম্যের বিধান করে থাকে। এতে তৃতীয় কোনো পক্ষের ভারসাম্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার কোনোরূপ অবকাশ নেই বললে চলে। শিথিল দ্বি মেরুকেন্দ্রিক মডেলে প্রতিযোগী শক্তির প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব অব্যাহত থাকলেও তাদের সামরিক রাজনৈতিক মুষ্টি বন্ধন ক্রমশ শিথিল হতে থাকে। ত্রিমেরু কেন্দ্রিক মডেলে এবং বহুমেরু-কেন্দ্রিক মডেল মূলত সম্ভাব্য আর্থ-সামাজিক, বিশেষ করে রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তির বিষয় বিবেচনা করে যথাক্রমে তৃতীয় ও ততোধিক বহুশক্তির উদ্ভব বা সম্ভাব্য ভারসাম্য বিধানের ক্ষমতা লাভের প্রসঙ্গ আসে। স্নায়ুযুদ্ধ উত্তরকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙ্গন ও বিলোপের পর অনেক মার্কিন লেখক ও বিশ্লেষক আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে একক মেরু কেন্দ্রিক' সিস্টেম (Unipolar System) হিসেবে উপস্থাপনে প্রয়াসী হন। তাঁদের মতে, সমকালীন বিশ্বরাজনীতি ও কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা মোকাবিলা করার মতো কোনো শক্তি অবশিষ্ট নেই। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক সিস্টেমের একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে এবং এই একক কেন্দ্রিক মডেলের কর্তৃত্ব ওয়াশিংটনের উপর এককভাবে ন্যস্ত করা হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গবেষণা ও অনুসন্ধানে কখন কোন শক্তিসাম্য মডেলের ব্যবহার হবে তা' নির্ভর করে গবেষক বা অনুসন্ধানকারী কোন সময়-কাল ও প্রেক্ষাপট নিয়ে নিজকে নিয়োজিত করবে।[৩]

গ. সর্বদিগ্‌গত ('Universalism') মডেল ঃ এই মডেলের রূপ দু'ভাবে উপস্থাপিত করা যেতে পারে ঃ এর একটি হচ্ছে উল্লম্ব বা অপ্রতিসম (Vertical or Asymmetric), আর দ্বিতীয়টি সমান্তরাল বা প্রতিসম (Horizontal or Symmetric)। উল্লম্বা বা অপ্রতিসম ধারা সম্বলিত সবদিগ্‌গত মডেলের অনুকরণে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় গড়ে তোলার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত আসে রোম

www.pathagar.com

..রণবাদী প্রক্রিয়া থেকে। পরবর্তী মধ্যযুগীয় ইউরোপে ...বিত্র রোম সাম্রাজ্য' ও পোপের মধ্যে অনেকটা একই ধরনের ...্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চলে, যদিও পোপ সম্ভবত রাজনীতির চেয়ে নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার ওপর জোর দেন বেশি। ওয়েস্টা ফালিয়া চুক্তির (১৬৪৮) ফলে সনাতন ধারার উল্লম্ব মডেলের প্রভাবে ব্যাঘাত ঘটে। এরপর বহুকালব্যাপী সম্ভবত কোনো না কোনোভাবে শক্তিসাম্য মডেলের প্রাধান্য দেখা দেয়। অনেকে অবশ্যি সমকালীন বিশ্ব পরিমণ্ডল অবধি অপ্রতিসম মডেলের প্রক্রিয়াগত যোগসূত্র তুলে ধরেন, উল্লেখ করেন ব্রিটিশ শান্তি (Pax Britannica), মার্কিন শান্তি (Pax Americana), সোভিয়েত শান্তি (Pax Sovietica) প্রভৃতি উল্লম্ব প্রকৃতির মডেলের কথা।

বিশ শতকে বহু স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্রের সৃষ্টি, সনাতন বিশ্ব কাঠামোর ভাঙ্গন, বিশেষ করে উপনিবেশবাদের অবসান এবং জাতিপুঞ্জ ও জাতিসংঘের মতো বিশ্ব সংগঠন সৃষ্টির ফলে সর্বদিগগত মডেল অনেকটা সমাদর লাভ করে বিশ্বজনীন রূপে, উপস্থাপিত হয় সমান্তরাল ও প্রতিসম ধারা সম্বলিত আশা-আকাঙক্ষা ও অভিলাষ। কেননা এ পর্যায় জাতীয় রাষ্ট্র শুধু স্বাধীনতার আমেজ লাভ করে নি, এসব রাষ্ট্র লাভ করে সম অধিকারের নীতির ভিত্তিতে সার্বভৌম ক্ষমতা। শুধুমাত্র অনাগত ভবিষ্যৎ বলতে পারে আন্তর্জাতিক সিস্টেম কিভাবে বিবর্তিত হবে – আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকদের কাজ হবে সেই অনাগত সিস্টেমের ফ্রেম প্রণয়ন করা।

উপর্যুক্ত আলোচনার নিরিখে একথা বলা প্রাসঙ্গিক যে, সিস্টেম সম্বন্ধীয় পদ্ধতি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সার্বিক প্রেক্ষাপট অনুধাবনে বেশ প্রয়োজনীয় ও উপযোগী মডেল, কিন্তু সার্বিক পরিচিত পর্যায় অতিক্রম করলে এই মডেলের সীমাবদ্ধতা প্রকাশ পায়। কেননা এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে পরিলক্ষিত সব কর্মকাণ্ড, সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থনীতিক ও মনস্তাত্ত্বিক শক্তিগুলোর বিশদ পরিচয় মেলে না, অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয় না রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে। তাই অন্যান্য মডেলেরও পদ্ধতি ব্যবহার অনিবার্য হয়ে পড়ে।

আদর্শ-মূল্যবোধ ভিত্তিক পদ্ধতি (Normative Approches)

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেক সময় নৈতিক নীতিমালা উপস্থাপিত হয়। নৈতিক নীতিমালার সঙ্গে সবসময় অবশ্য "উচিত-অনুচিত প্রসঙ্গ" উত্থাপিত হয় না; কখনো কখনো ঐতিহাসিক নিয়তিবাদ, আদর্শবোধ প্রভৃতিও বুঝানো হয়ে থাকে। আদর্শ-মূল্যবোধভিত্তিক পদ্ধতিকে তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিবেচনা করা যেতে পারে; (ক) আন্তঃরাষ্ট্র বিষয়ে দার্শনিক মতাদ; (খ) শক্তির রাজনীতি; (গ) আন্তর্জাতিক আইন ও সংগঠন।

www.pathagar.com

ক. আন্তঃরাষ্ট্র বিষয়ে দার্শনিক মতবাদ ঃ দার্শনিকদের মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও রাজনীতির সার্বিক প্রেক্ষাপটে যিনি "রূঢ় বা কঠোর বাস্তবতার" কথা তুলে ধরেন তিনি হচ্ছেন ম্যাকিয়াভেলী তাঁর 'দ্য প্রিন্স' ও 'দ্য আর্ট অব্ ওয়ার' শীর্ষক গ্রন্থে। তাঁর খ্যাতি শুধু শক্তির বাস্তব রূপ তুলে ধরার কারণে নয়, রাষ্ট্রের নীতি প্রণয়নে তিনি যে দৃঢ়তার সঙ্গে নীতিবোধ এবং ধর্মের বিধান প্রত্যাখ্যান করেন, জোর দেন যুদ্ধের কলাকৌশলের ওপর তার জন্যও তাঁর মতবাদ তাঁকে বিতর্কিত ব্যক্তিত্বে পরিণত করে।

এছাড়া ব্রিটিশ চিন্তাবিদ ফ্রান্সিস ব্যাকোন উপস্থাপিত করেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও বিদেশে ব্রিটিশ শক্তি সম্প্রসারণের যথাযথ উপযোগিতা সম্পর্কিত তত্ত্ব। পক্ষান্তরে জ্যাঁ জাঁক রুশো এবং ইম্যানুয়েল কান্ট আন্তর্জাতিক সম্পর্কে শান্তি, আদর্শ ও নীতিবোধ ভিত্তিক চিন্তাধারা প্রবর্তনের ওপর জোর দেন।[৫]

আন্তর্জাতিক সম্পর্কে আদর্শ বা নীতি-মূল্যবোধের কোনো স্থান নেই সম্ভবত এ কথা নিশ্চয়তা সহকারে বলা চলে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ উড্রো উইলসনের 'চৌদ্দ দফা' কর্মসূচির বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। এই কর্মসূচির আদর্শ অনেকখানি প্রতিফলিত হয় জাতিপুঞ্জ ও জাতিসংঘের সনদে। বলা প্রাসঙ্গিক, এ জাতীয় আদর্শ ও নীতিমালা মানুষের চিন্তাধারাকে উন্নততর করে বটে, কিন্তু তার ফলে এসব আদর্শ ও নীতিবোধ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্ব সদৃশ বলে গৃহীত হয় নি। কেননা যে বিশ্বে জাতীয় রাষ্ট্রের স্বার্থ ও উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে নেতৃবর্গ ও নীতি নির্ধারকেরা তৎপর সেই বিশ্বে নিছক নীতি-মূল্যবোধ সহজে তত্ত্বীয় রূপ পরিগ্রহ করে না।

খ. শক্তির রাজনীতি মডেল ঃ আন্তর্জাতিক সম্পর্কে অনেকে শক্তির রাজনীতি বা সংগ্রামকে একটি মৌলিক উপাদান রূপে উপস্থাপিত করেন। এসব চিন্তাবিদেরা নিজেদের বাস্তববাদী বলে মনে করেন। বাস্তববাদী তত্ত্বের খ্যাতনামা প্রবক্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হচ্ছে নিকোলাস জে. স্পাইকম্যান, হ্যানস জে. মরগেননথু ও ফন ক্লজভিৎস। এসব লেখক এবং কম্যুনিস্ট চিন্তাবিদেরা জাতীয় বা আন্তর্জাতিক স্বার্থ ও উদ্দেশ্য চরিতার্থতায় শক্তির ব্যবহারের ওপর জোর দেন। 'যুদ্ধ হচ্ছে রাজনীতির অব্যাহত রূপ"—এরূপ বচনে শক্তির রাজনীতি-ভিত্তিক মডেলের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি ঘটে।[৬]

কিন্তু বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সমকালীন বিশ্বে শক্তি, প্ররোচনা, সমঝোতা, কূটচাল, সহযোগিতা ও মৈত্রী সম্পর্কের মধ্যে পার্থক্য প্রায়শ তুলে ধরা কঠিন। দৃষ্টান্ত হিসেবে সমকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্কে সহযোগিতা ও

www.pathagar.com

সংহতির প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে। যদি সমকালীন আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক যথার্থ-ই শক্তির লড়াইভিত্তিক হতো তাহলে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠী, আফ্রিকান ঐক্য সংস্থা, আমেরিকার রাষ্ট্র সংগঠন, দক্ষিণ পূর্ব এশীয় জাতি সংস্থা এবং দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা প্রভৃতি বন্ধুভাবাপন্ন, আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক সংস্থা বা সংগঠন গড়ে উঠতো কিনা সন্দেহ। তাই শক্তির রাজনীতি-ই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একমাত্র মাপকাঠি এরূপ বলা সম্ভবত যুক্তিসঙ্গত হবে না।

গ. আন্তর্জাতিক আইন ও সংগঠনভিত্তিক মডেল ঃ আন্তর্জাতিক আইন ও সংগঠনের দৃষ্টিকোণ থেকে আন্তর্জাতিক আচরণ ও সম্পর্ককে রীতিবদ্ধ এবং সুসংহত করার প্রয়াস চলে আসছে প্রখ্যাত আইনবিদ উগো গ্রেশিয়াস এর "দ্য ল' অব ওয়ার এন্ড পীস" শীর্ষক গ্রন্থের রচনাকাল থেকে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গবেষণা ও বিশ্লেষণে এ পদ্ধতি বেশ ফলপ্রসূ রূপে বিবেচিত। ব্রায়ারলী, ফেনউইক, লৌটার-প্যাকট, অপেনহাইম, সোয়ার্জেন বার্গার, হিল, পটার প্রভৃতি যশস্বী লেখক ও চিন্তাবিদ আইন বিষয়ক পদ্ধতির উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

এছাড়া জাতিপুঞ্জ ও জাতিসংঘের মতো বিশ্ব সংগঠনসমূহ চুক্তি, সহযোগিতা, প্রস্তাব, আহবান, নির্দেশ, আবেদন প্রভৃতির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিবর্তনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।[৭] বিশ্ব ব্যবস্থা বিবর্তিত ও সংযোজিত হলেও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের সব অবস্থা প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এসবে মেলে না। রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক আচরণে পরিলক্ষিত সব উপাদান বা শক্তিসামর্থ্যের ব্যবহার সম্পর্কিত সব উপাত্ত বিশ্ব সংগঠনের মাধ্যমে সংগ্রহ করাও সম্ভব নয়। কেননা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতির উৎপত্তি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে হয় না, এ সবের উৎসমূলে রয়েছে জাতীয় সরকার ও রাষ্ট্রীয় সূত্র। তাই বলা সঙ্গত যে, আন্তর্জাতিক আইন ও সংগঠন পদ্ধতি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের শুধুমাত্র আংশিক ব্যাখ্যা বহন করে।

নীতি–বিজ্ঞান পদ্ধতি

এ হচ্ছে আন্তঃবিষয় সম্পর্কিত, বহু অধিতব্য শাস্ত্র বা জ্ঞান অর্জন ক্ষেত্রের সমন্বয়ে গঠিত বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি। আন্তর্জাতিক পরিবেশ ও রাষ্ট্রের আন্তক্রিয়ার ভিত্তি রীতিবদ্ধভাবে পর্যালোচনা এবং পুঞ্জীভূত তত্ত্বীয় জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে এরূপ পদ্ধতি ব্যবহার হয়। এ জাতীয় পদ্ধতিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রয়োগ করা চলে। যেমন ঃ

ক. সিস্টেম বিশ্লেষণ (Systems Analysis) ঃ এই দৃষ্টিকোণে শক্তিসাম্য ও বিভিন্ন মেরুকেন্দ্রিক মডেল এবং সাধারণ সিস্টেম্‌স্ তত্ত্ব (general systems

www.pathagar.com

theory) ব্যবহৃত হয়। এসবের উদ্দেশ্য হচ্ছে 'নির্ভরশীল' ('dependent'), স্বতন্ত্র' ('independent') ও 'মধ্যবর্তী (intervening) চলকসমূহের ('Variables')' মধ্যে যোগসূত্র, পার্থক্য বা ব্যবধান তুলে ধরা।

খ. ক্রিয়ামূলক মতবাদ ও সংহতি দৃষ্টিকোণ (Functionalism and Intergration) ঃ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও সংহতি ধারণার উৎপত্তি এবং এসবের বিবর্তন, প্রসার দীর্ঘকালীন, বিবর্তনধর্মী কিন্তু চিত্তাকর্ষক। অবশ্যি এটা বলা ঠিক হবে না যে, কোনো সাধারণ তত্ত্বীয় ধারায় এসব প্রাতিষ্ঠানিক ও সহযেগিতামূলক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে। এসব ক্ষেত্রে যাঁরা অবদান রাখেন তাঁদের মধ্যে খ্যাতনামা হচ্ছে ডেভিড মিট্রানী, কার্ল ডয়েস, মাইকেল হা'স ও হোয়ান গালটুং।

গ. সিদ্ধান্ত গ্রহণ দৃষ্টিকোণ (Decision-making) ঃ রাষ্ট্রবিশেষের আচার ও ব্যবহার বিধির কারণ ও অভিব্যক্তি, তাদের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার কলাকৌশল, বিশেষত সংকটকালীন সময়ে কিংবা সংকটমুক্ত পরিস্থিতিতে বিভিন্ন পর্যায়ে রাষ্ট্রের নেতৃবর্গ কিভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণ করে থাকেন সেসব নিয়ে এরূপ মডেলে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়।[৮] এই মডেলে অনেক তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত হয় বটে, কিন্তু কোনোরূপ সাধারণ তত্ত্বের উন্নয়ন ঘটেছে এরূপ দাবি করা সঠিক হবে না। গ্লেনপ্যাইজ, গ্রাহাম আলিসন, রিচার্ড ব্রোডী, রবার্ট নর্থ, অল আর, হোলস্ট্রি প্রভৃতি লেখকেরা এ দৃষ্টিকোণ নিয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণা করেন।

ঘ. দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ (Conflict Analysis) ঃ এই দৃষ্টিকোণে এমন বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর আন্তক্রিয়ার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয় যার ফলশ্রুতিতে দ্বন্দ্বের উদ্ভব ঘটে। অথবা যেসব ক্রিয়াকর্মের ফলে দ্বন্দ্বের নিরসন হয় তাও এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা চলে। আর্থার শেলিং, কেনেথ বোল্ডিং, এনাটোল র‍্যাপোপোর্ট প্রভৃতি বিশ্লেষক ও পন্ডিতবর্গ এ ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখেন। শূন্যমান, অশূন্যমান ধারণাসহ ক্রীড়াতত্ত্ব (Game theory with its concemitant zero-sum and non=zero-sum concepts), অনুকরণ (simulation) প্রভৃতি দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ দৃষ্টিকোণ প্রসূত পদ্ধতি।

ঙ. রণনৈতিক বা কৌশলগত বিশ্লেষণ (Strategic Analysis) ঃ সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষণে ব্যবহৃত নীতি-বিজ্ঞান পদ্ধতিগুলোর মধ্যে রণনৈতিক ফ্রেম অন্যতম। এই ফ্রেম বা কাঠামোতে রাষ্ট্রের মৌলিক উদ্দেশ্যাবলীকে বিভিন্ন পর্যায় বা স্তরে চিহ্নিত করা হয় এবং এসব উদ্দেশ্যাবলীর বাস্তবায়নে ব্যবহৃত পন্থা বা উপায়সমূহ সুনির্দিষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। এভাবে কৌশলগত কাঠামোতে একটি রাষ্ট্রের মৌলনীতি

www.pathagar.com

(Fundamental policy), মহারণনীতি (Grand Stratgy), রণনীতি (Strategy) এবং বহু ধরনের রণকৌশল (Tactics) চিহ্নিত করা হয়।

কৌশলগত বিশ্লেষকদের মধ্যে বিশেষ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করেন ফন ক্লজভিৎসে, বার্ণাড ব্রোডী, লিডেল হার্ট, মার্শাল সোকোলোভসকী, মাল্কোম ম্যাকিনটোস, মোর্টোন হ্যালপারিন, হ্যানস ব্যালডউন এর মতো লেখকবৃন্দ।[৯]

চ. শান্তি গবেষণা (Peace Research) ঃ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সম্প্রতিক গবেষণা দৃষ্টিকোণগুলোর মধ্যে শান্তি গবেষণা হচ্ছে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ কাঠামো। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও কোনো সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব রয়েছে বলা সঠিক হবে না। বরং শান্তি গবেষণা ক্ষেত্রে একাধিক তত্ত্ব রয়েছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসব তত্ত্ব পরস্পরবিরোধীও মনে হতে পারে। কেননা শান্তি গবেষক নামে কোনো অভিন্ন বা একক গোষ্ঠী রয়েছে এরূপ মনে করার কোনো কারণ নেই। অবশ্যি দ্বন্দ্বযুদ্ধ পরিহার করা, শান্তি বজায় রাখা এবং সহিংসতা ছাড়া শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে তত্ত্বীয় অবদানে তৎপর হওয়ার আদর্শে প্রায় সব শান্তি গবেষকদের গবেষণাকর্ম অনুপ্রেরণা যোগায়। এসব উদ্দেশ্য সাধনে কোনো কোনো শান্তি গবেষক এমন কি দ্বন্দ্ব তত্ত্বগুলোরও ব্যবহার করে থাকেন। শান্তি গবেষণা আন্দোলনের সূত্রপাত হয় স্কান্ডিনোভিয়ান দেশগুলোতে, যদিও এ আন্দোলন বর্তমানে 'আন্তর্জাতিক শান্তি গবেষণা সমিতির' ছত্রছায়ায় সমগ্র বিশ্বে ব্যাপকতা লাভ করে। অনেকে প্রথিতযশা নরওয়েজীয় শান্তি গবেষক হোয়ান গালটুংকে 'শান্তি গবেষণা আন্দোলনের জনক' রূপে অভিহিত করেন। তিনি ছাড়া এ আন্দোলনে আরো অনেকে বিশিষ্ট ভূমিকা রাখেন। যেমন, জাপানের ইউশিকাজো সাকামোটো, বৃটেনের এডাম কার্ল, আমেরিকার চাডউইক আলজার ও এলিজ বোল্ডিং প্রমুখ।[১০]

ছ. ভূ-অর্থনীতি (Geo-economics) ঃ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চর্চা ও গবেষণায় চিরাচরিতভাবে ভূ-রাজনীতির প্রভাব-ই অনেক বেশি প্রকট ছিল, কিন্তু সাম্প্রতিককালে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে ভূ-রাজনীতির চেয়ে, ভূ-অর্থনীতিই অধিকরত গুরুত্ব লাভ করে আসছে। এর কারণ হচ্ছে রাষ্ট্রিক সীমানার ঊর্ধ্বে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব–যেসব সমস্যার সমাধানে রাষ্ট্রের ভূ-কৌশলগত সীমানার বিধিবন্ধন-নিষেধ প্রভৃতির বাধা অতিক্রম কর অর্থনৈতিক যোগাযোগ, লেনদেন ও উন্নয়নের ওপর জোর দেয়া হচ্ছে। রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব, আধিপত্যবাদী ধ্যান-ধারণা, এবং কর্তৃত্ব স্থাপনের প্রয়াস সনাতনপন্থী ও সেকেলে বলে বিবেচিত হচ্ছে। ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক লেখক, গবেষক ও বিশ্লেষকবৃন্দও উত্তরোত্তর ভূ-অর্থনীতি পদ্ধতির দিকে আকৃষ্ট হচ্ছেন।

www.pathagar.com

সমন্বিত পদ্ধতি

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষণে ব্যবহৃত বিভিন্ন পদ্ধতির অপরিহার্য অংশ-বিশেষ নিয়ে গঠিত বলেই এরূপ পদ্ধতিকে সমন্বিত পদ্ধতি বলা হয়। অনেক ক্ষেত্রে মনে হতে পারে যে, কোনো একটি মাত্র পদ্ধতি ব্যবহার করে চিহ্নিত আন্তর্জাতিক সমস্যার তত্ত্বীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্ভব হবে না। এসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতি ও দৃষ্টিকোণের সমন্বয়ে একটি বিশ্লেষণী কাঠামো গঠন করা অপরিহার্য হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এ জাতীয় কাঠামোর উদ্দেশ্য সম্পর্কেও আলোকপাত করা চলে। যেমন, (ক) কোনো একটি সময়কালীন বিশ্ব বা আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক কাঠামো চিহ্নিত করার প্রয়োজন হতে পারে; (খ) যে সব উপাদান বা শক্তি রাষ্ট্রের আচরণে প্রভাব রয়েছে সে সবের বিশ্লেষণ অনিবার্য মনে হতে পারে; (গ) একটি বিশেষ রাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ও বৈদেশিক পরিবেশগত চাপের কারণে কিভাবে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বিজড়িত হয় তারও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপন অপরিহার্য রূপে প্রতিভাত হতে পারে; (ঘ) পরিশেষে, আন্তঃরাষ্ট্র সমস্যায় বিজড়িত রাষ্ট্রসমূহের সার্বিক সম্পর্কের ধারাও তুলে ধরতে হতে পারে।

স্বাভাবিকভাবেই বলা চলে যে, এসব কারণে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জটিল বিষয়াদি নিয়ে প্রায়শ একাধিক তত্ত্বীয় পদ্ধতির ব্যবহার করা আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। এরূপ সমন্বিত পদ্ধতির ব্যবহার কতখানি ব্যাপক হবে তা নির্ভর করবে অনুসন্ধান ও গবেষণাকর্মের তত্ত্বীয় উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের ওপর।[১১]

উপসংহার

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রতিযোগী তত্ত্বীয় পদ্ধতি সম্পর্কিত উপর্যুক্ত আলোচনা ও বিশ্লেষণ থেকে এটাই প্রতীয়মান হবে যে, আন্তর্জাতিক আচরণ ও ব্যবহারবিধি তত্ত্বীয় পর্যালোচনা এবং পুঞ্জীভূত জ্ঞানলাভের প্রচেষ্টায় বহু ধরনের পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রায় প্রতিটি পদ্ধতির ক্ষেত্রে আরো রয়েছে একাধিক দৃষ্টিকোণ, মডেল ও কাঠামো। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তত্ত্বীয় পদ্ধতি-ই তত্ত্ব প্রদান করে না, যদিও এসব পদ্ধতি তত্ত্বের উদ্ভাবনে পূর্বশর্ত বা পূর্ববর্তী সূত্র হিসেবে সহায়তা প্রদান করতে পারে। অন্যকথায়, তত্ত্বীয় পদ্ধতিই তত্ত্ব নয়, এ হচ্ছে তত্ত্বের দিকনির্দেশনা মাত্র। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গবেষণা ও অধ্যয়নে তত্ত্বীয় পদ্ধতি যোগায় যথাযথ ফ্রেম বা কাঠামো, তদন্ত ও অনুসন্ধান কাজ পরিচালিত করে সঠিক পথে, বিশ্লেষণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সুগম করে প্রচলিত তত্ত্বের যথার্থ ব্যবহার। এতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অনুসন্ধান ও গবেষণা প্রক্রিয়াগতভাবে হয় সৃজনপ্রয়াসী ও সৃষ্টিশীল, হয় বাস্তবমুখী ও বিশ্লেষণধর্মী, আন্তঃরাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক

www.pathagar.com

ভাবাদর্শ এবং পরিবেশগত জ্ঞান সমষ্টিগত ও পুঞ্জীভূত রূপ লাভ করে। তাই বলা চলে, তত্ত্বীয় পদ্ধতি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক তত্ত্বের উদ্ভাবন প্রক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। সঠিক পদ্ধতি নির্ধারণ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যয়নে অরাজকতা ও স্থিতিহীনতার পরিবর্তে যোগায় শৃংখলা ও নিয়মতান্ত্রিক ধারা, অজস্র উপাত্ত ও চলকরাশিতে সঞ্চার করে প্রত্যাশিত রীতিবদ্ধ, স্থিতিশীল তত্ত্বীয় গতি। একটি পৃথক বা স্বতন্ত্র অধ্যয়নযোগ্য বিষয় হিসেবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে উন্নততর ধারা বা এর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অধিকতর সুনিশ্চিত করতে হলে এই বিষয়ে সম্ভবত আরো সূক্ষ্ম ও সাবলীল পদ্ধতি উদ্ভাবনে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক গবেষণা ও বিশ্লেষকদের তৎপর হতে হবে।

তথ্যনির্দেশ

১. Morton A. Kaplan, *System and Process in International Politics* (New York : John Wiley and Sons, 1975), পৃ. ৩

২. Pedelford, প্রগুক্ত, পৃ. ২৩-২৪.

৩. ঐ পৃ. ২৪-২৫

৪ ঐ.

৫. Dogherty and Palftgraff, Jr. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩ - ৪

৬. Padelford, প্রাগুক্ত পৃ. ২৫

৭. ঐ, পৃ. ২৭ - ২৮.

৮. ঐ, পৃ. ৩১ - ৩৩.

৯. বিশদ ব্যাখ্যার জন্য এ গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য

১০. বিশদ আলোনার জন্য দ্রষ্টব্য গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়

১১. সমন্বিত পদ্ধতির ব্যবহারের জন্য লেখকের *Peacemaking in Indochina 1975-1975* (Dhaka : Univesity of Dhaka, 1983).

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

যুদ্ধ ও শান্তি ঃ গবেষণা পদ্ধতি ও তত্ত্বীয়রূপ

ভূমিকা

সমকালীন বিশ্বে যে কয়েকটি সমস্যা মানব সভ্যতার সংকট ও হুমকির কারণ বলে বিবেচিত যুদ্ধ ও শান্তির সমস্যা হচ্ছে এসবের মধ্যে সবেচেয়ে প্রকট। যুদ্ধ ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যুদ্ধের পাশাপাশি শান্তির অভিপ্রায়ও চিরন্তন। যুদ্ধে ঐতিহ্যগত ও সমসাময়িক দ্বন্দ্ব-বিরোধের অভিব্যক্তি ঘটে, পরিস্ফুট হয় হিংসা-বিদ্বেষ। এমন কি প্রকাশ পায় ক্ষমতায় সীমাহীন ইচ্ছাবৃত্তি বা অতৃপ্ত অভিলাষ। একই সঙ্গে যুদ্ধে লোভ-লালসাপ্রসূত শত্রুতা এবং উদ্দেশ্যমূলক সহিংস প্রবণতাও বৃদ্ধি পায়।[১] তবু শান্তির অবিরাম অন্বেষণও চলে আসছে। প্রকৃতপক্ষে, বহু দার্শনিক ও কল্পনাপ্রিয় চিন্তাবিদ শান্তির প্রয়াস সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন, বহু শতক থেকে জ্ঞানী-বিজ্ঞানীরা এ সম্পর্কে ভেবে আসছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য, রাষ্ট্রীয় কাঠামোর কৃত্রিমতা ও সভ্যতার কলহ প্রবণ কলুষতা থেকে মুক্ত করে বিশ্বকে স্বচ্ছ রূপ দেয়া, সুনিশ্চিত করা অনাবিল ও নিষ্কলুষ শান্তি। অবশ্য তাঁদের এরূপ মহান উদ্দেশ্য কখনো বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে নি।[২]

সমকালীন বিশ্বে একদিকে যেমন দূরত্ব কমে আসছে, অন্যদিকে তেমনি ঘটে চলছে প্রযুক্তিগত ও পারমাণবিক বিপ্লব। জল্পনা-কল্পনা চলছে লেইজার ও তারকা যুদ্ধ নিয়ে। এই সময়ে শান্তি সুনিশ্চিত করার প্রয়াসের চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কাজ আর কি হতে পারে? ধারণাগত দিক থেকে যুদ্ধের প্রত্যুত্তরে, এর ফলশ্রুতিতে চলে শান্তির প্রয়াস। এভাবে যুদ্ধ ও শান্তি মনে হয় ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ; এ প্রত্যয় দুটি এমনি চিন্তাধারার অংশবিশেষ যে এর একটি ক্ষেত্রে সমস্যা নিরসন হলে একই প্রশ্নে অন্যটির ওপরও প্রভাব ফেলে।[৩]

প্রথিতযশা আন্তর্জাতিক আইন বিশারদ কুইন্‌সী রাইটের মতে[৪], যুদ্ধ ও শান্তি হচ্ছে একই মুদ্রার এপিট-ওপেট মাত্র, "শান্তির অবস্থা নেই বলেই হয় যুদ্ধ", বলেন তিনি। যুদ্ধের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিরূপণ না করে শান্তির অবস্থা বা শান্তির অগ্রগতি বিশ্লেষণ করা চলে না। যুদ্ধ সম্পর্কে ভাবতে হবে এর প্রকৌশলগত ও গঠনমূলক দিক থেকে, দেখতে হবে কি করে একে

www.pathagar.com

নিয়ন্ত্রণ করা চলে। অবশ্যি যুদ্ধের সূত্র বা প্রক্রিয়ার চেয়ে অধিকতর লাভবান হওয়া যেতে পারে শান্তির অবস্থার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের দায়িত্ব শুধু শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দান বা উচ্চমানের গবেষণা কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয় নয় ; যুদ্ধ ও শান্তির মতো বিষয়াদি নিয়েও তাঁদের ভাবতে হবে, চিন্তা করতে হবে কি করে যুদ্ধের অভিশাপ থেকে পরিত্রাণ লাভ সম্ভব, কি করে বিশ্বে শান্তির জয় সুনিশ্চিত হবে।[৫] অবশ্যি যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কিত ভাবনা-চিন্তা সর্বদাই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয় অধ্যয়নের সিংহভাগ জুড়ে ছিল এবং রয়েছে। সন্‌'জ্র, কৌটিল্য, মেকিয়াভেলী বা ক্লজভিৎস'র লেখায় এসব বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞান ও চিন্তা সমন্বয়ের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়, যদিও এক্ষেত্রে তাঁদের অবদান অনেকটা ধ্রুপদী ভাবধারাপুষ্ট রূপে বিবেচিত। সমকালীন বিশ্বের বাস্তবরূপ অনেকটা ভিন্নতর। পারমাণবিক বিপ্লবের পাশাপাশি বিশ্ব এখন সামরিক আদর্শগত কলহ ও জোটের রাজনীতিতে দ্বিধা-বিভক্ত। বর্তমানে বিশ্বশক্তিসমূহের অস্ত্র-ভাণ্ডারে ৫০,০০০ এর অধিক ভয়াবহ মারণাস্ত্র সঞ্চিত রয়েছে।[৬] অব্যাহত জোট-রাজনীতি প্রসূত দলাদলি ও প্রতিযোগিতা এবং ভয়াবহ মারণাস্ত্রের সম্ভাব্য ব্যবহার, আর এসবের বিপজ্জনক পরিণতি সম্পর্কে অনেকে হতাশাব্যঞ্জক ভবিষ্যদ্বাণী করে চলছেন।[৭] তাই যুদ্ধ ও শান্তির সমস্যা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি জরুরি বিষয় হিসেবে বিবেচিত। বিশ্ব রাজনীতি সম্পর্কিত গবেষক ও বিশ্লেষক মাত্রই এসব বিষয়ে বেশ বিচলিত। প্রকৃতপক্ষে, সাম্প্রতিককালের অনেক বিজ্ঞানসম্মত ও পরিসংখ্যানভিত্তিক গবেষণাকর্ম যুদ্ধ ও শান্তির বিষয়ে আলোকপাত করে।[৮] উল্লেখ্য, সমকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে এসব গবেষণাকর্ম বেশ খ্যাতি অর্জন করে এবং পথদর্শীরূপে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে।

এ অধ্যায়ে বিশ্বরাজনীতি বিষয়ে গবেষকেরা যে ধারায় যুদ্ধ ও শান্তি নিয়ে গবেষণা-বিশ্লেষণ করে আসছেন সেই ধারার ওপর আলোকপাত করা হবে। এতে দু'টো সাম্প্রতিক গবেষণা-বিশ্লেষণ পদ্ধতির ওপর জোর দেয়া হবে ঃ এর প্রথমটি কৌশলগত ('Strategic') বিশ্লেষণ, আর দ্বিতীয়টি শান্তি গবেষণা। এ দুটি পদ্ধতির প্রথমটিতে যুদ্ধ ও রণনৈতিক আচরণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মেলে, আর দ্বিতীয়টিতে শান্তির অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়। এই দুটি বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণ সম্পর্কিত ও প্রক্রিয়াগত বাহ্যিক বৈপরিত্য থাকা সত্ত্বেও প্রবন্ধে এরূপ যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে যে, এ দু'টো আপাত ভিন্নমুখী পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্ভব, কেননা দু'টোই মূলত পারস্পরিকভাবে সম্পৃক্ত, দু'টোই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি

www.pathagar.com

নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করে এবং দু'টোতেই এসব বিষয়ে নীতি-নির্ধারণ বক্তব্য রাখা হয়।

যুদ্ধ গবেষণা

প্রথমত যুদ্ধ সম্পর্কিত অধ্যয়ন প্রক্রিয়া ও গবেষণালব্ধ জ্ঞানের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাক। বিশ্লেষক ও পণ্ডিতমাত্রই যুদ্ধ/দ্বন্দ্বকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিতব্য বিষয়রূপে বিবেচনা করেন। কিন্তু কিভাবে একে ধারণাগতভাবে কার্যকর রূপ দেয়া যেতে পারে বা কি পরিমাপে 'যুদ্ধ' প্রত্যয়টিকে বিচার-বিশ্লেষণ করা যেতে পারে সে সম্পর্কে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন। কেউ কেউ যুদ্ধকে একটি বিশেষ আইনগত অবস্থা ('Legal state') রূপে দেখেন, যে-অবস্থা বিভিন্ন জাতির মধ্যে সাময়িকভাবে বিরাজ করে আসছে; কেউ একে দেখেন একটি "প্রক্রিয়া" হিসেবে, যে প্রক্রিয়া চলে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন দ্বন্দ্বের রূপে—যাতে উত্তরোত্তর জোর বা শক্তি প্রদর্শিত হয়, দেখা দেয় সহিংসতার হুমকি এবং পরিশেষে চলে হিংসাত্মক তৎপরতা। আরো কিছু কিছু লেখক জাতীয় ভাবধারার ("National Attributes") প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন, তুলে ধরেন জাতির অভ্যন্তরীণ উপাদান। এসব ভাবধারা বা অভ্যন্তরীণ উপাদান সম্ভবত যুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট বলে অনেকে মনে করে।[৯]

সার্বিক ধারণাগত পর্যায়ে, যুদ্ধ ও দ্বন্দ্ব সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণ এবং প্রয়োগ-ক্ষেত্রের বিষয় উল্লেখ করা চলে। তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণ পর্যায়ে রয়েছে পার্থক্যমূলক সমীকরণ ("Differential equations"), সিদ্ধান্ত তত্ত্ব/ নিয়ন্ত্রণ তত্ত্ব, ক্রীড়া তত্ত্ব, দরাদরি তত্ত্ব, স্থিতি তত্ত্ব, সাংগঠনিক তত্ত্ব, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মডেল ("Stimulus-Reaction" বা S-R models), প্রভৃতি। প্রয়োগক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে যুদ্ধের উদ্যোগ, প্ররোচনা/যুদ্ধের পরিসমাপ্তি, দ্বন্দ্বের সময়/স্থিতিকাল, হুমকি/সংকট /যুদ্ধের সম্প্রসারণ, অস্ত্র প্রতিযোগিতা/ অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ, মৈত্রী বন্ধন, যুদ্ধের অভ্যন্তরীণ ফলাফল, প্রতিরক্ষা আমলাতন্ত্র/ সম্পদ বন্টন, পারমাণবিক সমীকরণ/মানোন্নয়ন, সংখ্যাবৃদ্ধি, যুদ্ধ সম্পর্কিত/রণনৈতিক আচরণ প্রভৃতি। এক একটি বিশেষ প্রয়োগক্ষেত্রের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণের সংযোগ বা ব্যবহার করা হলে আরো অসংখ্য সংযোজিত বা সমন্বিত তত্ত্বীয় রাশির রূপ পরিগ্রহ করতে পারে সৃষ্টি হতে পারে তত্ত্বীয় দীপপুঞ্জ।[১০]

মূলত যুদ্ধের এসব বহুবিধ দৃষ্টিকোণ ও প্রয়োগ ক্ষেত্রের শ্রেণী বিন্যাসের মাধ্যমে যুদ্ধ-দ্বন্দ্বে বিজড়িত বিষয়াদির তত্ত্বীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা বোঝাপড়ার প্রচেষ্টা চলে। কিন্তু এসব তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণ এবং প্রয়োগক্ষেত্র অনেক সময়

www.pathagar.com

এরূপ জটিল ও পরস্পবিরোধী রূপে প্রতিভাত হয় যে জ্ঞান-অনুসন্ধানী হতবুদ্ধিও হতে পারেন। তাই যুদ্ধ সম্পর্কিত জ্ঞান-অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কৌশলগত বা রণনৈতিক বিশ্লেষণী ফ্রেম বা রূপরেখার বিবর্তন বেশ তাৎপর্যের পরিবহন বহন করে। কেননা এরূপ বিশ্লেষণী রপরেখার মাধ্যমে যুদ্ধ-দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত সর্ব পর্যায়ে আচার-আচরণ রীতিবদ্ধভাবে বুঝা সহজ হয়।

রণনৈতিক ফ্রেম

প্রশ্ন হতে পারে, 'রণনৈতিক রূপরেখা, ফ্রেম বা কাঠামো কিরূপ? সাধারণত যুদ্ধদ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটে 'রণনৈতিক' বা 'কৌশলগত ' (Strategic') প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। এর ব্যবহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে রাষ্ট্রীয় অভিলাষ ও আচরণের বিভিন্ন দিক বা পর্যায় সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা। এ অভিলাষ বা আচরণ শুধুমাত্র যুদ্ধ ও দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। রণনৈতিক রূপরেখায় রাজনৈতিক ও সামরিক আশা-আকাঙ্ক্ষা সঠিকভাবে প্রতিফলিত হতে পারে।[১১] এ জাতীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জার্মান চিন্তাবিদ ক্লজভিৎসের উপস্থাপিত তত্ত্বীয় ধারণার কিছুটা সংশোধিত রূপ। ক্লজভিৎসের সংজ্ঞায় রণনীতি হচ্ছে "লড়াইয়ের কাজে ব্যবহৃত এমন এক কলাবিদ্যাবিশেষ যার মাধ্যমে যুদ্ধের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা যায়। তাঁর মতে, "যুদ্ধ কেবলমাত্র একটি রাজনৈতিক কর্ম নয়। বরং একে সত্যিকার ভাবে একটি রাজনৈতিক যন্ত্র বলা চলে, বলা যায় একটি অব্যাহত রাজনৈতিক ধারা, বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে অরাজনৈতিক [সামরিক] পন্থা অবলম্বন করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করা যায়।"[১২] রণনীতি ও কূটনীতির মধ্যে কখনো কখনো কিছুটা বৈসাদৃশ্য বা পার্থক্য তুলে ধরা হয়, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এ দু'টো প্রত্যয়ই রাজনীতির এক ও অভিন্ন ধারায় সম্পৃক্ত। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন রাষ্ট্রের বহুমুখী সম্পর্ক এভাবে পরিচালনা করা যাতে রাষ্ট্রসমূহ তাদের নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থে প্রসার করতে পারে।[১৩] তাহলে বলা যায় যে, একটি রণনৈতিক রূপরেখা ব্যবহার করে রাষ্ট্রসমূহের রাজনৈতিক ও সামরিক অভিলাষের পাশাপাশি এসব অভিলাষ অর্জনে তাদের ব্যবহৃত পদ্ধতি বা পন্থাও উন্মোচিত করা সম্ভব।

রণনৈতিক বা কৌশলগত বিশ্লেষণে 'নীতিকে' (Policy) একটি রাষ্ট্রের উচ্চতম অভিলাষরূপে চিহ্নিত করা হয়। একটি রাষ্ট্রের নীতি এর কৌশলগত পর্যায়ক্রমের অভিব্যক্তি ও ধারা নির্ধারণ করে। বস্তুত, রাষ্ট্রীয় এ নীতির ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক দিক পর্যালোচনা করে এর সঠিক আচরণকে কৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যায়ক্রমে এভাবে সাজানো যেতে পারে ঃ উচ্চতম রাষ্ট্রীয় 'নীতির' পর আসে রাষ্ট্রের 'মহারণনীতি' (Grand strategy);

www.pathagar.com

এর পর 'রণনীতি' (Strategy) এবং সর্বশেষে 'রণকৌশল' (Tactics)। (ছকে কাটা উদাহরণ দেখুন, চিত্র ঃ ৪.১ ঃ কৌশলগত পর্যায়ক্রম।) কৌশলগত বিশ্লেষণে মহারণনীতির স্থান হচ্ছে রণনীতি ও রণকৌশলের উর্ধ্বে, কেননা রণনীতি ও রণকৌশল উভয় রচিত ও চালিত হয় রাষ্ট্র বা জাতির অব্যবহিত অভিলাষ সাধনে। তবু রাষ্ট্রের অভীষ্ট লক্ষ্য বা মৌলনীতির পরে হবে মহারণনীতির স্থান। কেননা, মহারণনীতি হচ্ছে রাষ্ট্রের অভীষ্ট লক্ষ্য বা মৌলনীতি বাস্তবায়িত করার একটি প্রয়াস বা অভিব্যক্তি বলা যাতে পারে।[১৪]

রণনীতি হচ্ছে এক বা একাধিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, আর্থনীতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও সামরিক শক্তি-সামর্থ্য প্রয়োগ করার 'কলাকৌশল' ও 'বিজ্ঞান' বিশেষ। এর উদ্দেশ্য যুদ্ধরত বা শান্তির প্রয়াসে নিয়োজিত যে কোনো রাষ্ট্রের নীতি বাস্তবায়নের সর্বাধিক সমর্থন যোগানো।[১৫] এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা চলে যে, রণনীতি রাষ্ট্রের মহারণনীতি বা জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের উপায়, পন্থা বা

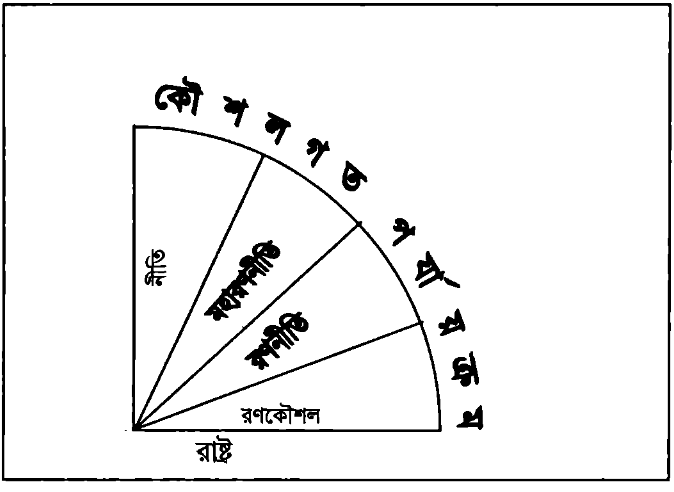

চিত্র ঃ ৪.১ কৌশলগত পর্যায়ক্রম

বাহন। এর মাধ্যমে একটি রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তার জাতীয় স্বার্থের উন্নয়ন সাধনে আত্মনিয়োগ করে থাকে। সঠিক রণনীতি নির্ধারণ করতে হলে কতকগুলো কৌশলগত দিক পর্যালোচনা ও নির্ণয় করা প্রয়োজন। এসবের মধ্যে রয়েছে মহারণনীতি বা জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণ, শত্রুপক্ষ ও নিজস্ব শক্তি-সামর্থ্যের কৌশলগত স্বার্থ-সুবিধের দিক মূল্যায়ন। এছাড়া আরো রয়েছে কৌশলগত সমস্যাদি ও ভাবধারা চিহ্নিতকরণ, জাতীয় উদ্দেশ্য সাধনে বিভিন্ন কর্মপন্থায় বিকল্প দিকগুলো বিশ্লেষণ এবং পরিশেষে, রাষ্ট্রীয় নীতি পূর্ণ

www.pathagar.com

বাস্তবায়নে একটিমাত্র কর্মপন্থা গ্রহণ প্রভৃতি।[১৬] মহারণনীতি যুদ্ধরত একটি রাষ্ট্রের রণনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে পরশপাথর স্বরূপ–কি কি শর্তাবলীর ওপর ভিত্তি করে রণনীতি রচিত মহারণনীতি তা নির্দেশ করে, কিভাবে জাতীয় লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব তাও মহারণনীতির আলোকে যাচাই করা হয়। কৌশলগত রূপরেখার নিম্নস্তরে অবস্থিত রণকৌশল। অবশ্য রণনীতি ও রণকৌশলের মধ্যে পার্থক্য বেশ অস্পষ্ট। কেননা এরা 'একে অপরের মাধ্যমে শুধুমাত্র প্রভাবিত হয় না, বাস্তব সম্পর্কের ক্ষেত্রে উভয়ে সংমিশ্রিতও হয় বটে'।[১৭]

কৌশলগত রূপরেখায় রণকৌশল যেমন ব্যবহৃত হয় রণনীতির নিম্নস্তরে তেমনি রণনীতি ব্যবহৃত হয় মহারণনীতির নিম্নস্তরে। বিষয়টি আরেকটু ভিন্নভাবেও বলা যেতে পারে ঃ রণনীতি ও রণকৌশল দুটি ভিন্ন ভিন্ন তাত্ত্বিক ধারণা প্রসূত হলেও উভয় একই বেষ্টনরেখায় সংযুক্ত, উভয়ই ব্যাপৃত যুদ্ধের কলাকৌশল নিয়ে; অন্যদিকে মহারণনীতি যুদ্ধকালের সীমারেখা অতিক্রম করে যুদ্ধোত্তর শান্তির প্রতিও নজর রাখে।[১৮] এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয়ও প্রণিধানযোগ্যঃ রাষ্ট্রের মহারণনীতি অর্জনে পুরোপুরি স্বীয় অঙ্গীকার এবং এ স্থির সংকল্প সাধনে সামগ্রিক কৌশলগত ক্ষমতার সম্ভাব্য সার্বিক ব্যবহার করা হলে শান্তি সংস্থাপন প্রক্রিয়ার প্রতি বিবদমান পক্ষের শূন্যমান কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গির (Zero-sum strategic approach) পরিচয় মিলে।[১৯] অন্য কথায়, যে-কৌশলগত পরিস্থিতিতে বিবদমান দু'পক্ষ প্রতিপক্ষকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত ও একেবারে বঞ্চিত করে পুরোপুরি স্বীয় উদ্দেশ্য চরিতার্থে সার্বিক রণনৈতিক প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয় সেই ক্ষেত্রে শান্তি সংস্থাপনের প্রস্তাবনা ও প্রসঙ্গ মনে হবে একতরফা স্বার্থ-প্রণোদিত বা আদেশ-নির্দেশ ভিত্তিক। স্বাভাবিকভাবেই এরূপ পরিস্থিতিতে শান্তি সংস্থাপন প্রক্রিয়া হবে অবান্তর। তার মানে, শূন্যমান রণনীতির ক্ষেত্রে যুদ্ধ বা দ্বন্দ্বরত দু'পক্ষের মধ্যে কৌশলগত প্রতিযোগিতা শেষ হতে পারে একমাত্র সামরিক-রণনৈতিক কলাকৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে, শান্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নয়।

উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা– বিশ্লেষণ থেকে এটা প্রতীয়মান হবে যে, যুদ্ধ বা দ্বন্দ্বে শান্তি সংস্থাপন প্রক্রিয়া সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জটিল, পরিবর্তনশীল ও কর্মমুখর সামরিক কৌশলগত আন্তক্রিয়া থেকে অবিচ্ছিন্ন। এতে রণনীতির পাশাপাশি প্রতিযোগী পক্ষের সামরিক পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি, সম্পদ বন্টন ও সামরিক সাজ-সরঞ্জাম বা রসদ সরবরাহের ব্যাপার ইত্যাদি বিজড়িত। এ সবের আলোকে যুদ্ধে লিপ্ত প্রতিযোগী পক্ষ তাদের নিজ নিজ মহারণনীতির অভিলাষ সাধনে একে অপরের বিরুদ্ধে বিভিন্নমুখী রণকৌশলী উদ্ভাবন ও ব্যবহার করে। যুদ্ধদ্বন্দ্বরত পক্ষসমূহের প্রতিযোগী রণকৌশলের নির্বাচন ও বাস্তব ব্যবহারের ফলে শান্তি সংস্থাপন প্রক্রিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ধারিত

www.pathagar.com

হবে ঃ এতে শান্ত প্রক্রিয়ার সাফল্য হয়তো দেখা দিতে পারে, হতে পারে ব্যাহত, এমন কি এ প্রক্রিয়া অবান্তর বা অপ্রাসঙ্গিকও মনে হতে পারে।

কৌশলগত বিশ্লেণের রূপরেখা এখন অবশ্য অপরিচিত নয়। কিন্তু ১৯৫০-এর দশকের পূর্বে এ রূপরেখা ততখানি সমাদর লাভ করে নি। এ সময়ে দুটো পরাশক্তিই পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র ও আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র প্রচুর পরিমাণে সঞ্চয় করে। তখন থেকে প্রচলিত কৌশলগত ও সামরিক বিতর্ক সমকালীন কৌশলগত চিন্তাধারার ক্ষেত্রে "স্বর্ণযুগের" সূচনা করে। পরবর্তীকালে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমী বিশ্বে পররাষ্ট্র নীতির সঙ্গে রণনীতি প্রসূত চিন্তাধারা সংযোজনের ব্যাপক প্রচেষ্টা চলে। স্বাভাবিক কারণে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নেও একই ধরনের প্রয়াস চলে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এরূপ ধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে র‍্যান্ড করপোরেশন, হাড্সন ইনস্টিটিউট, ও হোভার ইনস্টিটিউশন প্রভৃতি। সরকারি অনুদান ছাড়াও রকফেলার ব্রাদার্স ফান্ড', ফোর্ড ফাউন্ডেশন প্রভৃতি সংস্থা অর্থ যোগায়। ১৯৫৮ সনে লন্ডনে বেসরকারি উদ্যোগে গঠিত হয় প্রখ্যাত 'ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ'। এই প্রতিষ্ঠান কৌশলগত চিন্তা-চেতনা সৃষ্টি ও রণনৈতিক গবেষণা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে মৌলিক অবদান রেখে চলছে। যোগাযোগ, সদস্যপদ, সম্মেলন ও সেমিনার আয়োজনের দিক থেকে কালে এ প্রতিষ্ঠান যথার্থ আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করে। উল্লেখ্য, বর্তমানে এর সদস্যপদ বিশ্বের আশিটির বেশি দেশে বিস্তৃত। ক্রমশ বিশ্বের উন্নয়নশীল অনুন্নত দেশগুলোতে সরকারি উদ্যোগে একই জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, যেমনি বাংলাদেশেও প্রতিষ্ঠিত হয় 'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল এণ্ড স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ'। পাকিস্তানে রয়েছে, 'ইনস্টিটিউট ফর রিজিওলাল স্টাডিজ', 'ফর স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ' এবং ভারতে রয়েছে 'ইনস্টিটিউট ফর ডিফেন্স এণ্ড ডিফেন্স এনালাইসিস।' প্রায় প্রতিটি দেশে সব প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের কৌশলগত ও পররাষ্ট্র নীতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে আসছে।

যুদ্ধদ্বন্দ্ব সম্পর্কিত তত্ত্বীয় গবেষণা এবং বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রচলিত বিতর্কের কারণে কৌশলগত তত্ত্বীয় চিন্তাধারাও হয় বহুমুখী এবং বিচিত্রধর্মী। গবেষণা দৃষ্টিকোণ থেকে কাউকে 'মার্জিনপন্থী' বলা চলে, কাউকে বলা যায় 'সিস্টেমপন্থী'; আগ্রহের দিকে থেকে কেউ হচ্ছেন 'অগ্র-রণনৈতিক', কেউ 'বাস্তববাদী', আর কেউ হচ্ছেন 'পরীক্ষা-নিরীক্ষা' প্রয়াসী; কেউ ব্যবহার করে থাকেন 'চিরাচরিত' গবেষণা পদ্ধতি, আর কেউ কেউ বিভিন্ন ধরনের 'বৈজ্ঞানিক-রণনৈতিক' রূপে পরিচিত। বৈজ্ঞানিক-রণনৈতিকেরা 'সিস্টেম

www.pathagar.com

বিশ্লেষণ', ক্রীড়া তত্ত্ব ও অন্যান্য সৃজনশীল পন্থা-পদ্ধতির প্রয়োগের মাধ্যমে তাঁদের বিশেষজ্ঞমূলক জ্ঞানদক্ষতা ও পারদর্শিতা অর্জনে প্রয়াসী।[২০]

শান্তি গবেষণা

রণনৈতিক রূপরেখার মাধ্যমে নীতি নির্ধারণ বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ চলে, দেখা হয় যুদ্ধদ্বন্দ্ব সম্পর্কিত আচার-আচরণ, কিন্তু শান্তি গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে বস্তুনিষ্ঠ ও অনুকরণীয় জ্ঞানতত্ত্ব উদ্ভাবন ও সঞ্চয় করা। শান্তি গবেষণা চলে যুদ্ধদ্বন্দ্বের উৎস ও সূত্র বা প্রক্রিয়া উন্মোচিত করার কাজে, তুলে ধরা হয় এতে শান্তির অবস্থা। কৌশলগত বিশ্লেষণের প্রয়াস হচ্ছে এরূপ বোঝাপড়া করা হয় যে একটি উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কি কি নীতি গ্রহণ করা যেতে পারে। এতে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো পর্যালোচনা করা হয়। পক্ষান্তরে, শান্তি গবেষণা হচ্ছে একটি জ্ঞানচর্চার বিষয় স্বরূপ। এ গবেষণার ক্ষেত্রে জ্ঞানসাধনা একটি প্রশ্ন সম্পর্কিত উত্তর সন্ধানের কাজে নিয়োজিত ঃ 'নেতৃবর্গ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের কিরূপ উপদেশ দেয়া যেতে পারে?"[২১] এক মার্কিন সমাজ. মনোবিজ্ঞানীর মতে, শান্তি গবেষক যুদ্ধদ্বন্দ্বের 'সমাজ পরিবেশগত, দৃষ্টিভঙ্গিজনিত ও কাঠামোগত উপাদান' জানার প্রয়াসে গবেষণারত থাকেন।[২২] সংক্ষেপে, শান্তি গবেষণালব্ধ জ্ঞান রাষ্ট্রের হর্তাকর্তাদের তাঁদের কৌশলগত পছন্দ-অপছন্দ ও বিকল্প পন্থাসমূহের সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা মূল্যায়নে সহায়ক হতে পারে। এভাবে ধারণাগত দিক থেকে কৌশলগত বিশ্লেষণ ও শান্তি গবেষণা পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। একটি প্রভাব ফলে অন্যটির ওপর।

কৌশলগত বিশ্লেষণের মতো শান্তি গবেষণাও একটি সাম্প্রতিক জ্ঞান-অনুসন্ধানের ক্ষেত্র। ১৯৫০-এর দশকের পূর্বে শান্তি সমস্যা সম্পর্কিত গবেষণাকর্মে তত্ত্বীয় বা ধরণাগত রূপ দেয়া হয় অতি সামান্যই । সেই সময় অবধি শান্তি গবেষণা নামে কোনোরূপ জ্ঞানচর্চা বিষয়ের অস্তিত্ব ছিল না। শান্তি সম্পর্কিত জ্ঞান-গবেষণার উন্নয়ন এবং প্রসার চলে পারমাণবিক প্রযুক্তির ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা প্রসারের পাশাপাশি। এক্ষেত্রে সম্ভবত একটি নতুন প্রেক্ষিত তুলে ধরা যেতে পরে ঃ আর্থ-সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের অধিকার লাভের আকুল কামনা। এটা পরিলক্ষিত হয় বিশ্বের সর্বত্র। পারমাণবিক প্রযুক্তি এবং নতুন আর্থ-সামাজিক দাবি যথাক্রমে যুদ্ধোত্তরকালের দুটি ভিন্নধর্মী বিপ্লবের সঙ্গে সম্পৃক্তঃ এর একটি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিক বিপ্লব, আরেকটি সাম্যাদর্শের চেতনাজনিত বিপ্লব।[২৩] এরূপ দ্বান্দ্বিক উপাদানের ফলশ্রুতিতে নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিষয়াদিতে পুনরায় প্রবল আগ্রহ সঞ্চার হয়, আগ্রহ জাগে অস্ত্রশস্ত্রের প্রকোপে সংঘটিত দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধে।

www.pathagar.com

ফলে আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ ও শান্তির সমস্যাদি নিয়ে গবেষণা এ চিন্তার ক্ষেত্রে নতুন ভাবে সাড়া জাগে, নতুন ধ্যান-ধারণার সমাবেশ ঘটে আন্তর্জাতিক রাজনীতির বৃহত্তর পরিমণ্ডলে, নতুন জ্ঞান-জগতের দ্বারোদ্ঘাটিত হয়।

এ জাতীয় জ্ঞানান্বেষণ ও অনুসন্ধিৎসা থেকে বহু চিন্তাবিদ এবং পণ্ডিতের লেখা ও গবেষণাকর্মে গভীর পরিবর্তনের ধারা পরিলক্ষিত হয়। অনেকে যুদ্ধের কারণ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শান্তি প্রয়াসে আগ্রহী হন। এসব বিষয়ে নতুন আগ্রহের প্রভাব ছিল বহুমুখী। কতিপয় চিন্তাবিদ যুদ্ধ সম্পর্কে বেশ অন্তর্দৃষ্টি পরিচয় রাখেন, যুদ্ধের সমস্যা সম্পর্কে তাঁরা উপস্থাপিত করেন পুঞ্জিভূত তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণ। তাঁদের মধ্যে ছিলেন পিরিটিম সরোকিন[২৪] ও কুইনসী রাইট।[২৫] অন্যরা যুদ্ধের সমস্যা বিশ্লেষণে অংকশাস্ত্র ও পরিসংখ্যান সম্পর্কিত দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করেন। তাঁদের মধ্যে খ্যাতিমান ছিলেন ল্যুইস রিচার্ডসন।[২৬] তিনি ছিলেন একজন যশস্বী ব্রিটিশ আবহাওয়া ও পদার্থবিজ্ঞানী। কিছু কিছু চিন্তাবিদ যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রভিত্তিক অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োগ করে তত্ত্বীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করেন। তাঁদের মধ্যে সবচাইতে নামকরা ছিলেন ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী র‌্যামন্ড আরোঁ।[২৭] এছাড়া কতিপয় বিশ্লেষক-পণ্ডিত জোর দেন দ্বন্দ্বের সৃজনশীল ও ইতিবাচক বিষয়ের ওপর। তাঁদের মধ্যে নামকরা হচ্ছেন মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী লুইস কোজার।[২৮] তিনি প্রথিতযশা জার্মান দ্বন্দ্ব বিশ্লেষক জর্জ সিমেল–এর চিন্তাধারার অনুসারী।[২৯]

আরো কিছু বিশেষজ্ঞ যুদ্ধদ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন সুপারিশ করেন। একই সঙ্গে তাঁরা এরূপ অভিমতও ব্যক্ত করেন যে, দ্বন্দ্বকে একটি সার্বিক সামাজিক প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে দেখতে হবে, যুদ্ধকে দেখতে হবে সেই প্রক্রিয়ার একটি দিক হিসেবে। বস্তুত, তাঁরা সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিক যেমন, অর্থনীতিক, শিল্প সম্পর্কিত,আদর্শগত, নৈতিক সম্বন্ধীয় ও আন্তর্জাতিক দিকে দ্বান্দ্বিক যোগসূত্রের বিষয় বলে উল্লেখ করেন। এ জাতীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে বিশেষ অবদান রাখেন মার্কিন অর্থবিজ্ঞানী কেনিথ বোল্ডিং।[৩০] বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় শক্তির বন্টন এবং যুদ্ধের সূচনায় কোনোরূপ যোগসূত্র বা সংযোগ রয়েছে কিনা সেই বিষয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থপন করেন, তত্ত্বীয় বক্তব্য রাখেন যুদ্ধের প্রাদুর্ভাব ও তীব্রতার ওপর বিশ্লেষণী কাঠামো বা রূপরেখা উপস্থাপন করেন বিশ্বে দ্বিমেরুকরণ ও বহুমেরুকরণের তাৎপর্য সম্পর্কে। এসব স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞদের মধ্যে রয়েছেন মোর্টিন ক্যাপলান[৩১] কার্ল ডয়েস,[৩২] ডেভিড সিঙ্গার,[৩৩] কেনিথ ওয়াল্জ,[৩৪] রিচার্ড রোজন্কস[৩৫] প্রমুখ।

www.pathagar.com

যুদ্ধদ্বন্দ্বের কারণ ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞানচর্চা এবং বিশ্লেষণে নিযুক্ত থাকার পর্যায়ে উপর্যুক্ত পণ্ডিত–চিন্তাবিদদের গবেষণা ও অনুসন্ধানের ধারায় এক গভীর বিবর্তন দেখা দেয়। অনেকে শান্তির প্রয়াস ও শান্তির অবস্থা নিয়ে চিন্তালব্ধ জ্ঞান উপস্থাপিত করেন। অনেক পণ্ডিত ও বিশ্লেষক তাঁদের নতুন অনুসন্ধিৎসার দৃষ্টিকোণকে শান্তি গবেষণা রূপে তুলে ধরেন, নিজেদের পরিচয় দেন শান্তি গবেষকরূপে। এ গবেষণার প্রয়াস প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করে ১৯৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে স্কান্ডিনোভিয়ার দেশগুলোতে। নরওয়ের অস্‌লোতে প্রখ্যাত শান্তি গবেষক হোয়ান গালটুং-এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ইন্টারন্যাশনাল পীচ রিসার্চ ইনস্টিটিউট।' তাঁরই উদ্যোগে সৃষ্টি হয় অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বিভাগ 'পীচ এন্ড কনফ্লিক্ট স্টাডিজ'। প্রায় একই সময়ে সুইডেনেও প্রতিষ্ঠিত হয় 'স্টকহোম পীচ রিসার্চ ইনস্টিটিউট' বা সিপ্রি। শীঘ্রই গালটুং এবং অন্যান্যদের উদ্যোগে 'ইন্টারন্যাশনাল পীচ রিসার্চ এসোসিয়েশন' ও গঠিত হয়। শান্তি গবেষণাও এ সম্পর্কিত চিন্তা-চেতনায় বিভিন্নমুখী প্রভাব ও অবদান রাখেন গালটুং, আর এই নতুন গবেষণা বিষয়ের সঙ্গে তাঁর নাম অবিচ্ছেদ্য হয়ে দাঁড়ায়। তাঁকে অনেকে শান্তি আন্দোলনের জনকরূপে অভিহিত করেন।

অবশ্যি, শান্তি গবেষণা স্কান্ডিনোভিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি। ক্রমশ ইউরোপের অন্যত্র এবং উত্তর আমেরিকায়ও এ গবেষণা ক্ষেত্র প্রসার লাভ করে। এ বিষয় সম্পর্কে আগ্রহ জাগে বিশ্বের অন্যান্য মহাদেশেও। আলোচনা-সভা ও সম্মেলনের আয়োজন চলে অনবরত, প্রকাশিত হয় বহু পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী। অধ্যয়ন বিভাগ এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানও খোলা হয় বিশ্বের অনেক দেশে। বর্তমানে বিশ্বে এ জাতীয় বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩০০-এর অধিক হবে। এরূপ সব বহুমুখী কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্নঃ শান্তির সমস্যা ও প্রয়াস নিয়ে জ্ঞানচর্চা অব্যাহত রাখা। ১৯৬০-এর দশকের শেষ দিকে শান্তি গবেষণা ব্যাপক গতিশীলতা অর্জন করে এবং পরিশেষে এ সম্পর্কিত চিন্তা ও গবেষণা আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দুই হাজারের অধিক শান্তি গবেষক শান্তির সমস্যা ও অবস্থা নিয়ে জ্ঞানচর্চায় রত হন। এ সময় থেকে শান্তি গবেষণা একটি প্রতিষ্ঠিত আন্তঃঅধিতব্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত।[৩৬]

নতুন জ্ঞানচর্চার বিষয় শান্তি গবেষণা সরাসরি আদর্শ-মূল্যবোধ দ্বারা সংক্রামিত নয়। যুদ্ধদ্বন্দ্ব বিরোধী আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় শান্তিবাদ (Pacifism) বা শান্তি আন্দোলন।[৩৭] কিন্তু শান্তি গবেষণায় তত্ত্ব বা ধারণাগত দিক থেকেই সক্রিয় পন্থা গ্রহণ বা ক্রিয়াশীলতা পরিহার করা হয়। কেননা শান্তি গবেষণায় এরূপ মনে করা হয় না যে মানব

www.pathagar.com

সমাজ থেকে যুদ্ধ ও দ্বন্দ্বের নির্মূল করা সম্ভব হবে। বরং শান্তি গবেষণা মতে, দ্বন্দ্ব অনিবার্য, কিন্তু গবেষণালব্ধ রূপরেখা ও পুঞ্জিত জ্ঞানতত্ত্ব ব্যবহারের মাধ্যমে এর নিয়ন্ত্রণ করা বাঞ্ছিত বা সমীচীন এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে এসব-দ্বন্দ্ব বিরোধ সমাধানের প্রয়াস চলতে পারে। শান্তি গবেষণা সরাসরি আদর্শ-মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত না হলেও এ হচ্ছে একটি প্রেরণাব্যঞ্জক জ্ঞানান্বেষণের বিষয়। কেননা এতে সহিংসতার পথ পরিহার করে যুদ্ধদ্বন্দ্ব নিষ্পত্তির প্রয়াস চলে। এ জাতীয় উদ্দেশ্য সাধনকল্পে শান্তি গবেষকরা রাষ্ট্রীয় নীতির প্রাসঙ্গিকতা বিচার-বিবেচনা করে গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে প্রয়াসী।[৩৮]

নিঃসন্দেহে শান্তি গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছ, রয়েছে এর অভিন্ন শান্তির লক্ষ্য, কিন্তু এতে কোনো একক গোষ্ঠী এক বা একাধিক পদ্ধতির সমন্বিত ভিত্তিতে গবেষণাকর্মে নিয়োজিত রয়েছেন বলা সঠিক হবে না। বস্তুত, সাম্প্রতিককালের ব্যাপক পরিমাণ প্রবন্ধ বা নিবন্ধ ও বই-পুস্তক প্রকাশনা সত্ত্বেও শান্তি সমস্যা সম্পর্কে গবেষণা কাজ সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত ও রীতিবদ্ধভাবে পরিচালিত করার মতো এখনো পর্যাপ্ত তত্ত্বীয় পদ্ধতি বা রূপরেখা অনুপস্থিত। তাই এ গবেষণার বিষয়বস্তু ও এর পরিধি নিয়ে অনেক বিতর্কের অবতারণা করা যেতে পারে। এমন কি এর দৃষ্টিকোণ সম্পর্কেও বহুবিধ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হতে পারে।

এ ধরনের অবস্থার কারণ বহুবিধ। অংশত এর কারণ নিহিত শান্তি গবেষণার উদ্দেশ্যজনিত প্রক্রিয়ায় শান্তি গবেষণা যেহেতু চলমান দ্বন্দ্বের উৎস ও উত্তরের সন্ধানে ব্যাপৃত এবং দ্বন্দ্বের প্রকৃতি পরিবর্তনশীল সেহেতু শান্তি গবেষণাও দ্বন্দ্বের অব্যাহত প্রক্রিয়ার উৎস চিহ্নিত করার কাজে নিযুক্ত। এতে উদ্ভাবন করা হয় দ্বন্দ্বের সমাধানে যথাযথ পন্থা, আর এসব গ্রহণের সপক্ষেও যুক্তি-প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়।[৩৯] দ্বিতীয়ত, 'শান্তি' ধারণা হিসেবে এখনো অনেকের কাছে মনে হয় নীহারিকা বা মোহমায়ার মতো। বস্তুত, 'শান্তি' প্রত্যয়টি গলাবাজ রাজনীতিকরা সোচ্চার কণ্ঠে তাঁদের নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির কাজে এরূপ বিকৃতভাবে উপস্থাপিত করেন যে একে বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের কাজে ব্যবহার করা কঠিন।[৪০] এর কারণ ঃ ধারণা হিসেবে 'শান্তি' বেশ 'অস্পষ্ট', অনেকটা ভাবাবেগমণ্ডিত এবং এরূপ বহুমুখী অর্থ বহন করে যা' ব্যাখ্যাদানকারী আপন স্বার্থ চরিতার্থতায় এর ব্যবহার করতে পারে।[৪১]

এসব সত্ত্বেও এটা বললে সমীচীন হবে না যে, শান্তির কোনো বস্তুনিষ্ঠ অর্থ নেই। শান্তি গবেষণার সমরূপ ও নির্দিষ্ট রূপরেখার অভাব থাকলেও শান্তি সম্পর্কিত কিছু কিছু ধারণার মধ্যে যোগসূত্র পরিলক্ষিত হয়, যে সব ধারণা এ বিষয়ে তত্ত্বীয় গবেষণায় সহায়ক হতে পারে।

www.pathagar.com

প্রথমত শান্তির সংজ্ঞাগত রূপের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাক। বেশ কিছুকাল থেকে শান্তি গবেষণায়রত প্রায় প্রত্যেক গবেষক শান্তির নেতিবাচক ও ইতিবাচক সংজ্ঞা উপস্থাপিত করে আসছেন। নেতিবাচক শান্তি উদ্ভব হয় প্রত্যক্ষ সহিংসতা দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ না থাকলে। ইতিবাচক শান্তি অর্জন সম্ভব হয় সক্রিয় সহযোগিতা বা সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্কের উন্নয়ন, পারস্পরিক বোঝাপড়া, সামাজিক সুবিচার ও সংহতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।[৪২] তাহলে বলা চলে, শান্তি গবেষণার কাজ হচ্ছে, 'শান্তি বিঘ্ন হয়' বা 'শান্তি সুগম হয়' এরূপ অবস্থা নিরূপণ বা উদ্ভাবনকল্পে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা।[৪৩] এ জাতীয় কাজ সুসম্পন্ন হলে নেতিবাচক ও ইতিবাচক উভয়বিধ দৃষ্টিকোণ থেকে শান্তি সহজতর হবে। শান্তি গবেষণার উদ্দেশ্য কিন্তু নীতি প্রণয়ন নয়, এর কাজ হচ্ছে শান্তির অনুকূল অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান সমাবেশ করা, একে পুঞ্জিত বা তত্ত্বীয় রূপ দেয়া– এমনভাবে অধিকতর সমৃদ্ধ করা যাতে এই জ্ঞানতত্ত্বকে শান্তি প্রক্রিয়ার কাজে গ্রহণযোগ্য ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করানো যায়। এভাবে শান্তি গবেষণার জন্ম হয় একটি ফলিত জ্ঞানান্বেষণের বিষয় হিসেবে।[৪৪]

এরপর প্রশ্ন দাঁড়ায়, শান্তির যেহেতু দু'ধরনের অভিব্যক্তি সেহেতু কোনো ধরনের শান্তির ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা সমীচীন হবে–ইতিবাচক বা উচ্চমাত্রার শান্তি না নেতিবাচক বা নিম্নমাত্রার শান্তি? অনেকে মনে করেন যে, শান্তি সমস্যা সম্পর্কিত যে কোনো চিন্তা বা জ্ঞানচর্চায় নেতিবাচক ও ইতিবাচক উভয়বিধ শান্তির প্রতি দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কথা হচ্ছে, যেক্ষেত্রে পুরো সম্পর্কের ধারা দ্বান্দ্বিক রূপে পরিগণিত এবং মৌলিক প্রত্যক্ষজ বা উপলব্ধিপ্রসূত উপাদানসমূহ দ্বন্দ্ব-বিরোধমুখর রূপে প্রকাশ পায় সে ক্ষেত্রে উচ্চমাত্রা শান্তির সংজ্ঞা গ্রহণ করা শুধু অপ্রাসঙ্গিক হবে না, বিবেচিত হবে নিরর্থক রূপেও। প্রকৃতপক্ষে, দ্বন্দ্বমুখর যে কোনো পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ইতিবাচক শান্তির অবস্থা অনুমান করা অবাস্তব রূপে বিবেচিত হতে বাধ্য।[৪৫] তাই সম্ভবত এটা বলা সঙ্গত যে, ইতিবাচক শান্তির পূর্বাবস্থা সৃষ্টি হওয়া অবধি নেতিবাচক লক্ষণ বা অবস্থাদি চিহ্নিত করা উচিত হবে যা ইতিবাচক শান্তির পথে প্রতিবন্ধক হতে পারে।

অবশ্য সমাজে দ্বন্দ্ব ও কলহের তুলনা চলে মানুষের হাতে গড়া দুর্যোগ বা দুর্বিপাকের সঙ্গে। এ হচ্ছে এমন এক সর্বনাশা পরিস্থিতির সামিল যার মোকাবিলায় বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত, পর্যায় ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এরূপ এক ত্রাণ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয় যাতে বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তি, সংগঠন বা ব্যক্তিবিশেষকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে বিশেষ বিশেষ ভূমিকায় নিয়োজিত করা যেতে পারে। এরূপ ত্রাণ-অভিযানে উপশম কাজ সম্পূর্ণ করতে হলে এমন একটি কার্যকর প্রক্রিয়া দরকার যাতে দুঃখ-লাঞ্ছনার প্রতিষেধক ও

www.pathagar.com

সীমিতকরণ ব্যবস্থার পাশাপাশি পুনর্বাসনের বিধানও থাকে।[৪৬] দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে জটিল ব্যাধির সঙ্গেও তুলনা করা চলে।[৪৭] সুস্বাস্থ্য ফিরে পেতে হলে এরূপ ব্যাধির লক্ষণ বুঝা দরকার, দরকার যথাযথ প্রতিষেধক ও ঔষধ। এ সবের পাশাপাশি প্রয়োজন উপাদেয় ও পুষ্টিকর খাবার। এভাবে ত্রাণ ও চিকিৎসা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায় হচ্ছে একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত এবং প্রায়শ এসব পর্যায় পৃথক করা দায়। এসবের মতো শান্তিও হচ্ছে এক সমন্বিত প্রক্রিয়াজাত অভিযান। এ অভিযানে সব ধরনে প্রয়াস ও প্রচেষ্টা আবশ্যক হতে পারে যাতে দ্বন্দ্বের প্রতিষেধক ও সীমিতকরণে প্রকৃত অবদান রাখা সম্ভব হয়, শান্তি হয় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত।

এভাবে শান্তি এখন আর অবাস্তব বা কল্পলোকের অবস্থাকে বুঝানো হয় না। শান্তি হচ্ছে এক যৌথ পরিকল্পনা ও প্রক্রিয়ার ফসলস্বরূপ, যে প্রক্রিয়ায় দ্বান্দ্বিক 'সম্পর্ক পরিবর্তিত রূপ ধারণ করে এমন এক পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয় যখন উন্নয়ন [ও সংহতি] সম্ভব হতে পারে।'[৪৮] এ ধরনের প্রক্রিয়া সূচিত হয় শান্তি সংরক্ষণের ('Peacekeeping') মাধ্যমে, কিন্তু শান্তি প্রণয়ন ('Peacemaking') এবং শান্তি সংস্থাপন ('Peacebuilding') এই প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। কেননা শান্তি প্রক্রিয়া তার চূড়ান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে তিনটি পর্যায় অতিক্রম করতে হয়ঃ প্রত্যক্ষ সহিংসতা ('Physical violence'), নেতিবাচক শান্তি এবং ইতিবাচক শান্তি। (ছকে ব্যাখ্যার জন্য দেখুন নিম্নের চিত্র ঃ ৪.২ শান্তির পর্যায়ক্রম।)

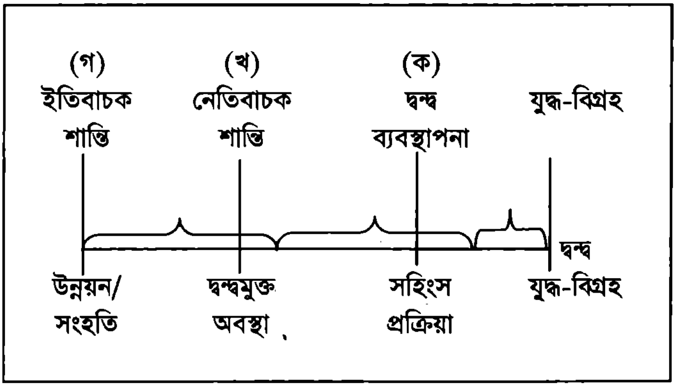

চিত্র ঃ ৪.২ শান্তির পর্যায়ক্রম

www.pathagar.com

প্রথম পর্যায় (ক) দ্বন্দ্ব-ব্যবস্থাপনা পন্থা'র ('Conflict-management technique') সমতুল্য। এই পর্যায়ে সহিংসতা নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে শান্তি প্রক্রিয়ার প্রধান কাজ যাতে দ্বন্দ্ব সম্প্রসারিত না হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে (খ) সহিংসতা ও প্রকাশ্য দ্বন্দ্বমুক্ত অবস্থা সৃষ্টি করতে হয় এবং এর ফলশ্রুতিতে নেতিবাচক শান্তির অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়।

তৃতীয় পর্যায়ে (গ) শান্তি প্রক্রিয়া সংহতি ও উন্নয়নের পথ সুগম করে।

একটি জঁটালো দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটে এরূপ যুক্তির অবতারণা করা যেতে পারে যে, একজন শান্তি সংরক্ষকের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টি করা, গড়ে তোলা এমন এক আপেক্ষিক উত্তেজনামুক্ত পরিবেশ যাতে শান্তিপ্রণেতা ও শান্তি-সংস্থাপক যথাক্রমে রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক সংগঠক হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন, চিহ্নিত করতে পারেন দ্বন্দ্ব-বিরোধের মূল কারণ, আর অধিকতর তৎপর হতে পারেন এসবের স্থির সমাধানে, সুনিশ্চিত করতে পারেন স্থায়ী শান্তি।

শান্তি প্রক্রিয়ার সার্বিক সমন্বিত অভিব্যক্তি সত্ত্বেও নেতিবাচক শান্তি-ই হচ্ছে সমকালীন শান্তি গবেষণার প্রধান মনোযোগের বিষয়। এর কারণ দু'ভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। প্রথমত, ইতিবাচক শান্তির পূর্বশর্ত হচ্ছে নেতিবাচক শান্তি, আর দ্বিতীয়ত নেতিবাচক শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হলে সহিংসতা সম্প্রসারিত হয়ে অপরিমিত রূপ ধারণ করতে পারে। শান্তি প্রক্রিয়ার আরেকটি দিকেও দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে শান্তিকে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া থেকে অবিচ্ছিন্ন মনে হবে, শান্তি হয়ে পড়ে দ্বন্দ্বের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তাই দ্বন্দ্ব তত্ত্ব 'শান্তি তত্ত্বের অপরিহার্য সহায়ক তত্ত্বরূপে বিবেচিত।'[৫০]

এই যুক্তির ধারা অবশ্যি এখানেই শেষ হয় না। এ প্রসঙ্গে আরো যুক্তিযুক্ত বিষয়ও বর্তমান। শান্তি যেহেতু দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া থেকে অবিচ্ছিন্ন সেহেতু আন্তর্জাতিক সম্পর্কে এ ধারণা দুটি সংশ্লিষ্ট ব্যাপকতর অর্থের রূপ পরিগ্রহ করে। প্রথমত, শান্তি দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের সার্বিক সম্পর্কে কতিপয় বৈশিষ্ট্যের ওপর আলোকপাত করে। শান্তি প্রক্রিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে শান্তি প্রয়াসীদের জন্য এর কার্যত অর্থ দাঁড়ায় এরূপ ঃ তাঁদের কাজ হবে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের ধারা চিহ্নিত করা, সমীচীন হবে দেখা কিভাবে দ্বন্দ্বরত পক্ষ-বিপক্ষের প্রতিযোগী মৈত্রী বন্ধন শান্তি প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলে। শান্তি প্রয়াসীদের দ্বিতীয় কাজ হবে প্রতিযোগী পক্ষ-বিপক্ষের নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে দ্বান্দ্বিক ব্যবস্থার একটি সীমারেখা চিহ্নিত করা। একে দ্বন্দ্বের অনুক্রমণী বা নির্ঘণ্টও বলা চলে। এটা থেকে প্রতিযোগী পক্ষসমূহের দ্বন্দ্বের সচেতনতার

www.pathagar.com

পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব হতে পারে। শান্তি প্রক্রিয়ার কার্যকর প্রয়াসের ক্ষেত্রে এরূপ প্রয়োজনীয় দু'টি ভাবধারা সম্পর্কবিহীন নয় ঃ একটি দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে সৃষ্ট চাপ নিরূপণে সাহায্য করে, আরেকটি নির্ধারণে সহায়ক হয় এই চাপ সম্পর্কিত শক্তি পরিমাপ মাত্রা।[৫১] এভাবে একটি দ্বান্দ্বিক ব্যবস্থায় সম্পর্কের ধারাও এর অভিব্যক্তিজনিত ভাব-লক্ষণসমূহ চিহ্নিত করার ফলে শান্তি প্রয়াসীর পক্ষে মূল্যায়ন সম্ভব হবে যে একটি দ্বন্দ্ব কি শূন্যমান না অশূন্যমান। এভাবে পর্যালোচনা সম্ভব যে একটি দ্বন্দ্ব কি আপোষরফার পর্যায়ে, না আপোষের অযোগ্য। শান্তি প্রয়াসী ভাবতে পারেন যে দ্বন্দ্ব কি আলাপ ও আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি হবে, না ফয়সালা হবে হারজিতের বা জয়-পরাজয়ের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এভাবে দ্বন্দ্বের যথার্থ রূপ বা প্রকৃতি অনুধাবন করতে পারলে শান্তি প্রয়াসী তাঁর করণীয় কাজ সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন, যেমন ডাক্তার চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাঁর রুগীর প্রকৃত অবস্থা বা লক্ষণসমূহ বুঝার পরই সঠিক ব্যবস্থাপত্র দিতে পারেন।

শান্তি তত্ত্ব

এ পর্যায়ে সমকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতির দ্বান্দ্বিক ভাবধারা সম্পর্কে শান্তি গবেষণালব্ধ কিছু কিছু তত্ত্বীয় ধারণার প্রসঙ্গ আলোচনা করা যেতে পারে। শান্তি গবেষণায় সমকালীন রাষ্ট্রীয় আচরণজনিত দুই ধরনের দ্বন্দ্বের বিষয় উল্লেখ করা হয় ঃ এর একটি অপ্রতিসম ('asymmetric') আরেকটি প্রতিসম ('Symmetric') দ্বন্দ্ব। দ্বিতীয় ধরনের দ্বন্দ্ব সংঘটিত হয় মোটামুটি সমতুল্য বা সমান (সার্বিক অর্থে) পদমর্যাদা ও ধন-সম্পদসম্পন্ন দুই বা ততোধিক শক্তির মধ্যে, আর প্রথম ধরনের দ্বন্দ্ব চলে "ভিন্নতর পদমর্যাদাসম্পন্ন শক্তির মধ্যে, যাদের সম্পদ ও সংগতি সমরূপ নয়, এমন কি যারা হচ্ছে ভিন্নতর প্রকৃতির।"[৫২] এই দু'ধরনের দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক কারণে ভিন্নতর সহিংস তৎপরতা বা হিংসাত্মক প্রক্রিয়া উদ্ভব করে ঃ প্রতিসম দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে প্রাতিস্বিক সহিংসতা ('Personal violence'), আর অপ্রতিসম দ্বন্দ্বের ফলে দেখা দেয় কাঠামোগত সহিংসতা ('Structural violence')[৫৩]

প্রতিসম দ্বন্দ্ব ও তার ফলশ্রুতিতে সংঘটিত প্রতিস্বিক সহিংসতায় প্রতিযোগী পক্ষের দ্বন্দ্বে, এমন কি শূন্যমানভিত্তিক একেবারে হারজিতের ক্ষেত্রেও, আন্তর্জাতিক স্থিতি ও শান্তির প্রতি হুমকি আপেক্ষিকভাবে কম। কেননা এ ক্ষেত্রে প্রতিযোগী পক্ষ-বিপক্ষের তুলনা চলে সমরূপ পদমর্যাদা ও সমপ্রতিযোগী আদর্শ-উদ্দেশ্য সম্পন্ন দুই পরাশক্তির সঙ্গে। ক্ষমতা ও পদমর্যাদা প্রভৃতির দিক থেকে এরূপ পক্ষ-বিপক্ষ যথার্ত-ই সমতুল্য। ফলে তারা সম্ভবত একে অপরের স্বার্থ-সুবিধে, লাভ-অলাভ, অভিলাষ-আকাঙ্ক্ষার

www.pathagar.com

মাত্রা ও সীমাবদ্ধতা বুঝতে পারে, আর বর্ধিত সহিংসতায় লিপ্ত হবার পূর্বে হাজার বার নিজ নিজ স্বার্থ ও অভিলাষের সীমারেখা বা গণ্ডি মূল্যায়ন করে থাকে। এক্ষেত্রে শান্তির কারণে পারস্পরিক যোগাযোগ বা শান্তি প্রয়াসী তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের সুযোগ ও সম্ভাবনা আপেক্ষিকভাবে অনেক বেশি।

কিন্তু অপ্রতিসম দ্বন্দ্ব ও এর ফলশ্রুতিতে সংঘটিত কাঠামোগত সহিংসতার ফলে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার স্থিতি বা এর শান্তিপূর্ণ বিবর্তন ক্ষুণ্ন হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রকটরূপে প্রকাশ পায়। এ জাতীয় দ্বন্দ্বে শান্তি প্রক্রিয়া বিপর্যস্ত হবার মূল কারণ হচ্ছে দ্বন্দ্বের মৈত্রী ব্যবস্থায় অপ্রতিসম বা উল্লম্ব প্রকৃতি। বস্তুত, একটি অপ্রতিসম দ্বন্দ্বকে উল্লম্ব অভিযান বা অনধিকার প্রবেশের সমপর্যায় ধরা যায়। বলা চলে, এ দ্বন্দ্ব হচ্ছে অতুলনীয় পদমর্যাদা ও সম্পদ-সংগতি সম্পন্ন একটি বহির্শক্তি কর্তৃক একটি ক্ষুদ্র দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অনাহুত হস্তক্ষেপ করার সামিল। এটা সম্ভবত বললে অত্যুক্তি হবে না যে, এই অনধিকার হস্তক্ষেপ প্রক্রিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে নতুন স্বাধীনতালব্ধ দেশসমূহের প্রতিসম আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিহত করে চলছে। এতে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার কাঠামোতে স্থিতিমূলক শান্তিপূর্ণ বিবর্তন ব্যাহত হয়ে আসছে। কেননা এর ফলে অনুষ্ঠিত যুদ্ধ-বিগ্রহের অতুলনীয় সামরিক শক্তির প্রবর্তন ঘটে, মানুষ এই শক্তির কারণে হয় শক্তির দাপটে প্রত্যয়ী রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রেরণ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী নেতৃবর্গের প্রতারণার বলি বা শিকার।

শুধু তাই নয়, মানুষ তার আত্মসিদ্ধির প্রয়াস থেকেও প্রবঞ্চিত হয়। এরূপ সমস্যার মূলসূত্র হচ্ছে অপ্রতিসম দ্বন্দ্ব, আর এসব দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয় অপ্রতিসম বা উল্লম্ব প্রকৃতির মৈত্রী ব্যবস্থা থেকে, শান্তি প্রক্রিয়া হয় বিপর্যস্ত। প্রসঙ্গটি সম্ভবত এভাবেও উপস্থাপিত করা যেতে পারে ঃ একটি অপ্রতিসম মৈত্রী ব্যবস্থার ফলশ্রুতিতে বিপথগামী প্রত্যক্ষণ বা দ্বন্দ্বের সচেতনতা জাগে; এর থেকে শান্তি প্রক্রিয়ায় বিপদগামী লেনদেন বা যোগাযোগের উদ্ভব ঘটে। এ সবের ফলে শান্তি হয় আরো সুদূরপরাহত, দ্বন্দ্বের অচলাবস্থা হয় অধিকতর প্রলম্বিত।

এভাবে সমকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতির অঙ্গনে পরিলক্ষিত অপ্রতিসম দ্বন্দ্ব অনেকটা যুক্তিযুক্ত অনুক্রমিক ধারায় সম্পৃক্ত ঃ উল্লম্ব বা অনধিকার প্রবেশের সঙ্গে যোগসূত্র ঘটে অপ্রতিসম মৈত্রীর ; ফলে সূচিত হয় অপ্রতিসম দ্বন্দ, আর এই দ্বন্দ্ব অপ্রতিসম সচেতনতা, রণসমাবেশ ও কৌশলগত সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দ্বন্দ্ব বিজড়িত পক্ষসমূহকে রূপান্তরিত করে শূন্যমান প্রতিযোগীতে এবং পরিশেষে আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কে এরূপ কাঠামোগত সহিংসতা দানা বেঁধে ওঠে যে শান্তি প্রক্রিয়া হিমাগারে নিক্ষিপ্ত হয়।[৫৪] মোট কথা, অপ্রতিসম, শক্তি, দৃষ্টিকোণ ও অপ্রতিসম মৈত্রী সম্পর্ক শূন্যমানের

www.pathagar.com

যুদ্ধদ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে এবং এ সকল ক্ষেত্রে শান্তি প্রক্রিয়া অপ্রাসঙ্গিক রূপ পরিগ্রহ করে।

এরূপ যুক্তির ধারা শান্তি তত্ত্ব প্রসূত। তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, কাঠামোগত সহিংসতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে দুর্বলের ওপর শক্তিমানের আঘাতে–আগ্রাসনের ফলে যখন আগ্রাসী শক্তি প্রত্যক্ষ সহিংসতার মাধ্যমে বিজড়িত হয় অপ্রতিসম দ্বন্দ্বে, সৃষ্টি করে লেজুড় বা তাবেদার সরকার, আর প্রতিষ্ঠা করে নিজেকে সেই সরকারের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে। অপ্রতিসম দ্বন্দ্ব উদ্ভব হলে এরূপ দ্বান্দ্বিক এক আবর্ত চক্র সৃষ্টি হয় এবং এর ফলশ্রুতিতে "অসম পক্ষ-বিপক্ষের মধ্যে সংঘটিত হিমায়িত সহিংসতা মোকাবিলা করা কঠিন হয়ে পড়ে," লিখেছেন হোয়ান গালটুং।[৫৫]

কেননা এ জাতীয় দ্বন্দ্বের সূত্রই হচ্ছে আন্তর্জাতিক সিস্টেমের খোদ প্রধান কাঠামো ঃ যেহেতু উল্লম্ব মৈত্রীর প্রধান নায়ক দ্বন্দ্বরত পক্ষসমূহ সৃষ্টি বা নির্ধারণ করে সেহেতু এ দ্বন্দ্বের প্রকৃতি গালটুং-এর মতানুযায়ী "দুই অসম পক্ষের হিমায়িত সহিংসতার দুষ্টরূপ পরিগ্রহ করে।"[৫৬] অপ্রতিসম দ্বন্দ্বের এরূপ আবর্ত চক্র থেকে পরিত্রাণ লাভ ও শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ হচ্ছে অনধিকার প্রবেশকারী শক্তির পক্ষে তার এক তরফা সম্প্রসারিত হাত গুটিয়ে নেয়া এবং এ জাতীয় দ্বন্দ্বের মধ্যস্থতাধর্মী হস্তক্ষেপের সুযোগ বা রাজনৈতিক সমাধানের অনুকূলে নিশ্চিত পরিবেশ সৃষ্টি করা।

উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে শান্তি তত্ত্ব এখন অনেকটা গ্রন্থিল, বোধগম্য রূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু এ তত্ত্ব এখন শুধু দ্বান্দ্বিক গবেষণার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, উন্নয়ন গবেষণার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ঃ "এ দুই ধারা গবেষণাকর্মের প্রথমটি নেতিবাচক শান্তির সঙ্গে অধিকতর সম্পর্কযুক্ত এবং দ্বিতীয়টি অধিকতর সংশ্লিষ্ট ইতিবাচক শান্তির সঙ্গে, যদিও অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে শান্তির উভয় প্রক্রিয়া একে অপরের কার্যক্ষেত্রে প্রসারিত হয়।"[৫৭] বস্তুত, শান্তি ও দ্বন্দ্ব তত্ত্বের মতো শান্তি ও উন্নয়ন তত্ত্বও অবিচ্ছিন্ন ঃ শান্তি না থাকলে অব্যাহত উন্নয়ন বা উন্নয়নের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা সম্ভবপর নয় এবং উন্নয়ন না ঘটলে শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না।[৫৮] উন্নয়নে সংজ্ঞা কি? শান্তির প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন বলতে শুধু উন্নতি-প্রবৃদ্ধি ও আধুনিকীকরণ বুঝায় না, এতে আরো "বিজড়িত সার্বিক আর্থ-সামাজিক সম্পর্ক এরূপ ঢেলে সাজানো যাতে অশান্ত অবস্থা সৃষ্টিকারী পূর্বের সকল দ্বন্দ্ব ও বিরোধের কারণ নির্মূল হয়, এসবের স্থলে চলে সহযোগিতা যাতে কোনোরূপ দ্বন্দ্ব বা বিরোধ পুনরায় দানা বেঁধে উঠতে না পারে।"[৫৯]

www.pathagar.com

এভাবে শান্তি তত্ত্ব শুধু উন্নয়ন তত্ত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, সহযোগিতা ও সমন্বয়মূলক অন্তর্নিহিত প্রয়োজনীয়তার কারণে সংহতি তত্ত্বের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গও হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুত, এই বিশ্ব সমাজে শান্তি সুনিশ্চিত করতে হলে মানবিক সম্পর্ক স্থিতিপূর্ণ করতে হবে সর্ব পর্যায়ে--দ্বান্দ্বিক, উন্নয়নমূলক ও সংহতির পর্যায়ে। জাতি ও রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে এসব সম্পর্ক হচ্ছে গতিশীল, আর তাই অব্যাহত শান্তির জন্য কাজ করতে হবে প্রতিনিয়ত যাতে হিংসাত্মক বা সহিংস কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জীবনের প্রবঞ্চনা এড়ানো সম্ভব হয়, সুনিশ্চিত করা চলে সুস্থ, সমৃদ্ধ জীবনের অভিজ্ঞতা ও সম্ভাবনা।

যুদ্ধ ও শান্তি গবেষণার সমরূপ উদ্দেশ্য

উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে এরূপ বুঝা যায় যে, ১৯৫০-এর দশকের দিকে শান্তি গবেষণার সূচনা থেকে শান্তি তত্ত্ব অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। এটা বলা হয়েছে যে, কৌশলগত জগতের আন্তর্জাতিক বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যাঁরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তাঁদের শক্তিভিত্তিক ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে শান্তি গবেষণার সূত্রপাত ঘটে। এমন কি দাবি করা হয় যে, শান্তি জ্ঞানান্বেষণের ক্ষেত্র থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে গোঁড়া বাস্তববাদীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়।[৬০] কিন্তু এ ধরনের বক্তব্য ত্রুটিমুক্ত নয়। এরূপ অভিমত শুধুমাত্র আংশিক সত্যতা বহন করে। কুইনসী রাইটের মতে, যুদ্ধ ও শান্তি হচ্ছে একই মুদ্রার এপিট-ওপিট মাত্র।[৬১] তাঁর বক্তব্যের রেশ ধরে এটা বলা যেতে পারে যে, কৌশলগত বিশ্লেষণ এবং শান্তি গবেষণাও হচ্ছে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ মাত্র। দু'টো গবেষণা বিষয় উৎসারিত হয় অনেকটা একই ঐতিহাসিক সূত্রে, দু'টোর উন্নয়ন ঘটে পারমাণবিক প্রযুক্তি ও মারণাস্ত্র উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে, দুটিতেই প্রায় একইরূপ ভাব ও ভাষা ব্যবহৃত হয়, দুটোই রাষ্ট্রীয় নীতি প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে জ্ঞান-গবেষণায় নিয়োজিত এবং প্রায়শ দু'বিষয়ের বিশ্লেষকদের মৌলিক স্বার্থ এবং উদ্দেশ্যও প্রায় সমরূপ। এসব সত্ত্বেও দুটো জ্ঞানান্বেষণের ক্ষেত্রই ভিন্নমুখী রূপরেখায় গণ্ডিবদ্ধ, অনেকটা আড়ষ্ট বলে মনে হয়।

কৌশলগত গবেষণার ভিন্নমুখী প্রবণতা

জ্ঞান-গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে কৌশলগত বিশ্লেষণে সার্বিক শান্তির উদ্দেশ্য রয়েছে বটে, কিন্তু বেশিরভাগ রণনৈতিক বিশ্লেষক রাষ্ট্রের দৈনন্দিন নিরাপত্তা ও সামরিক বিষয়াদি নিয়ে অধিকমাত্রায় বিচলিত এবং প্রায়শ তাঁরা দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিকোণ বা দূরদৃষ্টিজ্ঞান বিচ্যুত। কেননা তাঁদের অনেকে নিজেদের বাস্তববাদী বলে মনে করেন এবং রণনীতিকে তাঁরা একটি 'অমার্জিত হাতিয়ার' বা 'মারাত্মক বিষয় বা ব্যাপারে' পরিণত করেন। বাস্তববাদের আচরণে তাঁরা

উপস্থাপিত করেন অনেকটা অবাস্তব রণনৈতিক কৌশলগত তত্ত্ব। এসব তত্ত্বের মধ্যে রয়েছে নিবারক তত্ত্ব, 'নমনীয় প্রত্যুত্তরে,' সীমিত যুদ্ধ, পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের কৌশলমূলক ও কৌশলগত ব্যবহার, একটি সর্বব্যাপী যুদ্ধে প্রতিশোধমূলক বনাম প্রতিঘাতমূলক রণনীতি প্রয়োগ, 'সীমিত প্রতিশোধ' ব্যবস্থা, হুমকি ও প্রতিশ্রুতি প্রদানের মতো দ্বন্দ্বগত প্রক্রিয়া এবং এ জাতীয় আরো অনেক তত্ত্বীয় অভিব্যক্তি। তাঁরা শোনান 'ভয়াবহ প্রতিশোধের' কথা, বলেন 'বিশ্বাসযোগ্যতার' বিষয়, শহর-নগর নিশ্চিহ্ন করার প্রসঙ্গ টেনে আনেন, সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির জামানত সুনিশ্চিতকল্পে বলেন প্রতিঘাতমূলক শক্তির ব্যবহারের কথা, সহিংসতায় আইনগত বিধি-নিষেধ বা বাধা-বন্ধন অতিক্রম করে প্রতিহিংসামূলক পাল্টা ব্যবস্থার কথাও তাঁরা বলেন।

রণনৈতিক বিশ্লেষকদের জল্পনা ও কল্পনা এখানেই শেষ হয় নি। তাঁরা চালু করেন 'পারস্পরিক নিশ্চিত ধ্বংস' বা 'সন্ত্রাসের সাম্যের' মতো মতবাদ, কৌশলমূলক পারমাণবিক লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবার সম্ভাবনা এবং পরিকল্পনা নিয়েও বক্তব্য রাখেন। কৌশলগত বিশ্লেষকদের অনেকে রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারক হিসেবে কাজ করেন, সরকারি দায়িত্ব পালন করেন বিশেষজ্ঞ হিসেবে, পরাশক্তি ও অন্যান্য শক্তিবর্গের পারমাণবিক অস্ত্রের কৌশলমূলক মোতায়েনে ভূমিকা রাখেন, ইন্ধন যোগান পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের সম্ভাব্য সীমিত ব্যবহারের মতো বিশ্বাস ধারণেও। তাই রণনীতি অনেকের নিকট সামরিক কর্মকাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি রূপে মনে হয়।[৬২]

শান্তি গবেষণায় কল্পনামুখী প্রবণতা

পক্ষান্তরে শান্তি গবেষকরা সার্বিকভাবে হচ্ছেন অনেকটা স্বতন্ত্র, বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন পণ্ডিত ও তাত্ত্বিক মাত্র। যেসব সমস্যা নিয়ে নীতি নির্ধারকেরা প্রতিনিয়ত বা দৈনন্দিন জর্জরিত সে সব বিষয়ে শান্তি গবেষকদের খুব একটা উৎকণ্ঠা রয়েছে বলে মনে হয় না। বৈজ্ঞানিক রূপরেখাভিত্তিক জ্ঞান-গবেষণায় তাঁদের আগ্রহ রয়েছে সত্য এবং নীতি সম্বন্ধীয় পুঞ্জিত জ্ঞান উদ্ভাবনেও তাঁদের অবদান রয়েছে–এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তবু শান্তি গবেষকদের মোটামুটি আদর্শবাদী বলে মনে হয়। কেননা তাঁরা নীতি নির্ধারণকারী প্রশাসনিক ব্যবস্থা বা বাস্তব সরকারি কাঠামো থেকে নিজেদের দূরত্ব বজায় রাখতে প্রয়াসী। সম্ভবত একই কারণে কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নকারীরাও নিরাপত্তা ও রণনীতি সম্পর্কিত মর্মস্পর্শী বা স্পর্শকাতর বিষয়গুলোতে শান্তি গবেষকদের মতামত এড়িয়ে চলেন।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, শান্তি গবেষণা আন্দোলনের সূচনা থেকে এই জ্ঞানান্বেষণ ক্ষেত্রে নিয়োজিত জ্ঞানসাধক ও চিন্তাবিদরা শান্তি

www.pathagar.com

সম্পর্কিত চিন্তা-চেতনায় যথাযথ স্পষ্টতা ও নিষ্ঠার পরিচয় রাখেন। তাঁরা শুধু শান্তির নেতিবাচক কিংবা ইতিবাচক ধারণাগত রূপদান করেন নি, তাঁরা আরো উপস্থাপিত করেন অপ্রতিসম দ্বন্দ্ব ও কাঠামোগত সহিংসতার মতো তত্ত্বীয় অবস্থা যাতে প্রতিসম আশা-আকাঙক্ষা প্রতিহত হতে পারে, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় মানুষের আত্মসিদ্ধি বা মানবিক পূর্ণতা লাভের প্রক্রিয়ায়। তাঁরা আরো তুলে ধরেন যুদ্ধদ্বন্দ্বের এরূপ সম্ভাব্য পরিস্থিতি যাতে শান্তি প্রক্রিয়া সফল বা ব্যর্থ হতে পারে, আর তত্ত্বীয় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন কোনো কোনো পরিস্থিতিতে দ্বন্দ্বের অচলাবস্থা অব্যাহত থাকতে পারে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তাঁরা পশ্চিম ইউরোপের প্রতিরক্ষায় পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের ভূমিকা হ্রাস বা পরিহার সম্পর্কিত বিষয়ে বেশ কিছু তত্ত্বীয় ধারণা উপস্থাপন করেন। এসব ধারণা হচ্ছে প্রতিরক্ষা দৃষ্টিভঙ্গি ও কৌশলগত নীতি সম্পর্কিত। এমন ধারণার মধ্যে রয়েছে 'বিকল্প প্রতিরক্ষা', 'প্রতিরক্ষামূলক প্রতিরক্ষা' প্রভৃতি।[৬৩] শান্তি গবেষকদের উপর্যুক্ত বহুমুখী তত্ত্বীয় অবদান সত্ত্বেও এটা সম্ভবত বলা চলে, সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত রাষ্ট্রীয় নীতিতে শান্তি গবেষণালব্ধ জ্ঞানের প্রভাব অতি সীমিত বলে মনে হয়।

উপসংহার

বলা সঙ্গত যে, বিশ্ব সভ্যতা বর্তমানে এক ক্রান্তিকালে উপনীত। যুদ্ধের উপকরণ ও প্রযুক্তি মানব জাতিকে ঘিরে রেখেছে। পরাশক্তি ও অন্যান্য শক্তিবর্গ খেলে চলছে নিবারক চালের খেলা। এ খেলার চাল হিসেবে তারা পারমাণবিক যুদ্ধ ও লড়াইয়ের অস্ত্রশস্ত্র মোতায়েন করে চলছে, আর মানুষকে নিক্ষিপ্ত করছে 'উভয় সংকটমূলক বন্দিদশায়'। সভ্যতা বর্তমানে যে কিরূপ শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে নিপতিত তা' বিশ্বের বাস্তব অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করলে বুঝা যাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ৩-৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিমাণ ব্যয় করে গড়ে তোলা হয় এক ভয়াবহ পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডার। এ ভাণ্ডারে সঞ্চিত মেগাটন ক্ষমতার দ্বারা বিশ্বের প্রায় ষাট বিলিয়ন লোককে মারা যায়। তার মানে বর্তমানে জীবিত প্রতিটি মানুষকে এর দ্বারা ১২ বার মারা সম্ভব।

মার্কিন বিমান বাহিনীর বাজেটের বিষয় উল্লেখ্য করা চলে ঃ এই বাজেট তৃতীয় বিশ্বের ১.২ বিলিয়ন ছেলে-মেয়ের সর্বমোট শিক্ষা বাজেটের চাইতেও অনেক বেশি। অথবা উল্লেখ্য রুশ প্রতিরক্ষা বাজেট এর বিষয় ঃ মস্কো প্রতি বছর সামরিক খাতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে তা' তৃতীয় বিশ্বের ৩.৬ বিলিয়ন জনসংখ্যার স্বাস্থ্য-শিক্ষা যৌথ খাতের সার্বিক খরচের চাইতে অনেক বেশি। আরো উল্লেখ্য বিষয়ও রয়েছে। যেমন, একটি বিমানপোত বহর চালু

www.pathagar.com

রাখার জন্য প্রতিদিন ব্যয় হয় ৫,৯০,০০০ মার্কিন ডলার, কিন্তু ঐ প্রতিটি দিন শুধুমাত্র আফ্রিকায় ক্ষুধা বা ক্ষুধাজনিত কারণে ১৪,০০০ শিশু ধুকে ধুকে মারা যায়। যে কোনো 'বাস্তববাদী' কৌশলগত বিশ্লেষকের পক্ষে এসব রূঢ় বাস্তবতা উপেক্ষা করা কঠিন।

এছাড়া আরো মর্মস্পর্শী বাস্তব সত্যের স্বরূপও উদঘাটন করা চলে। সহিংসতা বেড়ে চলছে ক্রমশ। যুদ্ধ শুধু বাড়ছে না, বাড়ছে যুদ্ধজনিত মৃত্যুর হারও। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বের ৪০ বছরের চাইতে এ যুদ্ধের পরের ৪০ বছরে যুদ্ধমৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে চারগুণ। স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালে পরাশক্তিদ্বয় ভিন্ন দেশের মাটিতে ও ভিন্ন জনমানুষের জীবন নিয়ে উত্তরোত্তর ভূ-রাজনৈতিক অভিসন্ধি ও কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে।[৬৪] ইন্দোচীনে আমেরিকার অপ্রতিসম দ্বন্দ্বে-যুদ্ধে বিজড়িত থাকে এবং এ কাজে চূড়ান্ত হিসাবে ব্যয় করে ১৮০-২১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মতো।[৬৫] আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নও হয় সমরূপ ভূমিকায় অবতীর্ণ, আর অভিযুক্ত হয় 'ব্যাপক গণহত্যা আকারে উদ্বাস্তু সমস্যা' সৃষ্টির দায়ে।[৬৬] এসব যদি কাঠামোগত সহিংতার দৃষ্টান্ত না হয় তাহলে আর অন্য কোনো ভাষায় এসব উপস্থাপন করা চলে?

সহিংসতার আরেক রূপও দৃশ্যমান। সামরিক খাতে বিশ্বে প্রতিবছর খরচ হয় প্রায় ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অথচ বিশ্ব জনসংখ্যার বয়সী তিনজনের একজন একেবারে অশিক্ষিত, চারজনের মধ্যে একজন ভুখা। বিশ্বের এক বিলিয়ন জনমানুষ প্রতিনিধিত্বহীন সামরিক সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন দেশে বাস করে। ধনী দেশগুলো তাদের জাতীয় গড়পড়তা আয়ের ৫.৪% ব্যয় করে সামরিক খাতে, আর মাত্র ০.৩% প্রদান করে তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোকে উন্নয়নমূলক সাহায্য হিসেবে।[৬৭] শান্তি গবেষকরা এসব রূঢ় বাস্তবতার সত্যরূপ তুলে ধরেন এবং এ সবকে 'নিস্প্রাণ সহিংসতা' রূপে অভিহিত করেন, ('non-maierial violence') কেননা এসব সহিংস প্রক্রিয়া মানুষকে তার মানবিক আত্মসিদ্ধির সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে, ব্যাহত করে 'মানসিক আত্মবিকাশের পূর্ণায়ন[৬৮]। এর ফলে হয়তো বা শান্তি গবেষকরা নিছক আদর্শবাদী রূপে বিবেচিত হতে পারেন এক শ্রেণীর 'বাস্তববাদী' দেখক বা বিশ্লেষকদের দ্বারা।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি বাস্তবতার দিকেও দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যেতে পারে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কে একটি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি-কৌশল তখনই কার্যকর এবং ফলপ্রসূ বলে বিবেচিত হবে যখন প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্য যোগ্যতার যুক্তিভিত্তিক ও সুচিন্তিত মূল্যায়ন করা হবে, আপেক্ষিক তুলনা করা হবে নিজস্ব আদর্শ-উদ্দেশ্যের এবং এ দু'য়ের সমন্বিত সমীক্ষার ভিত্তিতে প্রণীত ও গৃহীত

www.pathagar.com

হবে প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রের একটি সার্বিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সাফল্যমুখী কৌশলগত কর্মপন্থা।[৬৯] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইন্দোচীনে দীর্ঘ প্রায় ২১ বছরের মতো অপ্রতিসম মৈত্রী সম্পর্কে বিজড়িত ছিল এবং এক বিশেষ পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্রের উল্লম্ব হস্তক্ষেপ ব্যাপকতর সামরিক রূপ পরিগ্রহ করে। বিপুল পরিমাণ আর্থিক অপচয় ছাড়াও ৫৬,০০০ এর মতো মার্কিন সৈন্য শুধুমাত্র ভিয়েতনামের রণাঙ্গনে প্রাণ হারায়। তবু ওয়াশিংটন ইন্দোচীনে তার কোনো মিত্রকে উদ্ধার বা রক্ষা করতে পারে নি। আফগানিস্তানে সোভিয়েত অভিজ্ঞতা একইভাবে ছিল ভয়াবহ। প্রায় এক দশকব্যাপী নৃশংস হস্তক্ষেপ প্রক্রিয়ার পর সাত দশকের সোভিয়েত রাষ্ট্রই ভেঙ্গে চুরমার হয়, আর এর ফলে সৃষ্ট আফগান গৃহযুদ্ধের প্রকোপ এখনো চলছে। রণনৈতিক ক্ষেত্রে এসব সঙ্গতিহীনতার পরিচয় বহন করে, দারুণ ব্যর্থতার ছাপও রাখে কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নকারী ও সামরিক বিশ্লেষকদের রণনৈতিক পর্যালোচনা এবং বিকল্প পরিকল্পনা ব্যবস্থার।

এটা বলার অবকাশ থাকে না যে, একমাত্র আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের ধ্বংসযজ্ঞ ক্ষমতার কারণেই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যুদ্ধকে চূড়ান্ত অভিব্যক্তি হিসেবে সেকেলে রূপদান করে। তাই রণনৈতিক বিশ্লেষক ও শান্তি গবেষকদের পক্ষে ভিন্নতর, পৃথক রূপরেখার পথ ধরে তাদের অমূল্য সময় ও প্রয়াসের অযথা অপচয় করা আদৌ সমীচীন হবে বলে মনে হয় না। রণনৈতিক ও কৌশলগত বিশ্লেষকদের উচিত হবে নতুন ধারার যুদ্ধ নিয়ে জল্পনা-কল্পনার চাইতে নতুন শান্তির পরিকল্পনার সন্ধানে অধিকতর অভিপ্রায় ও কর্মস্পৃহা প্রয়োগ করা। পারমাণবিক যুগে রণনীতির পুরানো সংজ্ঞা যথার্থ সেকেলে বলে মনে হয়। সমকালীন কৌশলগত নীতির প্রধান কাজ হচ্ছে যুদ্ধের পরিকল্পনায় প্রবৃত্ত থাকা নয়, এর মৌলিক কাজ অব্যাহত শান্তি ও উন্নয়নের বিকল্প নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা যাতে হিংসাত্মক বা দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া এড়ানো সম্ভব হয়, যাতে কোনোরূপ ভুলভ্রান্তির ফলশ্রুতিতে পরিশেষে রোজ-কেয়ামতের অনুপাতে সংঘটিত পারমাণবিক যুদ্ধজনিত মারাত্মক ধরনের ব্যাপক-সর্বনাশা হত্যাকাণ্ডের পরিণাম থেকে মানব সভ্যতাকে রক্ষা করা সম্ভব হতে পারে। বর্তমানকালে যুদ্ধজয়ের পরিকল্পনা, বিজয়ের মাধ্যমে উদ্দেশ্যসাধনে প্রয়াসী হওয়া চরম বোকামির সামিল। তাই রণনীতিকে দেখতে হবে সমকালীন বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে, বৃহত্তর শান্তির উদ্দেশ্যের আলোকে মানানসই পন্থা অবলম্বন করা, যাতে সামরিক শক্তি ব্যবহৃত হয় শুধুমাত্র দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের সমাধানে, শান্তিপূর্ণ স্বার্থ-অভিলাষ অর্জনে।[৭০]

www.pathagar.com

শান্তি গবেষকদের করণীয় দায়িত্ব সম্পর্কেও বেশ কিছু বক্তব্য রয়েছে। তাঁদের উচিত হবে বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্র তাত্ত্বিক, গবেষক বা নিছক জ্ঞানসাধকের স্বনির্ধারিত ভূমিকা পরিহার করা। তাদের শুধু উচ্চমানের গবেষণা কাজ বা তত্ত্বীয় সূত্র গড়ে তুললেই চলবে না, তাঁদের আরো সক্রিয় বা তৎপর হতে হবে যাতে তাদের পুঞ্জিত জ্ঞানতত্ত্ব আন্তর্জাতিক সম্পর্কে অধিকতর ফলপ্রদ কর্মকাণ্ড সুনিশ্চিত করে।[৭১] যে কোনো কল্যাণমুখী তত্ত্বের সুদৃঢ় ভিত্তি গড়ে তোলার এটাই হচ্ছে সর্বোত্তম পন্থা। শান্তি গবেষণার মতো নীতিগত ভাবধারা বিজড়িত বিষয়ে এভাবেই সম্ভাব্য অসঙ্গতি এড়ানো যেতে পারে। বস্তুত, শান্তি গবেষকরা যদি তাঁদের জ্ঞান ও তত্ত্বকে কৌশলগত পরিকল্পনা ও রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণের কাজে প্রাসঙ্গিক করে তুলতে যথার্থই প্রয়াসী হন তাহলে তাঁদের সরকারের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে, অধিকতর আন্তক্রিয়ায় বিজড়িত হতে হবে তাঁদের সেই নীতি-নির্ধারকদের সঙ্গে যারা বর্তমানে সরকারি প্রশাসনে একচেটিয়া উপদেষ্টা ও বিশেষজ্ঞমূলক পদাধিকার লাভ করে আসছেন। এভাবে শান্তি গবেষকদের অবশ্যি উচিত হবে তাঁদের মতবাদ ও জ্ঞানতত্ত্ব রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের কাজে প্রতিষ্ঠা করতে সক্রিয় হওয়া। যদি যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কিত এই দু'আপাত-প্রতিযোগী জ্ঞানচর্চা ক্ষেত্রের গবেষক-কর্মীরা উপর্যুক্ত ধারায় তৎপর হন তাহলে দুটোতে পরিলক্ষিত ইতিবাচক পরিবর্তনের ধারা সূচিত হবে, দুটো দৃষ্টিকোণের মধ্যে গড়ে ওঠবে সামঞ্জস্যের ভিত। একমাত্র এভাবেই রণনৈতিক বিশ্লেষক ও শান্তি গবেষকরা যৌথভাবে অনাগত সুন্দরতর বিশ্ব ও শান্তিপূর্ণ মনোরম ভবিষ্যতের প্রত্যাশার বাস্তব রূপ দিতে পারবেন, সম্ভবত গড়ে তুলতে অবদান রাখতে পারবেন এমন এক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক যা হবে যুদ্ধদ্বন্দ্ব মুক্ত, হবে শান্তির সুনিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ।

[যুদ্ধ, শান্তি ও নিরাপত্তা সম্পর্কে অনেক নতুন, বহুমাত্রিক তত্ত্বীয় ধারণার সমাবেশ ঘটেছে সাম্প্রতিককালে। বিশদ ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য ষোড়শ অধ্যায়]।

তথ্যনির্দেশ

১. Arnold. J. Toynbee. *War and Civilization* (London : ১৯৫০).

২. দ্রষ্টব্য, Jean Jacquess Rousseau. *Project for Perpetual Peace.* Translated From the French, E. M. Nuttall (London : ১৯৭২); Immanuel Kant, *Perpetual*

www.pathagar.com

Peace (ed.) Mary C. Smith (London : ১৯০৯) ; H. G. Wells , *The Common Sense of World Peace* (London : ১৯২৯)

৩. Nicholas J. Spykman *The Geography of Peace* (ed.) Helen R Nichell (New York : ১৯৪৪) পৃ. ৫.

৪. Quincy Wright, *The Causes of War and the Conditons of Peace* (London : ১৯৩৫) পৃ. ১.

৫. J. David Singer, "The Responsibilities of Competence in the Global Village, "*International Studies Quarterly*, Vol. 29, No -3 (১৯৮৫).

৬. Thomas J. Watson, Jr. "Arms Control : Soviet American Dialogue," *Vital Speech*, Vol, LII, No-18 (1 July 1986),

৭. একটি গ্রন্থে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় যে, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যে দ্বন্দ্ব অব্যাহত থাকবে যে পর্যন্ত দু'টি আর্থ-সামাজিক জোট বা ব্যবস্থা একটি আরেকটিকে হারিয়ে দিতে সমর্থ হবে। দ্রষ্টব্য Brian Crozier, Drew Middleton, Jeremy-Brown, *This War Called Peace* (New York : 1985) পৃ. ১১৫-১৪২. কার্যত, তাই-ই হয় : স্নায়ুযুদ্ধে মস্কো শুধু পরাস্ত হয় নি, সোভিয়েত কম্যুনিস্ট সাম্রাজ্য ভেঙ্গে হয় ক্ষত-বিক্ষত।

৮. Urs Luterbacher, "Last Words about War"? *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 28, No-1 (March 1984), পৃ. ১১৫ - ১৪২.

৯. Benjamin A, Most and Harvey Star, " Conceptualizing "War" : Consequences for Theory and Research. *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 27, No. 1 (March 1983), পৃ. ১৩৮.

১০. Michael D. Intriligator, "Research on Conflict Theory : Analytical Approaches and Areas of Application", *The Journal of Conflict Resolution*. Vol. 26, No-2 (June 1982) পৃ. ৩০৭ - ৩২৭; আরো দ্রঃ Luterbacher, "Last Words About War"? প্রাগুক্ত.

১১. দ্রঃ General Ailleret, "The Character of Strategy", *Survival*, 6 (1975); B. H. Liddell-Hart, *Strategy, the Indirect Approach* (London : 1967); পৃ. ৩৩৫ - ৩৮ ; George c. Reinhardt and Lt. Col. William Kinter, Policy : Matrix of Strategy", *United States Naval Institute Proceeding* , 80 : 2 (February 1954) পৃ. ১৪৭.

১২. Gen, Von Clause witz, *On War*, Translated, J. J Graham (London : 1962)d, Vol. 1. পৃ. ২৩.

১৩. Raymond Aron, *Peace and War : A Theory of International Relations*. Translated, R.H. Howard and A.B. Fox (New York : 1968), পৃ. ২৪.

১৪. Liddell-Han, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৫.

www.pathagar.com

১৫. দ্রঃ Bemard Brodie, "Strategy as a Science", *World Politics*, 1,4 (July 1949), পৃ. ৪৭৬ - ৭৭. Melvin J. Stanford, 'A Basic Strategy Framework", *Military Review*, 42 : 3 (August 1972), পৃ. ২৩ - ২৫; B. M. Simpson, "On the Theory of Strategy", *Military Review*, 43 : 6, (1968), পৃ. ৮৫-৮৮ Brig-Gen. Arnold, Giacalone, "Strategy Defined", *Military Review*, XLVII (1967), পৃ. ৪৭ Hedley Bull, "Strategic Studies and Its Critics", *World Politics*, XX : 4 (July 1968), পৃ. ৫৯৩ - ৯৭.

১৬. Simpson, "On the Theory of strategy", প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭-৮৮.

১৭. Liddell-Hart, প্রাগক্ত, পৃ. ৩৩৫.

১৮. ঐ, পৃ. ৩৩৫ - ৩৩৬.

১৯. Zero-sum strategy বা শূন্যমান রণনীতি মূলত ক্রীড়াতত্ত্ব থেকে নেয়া। এ তত্ত্বে আন্তর্জাতিক কৌশলগত সম্পর্ককে 'ক্রীড়ার' প্রতিরূপ হিসেবে দেখা হয়। এই 'ক্রীড়ার' সব আন্তক্রিয়া চলে প্রতিযোগী দু'পক্ষের কৌশলগত উদ্দেশ্য চরিতার্থতায় উভয় পক্ষই দু'ধরনের রণনীতি গ্রহণ করতে পারে ঃ শূন্যমান ও অশূন্যমান (Zero-and Non-Zero-sum) রণনীতি। শূন্যমান ক্রীড়া চলে দ্বন্দ্বরত দু'পক্ষের মধ্যে, যেমন 'ক' ও 'খ' -এর মধ্যে; প্রতি খেলা বা ক্রীড়া হচ্ছে হার-জিত ভিত্তিক ঃ এক পক্ষের হার হলে আরেক পক্ষের জিত হবে অবধারিত। কেননা এ জাতীয় রণনীতি হচ্ছে 'একক' মানভিত্তিক। বাস্তব জীবনে এর দৃষ্টান্ত হতে পারে একই ভৌগোলিক এলাকা যেটার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে চলছে দু'টি প্রতিযোগী দেশঃ যেমন, কাশ্মীর– এতে প্রতিযোগী এক দেশের জয় হলে অন্য দেশটিকে পুরো বঞ্চিত ও পরাজয় বরণ করতে হবে অবশ্যি। শূন্যমান রণনীতির ক্ষেত্রে কোনোরূপ সমঝোতামূলক শান্তির পরিণাম চিন্তা করা দায়। ক্রীড়াতত্ত্ব সম্পর্কিত আরো ব্যাখ্যার জন্য দ্রঃ Thomas C. Schelling, "What is Game Theory", in James C. Charlesworth, (ed.) *Contemporary Political Analysis* (New York : 1967); Morton A. Kaplan, "A note on Game Theory and Bargainig", in Morton A. Kaplan, (ed.) *New Approachas to International Relations* (New York : 1968).

২০. John Baylis, Ken Booth, John Garsseett and Phil Williams, *Contemporary Strategy : Theories and Policies* (London : 1975), পৃ. ৩৫ - ৩৬.

২১. John W. Burton, *International Relations : A General Theory* (London : 1965), পৃ. ৯২.

২২. Herbert C. Kelman, "Societal, Attitudinal and structural Factors in International Relations" , *Journal of Social Issues*, xi: 1 (1955), পৃ. ৪২-৫৬.

www.pathagar.com

২৩. Saul H. Hendlovitz and Thomas Weiss, "A Framework for the Policy Studies of Global Peace and Justice", in Christoph Wulf (ed.), *Handbook on Peace Education* (Oslo: 1974) পৃ. ২৩.

২৪. সরোকিন-এর গ্রন্থ অবশ্য কিছুকাল পূর্বের এবং যুদ্ধদ্বন্দ্ব সম্পর্কিত বিষয়ে তাঁকে পথিকৃত বলা যেতে পারে। দ্র ঃ Piritim A. Sorokin, *Social and Cultural Dynamics*. vl. 3 *Fluctuation of Social Relationships, War and Revolution* (New York : 1937).

২৫. Quincy Wright, *The Study of War* (Chicago : 1947), 2 Vols.

২৬. Lewis F. Richardson, *Arms and Insecurity* (London : 1960) also his *Statistics of Deadly Quarrels* (London : 1960).

২৭. Raymond Aron, Peace and War : *A Theory of International Relations*. Translated, R. Howard and A. B. Fox (New York : 1968)

২৮. Lewis Coser, *The Functions of Social Conflict* (New York : 1954).

২৯. George Simmel, *Corflict*, Translated, Kurt H. Wulf (IU : 1955).

৩০. Kenneth E. Bolding, *Conflict and Defense* (New York : 1962).

৩১. Morton A. Kaplan, *System and Process in International Politics* (New York : 1957).

৩২. Karl W. Deutsch, *The Analysis of International Relations* (Englewood Cliffs : 1968).

৩৩. J. David Siger, *Quantitative International Politics : Insights and Evidence* (New York : 1968).

৩৪. Kenneth W. Waltz, *Man, the State, and War*

৩৫. Richard N. Resencrance, *Action And Reaction in World' Politics* (Boston : 1963).

৩৬. Elise Boulding "Preface", in Juergen Dedring, *Recent Advances in Peace and Conflict Research : A Centical Survey* (Beverly Hills, L. A : 1976).

৩৭. শান্তি ও শান্তি আন্দোলন সম্পর্কিত বিশদ আলোচনার জন্য দেখুন A. C. F. Beales, *The History of Peace* (London 1931) : Sylvester J. Hemleboerr, *Plans for World Peace Through Six Centuries* (Chicago : 1943); Francis H. Hinsley, *Power and Pursuit of Peace : Theory and Practice in the History of Relations Between States* (Cambridge : 1963); Norman Agell, "Peace Movements", *Encyclopedia of the Social Sciences,* Vol. 12 (New York : 1968), পৃ. ৪১ - ৪৭.

www.pathagar.com

৩৮. Chadwick F. Alger, "Trend in International Relations Research", in Norman D. Palmer, (ed.) (ed.) *A Design for International Relations Research : Scope, Methods and Releavancec* (Philadelphia : 1970), পৃ. ১৩.

৩৯. Johan Galtung, "Peace Research", in *The Social Sciences : Problems and Orientations* (The Hague and Paris : 1968) পৃ. ১৯৫, ২০৩ - ৮.

৪০. Michael Howard, *Studies in War and Peace* (London : 1970), পৃ. ১৪.

৪১. Adam Curle, *The Scope and Dilemmas of Peace Studies* (Bradford : 1975), পৃ. ৯

৪২. দ্রঃ Johan Galtung, "Towards a Definition of Peace Research", *in Repertory of Institutes Specialising in Research or Peace and Disarmnament* (Paris : 1966); একই লেখকের "Violence, Peace, and Peace-Research", *Journal of Peace Research,* No. 3 (1968), পৃ. ২১৭ - ২৩১ ; Herman Schmidt, "Peace Research as Technology for pacification", *in Proceedings of the International Peace Research Association Third General Conference* Vol. 1: *Philosophy of Peace Research* (vna Gordcum and Comp, N.V. Assen: 1970, পৃ. ২০ - ৬৯.

৪৩. Johan Galting, *Peace Research: Education, Action, Essays in Peace Research* (Copenhagen: 1975), পৃ. ১৫০; একই লেখকের "Towards a Definition of Peace Research", প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩ - ২০৬.

৪৪. Herzog, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫; Galtung, "Peace Research", প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪.

৪৫. Galtng, Peace Research, পৃ. ১৬৩ - ১৬৪; একই লেখকের "Peace Research", প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪ - ২০৬.

৪৬. I. J. Rikhye, Michael harbottle, Bjorne Egge, *The Thin Blue line* (New Haven and London : 1974), পৃ. ১১ - ১৪.

৪৭. Francis A. Beer, *Peace Against War* (San Francisco : 1981), পৃ. ১

৪৮. Adam Curle, *Making Peace* (London : 1971), পৃ. ১৬.

৪৯. চিত্র ঃ ১, ২ - এ উপস্থাপিত 'শান্তির পর্যায়ক্রম" মূলত মার্কিন সংকট তাত্ত্বিক অরান আর, ইয়াং-এর *The Polities of Force* গ্রন্থ থেকে নেয়া। ইয়াং-এর সঙ্গে এ ছকের মৌলিক পার্থক্য হলো ঃ তিনি তাঁর ছকে বিশ্লেষণ করেন সংকট ব্যবস্থাপনার বিষয়; অন্যদিকে এই প্রবন্ধে একই ছক ব্যবহৃত হচ্ছে শান্তির পর্যায়ক্রম বিশ্লেষণের জন্য। ইয়াং-এর উপস্থাপিত সংকট-এর ক্রম-বিবর্তন প্রক্রিয়ার পালা পরিবর্তন করে এ প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে শান্তির পর্যায়ক্রম। একটি প্রতিসম প্রক্রিয়া রূপে দেখানো হয়েছে, যে প্রক্রিয়ায় রয়েছে তিনটি বিবর্তিত পর্যায় এবং প্রতিটি পর্যায় মোটামুটি তিনটি কৌশলগত পরিস্থিতির সঙ্গে পালাক্রমে উদ্ভূত হয়। মূল ছক ও ব্যাখ্যার জন্য দ্রঃ Oran

www.pathagar.com

R. Young, *The Politics of Force, Bargaining During International Crisis* (Princeton, N. J: 1968), পৃ. ৬ - ২৪.

৫০. Kenneth E. Boulding, "Towards a Theory of Peace", in Roger Fisher (ed.) *Inernational Conflict and Behavioural Scince : The Craigville Papers* (New York : 1964) পৃ. ৭১ - ৭২.

৫১. ঐ., পৃ. ৭১ - ৭৩.

৫২. Galtung, *Peace Research,* পৃ. ৭৯ - ৮০.

৫৩. ঐ., পৃ ৮০.

৫৪. এ সম্পর্কিত বিশদ সমীক্ষার জন্য দেখুন, Abul Kalam, *Peacemaking in Indochina 1954 - 1975* (Dhaka : 1982)

৫৫. Galtung, *Peace Research,* পৃ. ৮০ - ৮১.

৫৬. ঐ, পৃ. ২৪৭ - ২৫৫.

৫৭. Johan Galtung, "Violence, Peace, and Peace Research", *Journal of Peace Research,* No. 3 (1969).

৫৮. Li Shenzhi, "A Sharp Lookout - The Price of Peace", *Beijing Review,* Vol. 29, No. 23 (9 June 1986) পৃ. ১৭.

৫৯. Adam Curle, *The Scope and Dilmmas of Peace Studies* (Bradford: 1975) পৃ. ৩ - ৮.

৬০. Barry Buzan, "Peace, Power, and Security : Contending Concepts in the study of International Relation's, *The Journal of Conflict Resolution,* vol. 21, No. 2 (1968).

৬১. Quincy Wright, *The Causes of War and the Conditions of Peace* (London : 1935) পৃ. ১.

৬২. Glenn H. Snyder, "The Theory of Determence", in John F. Reichart ad Steven R. Sturn (eds.), *American Defense Policy,* 5th Edition (Baltimone and London: 1982) পৃ. ১৫৪; আরো দ্রঃ John Baylis et al. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩.

৬৩. বিশদ ব্যাখ্যার জন্য দ্রঃ Johan Galtug, "Transarmament : From offensive to defensive Defense", *Journal of Peace Research,* Vol. 21, No.2 (1984) পৃ. ১২৭ - ১৩৯; আরো দ্রঃ Ben Damkbaar, "Alternative Defense Policies and the Peace Movement", *Journal of Peace Research,* Vol. 21, No. 2 (1984), পৃ. ১৪১ - ১৫৩.

৬৪. Ruth Leger Sivard, *World Military and Social Expenditure 1985.* (Washington : 1985).

www.pathagar.com

৬৫. *Statistical Abstract of the United States, 1977*, U. S. Department of Commerce (Washington, D. C. September 1977), Table 50, পৃ ঃ ৩৬১.

৬৬. Edward Girardet, "The Soviets Declare Afganistan a free-fire zone : Migratory Genocide", *The New Republic* (4 March 1985), পৃ. ১৩ - ১৪.

৬৭. Sivard, প্রাগুক্ত,

৬৮. John Galtung Cited in Robery woito, *To end War : A New Approach to International Conflict* (New York: 1982), পৃ. ৩৩৬.

৬৯. Joseph S. Nye, Jr., "Can America Manage its Soviet Policy?" in Joseph S. Nye, Jr. (ed). *The Making of Americas Soviet Policy* (New Haven and London : 1984), পৃ. ৩৩৬

৭০. John Baylis et al, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪.

৭১. উদ্দেশ্যমূলক কর্মকাণ্ড বা উদ্দেশ্যের কাজ তত্ত্বের প্রয়োগ করা সম্পর্কে দেখুন, James S. Coleman, "Social Theory, Social Research and a Theory of Action", *American Journal of Sociology*, vol. 91, No. 6 (May 1986), পৃ. ১৩০৯ - ৩৫.

৭২. দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা চলে যে, টোর্ড হোয়েবিক সমাজ তত্ত্ব এবং বিজ্ঞান দর্শনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে শান্তি গবেষণার অসঙ্গতি রয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। দ্রঃ Tord Hoivik, "Peace Research and Science : A discussion Paper", *Journal of Peace Research*, Vol. 20, No 3 (1983) পৃ. ২৬১ - ২৬৯.

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

পরাশক্তি ও ক্ষুদ্ররাষ্ট্র সম্পর্ক

ভূমিকা

১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে একটি নতুন প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ সময় থেকে পরাশক্তিদ্বয় প্রত্যক্ষভাবে ক্ষুদ্রদেশসমূহের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে আসছে। ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি অবধি ইন্দোচীনের রাষ্ট্রগুলোতে আমেরিকার হস্তক্ষেপ ছিল ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের পরাশক্তির অভিযানের এক অতি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত- ১৯৭০-এর শেষপাদ থেকে উভয় পরাশক্তি আবার নতুনভাবে ক্ষুদ্রদেশগুলোতে হস্তক্ষেপ করে আসছে–ওয়াশিংটন হস্তক্ষেপ করে চলেছে মধ্য আমেরিকার নিকারাগুয়া ও এল্‌সাল্‌ভাডরে, আর মস্কো হস্তক্ষেপ করে আফগানিস্তানে। পরাশক্তিদ্বয়ের এ জাতীয় হস্তক্ষেপের ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে এক নতুন, তীব্র অবিশ্বাসের ভাব সঞ্চার হয়েছে। কেননা, সমকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এরূপ বাস্তবতা শক্তি চেতনাজনিত উল্লম্ব অভিযান[১] বা আগ্রাসনের জের টেনে চলেছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষাবধি স্বাধীনতা প্রাপ্ত নতুন দেশসমূহের প্রতিসাম্যমূলক আশা-অভিলাষ অর্জনে অন্তরায় সৃষ্টি করে আসছে।

সমকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এরূপ বাস্তবতার নিরিখে বেশ কয়েকজন সমাজ চিন্তাবিদ তাঁদের সুচিন্তিত বক্তব্য রেখে আসছেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রথিতযশা হচ্ছেন হোয়ান গালটুং। ইনি একজন নরওয়েজীর সমাজবিজ্ঞানী। এসব প্রসঙ্গে ভাবতে গিয়ে তিনি শান্তি গবেষণা নামে নতুন তত্ত্বমূলক বিষয় প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। পরাশক্তিদ্বয় কর্তৃক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রতিসাম্যমূলক বিবর্তনমুখী ধারা পরিবর্তনের প্রচেষ্টাকে তিনি দেখেন অপ্রতিসম দ্বন্দ্ব হিসেবে।[২] এ ব্যাপার ডিয়েটার সেংহাসও গালটুং-এর সঙ্গে একমত। কেননা তিনি মনে করেন, অধীনতামূলক মৈত্রীধারা সমকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং অপ্রতিসম দ্বন্দ্ব বারংবার সংঘটিত হবার পেছনে এ কারণটি প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত, আর তাই এ জাতীয় মৈত্রীধারা অধিকতর সূতীক্ষ্ণ ভাষায় তুলে ধরতে হবে।[৩] এঁদের চেয়ে আরো চিরাচরিতপন্থী বিশ্লেষকরাও কিন্তু সমকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে প্রকৃতরূপে অনুধাবন করার উদ্দেশ্যে অপ্রতিসাম্য প্রবণতাকে মূল চাবিকাঠি হিসেবে চিহ্নিত করেন।[৪]

www.pathagar.com

উল্লেখ্য, এ ধরনের প্রবণতা সমকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পরাশক্তি ও ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের সম্পর্কে সবচাইতে প্রকটরূপে ধরা দেয়। এল্-সালভাডর কিংবা আফগানিস্তানের দৃষ্টান্ত অতি সাম্প্রতিক-এসব দেশে পরাশক্তি হস্তক্ষেপ সম্পর্কিত তথ্য এখনো অপ্রতুল। তাই অপ্রতিসম মৈত্রী সম্পর্ক ও দ্বন্দ্ব বিষয়ে বিশদ সমীক্ষা চালাতে হবে ভিয়েতনামে মার্কিন হস্তক্ষেপের প্রেক্ষাপটে, কেননা ভিয়েতনাম যুদ্ধ এখনো আমাদের অনেকের স্মৃতি থেকে বিলীন হয় নি; অথচ এ যুদ্ধ সম্পর্কিত অনেক ঐতিহাসিক দলিল ইতিহাসবেত্তা ও বিশ্লেষকদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পাওয়া যায়। এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে।

১৯৪০-এর দশকের শেষপাদ থেকে ১৯৭০-এর মাঝামাঝি অবধি ভিয়েতনামে মার্কিন হস্তক্ষেপ-ই হচ্ছে সমকালীন বিশ্বরাজনীতিতে অপ্রতিসম মৈত্রী সম্পর্ক-এবং তার ফলশ্রুতিতে সংঘটিত অপ্রতিসম দ্বন্দ্বের-এক অতি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এ জাতীয় দ্বন্দ্ব আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কাঠামোতে স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ বিবর্তনে অন্তরায় সৃষ্টি করে চলছে। এরূপ মৈত্রী ও দ্বন্দ্ব সম্পর্কে গালটুং-এর প্রস্তাবিত একটি বিশ্লেষণী রূপরেখার আলোকে এ প্রবন্ধে এরূপ যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে যে, ১৯৭৫ সনে সাইগনের মুক্তি অবধি ভিয়েতনামে মার্কিন প্রচেষ্টা একটি বিশ্বশক্তি ও স্থানীয় ক্ষুদ্ররাষ্ট্র তাঁবেদারের মধ্যে গড়ে ওঠা অপ্রতিসম মৈত্রী বন্ধনের পরিচয় বহন করে যার ফলশ্রুতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই দেশে সম্প্রসারিত যুদ্ধে অনিবার্যভাবে জড়িয়ে পড়ে, আর চূড়ান্ত পর্যায়ে এরূপ কাঠামোগত সহিংসা ক্রিয়াকর্মে তৎপর হয় যাতে ভিয়েতনামে শান্তি প্রক্রিয়া ব্যর্থ হতে বাধ্য হয়।

শান্তি তত্ত্বের ফ্রেম

শান্তি গবেষণা আন্দোলন অন্যান্য যাঁরা অংশগ্রহণ করেন তাঁদের মত গালটুং-এর মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বের কাঠামোগত শান্তি সংরক্ষণ করা। তাঁর মতে, এই বিবর্তনমুখী শান্তির কাঠামোর প্রতি হুমকি আসছে সহিংস কাঠামোগত প্রবণতা থেকে।[৫] অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সিস্টেমে পরাশক্তিদ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত 'প্রধান কাঠামো' ক্ষুদ্রদেশগুলোকে নিয়ে গঠিত 'অধীন কাঠামো'র ওপর তাদের ইচ্ছাশক্তি চাপিয়ে দেয়ার প্রবণতা থেকে।[৬] গালটুং-এর বিশ্লেষণী রূপরেখার মৌলিক দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক হিসেবে দু'ধরনের মৈত্রীযোগের বিষয় উল্লেখ করা হয় ঃ এর একটি হচ্ছে প্রতিসম মৈত্রী, আরেকটি অপ্রতিসম মৈত্রী। এ দুটোর প্রথমটি হচ্ছে মোটামুটি সমতুল্য গুণাগুণবিশিষ্ট বা সমান (সঠিক) পদমর্যাদাসম্পন্ন ও সমান ধন-সম্পদের অধিকারী দু'দেশের মধ্যে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে 'ভিন্নতর পদমর্যাদা সম্পন্ন'

www.pathagar.com

দু'পক্ষের অধিকারী দু'দেশের সংস্থান-সঙ্গত সমতুল্য নয়, এমন কি যারা হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের।"[৭]

প্রতিসম ও অপ্রতিসম–গালটুং-এর প্রস্তাবিত এই দু'ধরনের মৈত্রী প্রচেষ্টা যথাক্রমে প্রতিসম ও অপ্রতিসম দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে পারে, এ সবের ফলশ্রুতিতে দেখা দিতে পারে যথাক্রমে 'প্রাতিম্বিক' (Personal) ও 'কাঠামোগত' (Structural) সহিংস প্রবণতা। গালটুং-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা চলে, "অপ্রতিসম দ্বন্দ্বে কাঠামোগত সহিংসতা যেরূপ প্রতিসম দ্বন্দ্বে প্রাতিম্বিক সহিংসতাও সেরূপ।"[৮] অপ্রতিসম মৈত্রীধারা এবং তার ফলশ্রুতিতে সংঘটিত অপ্রতিসম দ্বন্দ্ব গালটুং আরো তুলে ধরতে চেয়েছেন আন্তর্জাতিক সমাজে কর্তৃত্বসুলভ নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই কর্তৃত্বসুলভ নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই কর্তৃত্বসুলভ নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টার ফলে বিশ্বশক্তি ও তার স্থানীয় তাবেদার ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক উল্লম্ব যোগসূত্র স্থাপিত হয়, অথবা গালটুং এর ভাষায়, একে চিহ্নিত করা যায় যথাক্রমে 'কেন্দ্র' (Centre) ও 'প্রান্তের (Periphery) সম্পর্ক হিসেবে–তার মানে, প্রথমটি দ্বিতীয়টির অবস্থা শুধু নির্ধারণ করে না, এর প্রতিপালনের দায়িত্বভারও গ্রহণ করে। এ প্রক্রিয়া শুরু হয় বিশ্বশক্তির প্রভাব বলয় সৃষ্টির প্রচেষ্টা থেকে। কেননা বিশ্বশক্তির কেন্দ্র হিসেবে এরূপ সচেষ্ট হয় যাতে বিশ্বের সামাজিক পরিসরে প্রান্তের ক্ষুদ্ররাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত করতে পারে। এই প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয় পৃষ্ঠপোষক-তাঁবেদারদারী বা উল্লম্ব আন্তর্জাতিক সম্পর্ক।[৯]

প্রশ্ন হতে পারে– উপর্যুক্ত বিশ্লেষণী ফ্রেম ভিয়েতনামে কিভাবে প্রাসঙ্গিক হতে পারে? আন্তর্জাতিক আন্তক্রিয়ায় যাতে একটি বিশ্বশক্তি ও তার স্থানীয় ক্ষুদ্ররাষ্ট্র তাবেদারের মত দু'ধরনের শক্তি-কাঠামোর সমন্বয়ে মৈত্রী ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, যাতে পরিলক্ষিত হয়ে (১) অপ্রতিসাম্য বা অসম শ্রমবিন্যাস; (২) প্রথমটি দ্বিতীয়টির স্বাধিকারে হামলা করে অনধিকার প্রবেশ ও হস্তক্ষেপের মাধ্যমে; (৩) দুটো মিত্রজুড়ির মধ্যে তেমন কোনো অর্থবহ বা নিতান্ত সামান্য-ই দ্বি-পাক্ষিক লেনদেনভিত্তিক আন্তক্রিয়া হয়; এবং (৪) পরিশেষে, যাতে বিশ্বশক্তি তার মার্জিনের আবর্তে গঠিত করে তার নিজস্ব ধারা ও স্বার্থানুরূপ বহুমুখী আন্তক্রিয়া ও সংগঠন, তাতে যে মৈত্রী সম্পর্কের ধারা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে সেই সম্পর্ক যথার্থ-ই অপ্রতিসম বা উল্লম্ব হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।[১০]

www.pathagar.com

অপ্রতিসম সম্পর্ক

ভিয়েতনামে সংঘটিত দ্বন্দ্বের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে বুঝা যাবে যে, একটি ক্ষুদ্রদেশের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের বাইরে থেকে একটি বিশ্বশক্তি একরূপ উল্লম্ব, অপ্রতিসম মৈত্রী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আরো সুস্পষ্টভাবে বলতে গেলে উল্লেখ করতে হয় ভিয়েতনামে আমেরিকার জড়িয়ে পড়ার বিষয়টি যার ফলে ঐ দ্বন্দ্বে রাজনৈতিক মেরুকরণ বা মৈত্রীযোগ মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হয়। ভিয়েতনামে মার্কিন নীতি কয়েক পর্যায়ে রূপান্তরিত হয়ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে যুক্তরাষ্ট্র স্থানীয় কম্যুনিস্ট প্রতিরোধ আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলে, যদিও যুদ্ধোত্তর কালে ওয়াশিংটন কম্যুনিস্টদের প্রতি উপেক্ষা ভাব প্রদর্শন করে, এবং পরে কম্যুনিস্টদের নেতৃত্বাধীন ভিয়েতনামী বিপ্লবের সরাসরি বিরোধিতা করে।

১৯৪৯ সনের শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনাম ও ইন্দোচীনের অন্য দু'টি দেশ লাওস ও কম্বোডিয়ার ঔপনিবেশিক আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী ফরাসীদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন প্রদান করে। আমেরিকা ও পশ্চিমা মিত্রদেশসমূহ প্রথমে ফরাসীদের প্রতি নৈতিক সমর্থন প্রদান করে, পরে সামরিক উপকরণ ও রসদ যোগায়, আর সাইগনে ফরাসিদের উদ্যোগে গঠিত তাবেদার সরকারের প্রতি কূটনৈতিক স্বীকৃতি প্রদান করে। এর প্রত্যুত্তরে ভিয়েতনামী বিপ্লবীরা উত্তরাঞ্চলে তাদের ঘাঁটি জোরদার করে, গড়ে তোলে লাওস ও কম্বোডিয়ায় তাদের সহযোগী বাহিনীর ঘাঁটি। একই সঙ্গে আমেরিকার মত একটি বিশাল প্রতাপশালী বিশ্বশক্তির উত্তরোত্তর অগ্রাভিযান রোধকল্পে দু'টি বৃহৎ কম্যুনিস্ট শক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গণচীন এবং তাদের মিত্রদের সাহায্য-সমর্থন কামনা করে এবং সব কম্যুনিস্ট শক্তি ও মিত্রদেশ ভিয়েতনামী বিপ্লবীদের কূটনৈতিক স্বীকৃতি ও রসদ-সামগ্রী প্রদানে এগিয়ে আসে।[১১]

তবুও আমেরিকা বিশ্ব রাজনীতির পরিমণ্ডলে তাঁর বৃহত্তর স্বার্থ অর্জনের প্রয়োজনে তার প্রথম দিকের দোদুল্যমান নীতি ক্রমশ পরিবর্তন করে ভিয়েতনামী বিপ্লবের বিরুদ্ধে। কেননা মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েতদের অগ্রযাত্রা ও সাফল্যে ওয়াশিংটনের দৃঢ় প্রত্যয় হয় যে, কম্যুনিজম বা সাম্যবাদ একটি আদর্শগত খেয়ালীপনার ব্যাপার মাত্র নয়, এ হচ্ছে 'মুক্তবিশ্বের' প্রতি এক মারাত্মক হুমকি।

আসন্ন স্নায়ুযুদ্ধ পশ্চিমা নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ফ্রান্সের গুরুত্ব এবং প্রতিপক্ষের মার্ক্সীয় আনুগত্যের কারণে ভিয়েতনামী বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে অবিশ্বাস– এসবের ফলে মার্কিন নীতির প্রচলিত ধারা ত্বরান্বিত হয়, কম্যুনিস্টদের

www.pathagar.com

নেতৃত্বে উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে আমেরিকা ক্রমশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও বিজড়িত হয়ে পড়ে। ভিয়েতনামী সীমানার ওপারে মাও জেডং-এর বিজয় এবং কিছুকাল পরেই উত্তর ভিয়েতনামে গঠিত বিপ্লবী সরকারের প্রতি তাঁর স্বীকৃতির ফলশ্রুতিতে আমেরিকায় ফরাসিপন্থী নীতি অনমনীয় রূপ পরিগ্রহ করে এবং ১৯৫০ সনের ২৯ জানুয়ারিতে ওয়াশিংটন সাইগনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্য ঘোষণা করে। যুক্তরাষ্ট্র সাইগনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কও প্রতিষ্ঠা করে এবং "বিদেশ থেকে পরিচালিত অভ্যন্তরীণ অসন্তোষের বিরুদ্ধে" ফরাসিদের প্রচেষ্টার প্রতি দ্ব্যর্থহীন সমর্থন দানের কথাও ঘোষণা করে।[১২]

ভিয়েতনামে মার্কিন অনুপ্রবেশ

১৯৫০ সন থেকে যুক্তরাষ্ট্র ইন্দোচীনে ফরাসিদের সমর্থনে সার্বিক সাহায্য যুগিয়ে চলে। ভিয়েতনামে পরবর্তী ফরাসি সামরিক কর্মপন্থা বাস্তবে ছিল যৌথ ফরাসি-মার্কিন প্রয়াস মাত্র। ফরাসি সামরিক ব্যয়-নির্বাহের বেশিরভাগ আসতো মার্কিন সাহায্য থেকে; মার্কিন প্রযুক্তিকরা এগিয়ে আসে ফরাসি বিমান বাহিনীর সাহায্যে, আর মার্কিন রণনৈতিক কর্মকর্তাবৃন্দ ফরাসিদের অভিযান পরিকল্পনা প্রণয়নে অংশগ্রহণ করে।[১৩] ১৯৫১ অবধি ফরাসিদের দেয়া মার্কিন সাহায্য ও সমর্থনের প্রাচুর্য দেখে হো চি মিন বলতে বাধ্য হন যে, আমেরিকানরাই হচ্ছে ভিয়েতনামী বিপ্লবের "প্রকৃতশত্রু" আর ফরাসিরা হচ্ছে আমেরিকানদের "ভাঁড়াটে বাহিনী" মাত্র। [১৪]

প্রকৃতপক্ষে, ওয়াশিংটন ইতিমধ্যে সাইগনের ওপর তার কর্তৃত্ব জোরদার করে। ১৯৫১ সনের ৭ সেপ্টেম্বর সাইগনের বাওডাই সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সরাসরি একটি 'আর্থনীতিক সহযোগিতা" চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ চুক্তির ফলে যুক্তরাষ্ট্র ফরাসিদের ছাড়াই সাইগনে ফরাসিদের উদ্যোগে গঠিত সরকারের প্রতি সাহায্য যোগাতে সমর্থ হয়। মার্কিন সাহায্য পরিকল্পনা দেখাশোনার জন্য মার্কিন উপদেষ্টাদের সাইগনে পাঠানো হয়। ভিয়েতনামে মার্কিন অনুপ্রবেশের জোর তৎপরতা ও ক্রমবর্ধমান বাস্তব প্রকৃতিতে ফরাসি সরকারকে কঠোর মার্কিন চাপের সম্মুখীন হতে হয়। বিশেষ করে ফরাসিরা যখন ভিয়েতনামী কম্যুনিস্টদের সঙ্গে সমঝোতা ও শান্তি স্থাপনে সচেষ্ট হয় তখন তাদের ব্যর্থ মনোরথ হতে হয়।[১৫]

ভিয়েতনামে উল্লম্ব ধারার মার্কিন অনুপ্রবেশ পরেও অব্যাহত থাকে। ১৯৫৩ সনে ফরাসিদের প্রতি প্রচুর মার্কিন সাহায্যের বিনিময়ে ওয়াশিংটন দক্ষিণ ভিয়েতনামী সৈন্যদের প্রশিক্ষণে প্রত্যক্ষভাবে বিজড়িত হবার অধিকার লাভ করে। ১৯৫৪ সনের প্রথম দিকে জেনারেল ও ডানিয়েলকে সাইগনে

www.pathagar.com

মার্কিন সামরিক মিশনের প্রধান হিসেবে নিয়োগ করা হয়। ভিয়েতনামী বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দানের উদ্দেশ্য গঠিত তথাকথিত প্রশিক্ষণ সম্পর্ক নির্দেশনা মিশন (Training Relations Instruction Missions বা TRIM) নামে একটি যুক্ত ফরাসি-মার্কিন প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার প্রধান হিসেবে ও-ডানিয়েল দায়িত্বভার পালন করেন, যদিও এই মিশনের নামেমাত্র সার্বিক দায়িত্ব অর্পিত হয় ফরাসি সেনাধক্ষ্য পল এলির'র ওপর।

এ সময়ে ফরাসিদের সামরিক প্রচেষ্টা অধিকতর জোরদার করার উদ্দেশ্যে কঠোরতর মার্কিন প্রয়াস, পরে ফরাসিদের সামরিক সমর্থন দানে একটি "মহা শক্তি সংঘ" গড়ে তোলার মার্কিন প্রচেষ্টা সহ সব-ই ভিয়েতনামে যুক্তরাষ্ট্রের উল্লম্ব অভিযানের অংশবিশেষ ছিল। ১৯৫৪ সনের জেনিভা শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর দান থেকে ওয়াশিংটন ইচ্ছাকৃতভাবে বিরত থাকে। যদিও যুক্তরাষ্ট্র মৌখিকভাবে এ চুক্তির প্রতি সম্মান দেখাবে বলে তার ইচ্ছা ব্যক্ত করে, কার্যত ফরাসিদের আত্মসমর্পণ ও পরাজয়ের পর পরই অতি দ্রুত ফরাসিদের শূন্যস্থান পূরণে মার্কিন সরকার তৎপর হয়।

বস্তুত, জেনিভা শান্তি চুক্তির প্রধান লক্ষ্য ছিল ভিয়েতনামে লড়াই'র পরিসমাপ্তি ঘটানো। আর সেই অবধি এ দ্বন্দ্বে একটা-ই মৌলিক বিষয় ছিল ঃ ভিয়েতনামে যে অনিশ্চয়তা ও দ্বন্দ্ব সম্পর্কে জেনিভায় নিশ্চিত সমাধানের বিধান রাখা সম্ভব হয় নি তা কি খোদ ভিয়েতনামে স্থানীয় পর্যায়ে বিবদমান দু'পক্ষ, কম্যুনিস্ট ও অকম্যুনিস্টদের মধ্য নিষ্পত্তি হবে, না কি দ্বন্দ্ব বিশ্বপর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হবে, নিষ্পত্তি করা হবে বৃহৎ শক্তিগুলোকে বিজড়িত করে- ভিয়েতনামকে তাদের মার্জিনের আবর্তে এনে?[১৬] এটা বলা সমীচীন যে, বৃহৎ শক্তিসমূহের মধ্যে একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ই অবিচলভাবে শেষোক্ত পন্থার উপর জোর দেয়।[১৭]

উল্লেখ্য, জেনিভা চুক্তি সম্পাদিত হবার পর যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার পশ্চিমা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রতি কম্যুনিস্ট হুমকি মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে জোরেসোরে বিশ্বপর্যায়ে একটি কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়। ইতিমধ্যে ওয়াশিংটন এ অঞ্চলে নিবারক রণনীতি (Strategy of Deterrence) নামে একটি বিশ্ব কৌশলগত নীতি কার্যকর করে। এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র গোপন বা প্রকাশ্য কম্যুনিস্ট সম্প্রসারণ নিবৃত্ত ও 'মুক্ত বিশ্বের' আদর্শকে জিইয়ে রাখার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।[১৮] কার্যক্ষেত্রে নিবারক রণনীতির পূর্বশর্ত ছিল স্থানীয় বাহিনীসমূহকে জোরদার করা। একই সঙ্গে এর মর্মকথা ছিল এরূপ ঃ যদি এই স্থানীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী কম্যুনিস্টদের হুমকি সীমিত করতে সক্ষম না হয় তাহলে ব্যাপকতর মার্কিন

www.pathagar.com

প্রতিশোধমূলক ক্ষমতা দক্ষিণ ভিয়েতনামের স্থানীয় বাহিনীর সমর্থনে এগিয়ে আসবে।[১৯]

এভাবে ভিয়েতনামে আমেরিকার প্রাথমিক প্রচেষ্টার ধারা ছিল সামরিক ও কৌশলগত পর্যায়ে আর্থ-সামাজিক নীতি দ্বারা পরিচালিত নয়। এককভাবে ওয়াশিংটন সার্বিক প্রচেষ্টা না চালিয়ে আরো চেয়েছে বহুজাতিক কর্মপন্থা সক্রিয় করে তুলতে। ১৯৫৪ সনের ৩ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা বা সিয়াটো (Southeast Asia Treaty Organization বা SEATO) গঠনে উদ্যোগ গ্রহণ করে। একটি প্রটোকলের মাধ্যমে সিয়াটো তার প্রতিরক্ষামূলক ছত্রছায়া "কম্বোডিয়া, লাওস ও ভিয়েতনাম রাষ্ট্রের অধীন মুক্তাঞ্চলের" দিকেও সম্প্রসারিত করে।[২০] প্রকৃতপক্ষে, প্রতীকধর্মী হলেও সিয়াটো ছত্রছায়া ছিল যথার্থ-ই উল্লম্ব ধরনের- ভিয়েতনামের প্রতি সাহায্য ছিল একটি অকম্যুনিস্ট লেজুড় সরকারের প্রতি বাইরের বিশ্বের থেকে একতরফা প্রতিশ্রুতিজনিত যাতে দু'পর্যায়ে "মিত্রদের" মধ্যে পারস্পরিকভাবে সাহায্য ও সমর্থনে এগিয়ে আসার মত কোনোরূপ ওয়াদার লেনদেন হয় নি। এমন কি দক্ষিণ ভিয়েতনামী অকম্যুনিস্টরা আনুষ্ঠানিকভাবে বাইরের এরূপ প্রতিরক্ষামূলক ছত্রছায়া লাভের জন্যে অনুরোধও করে নি কিংবা ম্যানিলা সিয়াটো সম্মেলনে তারা অংশগ্রহণও করে নি। তবু ম্যানিলা চুক্তির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র সম্ভাব্য কম্যুনিস্ট গ্রাস থেকে ভিয়েতনামকে রক্ষাকল্পে "একক" ঈর্ষামুক্ত সামরিক দায়িত্ব" নিজ কাঁধে তুলে নেয়।[২১]

এ জাতীয় বহুজাতিক ব্যবস্থায় পরিতৃপ্ত না হয়ে যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্সের ওপর চাপ সৃষ্টি করে যাতে ফরাসি সরকার বর্ধিত মার্কিন ক্ষমতার অনুকূলে ক্রমশ ভিয়েতনাম থেকে নিজেদের হাত গুটিয়ে নেয়। ১৯৫৪ সনের সেপ্টেম্বরে ফরাসি– মার্কিন সমঝোতার পর তথাকথিত ফরাসি "সহযোগী রাষ্ট্র" [দক্ষিণ] ভিয়েতনাম ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় থেকে মার্কিন আর্থিক সামরিক সাহায্য "ভিয়েতনামী রাষ্ট্রে" প্রত্যক্ষভাবে পাঠানো যেত সাইগনকেন্দ্রিক ফরাসি উদ্যোগে গঠিত যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি ব্যাংকের মাধ্যমে। ফরাসিদের মাধ্যম আর প্রয়োজন হোত না। ভিয়েতনামে মার্কিন সামরিক মিশন তথাকথিত জাতীয় বাহিনীসমূহকে প্রশিক্ষণ দানের দায়িত্বে নিয়োজিত একরূপ ফরাসি টিমের পরিবর্তে আধা–স্থায়ী মিশনে রূপান্তরিত হয়।

মার্কিন পৃষ্ঠপোষকতামূলক নীতি

মার্কিন স্বার্থগত দৃষ্টিকোণ থেকে, ১৯৫৪ সনে সম্পাদিত জেনিভা চুক্তির পর ভিয়েতনামে আমেরিকার নতুনভাবে বিজড়িত হবার সুবিধা হচ্ছে এই যে

www.pathagar.com

ওয়াশিংটনের পক্ষে ফরাসি ঔপনিবেশিক স্বার্থ অর্জন সম্পর্কিত উদ্দেশ্য থেকে উন্নততর উদ্দেশ্য উপস্থাপন সম্ভব হয়। মার্কিন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে বলা হয় যে, ঔপনিবেশিক কর্তৃত্বাধীন এলাকায় আমেরিকা চাচ্ছে জাতীয় স্বাধীনতা, চাচ্ছে মুক্তদ্বার বাণিজ্য নীতি। তা'সত্ত্বেও কিন্তু ভিয়েতনামে আমেরিকার উল্লম্ব অনধিকার প্রবেশ প্রক্রিয়া গোপন করা ওয়াশিংটনের পক্ষে সম্ভব হয় নি। কেননা সেই দেশের মার্কিন অপ্রতিসম মৈত্রী প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। সাইগনের প্রতি ওয়াশিংটন একতরফা পৃষ্ঠপোষকতামূলক নীতি গ্রহণ করে চলে এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামে অসম শ্রম বিন্যাস করে নিজ কাঁধে অনেক দায়িত্বভার গ্রহণ করে।

এরূপ বক্তব্যের সপক্ষে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৫৪ সনে জানুয়ারিতেই যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামের জন্য একটি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এর উদ্দেশ্য ছিল স্বতন্ত্র চলাচল, সরবরাহ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাদিসহ ভিয়েতনামের নিজস্ব সৈন্য বাহিনীসমূহকে উন্নততর করা যাতে অবশেষে তারা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বজায় রাখতে সক্ষম হয়।[২২] ১৯৫৪ সনের জেনিভা চুক্তির পর আমেরিকা ভিয়েতনামে আরো সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। এ সময় থেকে ওয়াশিংটন সাইগনকে অধিকতর সাহায্য প্রদানে এগিয়ে আসে। দক্ষিণ ভিয়েতনাম মার্কিন উপদেষ্টা পদ্ধতির আওতাধীনে আসে। ১৯৫৪ সনের ২৩ অক্টোবর আইজেনহাওয়ার স্বয়ং নাশকতামূলক কাজ ও আগ্রাসন প্রতিরোধে সাইগনের প্রতি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। ফলে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরাসরি মার্কিন উপদেষ্টামূলক রণনীতির আওতায় আসে।

অচিরেই উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থায় মার্কিন প্রতিনিধি জেনারেল জে. এল. কলিনসকে সাইগনে পাঠানো হয়। তাঁর কাজ ছিল সাইগনে সব মার্কিন এজেন্সিসমূহের অভিযানের সমন্বয় বিধান করা। দক্ষিণ ভিয়েতনামী সরকারের জন্য "সম্ভাব্য সব ধরনের সাহায্য" ব্যবস্থা করা। তাঁর আরো দায়িত্ব ছিল "ভিয়েতনামী সেনাবাহিনীকে বিশেষ মার্কিন পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গড়ে তোলা যে পদ্ধতি কোরিয়া, গ্রিস, তুরস্কসহ বিশ্বের অন্যান্য অংশে কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়।"[২৩]

এর পর মার্কিন রাজনৈতিক ও সামরিক সংগঠনগুলো অতি দ্রুত সাইগন সরকারের সাহায্যে এগিয়ে আসে এবং একের পর এক সকল কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করে, যে সব কাজ পূর্বে ফরাসিরা সম্পন্ন করতো। মার্কিন ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ফরাসিদের স্থলাভিষিক্ত হয়। মার্কিন সাংস্কৃতিক প্রভাব ক্রমশ ফরাসি সংস্কৃতির স্থান দখল করে নেয়।[২৪] ওয়াশিংটনে প্রণীত একটি "দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা" ছিল বাস্তবায়নের পথে। ভিয়েতনামে মার্কিন সামরিক সাহায্য ও উপদেষ্টা দল পূর্বে মূলত সৃষ্টি করা হয় মার্কিন সাহায্য

www.pathagar.com

বিলি–বন্টন কাজের জন্য। কিন্তু ১৯৫৫ সনে সেই দল ফরাসীদের থেকে দক্ষিণ ভিয়েতনামী বাহিনীসমূহকে প্রশিক্ষণদানের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে। একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্র তার প্রদত্ত সামরিক উপকরণ বন্টন এবং তৎকালীন উপদেষ্টামূলক ব্যবস্থা সম্প্রসারণে অংশ হিসেবে আরো কয়েকটি সামরিক মিশনও প্রবর্তন করে।[২৫]

ইতিমধ্যে মার্কিন উপদেষ্টা বাহিনী দক্ষিণ ভিয়েতনামের তৎকালীন বিমান ও নৌসুবিধাসমূহের ব্যবহার শুরু করে। যুক্তরাষ্ট্র তার উপদেষ্টামূলক ভূমিকা ও রসদ সামগ্রী সরবরাহের মাধ্যমে সাইগনকে একটি সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলতে সাহায্য করে। মার্কিন বাহিনীর অনুকরণে ওয়াশিংটন দক্ষিণ ভিয়েতনামে সামরিক বাহিনী কাঠামো গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। ফলে দক্ষিণ ভিয়েতনামে বিমান ও নৌ-বাহিনীর পাশাপাশি নৌ-সেনাবাহিনীও সৃষ্টি করে। এ ছাড়াও ছিল মার্কিন সাহায্যপুষ্ট আঞ্চলিক ও গণবাহিনী। এসবের প্রাথমিক কাজ ছিল দক্ষিণ ভিয়েতনামে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা অভিযান চালানো।[২৬] ১৯৫৪ সনের অক্টোবরে ওয়াশিংটন "ভিয়েতনামের মুক্তিবাহিনীর অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা অভিযানে প্রায়োজনীয় আনুগত্য ও কার্যকারিতার উন্নতি সাধনকল্পে একটি জরুরি পরিকল্পনা" বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[২৭] এভাবে দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন অনুপ্রবেশ ছিল বেশ রীতিবদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্র অপ্রতিসম শ্রম বিন্যাসের মাধ্যমে দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রতিরক্ষা ও উন্নয়নের দায়িত্বভার এককভাবে গ্রহণ করে। একটি প্রকৃত স্বাধীন দেশ হিসেবে দক্ষিণ ভিয়েতনামের পক্ষে তার নিজস্ব স্বাধিকার-স্বকীয়তা উন্নয়নের সুযোগ ছিল না বললেই চলে।

ওয়াশিংটন তার উল্লম্ব, অধিকার প্রবেশ শুধু দক্ষিণ ভিয়েতনামের সামরিক ও কৌশলগত ক্ষেত্রেই সীমিত রাখতে চায় নি, সাইগনে ফরাসি উদ্যোগে গঠিত সরকারের ওপর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপনেও প্রয়াসী হয়। সরকারের যে কোনো রাজনৈতিক পরিবর্তন বা এর অভ্যন্তরীণ সংস্কার ছিল মার্কিন উদ্যোগ বা মার্কিন চাপের ফলশ্রুতি, তার নিজস্ব উদ্যোগ বা আয়োজনের ফসল নয়। মার্কিন কর্মচারীদের শুধু সাইগনে পাঠানো হয় নি, পাঠানো হয়েছে দূর প্রত্যন্ত অঞ্চলে, আর এরা দক্ষিণ ভিয়েতনামের জাতীয় ও স্থানীয় রাজনীতিতে সত্যিকারে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের ভূমি সংস্কার পরিকল্পনা, বাজেট প্রণয়ন ও উন্নয়ন পরিকল্পনার মত বেসামরিক বিষয়ও মার্কিন উপদেষ্টা দল তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখে।[২৮]

www.pathagar.com

আমেরিকার মার্কিনীকরণ প্রক্রিয়া

দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন উল্লম্ব অনুপ্রবেশের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে ওয়াশিংটন সাইগনে এ ধরনের অকম্যুনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয় বা সমর্থন প্রদান করে যে-সরকার চেয়েছে অব্যাহত মার্কিন হস্তক্ষেপ ও মার্কিন রণনীতি প্রসূত মার্কিন আবর্তের বন্ধন। ওয়াশিংটন সর্বদা সাইগনে দেখতে চেয়েছে এমন একটি সরকার যে সরকার হবে কম্যুনিস্ট-বিরোধী। কট্টর কম্যুনিস্ট-বিরোধী নগো ভিন ডিয়েম সাইগনে প্রথমে হন প্রধানমন্ত্রী এবং পরে প্রেসিডেন্ট পদেও আসীন হন। কেননা তিনি ছিলেন আমেরিকার আস্থাভাজন, "মার্কিন পছন্দসই মানুষ"।[২৯] তাঁর মাধ্যমে এই কম্যুনিস্ট-বিরোধী রাষ্ট্রসত্তা ফরাসীদের কর্তৃত্ব ডিঙ্গিয়ে মার্কিন অভিভাবকত্বাধীন হয়। ম্যান্সফিল্ড রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, ডিয়েম যখন নতুন ঘোষিত দক্ষিণ ভিয়েতনামী প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হন তখন থেকে, 'প্রতিরক্ষা, অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা ও আর্থনীতিক সমর্থনের জন্য বাইরে থেকে দক্ষিণ ভিয়েতনামের সার্বিক দায়িত্বভার গ্রহণ করে আমেরিকা আর ভিয়েতনামী সরকারকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে বৈদেশিক সাহায্যের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়।

জেনিভা চুক্তি সম্পাদিত হবার পর দক্ষিণ ভিয়েতনামে কম্যুনিস্ট-বিরোধী সরকারের প্রতি পূর্ণ ম্যার্কিন আর্থিক সমর্থন এরূপ ইঙ্গিত বহন কর যে, সে দেশে আমেরিকা তার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী। একই সঙ্গে মার্কিন সামরিক কর্মচারীদের উপস্থিতির মাধ্যমে দক্ষিণ ভিয়েতনামের সামরিক বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দানের পরিকল্পনা থেকে বুঝা যায় যে, ওয়াশিংটন তার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ নিশ্চিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। এভাবে ফরাসিদের ভূমিকা যতই বিলুপ্ত হয়ে চলে ততই ভিয়েতনামীদের কম্যুনিস্ট ও অকম্যুনিস্ট হিসেবে দু'ভাগ করতে যুক্তরাষ্ট্র উত্তরোত্তর এক সক্রিয় প্রক্রিয়ায় বিজড়িত হয়।[৩১] ১৯৫৬ সনের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামে সহযোগী দু'টো রাষ্ট্র ফ্রান্স ও বৃটেনকে সসম্মানে বিদায় দেয়।[৩২] আর দক্ষিণ ভিয়েতনামকে একচেটিয়া মার্কিন তাবেদার রাষ্ট্রে রূপান্তর করে সাইগনে ফরাসি উদ্যোগে গঠিত সরকারের সংরক্ষণ ও জিইয়ে রাখার দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়। আর্থিক ও সামরিকভাবে সাইগন সরকার ছিল অনেকটা এরূপ অসহায় যে একমাত্র মার্কিন রাজনৈতিক সামরিক উপস্থিতি একে ক্ষমতায় আসীন রাখতে পারতো। উপরন্তু ভিয়েতনামের ভেতর ও বাইরের বিশ্বে এই অকম্যুনিস্ট সরকারের প্রদর্শিত ভূমিকার জন্য ওয়াশিংটনকে দায়ী করা হয়। এভাবে বাহ্যিক আবরণ ও বাস্তবে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার পুরোপুরি মার্কিন লেজুড় সরকারের রূপ পরিগ্রহ করে, আর ফরাসিদের সমস্যা রূপান্তরিত হয় মার্কিন সমস্যার।[৩৩]

www.pathagar.com

১৯৫৪-১৯৫৬ এর জেনিভা-উত্তর সংকটকালীন বছরগুলোতে দক্ষিণ ভিয়েতনামে আমেরিকার প্রত্যক্ষভাবে প্রতিশ্রুতি দান ও বিজড়িত হবার যাত্রা শুরু হয়। এই যাত্রায় যুক্তরাষ্ট্র ও তার সাইগনস্থ তাঁবেদার সরকার "আঘাত-প্রত্যাঘাত, হতাশা ও বিজয় লাভ অভিলাষের দুর্লভ প্রত্যাশায়" একযোগে কাজ করে চলে।[৩৪] ১৯৫৪ এর জেনিভা চুক্তির পর সাইগনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের অপ্রতিসম মৈত্রীবন্ধন স্থাপন থেকে বিরত হবার প্রচুর সুযোগ ছিল। কিন্তু ১৯৫৪ সনে একবার যখন ওয়াশিংটন এ বন্ধনজনিত দ্বন্দ্বের পথ বেছে নেয় এবং এ পথেই চলতে থাকে ১৯৫৬ সন অবধি, এ পথই তাকে আঁকড়ে ধরে রাখে এবং এ দ্বান্দ্বিক পথের অব্যাহত প্রক্রিয়ায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রাখে।"[৩৫]

ইতিমধ্যে, নিবারক তত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যুক্তরাষ্ট্র এরূপ সামরিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে যাতে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর এলাকা সর্বদা শক্তিশালী নৌ ও বিমান বাহিনী মোতায়েন রাখার নির্দেশ দেয় হয়। এর কাজ হবে "যে কোনো আগ্রাসনকে আমাদের পছন্দসই পদ্ধতি বা স্থানে আঘাত করা", বলেন স্বয়ং ডালেস।[৩৬] ১৯৫৭ সনের ১ জুলাই ঐ সময়কার পৃথক বিমান বাহিনী কম্যান্ড, মার্কিন দূরপ্রাচ্য বাহিনীকে পুনর্গঠন করে প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিমান বাহিনীতে রূপান্তরিত করা হয়। এই নবগঠিত বিমান বাহিনীকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় কম্যান্ডের সঙ্গে এক করা হয়।[৩৭] প্রকৃতপক্ষে এ সময় মার্কিন প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিমান বাহিনী তার ব্যাপক উন্নততর পরমাণুবোমার ভাণ্ডার বৈমানিকদের বর্ধিত প্রস্তুতি ও যোগ্যতা, এর কৌশলগত সচলতা এবং এর বি- ৪৭ বোমার বিমানবহর নিয়ে সম্ভবত সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংস করে দিতে পারতো। ঐ সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সোভিয়েতদের পাল্টা প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা ছিল অতি নগণ্য।[৩৮]

এভাবে যুক্তরাষ্ট্র তার বিশ্ব নিবারক রণনীতি ও উপদেষ্টা পদ্ধতির বলয় ভিয়েতনামে সম্প্রসারিত করে এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামে একটি 'স্বাধীন' এবং স্বনির্ভর অকম্যুনিস্ট সরকার গঠনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৯৫৪ সনের জেনিভা চুক্তিতে নির্বাচনের মাধ্যমে ভিয়েতনামকে পুনরেকত্রিত করার যে বিধান রাখা হয় সাইগন সরকার মার্কিন ইন্ধনে সম্পূর্ণ প্ররোচিত হয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে। দক্ষিণ ভিয়েতনামকে 'মুক্ত বিশ্বের' কর্তৃত্বাধীন রাখার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ওয়াশিংটন সাইগনকে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে ইন্ধন যোগায়। ১৯৬১ সনের দিকে ভিয়েতনামে মার্কিন কৌশলগত প্রচেষ্টা ছিল অপেক্ষাকৃত সামান্য "যদিও এর গুরুত্ব দিন দিন বেড়ে চলে।"[৩৯]

১৯৬১ সনের প্রথম দিকে দক্ষিণ ভিয়েতনামে 'প্রারম্ভিক বিদ্রোহে'র উদ্ভব ঘটে। যুক্তরাষ্ট্র একে দেখে একটি নতুন কৌশলগত পরিস্থিতি হিসেবে। ভিয়েতনামে নিবারক পরিকল্পনার প্রয়োগ সম্পর্কে তখন কিছু প্রশ্নের অবতারণা

www.pathagar.com

করা হয়। কেননা প্রকৃত অর্থে এর উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যক্ষ সামরিক হস্তক্ষেপ বা যুদ্ধ অভিযান থেকে বিরত থাকা। পরবর্তীকালে প্রচলিত মার্কিন রণনীতি পুনঃ-পর্যালোচনা করা হয়, গ্রহণ করা হয় 'নমনীয় প্রত্যুত্তর" নামে নতুন কৌশলগত পরিকল্পনা। এর অর্থ ছিল ভয়াবহ মার্কিন প্রতিশোধমূলক হুমকির পরিবর্তে সীমিত মার্কিন সামরিক কর্মপন্থা গ্রহণ। এই কর্মপন্থা যুক্তরাষ্ট্র তার পারমাণবিক নিবারক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রেখে একটি মাত্রাঙ্কিত নীতির অধীন ক্রমশ প্রয়োগ করতে সক্রিয় হয়।[৪০] ভিয়েতনামে এই নতুন কৌশলগত পরিকল্পনা 'প্রতি বিদ্রোহী' রণনীতির অধীন বাস্তবায়ন করা হয়। ওয়াশিংটনের উদ্দেশ্য ছিল সাইগনে কম্যুনিস্ট বিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের পরিচালিত অভিযান প্রতিহত করা।

এরপর ওয়াশিংটন দক্ষিণ ভিয়েতনামে একটি "যুদ্ধ উন্নয়ন ও পরীক্ষা কেন্দ্র" সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল ভিয়েতনামী বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে নতুন নতুন অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের পন্থা উদ্ভাবন করা।[৪১] ১৯৬১-১৯৬২ সনব্যাপী যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ ভিয়েতনামে তার উল্লম্ব অবস্থান ও অপ্রতিসম মৈত্রী সুদৃঢ়করণে একটি ব্যাপকতর পরিকল্পনা গ্রহণ করে যাতে লেজুড় সরকার সাইগনের প্রতি বিদ্রোহী অভিযান জোরদার করা যায়। এ উদ্দেশ্য সাধনে গৃহীত হয় মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা কর্ম স্মারকলিপি নম্বর ৫২ (১১ মে ১৯৬১)। এর মাধ্যমে ভিয়েতনামে নতুন মার্কিন প্রতি-বিদ্রোহী রণনীতির সমর্থনে একের পর এক কর্মপন্থা গৃহীত হয়-এতে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত ব্যবস্থায় কাঙ্ক্ষিত সূঁচালো গতিধারার সঞ্চার হয়, নির্দেশনা আসে হস্তক্ষেপের অনুকূলে। শীঘ্র আমেরিকা ত্বরান্বিত প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে সূচনা করে "পারস্পরিক" সমর্থনে একের পর এক সামরিক, অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও গুপ্ত ধরনের কর্মপন্থা... ।"[৪২]

বাস্তবে কিন্তু দেখা যায় যে যুক্তরাষ্ট্র পূর্বের চাইতেও আরো প্রত্যক্ষভাবে ভিয়েতনামে তার একতরফা উল্লম্ব অভিযান, অনধিকার প্রবেশ, যাত্রা অব্যাহত রাখে। মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা কর্মস্মারকলিপি, ১১১ (২২ নভেম্বর ১৯৬১) "ভিয়েতনাম পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়" অনুমোদন করে। এতে সম্ভাব্য উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে পূর্ব পরিকল্পনার কথা বলা হয়, মার্কিন সেনাবাহিনীর সংখ্যা বাড়াবার ব্যবস্থা করা হয়; নিম্ন পর্যায়ে সৈন্য সংখ্যা কত হতে পারে এ রূপ কিছু বলা হয় নি–এমন কি পরিকল্পিত সামরিক অভিযানসমূহে মার্কিন কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ও অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। মার্কিন সাহায্য ও উপদেষ্টা দলের শক্তি অনতিবিলম্বে বৈমানিক, যোগাযোগ ও গুপ্তচর ইউনিট সংযোজনের মাধ্যমে জোরদার করা হয়। শীঘ্রই মার্কিন বিমান ও হেলিকপ্টার

www.pathagar.com

বহরকে দক্ষিণ ভিয়েতনামে যুদ্ধ ও সমর্থনমূলক অভিযানে অংশগ্রহণেরও কর্তৃত্ব দেয়া হয়।[৪৩]

এতেও ওয়াশিংটন পরিতৃপ্ত ছিল না। মার্কিন ইচ্ছা ছিল যুদ্ধে অধিকতর ভূমিকা গ্রহণ। তাই ১৯৬২ সনের প্রথম দিকে মার্কিন সাহায্য ও উপদেষ্টা দলকে একটি পূর্ণ অভিযানমূলক সংস্থায় রূপান্তরিত করা হয়। এর নাম দেয়া হয় 'সামরিক সাহায্য কম্যাণ্ড ভিয়েতনাম', এবং চার তারকায় ভূষিত হরকিন্স নামক একজন মার্কিন জেনারেলের ওপর এর কম্যাণ্ড অর্পিত হয়। তিনিই ছিলেন ভিয়েতনামে মার্কিন সামরিক সাহায্য কমাণ্ডের প্রথম কমাণ্ডার। ওয়াশিংটন ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চল ভিত্তিক যে মার্কিন সামরিক সাংগঠনিক কাঠামো ছিল তিনি ছিলেন সেই সংযোগে আবদ্ধ। মার্কিন হস্তক্ষেপের এই রূপান্তরিত ধারা ছিল একই সঙ্গে সংখ্যাগত ও গুণগত । কেননা দক্ষিণ ভিয়েতনামে যুক্তরাষ্ট্র বড় আকারে শুধু তার সৈন্য-সংখ্যা বাড়িয়ে চলে নি, সাইগনকে প্রতিরক্ষামূলক কর্মপন্থা থেকে আক্রমণমূলক কর্মপন্থায় প্ররোচিতও করে। বস্তুত, ১৯৬২ সন থেকে সাইগনস্থ তাবেদার সরকারের সমর্থনে মার্কিন সামরিক প্রতিশ্রুতি বেড়ে চলে, হয় অপরিবর্তনীয়। এভাবে ওয়াশিংটন, নৈতিক বিধি-নিষেধের "চূড়ান্ত সীমা লংঘন করে, আর এরপর থেকে মার্কিন হস্তক্ষেপ তার সম্প্রসারণের বীজ বহন করে চলে", লিখেছেন ব্রিটিশ বিশ্লেষক ডানকানসন।[৪৪]

মার্কিন কাঠামোগত সহিংসতা

১৯৬২ সন থেকে যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ ভিয়েতনামের কম্যুনিস্ট নিয়ন্ত্রিত এলাকায় অপ্রতিহত ধারায় সি. এস. গ্যাস এবং বিমান থেকে শস্য ফসল ও গাছপালা নাশক ঔষধ বর্ষণ করে। এসব করা হয় ২, ৪, ৫-টি 'এজেন্ট অরেঞ্জ' ব্যবহারের মাধ্যমে 'র‍্যান্স হ্যান্ড' (Ranch hand) সঙ্কেত নামক এক পরিকল্পনার অধীন।[৪৫] এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র লাওস ও কম্বোডীয় সীমানার ওপর দিয়ে মার্কিন বিমান চরবৃত্তি ও পশ্চাদ্ধাবন অভিযান চালাবারও কর্তৃত্ব প্রদান করে।

এসবের উদ্দেশ্য ছিল তথাকথিত 'সীমানা নিয়ন্ত্রণ' ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের সীমান্তের ওপার থেকে শত্রু বাহিনীর অনুপ্রবেশ রোধ করা। ১৯৬৪ সনের ১ ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্র তিন পর্যায়ভিত্তিক একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে যাতে প্রতি বছর পর এটা সম্প্রসারিত করে উত্তর ভিয়েতনামের ওপর "তার পরিচালিত নীতির বিরুদ্ধে কঠোরতর পর্যায়ে শাস্তি বিধান করা যায়।"[৪৬]

ইতিমধ্যে ভিয়েতনামের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মার্কিন হস্তক্ষেপের আরেক রূপ পরিগ্রহ করে। ১৯৫৪ সনের ২৩ অক্টোবরে আইজেনহাওয়ার যখন

www.pathagar.com

সাইগনকে উদ্দেশ্য করে প্রথম পত্র লিখেন তখন থেকে ওয়াশিংটন বেশ কিছু একতরফা ওয়াদা এবং সাইগনের সঙ্গে কিছু দ্বি-পাক্ষিক ইস্তেহারের মাধ্যমে দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রতিরক্ষা ও এর 'স্বাধীন' সত্তা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। এভাবে আইজেন-হাওয়ার তাঁর মূল প্রতিশ্রুতিতে সাইগন সরকারকে একটি শক্তিশালী ও স্বনির্ভর রাষ্ট্র গড়ে তুলতে ও এ রাষ্ট্রকে জিইয়ে রাখতে সার্বিক মার্কিন সাহায্যের কথা বলেন। এতে বলা হয় যে, সাইগন তার স্বাধীনতা সংরক্ষণ করবে এবং "নাশকতামূলক প্রচেষ্টা ও সামরিক আগ্রাসন প্রতিহত করবে।"[৪৭] ১৯৫৭ সনের ১১ মে একটি যুক্ত সরকারি ইস্তেহারের মাধ্যমে ওয়াশিংটন "সাম্যবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে মুখোমুখি হতে" সাইগনকে সাহায্য প্রদানের ওয়াদা করেন। ১৯৫০ সনের ২৫ অক্টোবর মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরেক পত্রে সাইনগনকে তার সমাসন্ন কঠিন সংগ্রামে সাহায্য প্রদানের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে "যতদিন পর্যন্ত আমাদের শক্তি ও সামর্থ্য [সেই সংগ্রামে] ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারে।"[৪৯] ১৯৬১ সনের ১৩ মে'র যুক্ত ইস্তেহারে যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘতরমেয়াদি ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা গ্রহণে সম্মত হয় যাতে সাইগন বর্ধিত ও ত্বরান্বিত সাহায্য লাভ করে।

এর পরও আরো "সুদূরপ্রসারী কর্মপন্থা" গ্রহণের ওয়াদা করা হয়।[৫০] ১৯৬১ সনের ১৪ ডিসেম্বরে লিখিত মার্কিন প্রেসিডেন্টের আরেকটি পত্রে সাইগনকে অধিকতর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করা হয় দক্ষিণ ভিয়েতনামী জনগণকে রক্ষা ও স্বাধীনতা সংরক্ষণকল্পে সাইগনের প্রতিরক্ষামূলক প্রচেষ্টা জোরদার করা।[৫১] ১৯৬২ সনের ৪ জানুয়ারির যুক্ত ইস্তেহারে ওয়াশিংটন "সামরিক ক্ষেত্রে দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রতিরক্ষা জোরদার করার" অঙ্গীকার করে যাতে বিশদ প্রতি-বিদ্রোহী পরিকল্পনায় ব্যাপক হারে মার্কিন সাহায্য মিলে। পরিশেষে, ১৯৬৩ সনের ৩১ ডিসেম্বরের এক পত্রে কম্যুনিস্ট শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের তিক্ত লড়াইয়ে সাইগন সরকারের প্রতি যুক্তরাষ্ট্র পূর্ণ সমর্থন দানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়; এ উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামে মার্কিন বাহিনী ও রসদ সামগ্রি পাঠাতে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে যাতে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে 'বিজয়লাভ" নিশ্চিত করা যায়।[৫২]

এ ধরনের একতরফা মার্কিন ওয়াদা ও কর্মপন্থায় ক্ষুদ্র দেশ ভিয়েতনামের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে আমেরিকার মত একটি পরাশক্তির অনধিকার প্রবেশের উলঙ্গ প্রয়াস প্রতিফলিত হয়। কেননা, যাকে নিয়ে এসব মার্কিন ওয়াদা ও অঙ্গীকার সে সরকার ছিল খোদ ওয়াশিংটনের সৃষ্ট ও আমেরিকা কর্তৃক প্রতিপালিত।

বস্তুত, দক্ষিণ ভিয়েতনামে ডানপন্থী সরকারের প্রতি মার্কিন সমর্থন বা এর বিরুদ্ধাচরণ এ সময় থেকে এ সরকারের অভ্যন্তরীণ সাফল্যের ওপর নির্ভর করে নি, নির্ভর করে মূলত কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে এ সরকারের

www.pathagar.com

রাজনৈতিক বিরোধিতার বহরের ওপর, নির্ভর করে এ সরকার কতখানি অব্যাহত মার্কিন লেজুড়বৃত্তিতে আগ্রহশীল। নীতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, এর অর্থ ছিল কম্যুনিস্টদের সঙ্গে সমঝোতা প্রয়াসী যে কোনো সরকার থেকে মার্কিন সমর্থন প্রত্যাহার বা এরূপ রাজনৈতিক সমাধান এড়িয়ে চলা যাতে তাবেদার সরকারের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া গণতান্ত্রিকভাবে অন্যদের জন্য উন্মুক্ত হতে পারে, হাত গুটাতে বাধ্য হতে হবে আমেরিকাকে।[৫৩]

উল্লেখ্য, ১৯৬৩ সনের বসন্তকালে ডিয়েম-ন্যু সরকার দক্ষিণ ভিয়েতনাম প্রশাসনে মাত্রারিক্ত মার্কিন হস্তক্ষেপে বীতশ্রদ্ধ হয়ে, মার্কিন উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে হ্যানয় নেতৃত্বের সঙ্গে সমঝোতা প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়। এতে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের পোলিশ প্রতিনিধি দলের প্রধান ও সাইগনস্থ ফরাসি দূত মধ্যস্থতা করেন। দু'পক্ষের একটি শান্তি চুক্তির কিছু মৌল নীতিমালা সম্পর্কিত অন্তর্বর্তীকালীন মতৈক্যও প্রতিষ্ঠিত হয়। এসবের মধ্যে দক্ষিণ ভিয়েতনামে কম্যুনিস্টপন্থীদের নিয়ে একটি কোয়ালিশন সরকার গঠন ও ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন প্রত্যাহারের মত জটিল বিষয় দু'টিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফলে মার্কিন তাবেদার সরকার তার পৃষ্ঠপোষকের নির্ধারিত পরিসীমা অতিক্রম করে বলে মনে হয়। এতে ডিয়েম-ন্যু সরকারের রাজনৈতিক বিরুদ্ধ মতাবলম্বী মনোভাবও পরিদৃষ্ট হয়। পরবর্তীকালে সহিংস প্রক্রিয়ায় এ সরকারের উচ্ছেদ, ডিয়েম-ন্যুর নৃশংস হত্যা এবং তাঁদের সঙ্গে তাঁদের শান্তি পরিকল্পনারও অপমৃত্যু—এসব প্রভৃতি মার্কিন ষড়যন্ত্রের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি না হলেও এসব প্রক্রিয়ার পথ মার্কিন সরকারই উন্মুক্ত করে।[৫৪]

আরো উল্লেখ্য, ডিয়েম সরকারের উচ্ছেদের পর কিছুকাল সাইগনে সামরিক জান্তার ক্রমান্বয়িক অভ্যুত্থান ঘটে—মনে হয় যেন এসব ছিল এক অশেষ প্রক্রিয়া। প্রতিটি জান্তা এক একটি অভ্যুত্থানের ফলে ক্ষমতাচ্যুত হয়, ক্ষমতা লাভ করে নতুন কতিপয় জেনারেল, এর পর সামরিক বাহিনীর অধস্তন বেশ কিছু অফিসারের পদোন্নতি ঘটে।[৫৫] অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, ডিয়েমের পর যেসব সামরিক জান্তা ও সরকার ক্ষমতা দখল করে একের পর এক এর সবগুলোই নিঃসংশয় মার্কিন অপ্রতিসম মৈত্রী বন্ধনের আমেজ লাভ করে। সাইগনে ক্ষমতার কোন্দল ঐ পর্যন্ত মার্কিন মৈত্রী ছত্রছায়াকে প্রভাবিত করে নি যে-পর্যন্ত এরূপ কোন্দল মার্কিন অপ্রতিসম যোগসূত্র ও মৈত্রী বন্ধনের আবর্ত থেকে দক্ষিণ ভিয়েতনামকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে না চায়।

এভাবে ভিয়েতনামে মার্কিন উল্লম্ব অনুপ্রবেশ রাজনৈতিক ও সামরিক উভয় দিক থেকে যথার্থ সহিংস রূপ ধারণ করে এবং উত্তরোত্তর ভিয়েতনাম একটি অপ্রতিসম দ্বন্দ্বের অধিক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়। এরূপ সম্প্রসারিত ভূমিকা গ্রহণ সত্ত্বেও ১৯৬৫ সনের প্রথম দিকে ওয়াশিংটন এরূপ হুমকি দেখে যে

www.pathagar.com

সাইগনস্থ তার তাবেদার সরকারের পতন সমাসন্ন। সারা দক্ষিণ ভিয়েতনামব্যাপী কম্যুনিস্টদের গেরিলা অভিযান থেকে এরূপ ধারণা জন্মে। আমেরিকা তখন নতুন কৌশলগত প্রত্যুত্তর দেয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। বিশ্ব কৌশলগত নীতি পর্যায়ে "নমনীয় প্রত্যুত্তর" তখনো তার যথার্থতা হারায় নি। অবশ্য কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গিতে নমনীয়তা থাকার ফলে 'সীমিত যুদ্ধের' রণনীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো সম্ভব হয়। মাত্রাঙ্কিত নীতির অধীন এ রণনীতি গৃহীত হয়। এর ফলে দক্ষিণ ভিয়েতনামে কম্যুনিস্ট বিদ্রোহী তৎপরতা চিহ্নিতকরণে যুক্তরাষ্ট্র তার দৃঢ় প্রত্যয় প্রদর্শন করতে সক্রিয় হয়। এই রণনীতির কার্যকর করা 'মাত্রায় মাত্রায় সম্প্রসারিত অভিযান চালিয়ে হয় উত্তরোত্তর চাপ সৃষ্টি করে শত্রুর বাহুবল সংকোচিত করা যায়", শত্রু নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়, আর দক্ষিণ ভিয়েতনামে তার কৌশলগত প্রচেষ্টা থেকে বিরত হয়।[৫৬] ১৯৬৫ সনে আরেকটি নতুন মার্কিন কম্যাণ্ড সৃষ্টি করা হয়। অনতিবিলম্বে এটা কার্যকরও হয়।

নব-ঘোষিত মাত্রাঙ্কিত রণনীতির অধীন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর ভিয়েতনামের লক্ষ্যস্থল এবং লাওস ও কম্বোডিয়ায় কম্যুনিস্ট ঘাঁটি এলাকা ও অনুপ্রবেশ পথসমূহের ওপর রীতিবদ্ধভাবে ব্যাপক বিমান অভিযান শুরু করে। মাত্রাঙ্কিত রূপরেখা ব্যবহারের মাধ্যমে 'মৃতদেহ গণনা' রণকৌশল সহযোগে যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ ভিয়েতনামে কম্যুনিস্ট নিয়ন্ত্রিত এলাকার বিরুদ্ধে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ পরিচালনা করে। সাইগনের দখলিকৃত এলাকার পরিসর সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে একটি 'তুষ্টি বিধান' (Pacification) যুদ্ধও চালানো হয় এবং ১৯৬৭ সনের দিকে "বেসামরিক অভিযান ও বিপ্লবী উন্নয়ন সমর্থন" নামে একটি নতুন সংগঠনও সৃষ্টি করা হয়। এ নতুন সংগঠন ছিল মার্কিন সামরিক কম্যাণ্ড এর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সাইগনস্থ তাঁবেদার সরকারের ওপর এর কার্যকর উল্লম্ব যোগসূত্র ও নিয়ন্ত্রণ ছিল।[৫৭] এভাবে ভিয়েতনামে মার্কিন উল্লম্ব অভিযান প্রসূত কাঠামোগত সহিংস তৎপরতা পুরোদমে চলে।

তবু ভিয়েতনামে মার্কিন উদ্দেশ্য অর্জন সুদূরপরাহত হয়ে পড়ে। বরং ১৯৬৮ সনের প্রথম দিকের 'টেট অভিযান' (Tet Offensive) নামে ভিয়েতনামী কম্যুনিস্টদের নববর্ষ অভিযানের পর যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ ভিয়েতনামে তার তৎকালীন রণনীতি পুনঃপর্যালোচনা করা প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এ সময়ে কম্যুনিস্টদের দ্রুত ও ব্যাপকতর অতর্কিত অভিযানের ফলে ওয়াশিংটনে এক হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। ভিয়েতনামে মার্কিন সরকার যখন সম্ভাব্য বিজয়ের কথা বলে আসছিল ঠিক সেই মুহূর্তে শত্রুর প্রবল ও ব্যাপকতর হামলা এরূপ প্রমাণই বহন করে যে, ভিয়েতনাম যুদ্ধে পাঁচ লক্ষাধিক সৈন্যসহ প্রত্যক্ষ মার্কিন হস্তক্ষেপ এবং ব্যাপকতর মার্কিন ক্ষয়ক্ষতি

www.pathagar.com

সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র ও তার তাঁবেদার বাহিনীর অবস্থা দশকের মার্কিন উপদেষ্টামূলক ভূমিকার সময়ের চাইতে ভালো ছিল না।

এ সব বাস্তবতা ও যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধের বিরুদ্ধে অসন্তোষের নিরিখে মার্কিন সরকার পুনরায় তাদের তৎকালীন রণনীতি পাল্টাতে বাধ্য হয়, গ্রহণ করে 'বাস্তবানুগ নিবারক' (Realistic Deterrence) নামে নতুন রণনীতি। নতুন মার্কিন রণনৈতিক কর্মপন্থায় 'পর্যাপ্ততা' ও 'শরিকদারি'র ওপর জোর দেয়া হয়। বাইরে থেকে মার্কিন সরকার পর্যাপ্ত সামরিক রসদ-সরঞ্জাম যোগাবে যাতে যুক্তরাষ্ট্র ও তার তাঁবেদার সরকারের ওপর শত্রুপক্ষ কোনোরূপ অবাঞ্ছিত শর্ত চাপিয়ে না দিতে পারে। একই সঙ্গে 'শরিকদারি' ধারণার অনুরূপ কৌশলগত প্রচেষ্টার নিম্নতর পর্যায়ে মিত্রদের সাথে শরিকিভাবে বলপ্রয়োগ ও শরিকি হারে দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে মার্কিন বাহিনীর প্রত্যক্ষ ভূমিকা হ্রাস করার বিধান রাখা হয়।[৫৮] বস্তুত, নমনীয় প্রত্যুত্তর তত্ত্বে নির্দেশিত বিশ্বব্যাপী সর্বপ্রকার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের একাই আর পুলিশি নেতৃত্ব গ্রহণের প্রয়োজন হবার কথা নয়। নতুন তাত্ত্বিক মূল্যায়নের অনুকরণে যুদ্ধে পুনর্বার 'ভিয়েতনামীকরণের' প্রচেষ্টা চালানো হয়, গুরুত্ব দেয়া হয় 'তুষ্টি বিধান' ও 'জন নিরাপত্তার' ওপর, যদিও বাস্তবে দক্ষিণ ভিয়েতনামে রক্তক্ষয়ী অভিযান ও 'মৃতদেহ গণনার' রণকৌশল ছিল মার্কিন ও তাঁবেদার বাহিনীর মৌলিক সামরিক পদ্ধতি।

মার্কিন ছত্রছায়ায় বহুজাতিক আন্তক্রিয়া

ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামে তার অনধিকার অনুপ্রবেশ, উল্লম্ব অভিযান এবং সেই দেশকে তার নিজস্ব মার্জিনের আবর্তে আনার পাশাপাশি পুনরায় বহুজাতিক আন্তক্রিয়া ও সংগঠন সৃষ্টির প্রয়াস পায়। এর ফলশ্রুতিতে ভিয়েতনামের ব্যাপারে অধিকতর সংখ্যক বাইরের শক্তি বিজড়িত হয়। এ উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র সাইগনকে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সম্মেলনে হাজির করায় যাতে সাইগন আমেরিকার সব সম্প্রসারণমূলক তৎপরতার সম্পূর্ণ (যদিও অপ্রতিসম) মিত্রে পরিণত হয়। ১৯৫৪ সনের ম্যানিলা চুক্তিতে ভিয়েতনামে মার্কিন সামরিক কর্মপন্থায় সহযোগী হিসেবে আরো বাইরের রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণের বিধান রাখা হয়।

উল্লেখ্য, ১৯৬০-এর প্রথমাবধি ভিয়েতনামে বিজয়ের সন্ধানে হস্তক্ষেপ করতে গিয়ে ওয়াশিংটন তার মিত্রদেশগুলোকে যথাসম্ভব দূরে রাখে, কিন্তু পরিস্থিতির অবনতি ঘটার ফলে যুক্তরাষ্ট্র সহযোগী ভূমিকায় আরো মিত্রদেশকে সক্রিয়ভাবে বিজড়িত করা শুরু করে। ১৯৬১ সনে প্রত্যক্ষ মার্কিন উদ্যোগের ফলে মিত্রদেশসমূহের সাহায্যের জন্য অনুরোধ করা হয়।

www.pathagar.com

এ প্রচেষ্টা আরো জোরদার করা হয় ১৯৬৫ সনের দিকে। সাইগন "শুধুমাত্র সাহায্য চেয়ে আনুষ্ঠানিক অনুরোধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করে।"[৫৯] ইন্দোচীনের বাইরে মার্কিন আয়োজিত প্রথম সম্মেলন হয় হনোলুলুতে, ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ সনে। এ সম্মেলনে ওয়াশিংটন সমন্বয়মূলক সামরিক পরিকল্পনা গ্রহণে সাইগনের সম্মতি লাভ করে, উভয়ে 'ঘনিষ্ঠতর সামরিক সহযোগিতা এবং উত্তরোত্তর সামরিকভাবে কার্যকর নীতি গ্রহণে পূর্ণ মতৈক্যে পৌঁছে। এরপর এ ধনের আরো কয়েকটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সাতজাতি শীর্ষ সম্মেলন হয় ২৪ অক্টোবর ১৯৬৬ তারিখে। এতে সাইগন ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগ দেয় অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ কোরীয় প্রজাতন্ত্র, ফিলিপাইন ও থাইল্যান্ড। এ সাতজাতি বৈঠকে দক্ষিণ ভিয়েতনামী জনগণের প্রতিরক্ষায় "অভিন্ন প্রতিশ্রুতি" বিষয় আলোচিত হয় এবং তারা "...পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যতখানি দৃঢ়তা সহকারে ও যত দিন প্রয়োজন সামরিক ও অন্যান্য সব ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে সম্মত হয়"। যুক্তরাষ্ট্র ও সাইগনের মধ্যে আরেক বৈঠক হয় ২১ মার্চ ১৯৬৭ তারিখে এ গোয়ামে। এরপর উভয়পক্ষ এক ইস্তেহারে ম্যানিলা ও হনোলুলুতে গৃহীত প্রস্তাবাবলীতে তাদের আস্থা পুনর্ব্যক্ত করে, দক্ষিণ ভিয়েতনামে "মুক্তি প্রতিরক্ষাকল্পে" তাদের দৃঢ় সংকল্প পুনরায় ঘোষণা করে। উভয় মিত্র আরেকটি যুক্ত বিবৃতি প্রচার করে ক্যানবেরা থেকে। ২০ ডিসেম্বর ১৯৬৭ তারিখে। এতে ম্যানিলা ইস্তেহারের বক্তব্য আবার সজোরে বিধৃত হয়, উভয়পক্ষ যথাযথ সামরিক কর্মপন্থা গ্রহণে সম্মত হয়।

এরপর প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে অবস্থিত মিডওয়ে দ্বীপ নিক্সন ও থিউ'র মধ্যে গোপন আলাপ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় ৮ জুন ১৯৬৯ তারিখে। এতে তাঁরা ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও মুক্তি নিশ্চয়তা বিধানকল্পে অভিন্ন প্রচেষ্টার ওপর জোর দেন। এতে দক্ষিণ ভিয়েতনামী সশস্ত্র বাহিনীসমূহকে আরো জোরদার করার ব্যবস্থা করা হয় যাতে 'যুক্তরাষ্ট্রের মহত্বের সহিত গৃহীত ভারের বোঝা লাঘব হয়", কেননা যুক্তরাষ্ট্র "মুক্তির প্রতিরক্ষা বিধানে এবং মুক্ত বিশ্বের স্বাধীনতা প্রয়াসে" সাইগনের সঙ্গে যুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করে।[৬০]

উপর্যুক্ত বিশ্লেষণে এটা সুস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয় যে, ওয়াশিংটন-সাইগনের মৈত্রী সম্পর্কের মাধ্যমে একটি বাইরের শক্তি একটি ক্ষুদ্র দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে চলে, এ হস্তক্ষেপ প্রসূত অভিযান যথার্থ-ই চলে উলম্ব ধারায়। কেননা দুই মিত্রের মধ্যে কোনোরূপ অর্থবহ দ্বি-পাক্ষিক আন্তক্রিয়া চলে নি। অর্থাৎ দু'পক্ষের মৈত্রীযোগের ফলশ্রুতিতে পরাশক্তি মিত্র-

www.pathagar.com

ই ক্ষুদ্ররাষ্ট্র দক্ষিণ ভিয়েতনামের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এককভাবে হস্তক্ষেপ অধিকার লাভ করে অথচ সাইগন যুক্তরাষ্ট্রে সমরূপ অধিকার লাভ হয় নি।

ভিয়েতনামে বহুজাতিক আন্তক্রিয়া ও মার্কিন মার্জিনের আবর্তে ক্রমবর্ধমান হারে সহিংস প্রক্রিয়া চালানো সত্ত্বেও ১৯৭২ শেষপাদে যুক্তরাষ্ট্র নতুন কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণে বাধ্য হয়। যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যুদ্ধ-বিরোধী অশান্ত অবস্থা এবং বিশ্ব কৌশলগত সম্পর্কে উদ্ভূত নতুন অনুকূল পরিস্থিতি ওয়াশিংটনকে তার কৌশলগত ব্যবস্থা পুনর্মূল্যায়নে প্রবৃত্ত করে। বিশ্ব পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্র তার প্রতিযোগী শক্তি চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক সহজ করে, কিন্তু অভ্যন্তরীণ অশান্ত অবস্থার কারণে ওয়াশিংটন ইতিমধ্যেই তার সৈন্যের বেশিরভাগ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। তবু দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে একেবারে সরে যাবার চাপ অব্যাহত থাকে আমেরিকায়।

এ ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলায় ওয়াশিংটন ভিয়েতনামী কম্যুনিস্টদের সঙ্গে কূটনৈতিক সংলাপ ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর দেখে নি। কিন্তু এই সংলাপের ফসল ১৯৭৩ সনের পারী শান্তি চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে যুক্তরাষ্ট্র 'সাম্যাবস্থার রণনীতি' নামে এক নতুন কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে। কার্যকর পর্যায়ে ওয়াশিংটন কূটনৈতিক ও রণনৈতিক প্রচেষ্টা সংযোগের মাধ্যমে হ্যানয়ের সম্প্রসারণমূলক "সীমাহীন ইচ্ছাবৃত্তিকে" এমননিভাবে দমাতে চায় যাতে "দক্ষিণ ভিয়েতনাম নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারে, আর বিবর্তিত প্রক্রিয়ায় [ভিয়েতনামে] একরূপ সাম্যাবস্থা সৃষ্টি হবে," লিখেছেন কিসিঞ্জার স্বয়ং।[৬১] অন্য কথায়, ভিয়েতনামে মার্কিন রণনীতি ছিল পুরানো মার্কিন রণনৈতিক পরিকল্পনার ধাঁচে প্রণীত ঃ দক্ষিণ ভিয়েতনামে একটি মার্কিনপন্থী অকম্যুনিস্ট রাষ্ট্রসত্তা যে কোনো ভাবে জিইয়ে রাখতে হবে।

আমেরিকার অব্যাহত কৌশলগত প্রক্রিয়া

প্রকৃতপক্ষে, হ্যানয়ের সঙ্গে একটি শান্তি চুক্তি সম্পাদনের পরিকল্পনা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামে তার উল্লম্ব ধারার মার্জিনীকরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখে। থিউ'র পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা নগুয়েন ফুডুকে'র সঙ্গে ২৯-৩০ নভেম্বর ১৯৭২ তারিখে হতে হোয়াইট হাউসে আলাপকালে নিক্সন সাইগনের বিশেষ দূতকে ওয়াদা প্রদান করেন যে সাইগনের স্থিতি বিধানের সংগ্রামে যথেষ্ট নতুন অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা হবে, আর হ্যানয় যদি ব্যাপক হারে যুদ্ধ বিরতি লংঘন করেন তাহলে সাইগন মার্কিন সাহায্যের ওপর পূর্ণ ভরসা করতে পারে।[৬২] সাইগনকে দেয়া নিক্সনের গোপন প্রতিশ্রুতির এটি ছিল প্রথম প্রতিশ্রুতি মাত্র।

এছাড়া প্রেসিডেন্টের সহকারী জেনারেল হেগকে নিক্সন তিনবার সাইগনে পাঠান-প্রথমে নভেম্বরে, পরে ডিসেম্বর ১৯৭২ এবং পরিশেষে পাঠান জানুয়ারি

www.pathagar.com

১৯৭৩ তারিখে। এ সময় থিউকে পুনরায় নিশ্চয়তা দেয়া হয় যে তাঁর সরকারের স্থিতি বিধানে মার্কিন আগ্রহ অব্যাহত থাকবে। এটা তখন বুঝিয়ে দেয়া হয় যে, প্রস্তাবিত চুক্তি সম্পাদন ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই, কিন্তু এ চুক্তি সম্পাদন করা হলেও ভিয়েতনামের প্রতি মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌলিক কোনো পরিবর্তন ঘটবে না। বরং এ চুক্তি সম্পাদিত হলে যুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণ সম্ভব হবে এবং দুই মিত্র রাষ্ট্রের অভিন্ন উদ্দেশ্য অর্জনে একযোগে কাজ করা সম্ভব হবে। নভেম্বরে হ্যাগের সফরের পর নিক্সন থিউকে এক ব্যক্তিগত পত্রে জানান যে, "যে কোনো চুক্তিপত্রে কি লেখা হচ্ছে তা' গুরুত্বপূর্ণ নয়, মৌলিক হচ্ছে পুনর্বার আগ্রাসন চললে আমরা কি করবো তাই। এর পর নিক্সন থিউকে দেয়া তাঁর প্রতিশ্রুতির ব্যাখ্যা প্রদান করেন ঃ "আপনি আমার নিশ্চিত আশ্বাস গ্রহণ করুন যে হ্যানয় যদি চুক্তির শর্ত মানতে ব্যর্থ হয় তবে আমি দ্রুত ও কঠোর প্রতিশোধশূলক ব্যবস্থা গ্রহণে দ্বিধা করবো না"।[৬৩]

এরপর ১৪ জানুয়ারি ১৯৭৩ তারিখে হ্যাগের মাধ্যমে নিক্সন থিউক আরেকটি পত্র দেন এতে তিনি "সন্দেহাতীত ভাষায় জানিয়ে দেন। যে যুক্তরাষ্ট্র আপনার সরকারকে দক্ষিণ ভিয়েতনামের একমাত্র বৈধ সরকার বলে স্বীকৃতি প্রদান করে।" থিউকে পূর্ণ মার্কিন আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্যেরও প্রতিশ্রুতি দেন।[৬৪] বস্তুত, পারী চুক্তি সম্পাদনের প্রাক্কালে সাইগনের প্রতি মার্কিন প্রতিশ্রুতির ব্যাপকতা ও 'যুক্ত কর্মপন্থা' গ্রহণের একতরফা মার্কিন অঙ্গীকার এমন কি থিউ স্বয়ং- হতবাক হয়। কেননা থিউ, স্বয়ং নিক্সন তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেন, "জানান যে, তাঁর কাছে এরূপ সুস্পষ্ট মনে হয় যেন তাঁকে শান্তি চুক্তি সম্পাদনের কথা বলা হচ্ছে না, বরং অব্যাহত মার্কিন সমর্থন সম্বলিত একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর দানের কথা বলা হচ্ছে।"[৬৫] ওয়াশিংটন শুধু অব্যাহত অপ্রতিসম সমর্থনমূলক ছত্রছায়ায় ওয়াদা প্রদান করে নি, এরূপও হুমকি প্রদান করে যে সাইগনকে ছাড়াই যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদন করবে। ফলে সাইগন তার আপত্তি সত্ত্বেও চুক্তিতে স্বাক্ষর দানে বাধ্য হয়। যেহেতু ১৯৭৩ সনের শ্যান্তি চুক্তি সাইগনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্পাদিত হয় সাইগন সরকার সেহেতু এর বাস্তবায়নে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। পরে মার্কিন প্রতিজ্ঞা অনুরূপ ওয়াশিংটনের সমর্থন সহকারে কম্যুনিস্টদের দখলিকৃত বিক্ষিপ্ত স্থানসমূহ থেকে তাদের উৎখাতকল্পে আক্রমণমূলক অভিযান পরিচালনা করে।[৬৬]

ভিয়েতনামে অব্যাহত মার্কিন অপ্রতিসম মৈত্রী প্রচেষ্টার ধারা আরো স্পষ্টতর রূপে তুলে ধরা যেতে পারে। ১৯৭৩ সনের পারী শান্তি চুক্তি সম্পাদনের পর পরই যুক্তরাষ্ট্র সাইগনে 'স্বাধীন' অকম্যুনিস্ট সরকার বহাল রাখার চেষ্টা থেকে বিরত হতে পারতো, পরিত্যাগ করতে পারতো সাইগনের

www.pathagar.com

সঙ্গে পৃষ্টপোষক-তাবেদার ভিত্তিক সম্পর্ক গ্রহণ করতে পারতো দক্ষিণ ভিয়েতনামে প্রতিযোগী দু'পক্ষের মধ্যে সুস্পষ্টরূপে পক্ষপাতহীন প্রতিসম ভূমিকা। কিন্তু পারী চুক্তি-উত্তরকালে মার্কিন-সাইগন অপ্রতিসম মৈত্রী ধারা সূচনা করা হয় ২৩ জানুয়ারি ১৯৭৩ তারিখে নিক্সন তখন নিঃসংশয়ে পুনর্বার জানিয়ে দেন যে যুক্তরাষ্ট্র সাইগনকে দক্ষিণ ভিয়েতনামের একমাত্র বৈধ সরকার হিসেবে অব্যাহত স্বীকৃতি দিয়ে যাবে। এতে দক্ষিণ ভিয়েতনামের সর্বত্র সাইগনের তখনো পুরো সার্বভৌমত্ব রয়েছে এরূপ দাবির পেছনে মার্কিন অপ্রতিসম মৈত্রী যোগসূত্রের সমর্থন মেলে এবং সেই বৈধতার দাবি নিয়েই সাইগন কম্যুনিস্টদের নিয়ন্ত্রিত এলাকা দখল করতে পারে। শান্তি চুক্তি উত্তরকালে মার্কিন অপ্রতিসম মৈত্রী যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতা একটি নতুন যুদ্ধের বীজ বহন করে। প্রথমে এ যুদ্ধ নিম্ন পর্যায়ে পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু ক্রমশ অবারিত ধারায় এর ব্যাপকতা ও তীব্রতা বেড়ে চলে।

বস্তুত, প্যারী শান্তি চুক্তি উত্তরকালের সাইগনের সমগ্র রণীতির মার্কিন আর্থিক, সামরিক ও বিমান সমর্থনের ভিত্তিতে রচিত ছিল। ওয়াশিংটনও সাইগনের উপর প্যারী চুক্তি চাপিয়ে দেয়ার পর ১৯৭৩ সনের ফেব্রুয়ারিতে নতুন প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। এ সময় মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট এগনিউ অব্যাহত মার্কিন সমর্থন জানাতে সাইগনে আসেন। এপ্রিলে থিউ স্বয়ং অব্যাহত মার্কিন সাহায্য সমর্থনের দাবি নিয়ে ওয়াশিংটন সফরে যান। এর পর ৩ এপ্রিল ১৯৭৩ সনে ক্লিমেন্ট থেকে এক যুক্ত ইস্তেহারে আমেরিকা "পর্যাপ্ত ও প্রচুর অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদানের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে...।"[৬৭] নিক্সন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় থিউকে সামরিক সাহায্য প্রদানেরও অঙ্গীকার করেন। কিসিঞ্জার এরূপ ওয়াদাও করেন যে, যদি "চুক্তির প্রতি হ্যানয়ের সৎ উদ্দেশ্যের অভাব প্রমাণ করা যায়" তাহলে মার্কিন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হবে "ভয়াবহ ও নিষ্ঠুর।"[৬৮] থিউ যেহেতু শান্তি চুক্তি বিরোধিতা করে আসছিলেন সেহেতু এরূপ মার্কিন ওয়াদার অর্থ দাঁড়ায় থিউকে কম্যুনিস্টদের সৎ উদ্দেশ্যের অভাব প্রমাণে সক্রিয় পন্থা গ্রহণে উৎসাহ দেয়া। খুব স্বাভাবিকভাবেই থিউ মার্কিন ওয়াদা অঙ্গীকার পুলকিত হন। কেননা যুক্তরাষ্ট্র প্রয়োজনবোধে হ্যানয়ে বোমা বর্ষণ করে আত্মসমর্পণ করাবে বলেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।[৬৯]

বস্তুত, ইতিমধ্যে পেন্টাগন ১৯৭৩ সনের শান্তির চুক্তি কার্যকর হবার পরেও তার সাইগন তাবেদার সরকারের সমর্থনে বিকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নে সচেষ্ট হয়। ভিয়েতনামে মার্কিন সামরিক উপদেষ্টা কম্যাণ্ডের গোপন কৌশলগত নীলনক্শা তথাকথিত "দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সাংগঠনিক পরিবর্তন" সম্পর্কিত কার্যকর পরিকল্পনা প্রণীত হয় ২৭ নভেম্বর ১৯৭২ তারিখে। এতে

www.pathagar.com

ভিয়েতনাম ও পার্শ্ববর্তী সীমান্ত দেশ লাওস ও কম্বোডিয়ার অব্যাহত সামরিক তৎপরতার বিধান রাখা হয়।

এসব সামরিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার কথা মার্কিন প্রশান্ত মহাসারগরীয় কম্যাণ্ডের তত্ত্বাবধান ও থাইল্যান্ডে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন ও সাহায্য দলের সঙ্গে দিনের ২৪ ঘন্টাব্যাপী প্রত্যক্ষ যোগাযোগের মাধ্যমে। উল্লেখ্য, থাইল্যান্ডের অবস্থিত এই মার্কিন দলটির নিকট সেই দেশে মার্কিন বি-৫২ ও অন্যান্য বোমারু বিমানের ওপর কম্যাণ্ড কর্তৃত্ব থাকে।

১৯৭৩-এর শান্তি চুক্তির পর প্রকৃতপক্ষে যুক্তরাষ্ট্র তার কৌশলগত নীল নক্শা বাস্তবায়ন করে এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামে প্রয়োজনীয় সংগঠনিক যোগসূত্র সৃষ্টি করে। ইতিমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র গোপনে চুক্তি-উত্তরকালে দক্ষিণ ভিয়েতনামে বেশ কিছু মার্কিন 'বেসামরিক' নাগরিকদের উপস্থিতির পরিকল্পনা গ্রহণ করে। আসলে এরা সবাই ছিল সরাসরি মার্কিন সামরিক বাহিনী থেকে নেয়া, কিন্তু ভিয়েতনামে একইরূপ কাজের জন্য এদের সরকারিভাবে মার্কিন বাহিনী থেকে অবসর দেয়া হয়। এদের মধ্যে কাউকে মার্কিন সরকার-ই ভাড়া করে, আর কাউকে নিয়োগ করে ২৩ টি মার্কিন করপোরেশন। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র সব মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র এবং সব ঘাঁটি ও সামরিক প্রতিষ্ঠান সাইগনের কাছে হস্তান্তর করে, যদিও ১৯৭৩-এর চুক্তি মোতাবেক সব মার্কিন ঘাঁটি ভেঙ্গে ফেলার কথা ছিল। মার্কিন অস্ত্র সামগ্রীও দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে সরিয়ে নেয়ার কথা ছিল।

আরো কথা ছিল যে, সাইগনের বাইরে অবস্থিত মার্কিন উপদেষ্টা কম্যাণ্ডের সদর দফতর সোন ন্যুট এয়ারপোর্টও ভেঙ্গে ফেলা হবে। কিন্তু একে মার্কিন উপদেষ্টাদের সদর দফতরে রূপান্তরিত করা হয়– নাম পাল্টে বলা হয় 'প্রতিরক্ষা এ্যাটাশী'র অফিস। বাস্তবে কিন্তু এর একটি কম্যাণ্ড কাঠামো ছিল, ছিল এর ৪,৭৫০ কর্মচারী নিয়ে নিয়মিত একটি সংগঠন। এ সংগঠনের প্রধান ছিলেন একজন মেজর-জেনারেল। তাঁকে জবাবদিহি করতে হতো থাইল্যান্ডে নিযুক্ত মার্কিন সমর্থন ও সাহায্য দল ও সপ্তম বিমান বাহিনীর কম্যাণ্ডার এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় মার্কিন কম্যাণ্ডের নিকট। পূর্বেকার মার্কিন প্রতি-বিদ্রোহী সংস্থার কার্যাবলীর দায়িত্ব অর্পিত হয় মার্কিন দূতের রণক্ষেত্রের দায়িত্বে নিযুক্ত বিশেষ সহকারীর ওপর। উপরন্তু, যুক্তরাষ্ট্র দূতালয়ের কার্যক্রমও সম্প্রসারিত করে এবং সাইগনে স্থিতিবিধানে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালায়।

পরিশেষে, ওয়াশিংটন সাইগনে একটি নতুন সামরিক সংস্থাও সৃষ্টি করে। একে বলা হয় ওয়ান্ড মিশন। কেননা এর নেতৃত্ব প্রদন করেন ভিয়েতনামে শেষ মার্কিন উপদেষ্টা কম্যাণ্ডার ও যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধান

www.pathagar.com

জেনারেল ফ্রেডারিক সি. ওয়্যান্ড। সাইগন সরকারকে বহালতবিয়েতে রাখার উদ্দেশ্যে একে যে কোনো কার্যকর পন্থা গ্রহণের দায়িত্ব দেয়া হয়।[৭০] বস্তুত, সাইগনের পতনের শেষ দিন অবধি ওয়্যান্ড মিশন কিছু চিহ্নিত উদ্দেশ্য অর্জনে এর সর্বশক্তি নিয়োগ করে ; মৌলিক লক্ষ্য ছিল নতুন রণকৌশল উদ্ভাবন করে সাইগনস্থ তাবেদার সরকারকে টিকিয়ে রাখা।

একইসঙ্গে, ১৯৭৩-এর পর সাইগনের স্থিতিবিধানে যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ ভিয়েতনামে তার মার্জিনীকরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। ওয়াশিংটন ও সাইগনের সমগ্র মৈত্রী সম্পর্কের কাঠামো ছিল অপ্রতিসম যোগসূত্রভিত্তিক। কেননা দক্ষিণ ভিয়েতনামী সরকারের জিইয়ে থাকাটা পুরো নির্ভর করে মার্কিন রণনীতি, মার্কিন সিদ্ধান্ত, মার্কিন উপদেষ্টামূলক সমর্থন ও শুধু মার্কিন বাজেটে নির্ধারিত অর্থ বরাদ্দের মাধ্যমে। মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ, পেন্টাগনের এক মুখপাত্র খোলামনে জানান,"সাইগন বাহিনীর পরিসীমা, এর অভিযান সংখ্যা, প্রভৃতি নিরূপণ করে। মার্কিন মিশন মার্কিন বাহিনীর পরিকল্পনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে যে, যে পরিমাণে সরবরাহ, রসদ, যন্ত্রসামগ্রী ও অস্ত্র-সরঞ্জাম প্রয়োজন হবে তা' নির্ধারণ করে" এবং পালাক্রমে এসব আবার ওয়াশিংটনে পেন্টাগন, মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ ও হোয়াইট হাউজ কর্তৃক নীতিগত সিদ্ধান্তে ভিত্তিতে গৃহীত হয়।"দক্ষিণ ভিয়েতনামী সরকার কোনো বাৎসরিক বাজেট প্রস্তাব রাখে না"–যথার্থই উল্লেখ করা হয় এরূপ, সাইগন সরকারকে যা-ই বলা হয় এ সরকার তাই করে থাকে।[৭১]

১৯৭৩ চুক্তির পরেও সাইগনকে শক্তিশালী করার জন্য ওয়াশিংটন ব্যাপকতর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। ফলে সাইগন একটি দুর্দান্ত যুদ্ধযন্ত্র গড়ে তোলে। মার্কিন সাহায্যপুষ্ট সাইগনের নিয়মিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল ৫,৭২,৩০০। এরা সবাই ছিল এম-১৬ রাইফেল দ্বারা সজ্জিত। স্থানীয় আধা-সামরিক বাহিনীতে ছিল ৫,৩৫,০০০ জন, আর খণ্ডকালীন কর্মে নিয়োজিত মিলিশিয়া ছিল প্রায় ১৪ লক্ষ। সাইগনের এই সশস্ত্র বাহিনী ১৫০০ ওপর ট্যাংক, প্রয়োজনীয় সংখ্যক সশস্ত্র সৈন্য বহনকারী গাড়ি ১৫০০ গোলন্দাজ কামান দ্বারা সমর্থিত ছিল। এছাড়া ছিল ২০০০ মত বিমান নিয়ে সাইগনের একটি শক্তিশালী বিমান বাহিনী ; এর এক-তৃতীয়াংশ ছিল ফাইটার বোমারু বিমান এবং সব মিলিয়ে বিশ্বে এই বিমান বাহিনীর স্থান ছিল চতুর্থ। সাইগনস্থ তাবেদার সরকারের সামরিক শক্তি গড়ে তোলার এরূপ প্রকাণ্ড তৎপরতা চালাবার পর কিসিঞ্জার যথার্থ-ই দাবি করতে পারেন যে দুই ভিয়েতনামের কৌশলগত পরিস্থিতিতে "সত্যিকর সাম্যাবস্থা প্রতিফলিত হয়।"[৭২]

আরো উল্লেখ্য, ওয়াশিংটন তার প্রতিশ্রুতি মতো দক্ষিণ ভিয়েতনামে কম্যুনিস্টদের ক্ষমতা থেকে দূরে রেখে সাইগন সরকারকে ক্ষমতায় বহাল

www.pathagar.com

রাখতে সর্বপ্রকার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হয়, যদিও মার্কিন কংগ্রেস তখন ইন্দোচীনে আরো মার্কিন সামরিক অভিযান নিষিদ্ধ করে। কিন্তু মার্কিন সাহায্য হ্রাস করার পর মার্কিন সরকার সাইগন সরকারকে টিকিয়ে রাখার জন্য সাইগনের সাহায্যসূত্র বহুজাতিক রূপ দেয়ার এক কঠোর প্রচেষ্টা চালায়। এভাবে ভিয়েতনামকে মার্কিন মার্জিনী আবর্তে আনার উদ্দেশ্যে তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে, আর সাইগনের ক্ষমতার ভিত্তি ছিল "অর্থ ও সরবরাহের জন্য আমেরিকাকে প্রলুব্ধ করার মতো যোগ্যতা প্রদর্শন করা।"[৭৩] বস্তুত, সাইগন পতনের শেষ সপ্তাহ অবধি মার্কিন সরকার সাইগনে তার বিশেষ অধিকার ও প্রভাব বজায় রাখে। এই শেষ সপ্তাহে সাইগনের পার্লামেন্ট 'জাতীয় সমঝোতা' অর্জনকল্পে জেনারেল ডোং ভ্যান মিনকে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত করে এবং তাঁর নব নির্বাচিত সরকার চূড়ান্ত পর্যায়ে ভিয়েতনামী কম্যুনিস্টদের দাবির মুখে নতি স্বীকার করে, মেনে নেয় যে–

১. সব মার্কিন সামরিক কর্মচারীবর্গকে অবশ্যই ভিয়েতনাম পরিত্যাগ করতে হবে এবং

২. নতুন সাইগন সরকার পুরানো মার্কিন উদ্যোগে গঠিত সরকারের কোনোরূপ দায়-দায়িত্বের বোঝা বইবে না।

মার্কিন অপ্রতিসম সম্পর্ক ও ইন্দোচীন অবলুপ্ত শান্তি

উপর্যুক্ত বিশ্লেষণ থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, যুক্তরাষ্ট্র দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও পরিকল্পিতভাবে ভিয়েতনামে তার বিশ্বকাঠামো বলয় সম্প্রসারিত করে। এই প্রক্রিয়ায় ওয়াশিংটন একের পর এক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রবৃত্ত হয় পর্যায়ক্রমে। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্র ব্যাপক আকারে রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে ভিয়েতনামে জড়িয়ে পড়ে বিলুপ্ত হয় ভিয়েতনামের স্বাধিকার। ভিয়েতনামে সামরিক পরিস্থিতি যতই আমেরিকার প্রতিকূলে যায়, আর যুদ্ধের প্রবাহ মার্কিন তাবেদার সরকারের বিপক্ষে যায় ওয়াশিংটনের পরোক্ষ ও উপদেষ্টামূলক ভূমিকা ততই সক্রিয় ও ক্রমবর্ধমানভাবে প্রত্যক্ষ যুদ্ধপ্রবণ ভূমিকায় রূপান্তরিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৫৪ থেকে দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন অনুপ্রবেশ প্রক্রিয়ায় সম্প্রসারিত ধারা পরিলক্ষিত হয়, গৃহীত হয় একের পর এক সম্প্রসারণমূলক সিদ্ধান্ত। ফলে দক্ষিণ ভিয়েতনামে তাবেদার সরকার পশ্চাদগামী হয় এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধ প্রধানত 'মার্কিনী ব্যাপাররূপে' প্রতীয়মান হয়। ১৯৬৫ অবধি যুক্তরাষ্ট্র শুধু ভিয়েতনাম যুদ্ধে লিপ্ত হয় নি, বিজড়িত হয় সমগ্র ইন্দোচীন দ্বন্দ্বে। মনে হয় হয় যেন লাওস ও কম্বোডিয়াসহ দক্ষিণ ভিয়েতনামের তাঁবেদার সরকারসমূহ মার্কিন বিশ্বগ্রাসী নীতির একক, সমন্বিত

www.pathagar.com

প্রান্তরে পরিণত হয়। ওয়াশিংটনের গৃহীত পরবর্তী কৌশলগত নীতিমালা ও দ্রুত পর্যায়ে বাস্তবায়িত সম্প্রসারণমূলক পদক্ষেপ মার্কিন সাইগন অপ্রতিসম মৈত্রী সম্পর্কের স্বাক্ষর বহন করে।

বস্তুত, মার্কিন-সাইগন মৈত্রী-বন্ধন ছিল অপ্রতিসম শ্রম বিন্যাসভিত্তিক। এ সম্পর্ক ছিল ভিয়েতনামে একটি বিশ্ব প্রধান কাঠামো থেকে একটি অধীন কাঠমোয় অভিযানভিত্তিক প্রক্রিয়া দ্বারা চিহ্নিত। দুই মিত্র শরিকের মধ্যে কোনোরূপ দ্বি-পাক্ষিক আন্তক্রিয়া ছিল না বললেই চলে। নিঃসন্দেহে এ ছিল আন্তর্জাতিক সিস্টেম দু' কাঠামোকে জড়িয়ে একটি অপ্রতিসম মৈত্রীস্বরূপ, যে মৈত্রী বন্ধনের অভিন্ন উদ্দেশ্যের কথা বলা হয় বটে, কিন্তু বাস্তবে স্থানীয় স্বার্থের পরিসীমা ডিঙ্গিয়ে মৈত্রী বন্ধন ব্যবহৃত হয় বিশ্ব কাঠামোর আদর্শ উদ্দেশ্য রক্ষার্থে। বিশ্ব পর্যায়ে মার্কিন কর্তৃত্বে বহুজাতিক আন্তক্রিয়া এবং মার্জিনের আবর্তে আনার প্রচেষ্টার ফলে সাইগনের ওপর এরূপ কাজ অর্পিত হয় যা' ওয়াশিংটন তাকে সম্পন্ন করতে বলে, রচিত হয় তাদের যুক্ত সামরিক কর্মপন্থা এবং লাওস ও কম্পোডিয়ায় উভয়ের যৌথ অভিযানের ভিত্তি। মৈত্রীবন্ধনের এরূপ উল্লম্ব পর্যায়ক্রমিক অগ্রগতি এবং এর পাশাপাশি গৃহীত সম্প্রসারিত কর্মপন্থার ফলে এভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে ভিয়েতনাম যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। একটি পরাশক্তি চূড়ান্তভাবে তার মর্যাদা ও ভয়াবহ প্রযুক্তিক ক্ষমতা ব্যবহার করে একটি ক্ষুদ্রদেশের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে, রূপান্তরিত করে একে দীর্ঘমেয়াদি ও ব্যয়বহুল এক আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বে।

প্রকৃতপক্ষে, জেনিভা-উত্তরকালে ভিয়েতনামে আমেরিকার বিজড়িত হবার প্রথম বছর কয়েক থেকে এটা বাহ্যত প্রকাশ পায় যে সাইগনস্থ অকম্যুনিস্ট সরকারের একটি বিশেষ করণীয় কাজ ছিল মার্কিন আস্থা অর্জন। কেননা যুক্তরাষ্ট্র- ই ছিল এ সরকারের অভ্যন্তরীণ সম্পদ ও আন্তর্জাতিক সমর্থনের ভিত্তি। সত্যিকার অর্থে ওয়াশিংটন তার সমর্থন প্রত্যাহার করলে সাইগনে যে-কোনো সরকারের পক্ষে ক্ষমতায় টিকে থাকা কঠিন হতো।

আরো সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা চলে, দক্ষিণ ভিয়েতনামের অকম্যুনিস্ট সরকার তার রাজনৈতিক স্থিতি, দেশের ভৌগোলিক সংহতি বা রাজনৈতিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা তার নিজস্ব সামর্থ্য ও সম্পদ কাজে লাগিয়ে জাহির করতে পারে নি, তার এ কাঙ্ক্ষিত নিশ্চয়তা বাইরে থেকে আসে। যুক্তরাষ্ট্রের মত একটি বিশ্বশক্তি তার রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি ও সামরিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সেই নিশ্চয়তা প্রদান করে। সত্যিকার অর্থে মার্কিন সামরিক বাহিনীকে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ ভূমিকা গ্রহণ করে সাইগন সরকারের নিরাপত্তা বিধানে সক্রিয় হতে হয়। সার্বিকভাবে সাইগনও মার্কিন রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি, সামরিক বা প্রতিরক্ষামূলক ছত্রছায়ায় বা পৃষ্ঠপোষকতা শুধু অনুমোদন করে

www.pathagar.com

নি, স্বাগতও জানায়। মার্কিন-সাইগন মৈত্রী বাহ্যিক ও বাস্তবিকভাবেই ছিল উল্লম্ব মৈত্রী কাঠামো ভিত্তিক। এই মৈত্রী ব্যবস্থা ওয়াশিংটন চাপিয়ে দেয় ঃ যদিও যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সিস্টেমে বিশ্বকেন্দ্র বা প্রধান কাঠামো স্বরূপ, তবুও এই কেন্দ্র– কাঠামোর অধীন সিস্টেমে একটি প্রান্ত সৃষ্টি করে একে আবদ্ধ করে স্বীয় মৈত্রী বন্ধনে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পরাশক্তি ভিয়েতনামের স্থানীয় দ্বন্দ্বে অনুপ্রবেশ করে একে রূপান্তরিত করে অপ্রতিসম দ্বন্দ্বে, ফলে সৃষ্টি হয় প্রত্যক্ষ বা কাঠামোগত সহিংসতা।[৭৪] কেননা এ জাতীয় দ্বন্দ্বের সূত্র-ই হচ্ছে বিশ্বশক্তি ব্যবস্থার খোদ প্রধান কাঠামো। যেহেতু উল্লম্ব মৈত্রীর প্রধান নায়ক এক পরাশক্তি দ্বন্দ্বরত পক্ষসমূহ নির্ধারণ ও সৃষ্টি করে সেহেতু এ দ্বন্দ্বের প্রকৃতি গালটুং-এর মতানুযায়ী "দুই অসম পক্ষের হিমায়িত সহিংসতা'র" রূপ পরিবগ্রহ করে।[৭৫]

আরেকটু ব্যাখ্যা প্রদান করলে সম্ভবত বিষয়টি অধিকতর সুস্পষ্ট হবে। ভিয়েতনামে আমেরিকা অপ্রতিসম ধারায় বিজড়িত হবার ফলে অকম্যুনিস্ট মৈত্রী সম্পর্কে শুধু তার প্রাধান্যের চাপ অনিবার্য হয়ে পড়ে নি, দ্বন্দ্বের নিরসনে রত শান্তি প্রক্রিয়ায়ও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এটা নিতান্ত-ই স্বাভাবিক যে একটি পরাশক্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র তার বিশ্বব্যাপী ব্যাপকতর স্বার্থ ও বিশ্বশক্তি-চেতনা নিয়ে এরূপ চাইবে যাতে যে কোনো শান্তি প্রক্রিয়া বা কূটনৈতিক ভাব-বিনিময়ে তার নিজস্ব কল্পগত আঞ্চলিক ও বিশ্বস্বার্থের সংরক্ষণ বা উন্নতি সাধন সম্ভব হয়। অথচ এ জাতীয় মার্কিন আঞ্চলিক ও বিশ্বস্বার্থে ভিয়েতনামে আমেরিকার প্রতিযোগী বা বিরুদ্ধপক্ষের সম্প্রত্যয়গত চেতনা বা স্বার্থের দিক থেকে ছিল একেবারে অবান্তর। সত্যিকার অর্থে সাইগনে অকম্যুনিস্ট তাঁবেদার সরকার সৃষ্টি ছিল আঞ্চলিক ও বিশ্ব পর্যায়ে আমেরিকানদের কম্যুনিস্ট-বিরোধী কাঠামো গড়ে তোলা বা এ সবের সম্প্রসারিত পরিকল্পনার-ই অংশবিশেষ। অথচ ভিয়েতনামী বিপ্লবীরা ভিয়েতনামের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপকে মার্কিন অনধিকার চর্চা মনে করে। এর বিরোধিতায় তারা নিযুক্ত হয় মূলত এ কারণে যাতে তাদের জাতীয় স্বাধীনতা ও তাদের দেশের পুনরেকত্রীকরণ অর্জন সম্ভব হয়। পরস্পরের এসব সম্প্রত্যয়গত চেতনা প্রতিফলিত হয় তাদের নীতি নির্ধারণে এবং অনিবার্যভাবে প্রভাব ফেলে কূটচাল ও শান্তি প্রক্রিয়ায়।[৭৬]

এভাবে ভিয়েতনামে শান্তি প্রক্রিয়ার ব্যর্থতা সম্পৃক্ত ছিল এ দ্বন্দ্বের অপ্রতিসম প্রকৃতিতে বা এর মৈত্রী ব্যবস্থায় উল্লম্ব চরিত্রে। কেননা শান্তি প্রক্রিয়ায় একেবারে ভিন্নমুখী ক্রিয়াকর্ম বা নেতিবাচক যোগাযোগ শুধু তৎকালীন কূটনৈতিক অচলাবস্থাকে প্রলম্বিত করে। নিঃসন্দেহে ভিয়েতনামে অপ্রতিসম মৈত্রী প্রচেষ্টা এভাবে সৃষ্টি করে অপ্রতিসম দ্বন্দ্ব। ফলে দ্বন্দ্বরত

www.pathagar.com

পক্ষসমূহ অপ্রতিসম চেতনা, সমাবেশজনিত ও সাংগঠনিকক ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে শূন্যমানসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে প্ররোচিত হয় এবং এরূপ এক কাঠামোগত সহিংসতা দানা বেঁধে ওঠে যাতে শান্তি প্রক্রিয়া হিমাগারে নিক্ষিপ্ত হয়।[৭৭]

পরাশক্তি হস্তক্ষেপ ধারা

পূর্বেই বলা হয়েছে, সমকালীন বিশ্বে ভিয়েতনামে অপ্রতিসম মৈত্রীযোগ ও উল্লম্ব অভিযানের একমাত্র দৃষ্টান্ত নয়। ভিয়েতনাম ও ইন্দোচীন থেকে আমেরিকানদের প্রত্যাহারের বছর কয়েকের মধ্যেই সোভিয়েতরা সমসাময়িক কালের আরেকটি "ব্যাপকতর কৌশলগত যুদ্ধে" বিজড়িত হয় আফগানিস্তানে। প্রায় এক দশকের কাছাকাছি সময় সেই দেশে সোভিয়েত বাহিনী প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ও সামরিক অভিযানে জড়িয়ে ছিল। সেখানে তারা "ব্যাপক গণহত্যা আকারে উদ্বাস্তু সমস্যা" সৃষ্টির দায়ে অভিযুক্ত হয়।[৭৮] এ প্রসঙ্গে অনেক তথ্য এখনো অজানা। কিন্তু আফগানিস্তানকে সোভিয়েত অপ্রতিসম মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ করার মস্কোর দৃঢ়প্রত্যয় পরিলক্ষিত হয় কাবুলে সোভিয়েত তাবেদার সরকার সংগঠনে এবং এই দেশে প্রায় ১,১৫,০০০ অভিযানে তৎপর সোভিয়েত বাহিনীর উপস্থিতিতে। উল্লেখ্য, সোভিয়েত অভিযানের প্রথম দিকে আফগানিস্তানে সোভিয়েত সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৮৫,০০০। অনেকটা ভিয়েতনামে মার্কিন অভিযানের অনুকরণে আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনী শহর-নগর, বিমান ঘাঁটি, প্রধান প্রধান সড়ক-রাজপথ ও গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত কেন্দ্রসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে। ভিয়েতনামে মার্কিন উপদেষ্টাদের মতো আফগানিস্তানের সোভিয়েত উপদেষ্টাও আফগান সরকারি মন্ত্রণালয় ও সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত প্রণালী নিয়ন্ত্রণ করো, এমন কি ক্রেমলিন আফগান সমাজের প্রায় প্রতিটি দিক সোভিয়েতীকরণের প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। ফলে রাশিয়া ও দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশের মধ্যে একটি ঐতিহ্যগত বাফার রাষ্ট্র হিসেবে আফগানিস্তানকে হরাবার প্রকৃতি সম্ভাবনা দেখা দেয়।[৭৯]

পক্ষান্তরে, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মত মধ্য আমেরিকাতেও যুক্তরাষ্ট্র সম্ভাব্য সোভিয়েত সম্প্রসারণমূলক হুমকির কথা বলে আসছে। ওয়াশিংটন এ অঞ্চলেও 'ডমিনো' প্রতিক্রিয়ার ফিকির তোলে। ১৯৫০-এর দশকে ভিয়েতনামে মার্কিন ভূমিকার অনুরূপ সালভাডরীয় বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দানের জন্য মার্কিন সামরিক উপদেষ্টাদের নিয়োজিত করে, বর্ধিত হারে সালভাডরে মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র পাঠাচ্ছে ওয়াশিংটন এবং এল-সালভাডরে বামপন্থী গেরিলাদের প্রতি সাহায্য ও সরবরাহ নিষিদ্ধ করে। একই সঙ্গে ওয়াশিংটন

www.pathagar.com

নিকারাগুয়ায় সান্ডানিস্তা সরকারের উৎখাতকল্পে গৃহীত মার্কিন কর্মপন্থার সপক্ষেও কৌশলমূলক প্রচারণা চালায়।[৮০]

উপসংহার

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, তৃতীয় বিশ্বের ক্ষুদ্ররাষ্ট্রগুলো সার্বিকভাবে পরাশক্তিদ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত প্রধান কাঠামোর সঙ্গে প্রতিসম সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট। এ ধরনের ভাবধারা পরিলক্ষিত হয় জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের পটভূমি ও ঐতিহ্যিক কর্মকাণ্ডে, '৭৭-জাতি গ্রুপ', উত্তর-দক্ষিণ আলোচা এবং তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য সংস্থার কার্যবিবরণী ও ইস্তেহার থেকে। সর্বোপরি, তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অপ্রতিসম মৈত্রী ধারা ও হামলার বিরুদ্ধে জনগণের দৃঢ় প্রত্যয়জনিত প্রলম্বিত সংগ্রামে প্রতিসম আশা-অভিলাষ পরিস্ফুট হয়। তবু দুটি বিশ্বশক্তি মত্ত হয় পারস্পরিক প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে অপ্রতিসম হস্তক্ষেপ প্রক্রিয়ায়। এরূপ শূন্যমান প্রতিযোগিতায় প্রতিটি বিশ্বপক্ষকে নিজস্ব স্বকীয় অপ্রতিসম মৈত্রীসুলভ ধাচে ক্ষুদ্রদেশে হস্তক্ষেপ করতে প্ররোচিত করছে, যেন একে অপরের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে। বাস্তবে কিন্তু তাদের হারজিত খেলার শিকার হয়ে তৃতীয় বিশ্বের দুর্বল ও ভাগ্যাহত দেশগুলো।

একটি পররাষ্ট্র নীতি-কৌশল তখনই কার্যকর ও ফলপ্রসূ বলে বিবেচিত হয় যদি প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্য যোগ্যতায় যুক্তিভিত্তিক ও সুচিন্তিত মূল্যায়ন করা হয় এবং আপেক্ষিক তুলনা করা হয় নিজস্ব আদর্শ ও উদ্দেশ্যের। তদুপরি ও দু'য়ের সমন্বিত সমীক্ষার ভিত্তিতে একটি সার্বিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সাফল্যমুখী কৌশলগত কর্মপন্থা প্রণীত ও গৃহীত হতে পারে। দীর্ঘ একুশ বছর যাবৎ যুক্তরাষ্ট্র ইন্দোচীনে অপ্রতিসম মৈত্রী প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। ষাটের দশকে এ প্রচষ্টা ব্যাপকতর রূপ পরিগ্রহ করে। তবু ওয়াশিংটন সেখানে তার কোনো মিত্রকে উদ্ধার করতে পারে নি। মস্কো আফগানিস্তানে অনেকটা একইরূপ প্রচেষ্টায় সক্রিয় ছিল প্রায় এক দর্শককাল। মস্কোর প্রকাশ্য উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল ইরানে হারানো মার্কিন ঘাঁটির পরিবর্তে আফগানিস্তানে 'একটি নতুন সোভিয়েত বিরোধী সেতু-বন্ধন' সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা প্রতিহত করা, নিবারণ করা সোভিয়েত ইউনিয়নের দক্ষিণ প্রান্ত তার নিরাপত্তার প্রতি মারাত্মক হুমকি।[৮২] কিন্তু লাখ-লাখ আফগান জনগণ প্রতিবেশী দেশগুলোতে পালিয়ে আন্তর্জাতিক সাহায্য ও সমর্থন নির্বিশেষে মুজাহিদের ভূমিকা গ্রহণ করে; ১৯৮৮ সনের জেনিভা চুক্তির ধারা অনুযায়ী ১৯৮৯ মার্চের মধ্যে সোভিয়েত সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার সত্ত্বেও আফগানিস্তানে সোভিয়েত তাবেদার সরকারের বিরুদ্ধে মুজাহিদেরা ব্যাপক নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড ও সামরিক

www.pathagar.com

তৎপরতা অব্যাহত রাখে। ফলে এটা বলা সঠিক যে, সোভিয়েত নিরাপত্তা আগের চেয়ে কিছুতেই অধিকতর সুনিশ্চিত হয় নি।

উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রেক্ষাপটে এটা সম্ভবত বলা সঙ্গত যে, পরাশক্তিদ্বয়ের উচিত হবে ক্ষুদ্ররাষ্ট্রসমূহের উলঙ্গ অভিযান, মার্জিনীকরণ ও পুলিশি ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে বিরত থাকা, আর এই হস্তক্ষেপজনিত প্রক্রিয়ায় তাদের নিজস্ব শক্তি-চেতনা ও বিশ্বাসযোগ্যতার বিষয় পরিহার করা।[৮৩] কেননা ক্ষুদ্রদেশসমূহের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাদের হস্তক্ষেপ ও মার্জিনীকরণের ফলে শুধু সে সব ভাগ্যাহত ক্ষুদ্রদেশগুলো নয় বিশ্ব সম্প্রদায়কেও অনেক ব্যয়বহুল ও মর্মান্তিক অভিজ্ঞতায় নিমগ্ন হতে হয়। বস্তুত, ইন্দোচীন ও মধ্য আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্র এবং আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার আলোকে এটাও বলা যেতে পারে যে, পরাশক্তিদ্বয়ের পক্ষে সমীচীন হবে তাদের নিজদের অবস্থান যথাযথ পর্যালোচনা করা যাতে একটি ক্ষুদ্রদেশের আন্তঃকলহে আর তাদের নিজস্ব সামরিক শক্তি প্রবর্তন করে একে অপ্রতিসম দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত করতে না হয়। একই সঙ্গে পরস্পরের সমঝোতা ও সহযোগিতার ইতিবাচক দিকটা সম্পর্কেও তাদের ভাবা উচিত হবে যাতে ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের কলহে বিশ্বসংগঠনসমূহের যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার রূপরেখায় যথাবিহিত কর্মপন্থা গ্রহণ করা যায়। এতে পরাশক্তিদ্বয়কে নিজস্ব জাতীয় অহমিকাবোধ বা মুখরক্ষার ব্যাপার, বিশ্বব্যাপী তাদের সম্মান বা জড়িয়ে পড়ে স্বীয় দেশে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াজনিত উদ্ভূত জটিলতার মতো বিষয়াদি সৃষ্টি পরিহার করা সম্ভব হবে।

পরাশক্তি ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের মধ্যে অপ্রতিসম দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের পরিণতি

এ প্রবন্ধ লেখা হয় ১৯৮৯ সনের জুনে। এর পর থেকে সার্বিকভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। পরিবর্তন দেখা দেয় পরাশক্তি-ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের গুণগত সম্পর্কেও। এ সময়ের সবচেয়ে উল্লেখ্যযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হচ্ছে বিশ্বের দ্বিতীয় পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয়কর ভাঙ্গন ও বিলোপ এবং স্নায়ুযুদ্ধের অবসান। প্রায় চার দশকেরও অধিক সময় কালব্যাপী সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বব্যাপী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শক্তিদ্বন্দ্ব ও আদর্শিক লড়াইয়ে প্রবৃত্ত ছিল। এ কর্তৃত্বের লড়াই প্রথম ও প্রধানত কেন্দ্রীভূত ছিল ইউরোপে, পরে তা বিস্তার লাভ করে তৃতীয় বিশ্বে, বিভিন্ন মহাদেশ, অঞ্চল ও সব ধরনের দেশে। কর্তৃত্ব লাভের অন্বেষায়, তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রসারের উদ্দেশ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার জাতীয় আয়ের এক সুবিশাল অংশ ব্যয় করে আণবিক-পারমাণবিক অস্ত্রসামগ্রীসহ

www.pathagar.com

বিভিন্নতর মারণাস্ত্রের উদ্ভাবন ও উন্নয়নে। একই সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন নেতৃত্বাধীন পুঁজিবাদী জগতের সঙ্গে বিশ্বব্যাপী কৌশলগত দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। এমন কি ক্রেমলিন নেতৃত্ব চীনের সঙ্গে কম্যুনিস্ট জগতের অন্তর্দ্বন্দ্বেও জড়িয়ে পড়ে। ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন লাতিন আমেরিকার কিউবা, এল সালভেডর ও নিকারাগুয়া থেকে আফ্রিকার কঙ্গো, এঙ্গোলা, সোমালিয়াসহ আরো অনেক দেশে এবং এশিয়ার কম্বোডিয়ার ও আফগাসিস্তানে ব্যাপক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হয়। কম্বোডিয়ার সোভিয়েত সম্পৃক্ততা ছিল পরোক্ষ যদিও মস্কো এক পর্যায়ে কম্বোডীয় দ্বন্দ্বে ভিয়েতনামের হস্তক্ষেপে ইন্ধন ও সাহায্য যোগাতে গিয়ে দৈনিক ৬ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত ব্যয় করে, কিন্তু আফগানিস্তানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপ ছিল প্রত্যক্ষ ও ব্যাপকতর যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়। এর ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী।

বস্তুত, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয়কর ভাঙ্গন ও বিলোপের জন্য কোনো একটি কারণ চিহ্নিত করা যায় বা এককভাবে বেশি দায়ী করতে হয় তাহলে আফগানিস্তানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপে বিষয় উল্লেখ করা চলে। প্রায় এক দশকব্যাপী এ হস্তক্ষেপের ফলে আফগানিস্তানের মতো একটি ক্ষুদ্ররাষ্ট্র ক্ষত-বিক্ষত হয়–যে দ্বন্দ্বের প্রক্রিয়া প্রকৃত অর্থে সেই হতভাগ্য দেশকে এখনো ক্ষত-বিক্ষত করে চলেছে, কিন্তু তার পার্শ্ববর্তী সেই দেশে দীর্ঘকালীন সোভিয়েত হস্তক্ষেপ খোদ সোভিয়েত জনগণের মধ্যে মস্কোর হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্য, প্রক্রিয়া এবং নিরর্থক বিপুল ব্যয়নির্বাহ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে। অথচ সুবিশাল সোভিয়েত সাম্রাজ্যের বিভিন্ন রাজ্যে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে হতাশা, নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি ও ভয়ানক দারিদ্র্যের অবস্থা বিরাজ করে। প্রতিবেশী আফগানিস্তানের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে খোদ সোভিয়েত সৈন্যরা তাদের নিজেদের সত্তা ও অবস্থান সম্পর্কে হতবুদ্ধি হয়। এ যুদ্ধে সোভিয়েত তাবেদার সরকার শুধু ক্ষমতাচ্যুত হয় নি, ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো হেরে যায় খোদ সোভিয়েত ইউনিয়ন। বস্তুত আফগানিস্তানে সোভিয়েত-বিরোধী মুজাহিদদের হারাতে গিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেতর থেকে ভেঙ্গে পড়ে। অপ্রতিসম যুদ্ধদ্বন্দ্ব শুধু ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর নয়, অপ্রতিসম শক্তির জন্যও বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

পরাশক্তি ও ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের সম্পর্কে সাম্প্রতিক গুণগত পরিবর্তন

স্নায়ুযুদ্ধ উত্তরকালে পরাশক্তির অবস্থান ও পরাশক্তি-ক্ষুদ্ররাষ্ট্র সম্পর্কে ব্যাপক গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে। এ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় প্রথমত আন্তর্জাতিক সিস্টেমের রূপান্তরে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয় ও ভাঙ্গনের অর্থ হচ্ছে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে তার কৌশলগত অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়া, এমন কি

www.pathagar.com

রাজনৈতিক ইচ্ছাবৃত্তি বিলীন হওয়া। এটা সত্য যে, ভেঙ্গে যাওয়া সত্ত্বেও রুশ ফেডারেশন এখনো একটি বিশাল রাষ্ট্র এবং মস্কোর আণবিক-পারমাণবিক ভাণ্ডারেও বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র জমা আছে। কিন্তু এসব নিয়ে শক্তিদ্বন্দ্বে লিপ্ত হবার অবস্থা ক্রেমলিনে আদৌ রয়েছে বলে মনে হয় না।

এছাড়া বর্তমানে বহুদলীয় রাজনীতি ও বাজার অর্থনীতিতে দীক্ষালাভের পর মস্কোর নেতৃত্বের এখন আর আদর্শিক স্পৃহা থাকারও কোনো কারণ নেই। তাই আন্তর্জাতিক সিস্টেম রূপান্তরিত হয়েছে 'একমেরুকেন্দ্রিক' ব্যবস্থায়— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই বর্তমানে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে একক কর্তৃত্বের অধিকারী, এরূপ বলা হয়ে থাকে। পরাশক্তি ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের প্রতিটি সম্পর্কের ক্ষেত্রে হয়তো এ ধরনের বক্তব্যের তত্ত্বীয় ভিত্তি দাঁড় করানো কঠিন হবে, কিন্তু সার্বিকভাবে কৌশলগত শক্তির দিক থেকে অথবা রাজনৈতিক ইচ্ছাবৃত্তি বা বিলাসের দৃষ্টিকোণ্ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ব প্রতিযোগী বলতে সম্ভবত এখন আর কোনো শক্তি নেই। তবু বিশ্বসম্পর্কের ক্ষেত্রে সমস্যা ও সংকটের সমাধানে যুক্তরাষ্ট্র এককভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না বা কোনো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে পারে না। বিশ্ব শান্তি ও স্থিতিশীলতার স্বার্থে সেই ধরনের একক অপ্রতিসম মার্কিন ভূমিকা কাম্যও নয়। ওয়াশিংটনও এ সম্পর্কে অবহিত। আর সেই কারণে পরাশক্তি ও ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্নায়ুযুদ্ধ উত্তরকালে অধিকতর বাস্তবধর্মী ভূমিকা রেখে আসছে।

১৯৯১ সনের পারস্য উপসাগরীয় যুদ্ধের প্রসঙ্গেই আসা যাক। এ যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখলকে কেন্দ্র করে। সমস্যা মূলত এক্ষেত্রে শুরু হয় একটি আঞ্চলিক বৃহৎ শক্তি কর্তৃক একটি ক্ষুদ্ররাষ্ট্র গ্রাস করার কারণে। পরাশক্তির ভূমিকা ছিল পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা, অর্থাৎ রাষ্ট্র হিসেবে কুয়েত-এর স্বাধীন অবস্থান ছিল আন্তর্জাতিক আইন, নীতি-নৈতিকতা ও বিশ্বজনমত প্রভৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

স্বাভাবিকভাবেই ইরাকি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মার্কিন উদ্যোগ, বিশেষ করে জাতিসংঘের সমর্থন ও আন্তর্জাতিক কোয়ালিশন গঠন স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন লাভ করে।

একইভাবে বসনিয়া-হারজেগভিনিয়ায় মুসলিম নিধনের বিরুদ্ধে মার্কিন উদ্যোগে বহুজাতিক বাহিনী গঠনের প্রক্রিয়া ও ডেটন শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও বিশ্ব জনমতের সমর্থন লাভ করে। এমন কি মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়া বাস্তবায়নেও মার্কিন নেতৃত্ব প্রায়শ প্রশংসার দাবি রাখে, যদিও শেষোক্ত এ প্রয়াস ক্ষেত্রবিশেষে সমালোচনার সম্মুখীনও হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

পরিশেষে, এ প্রবন্ধের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে কিছু বলা সমীচীন। বর্তমান প্রবন্ধে প্রধানত ভিয়েতনামের বিষয় আলোচিত হয়। এ জাতীয় গবেষণালব্ধ জ্ঞান রাষ্ট্রনায়ক ও শান্তিবিধান কর্তাদের ওপর অধিকতর শিক্ষাপ্রদ ও প্রজ্ঞাসুলভ প্রভাব রাখতে হলে বা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে জাতীয় নীতি নির্ধারণে আরো সুস্পষ্ট ছাপ ফেলতে হলে অন্যান্য আন্তর্জাতিক দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সময়ে পরাশক্তিদ্বয়ের আচরণ সম্পর্কে আরো ব্যাপক সমীক্ষা চালাতে হবে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে বহুকৃষ্টির সংযোগ ও আন্তর্জাতিক আন্তক্রিয়া সম্পর্কিত জ্ঞানগর্ভ তত্ত্বীয় জ্ঞানের সমাবেশ ঘটাতে হবে। এমন কি ভিয়েতনাম সম্পর্কে আরো ব্যাপক ও গভীরতর সমীক্ষা সম্ভব। ভিয়েতনামে আন্তঃজাতীয় শান্তি সমস্যাসহ এ জাতীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে গবেষণার বিষয়বস্তু ও পরিধি আরো বিস্তৃত রূপ দেয়া যেতে পারে যাতে সেই দেশে যুদ্ধ ও শান্তির ব্যাপারে অধিকতর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা যায়। একই সঙ্গে ইন্দোচীনে, বিশেষ করে কম্বোডিয়াকে ঘিরে আন্তঃরাষ্ট্রিক যুদ্ধ ও শান্তি সমস্যা সম্পর্কেও সুচিন্তিত রূপরেখার ভিত্তিতে পুঞ্জিভূত জ্ঞানার্জন সম্ভব।

তথ্যনির্দেশ

১. 'উল্লম্ব অভিযান' প্রত্যয় ব্যবহার করা হয়েছে ইংরেজি vertical -এর পরিবর্তে। একটি অতুলনীয় পদমর্যাদা ও ধন-সম্পদশালী বহিঃশক্তি কর্তৃক একটি অতুলনীয় পদমর্যাদা ও ধন-হস্তক্ষেপ করার ব্যাপারটাকে উল্লম্ব অভিযান রূপে অভিহিত করা হয়েছে। পরের টীকাও দ্রষ্টব্য।

২. অপ্রতিসম দ্বন্দ্বের (asymmetric conflict) তত্ত্বীয় প্রেক্ষাপট উপস্থাপিত করেন গালটুং স্বয়ং। তিনি একে প্রতিসম দ্বন্দ্ব (symmetric conflict) থেকে ভিন্নরূপে দেখেন। গালটুং অপ্রতিসম দ্বন্দ্বকে চিহ্নিত করেন তাঁর আরেক তত্ত্বীয় ধারণা 'কাঠামোগত সহিংসতা' ('structural violence')- এর সঙ্গে! দ্রঃ Johan Galung, Peace Research, Education, Action : Essays in Peace Research,vol. 1 (Copenhagen, Christian Ejlers Forlag,1975) পৃ. ৭৯ - ৮০; একই লেখকের ("Violence, Peace and Peace Research"Journal of Peace Research, No. 3 (1969), ১৬৬ - ১৯২, মূল প্রবন্ধও দ্রষ্টব্য। আরো বিশদ ব্যাখ্যার জন্য বর্তমান গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য

৩. (Dieter Senghaas,"Conflict formations in contemporary International Society", Journal of Peace Research, No. 3 (1973) পৃ. ১৬৩-১৮৪ (Juergen Dedring, Recent Advances in Research"Journal of Peace Research (London : Sage Publications, 1976) পৃ. ২২, ৪৩-৪৪

www.pathagar.com

৪. দ্রঃ Ruri Ra'anan,"Soviet Strategic Doctrine and the Soviet-American Global Contest", The Annals of the American Academy of Political Science (September 1981), পৃ. ৮

৫. Johan Galtung, Peace Research, প্রাগুক্ত, vol. I, পৃ. ২৩৫ - ৪৭; একই লেখকের Towards a Definition of Peace Research". repertory of Institutes Specializing in Research on Peace and Disarmanent (Paris : UNESCO, 1966) No. 23 পৃ. ৭ ; তাঁর "Peace Research", in The Social Science : Problems and Orientations (Paris : MOUNTON/UNESCO,1968, পৃ. ১৩

৬. ১৯৬০-এর দশক থেকে কয়েকজন বিশ্লেষক 'প্রধান' ("dominant) ও 'অধীন' ("subordinate") এ দু'টি প্রত্যয় ব্যবহার করে আসচেন সিস্টেম/কাঠামো প্রেক্ষাপটে যথাক্রমে বিশ্ব পর্যায়ে পরাশক্তিদ্বয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে ক্ষুদ্ররাষ্ট্রসমূহের সম্পর্কের ধারা নিরূপণে। দ্রঃ Leonard Binder, The Ideological Revolution in the Middle East (New York : John Wiley and Sons, 1964), অধ্যায়-৯; একই লেখকের "Transformation in the Middle East Subordinate System After 1967", in Michael Confino and Shimon Shamir (eds.) The U.S.S.R. and the Middle East (Jerusalem : Israel University Press, 1973); Michael Brecher."The Subordinate System of Southern Asia", World Politics, 15 (January 1963); তাঁর "The Middle East Subordinate System and Its Impact on Israel's Foreign Policy', International Studies Quarterly, ১৩ঃ২ (June 1969).

৭. Galtung, Peace Research, vol. I, পৃ. ৭৯ - ৮০

৮. ঐ, পৃ. ৮০

৯. জাতীয় রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক সমাজের আন্তক্রিয়া বহু ধরনের আন্তক্রিয়া চলে। এসব চলাকালে একটি কাঠামোভিত্তিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ দেখা দেয়, প্রতিষ্ঠিত হয় এমন একটি আন্তর্জাতিক উল্লম্ব যোগসূত্রভিত্তিক বন্ধন এই সমাজের কেন্দ্র (centre) ও প্রান্তের (Periphery) মধ্যে যেটার প্রথমটি দ্বিতীয়টিকে সৃষ্টি করে, যোগায় সব সাহায্য ও সমর্থন এবং পারস্পরিক সম্পর্কের নিয়মাবলীও নিরূপণ করে। দ্রঃ Galtung, Peace Research, vol. I, পৃ. ৭৯-৪০; একই লেখকের, "A Structural Theory of Aggression', Journal of Peace Research, 1 (১৯৬৪), পৃ. ৯৫ - ১১

১০. Galtung, Peace Research, vol. I, পৃ. ২৬৪ - ২৭৬

১১. বিশদ ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, Abul Kalam,"The Indochinese Triangle" : Diplomacy between Hanoi, Beijing and Moscow", Journal of the Asiatic Society of Bangladesh, XXXVIII : (June 1983), পৃ. ৩০ - ৫৩

www.pathagar.com

১২. F.M. Kail, *What Washington Said: Administration Rhetoric and the Vietnam War, 1949-1969* (New York and London: Harper and Row Publishers, 1973), পৃ. ৬ - ৭

১৩. Bernard B. Fall, The Two Vietnams: A Military and Political *Analysis. Second Edition* (New York: Praeger, 1976), পৃ. ১৫৩-৫৪

১৪. Philippe Devillers and Jean Lacouture, *End of War, Indochina, 1954* (New York: Praeger, 1969), পৃ. ৭১ - ৭২

১৫. Fall, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২ - ২৪.

১৬. ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের প্রতি মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির প্রেক্ষাপটে মার্জিনের আবর্তে আনা বা মার্জিনীকরণ ("marginalization") প্রত্যয় ব্যবহার করা হয়। এর মাধ্যমে বুঝানো হয় যে, যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামকে মার্কিন বিশ্বগ্রাসী রণনীতিপ্রসূত রূপরেখার অধীনে টেনে আনতে সক্রিয় হয়

১৭. Noan Chomsky, *American Power and New Mandarins* (London : Pantheon, 1971), পৃ. ১৭৮। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইন্দোচীনে বিজড়িত হবার পিছনে ওয়াশিংটন কিছু কিছু পূর্ব ধারণা বা চেতনাগত অনুভূতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। বিশদ ব্যাখ্যার জন্য দেখুন , Abul Kalam, "Perception and Peacemaking: The Case of American Intervention in Indochina, ১৯৫৪-১৯৭৫", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, XXVII: (2 December, 1982), পৃ. ১৬৬- ১৯৩।

১৮. Hans J. Morgenthau, "The Political and Military Strategy of the United States" *Bulletin of the Atomic Scientists*, 10:8 (October 1954), পৃ. ২৩২-৩২৭

১৯. Rohbert F. Randle, Geneve 1954: *The Settlement of the Indochinese War* (Princeton: Princeton University Press, 1969), পৃ. ৩৬ - ৩৭, ৭১

২০. দ্রঃ SEATO Communique', in Marvin E. Gettleman (ed). *Vietnam: History. Documents and Opinions on a Major World Crisis* (London and New York : Fawcett World Livrary, 1967), পৃ. ৯৯-১০২.

২১. Victor Bator, *Vietnam: A Diplomatic Tragedy* (London: Faber and Faber 1965), পৃ. ১৫৬-৫৭.

২২. NSC Policy Statement of January 1954, *United States-Vietnam Relations, 1945-1967, U.S. Department of Defense* (Washington, D.C., S. Geneal Printing Office, 1971) Book 9, পৃ. ২৩০.

২৩. *The New York Times* (18 November 1954), cit. in Marvin Leonard Kalb and Elie Abel. *The Roots of Involvement: The US in Asia, 1784-1971* (New Your: Praeger, 1971) (New York: Praeger, 1971), পৃ. ৯৭.

www.pathagar.com

২৪. Bernard B. Fall, "Indochina Since Genevea", *Pacific Affairs*, 28 (1955), পৃ. ২৯

২৫. ভিয়েতনামে এ সময়কার মার্কিন প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত নির্দেশনা মিশন এবং মার্কিন সামরিক সাহায্য ও উপদেষ্টা দল ছাড়া আরো দুটি দল সৃষ্টি করে - এ দুটোর প্রথমটি ছিল যুদ্ধের অস্ত্র প্রশিক্ষণ সংগঠন (Combat Arms Training Organiziation (CATO) এবং দ্বিতয়টি সাময়িক উপকরণ পুনরুদ্ধার মিশন (Temporary Equipment Recovery Mission (TERM), দ্রঃ Fall, *The Two Vietnams*, পৃ. ৩১৮-১৯.

২৬. *The Pentagon Papers, The Defense Department History of United States Decisionmaking on Vietnam*. The Senater Gravel Eition, vol. (Boston: Bcacon Press, 1971), পৃ. ২৪৯ - ৫০; ঐ, vol. II, পৃ. ৪৩৫-৩৮.

২৭. ঐ, Vol. II, পৃ. ৪৩২.

২৮. Fall "Indochina Since Geneve" প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-১০.

২৯. ঐ, পৃ. ২৩ ; Dennis J. Duncanson, *Government and Revolution in Vietnam* (London : Oxford University Press, ১৯৬৭) পৃ. ২১০.

৩০. Report of Senator Mike Mansfield, *Vietnam and Southeast Asia* (WAshington, D.C.: U.S general Printing Office, ১৯৬৩), পৃ. ৩.

৩১. Frances Fitzgerald, Five in the Lake, the Vietamese and the Americans in Vietnam. (New York: Little, Brown, 1972), পৃ. ৪২৩.

৩২. বৃটেনে ১৯৫৪তে জেনিভা সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া সিয়াটো'র সদস্য দেশ এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার স্থিতিবিধানেও বৃটেনে আগ্রহ ছিল। তাই জেনিভা উত্তরকালে ইন্দোচীনকে নিয়ে ফরাসি-মার্কিন আলোচনা থেকে বৃটেনকে বাদ দেয়ায় লন্ডন ক্ষুণ্ন হয়। বৃটেনকে জড়িত করতে ফরাসিদের প্রচেষ্টাতে যুক্তরাষ্ট্র বাধা দেয়। Bator, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭.

৩৩. Fall, *The two Vietnams*; পৃ. ৩৯১ - ৯৫.

৩৪. Chester L. Cooper, *The Lost Crusade: America in Vietnam* (New Youk: Dodd, Mead, 1970), পৃ. ১৪৬- ৪৭.

৩৫. Bator, প্রাগুক্ত, ১৫৯.

৩৬. "Alliance and Deterrence", *Department of State Bulletin* (27 পৃ. ৪৩২, September 1954)

৩৭. "Pacific Air Force" *Air Force* (May 1973), পৃ. ৮৩.

৩৮. Samuel P. Huntington, *The Common Defense* (New York: 1961), পৃ. ৬৫

৩৯. *The Pentagon Papers*, Gravel Edn, Vol. II, পৃ. ৪৩৪.

www.pathagar.com

৪০. Marian D. Irish and Ikle Frank. *U.S Foreign Policy* (New York: Harcourt Jovanovich Inc., 1975), পৃ. ৪৬৫.

৪১. (Document 98), " A Program of Action for South Vietnam, 8 May 1961, *The Pentagon Papers*. Gravel Edn, II: ৬৩৮; *The United States Air Force in Southeast Asia, 1961-1973*. Carl Berger (ed), Office of Air Force History (Washington. D.C.: General Printing Offices, 1977), পৃ. ১১.

৪২. *The Pentagon Papers*, Gravel Edn II: ২৩-২৫.

৪৩. ঐ, পৃ. ১১৪-১৮, ১৭৬ - ৭৯। General William C, Westmoreland, *A Soldier Reports*, (Gardem City, N.Y: Doubleday and Co. Inc., 1976), পৃ. ১০৪.

৪৪. Duncanson, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮ - ৩০৯.

৪৫. বিশদ ব্যাখ্যার জন্য দ্রঃ *Command History 1970*. Vol. II (Washington, D.C.: General Printing Offices. 1971), পৃ. XIV - 6, also *Congressional Record*. House, (12 June 1969), পৃ. ৭৭৫.

৪৬. *The Pentagon Paper*১, Gravel Edn. III: ১৪৯-৫০.

৪৭. U.S. Congress, Senate Committee on Foreign Relations, *Background Information Relating to Southest Asia and Vietnam*. Revised Edn. (Washington, D.C.: U.S. General Printing Office, 1974), পৃ. ১০৬- ১০৭.

৪৮. ঐ, পৃ. ৫.

৪৯. ঐ, পৃ. ৬ ; *The Pentagon Papers*, 1, পৃ. ৬২৯.

৫০. *Background Information*, পৃ. ১১৫-১১৬.

৫১. ঐ, পৃ. ১১৭.

৫২. ঐ, পৃ. ১৩৩-৩৪.

৫৩. Gareth Porter, *A Peace Denied: The United States, Vietnam and the Paris Agreement* (Bloomington and London: Indiana University Press 1975), পৃ. ৩৫.

৫৪. বিশদ আলোচনার জন্য দ্রঃ George Chafard, *Les Deux guerres du Vietnam* Paris: Calmann - Levy, ১৯৬৯) পৃ. ৩০৭ - ৩০৮.

৫৫. Fitzerald, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৬৪.

৫৬. The Pentagon Papers, II: 459; Westmoreland, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২.

৫৭. বিশদ ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, Abul Kalam, *Peacemaking in Indochina 1954 - 1975,* Dhaka: Dhaka University Press, 1983), পৃ. ৩৭২-৭৩.

www.pathagar.com

৫৮. Gustav Hagglund, "United States NATO Strategy", *Military Review*, 44, 1 January 1974), পৃ. ৩৯-৪০.

৫৯. Lt. Gen. Stanley Robert Harsen and Brig. Ger. James Lawton Collins. Jr., *Vietnam Studies: Alied Participation in Vietnam* (Washington : U.S. Department of the Army, 1975), No. 13.

৬০. *Background Information*, পৃ. ১৭৭ - ১৮১: ২০৩ - ২০৪, ৩২৪ - ৩২৮: ৩৪৯- ৫০.

৬১. "Testimony by Kissinger before the Select Committeee on Foreign Relations, June 7, 1974" in Gareth Porter (ed.), *Vietnam: The Definitive Documentatin of Human Decision* (London, Philadelphia and Rhine : Heyduy and Son Ltd., 1979, II: ৬৫২-৫৩.

৬২. Tad Szulc. *The Illusion of Peace : Foreign Policy in the Nixon Years* (New York : Viling Pres. 1978), পৃ. ৬৩৭.

৬৩. Richard M. Nixon, The Memoirs of Richard Nixon (London : Sidgwick and Jackson, 1978), পৃ. ৭১৮ - ৫০.

৬৪. ঐ, পৃ. ৭৮৯ - ৫০.

৬৫. ঐ, পৃ. ৭৩৭.

৬৬. ঐ, পৃ. ৭১৮ - ৭৫০ ; Leon Howell, "Vietnam: Is the End in Sight?" *Christianity and Crisis*, 35: (1975) পৃ. ৪৪.

৬৭. উল্লেখিত, Allam E. Goodman, *The Loas Peace*, পৃ. ৫২.

৬৮. Frank Snepp. *Decent Interval* (New York: Random House, 1977), পৃ. ৫২.

৬৯. Henry A. Kissinger, *The White House Years* (Boston : Little, Brown and Co., 1979), পৃ. ১৪৭০.

৭০. Snepp, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১-৮৪; Szulc, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৭ - ৪০; ; Porter, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬-৮৭; D. Aftergut, and D. Roose, "Civilianizing the War", *American Report* (12 March 1973); "U.S. Violations of the Accord" *Vietnam International Bulletin* (April -May 1973), পৃ. ২ - ৯; Last Flight From Saigon (ed.) Lt. Col A.J.C. Lavalle. *USAF Southest Asia Monograph Series*, Vol. IV, Nol. 6 (Washington, D. C. : U.S. General Printing Office, 1977), পৃ. ৪ - ৫.

৭১. দ্রঃ U.S. Senate, Comittee on Annual Services, *Hearings: Fiscal Year 1975 Authorization for Military Procurement.* Part 4 (Washington, D.C.: U.S. General Printing Offi9ce, 1976), পৃ. ১৮৯ - ৯২.

www.pathagar.com

৭২. Kissinger, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭০.

৭৩. Leon Howell, " Vietnam : Is the End In Slight?" *Christianity and Science* (১৯৭৫), পৃ. ৪৪. সাইগনের সাহায্যে সূত্রের বহুজাতিক রূপ দেয়ার মার্কিন প্রচেষ্টার বিবরণের জন্য দেখুন, Gabriel Kolko, "The United States Efort to Moblize World Bank Aid To Saigon," *Journal of Contempory Asia*, 4 : 1 (1974).

৭৪. তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কাঠামোগত সহিংসতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে একটি অতি শক্তিশালী রাষ্ট্রের আরেকটি ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের ওপর আক্রমণের ফলে, যখন আগ্রাসী শক্তি প্রত্যক্ষ সহিংসতার মাধ্যমে দ্বন্দ্বে বিজড়িত হয়ে শক্তির দাপটে নিজকে পৃষ্ঠপোষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। গালটুং মনে করেন যে, অপ্রতিসম দ্বন্দ্ব উদ্ভব হলে এরূপ এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যার ফলে শান্তি প্রক্রিয়ায় একটি পক্ষপাতদুষ্ট প্রভাবের সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে "অসম প্রতিপক্ষসমূহের মধ্যে সংঘটিত হিমায়িত সহিংসতার মোকাবেলা করা কঠিন হয়ে পড়ে।" দ্রঃ Johan Galtung, *Peace Research*, Vol. 1 পৃ. ৮০ - ৮১.

৭৫. গালটুং-এর যুক্তিমতে, অপ্রতিসম দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত উলঙ্গ হামলাকারী শক্তি কাঠামোর বিরুদ্ধে শান্তিবিধান কর্তাকে পক্ষপাতিত্বমূলক ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে। কেননা, এক্ষেত্রে "সহিংসতার যে - কোন যুক্তিসংগত সংজ্ঞা গ্রহণ করা হলে এরূপ একটি দ্বান্দ্বিক ব্যবস্থায় শান্তিবিধানকর্তাকে দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হতে হবে ঐ পক্ষের বিরুদ্ধে যে-পক্ষ কাঠামোগত সহিংসতা সঞ্চার করে, যথাযথ ও গভীরভাবে তাকে দেখতে হবে প্রত্যক্ষ সহিংসতার হুমকি কোথায় নিহিত।" স্বাভাবিকভাবেই, এ জাতীয় দ্বন্দ্বে শান্তি বিধানকর্তার ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা সীমিত হতে বাধ্য। দ্রঃ তাঁর *Peace Research* 1, পৃ. - ২৪৭-২৫৫.

৭৬. আরো বিশদ ব্যাখ্যার জন্য দেখুন Kalam "Perception and Peacemaking" ..... প্রাগুক্ত.

৭৭. উপর্যুক্ত যুক্তিকতার গভীরতর দিক সম্পর্কে অনুধাবন করতে হলে দেখুন, Kalam *Peacemaking Indochina*, অধ্যায় ৪ - ৫.

৭৮. Edward Girardet, "The Soviets Declare Afghanistan a free-fire zone: Migratory Genocide", *The New Republic* (4 March ১৯৯৫). পৃ. ১৩ - ১৪.

৭৯. ঐ.

৮০. George. D. Mofett, "Perspectives on Central America", *The Christian Science Monitor* (30 January 1984); Arturo J. Cruz, "Nicaragua: The Sandanista Regime at A Watershed", *Strategic Review* (Spring ১৯৮৪), পৃ. ১১ - ২৩। সালভাডরীর প্রতিরোধ যুদ্ধ সম্পর্কে ব্যাখ্যা - বিশ্লেষণের জন্য দেখুন, Robert Leiken, "Anatomy of Resistance", *World View* (June ১৯৮৩), পৃ. ৫ - ৯.

৮১. Joseph. S.N.ye, Jr., "Can America Manage its Soviet Policy?" In Joseph S. Nye, Jr. (ed)., *The Making of America's Soviet Policy* (New Haven and London : Yale University Press, ১৯৮৪), পৃ. ৩৩৬.

www.pathagar.com

৮২. A.A. Gromyko and B.N. Ponomarev (eds.), *Soviet Foreign Policy* 1917 - 1980. Fourth Edition. (Moscow: Progress Publishers, 1981), পৃ. ৬১২-৬১৬. মার্কিন বক্তব্যের জন্য, "Afghanistan; Five Years of Occupation", United States Department of State, Bureau of Public Affairs (Washington, D.C.: December 1984), *Special Report*. No. 120 পৃ. ১ - ৮.

৮৩. অনেকটা একইরূপ বক্তব্যের জন্য দেখুন, Arthur M. Cox. "Wat does UN Peacekeeping Mean?" *The Saturday Review* (14 May 1966), পৃ. ১৯ - ২১.

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরাশক্তি সম্পর্ক, নিবারণ তত্ত্ব ও যুদ্ধ সম্প্রসারণ

ভূমিকা

সমকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতি হচ্ছে আন্তক্রিয়াভিত্তিক। এতে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি রাষ্ট্রের গৃহীত প্রতিটি ক্রিয়া বা পদক্ষেপের প্রত্যুত্তর বা প্রতিক্রিয়া আসে প্রভাবান্বিত আরেকটি রাষ্ট্র থেকে। রাজনৈতিক আন্তক্রিয়ার এই ধারায় দু'টো তত্ত্বীয় শব্দের ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতির অন্তর্নিহিত আচরণ বা মর্মকথার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে। এর একটি হচ্ছে 'নিবারণ' ('deterrence') এবং আরেকটি 'সম্প্রসারণ' ('escalation')। সম্প্রসারণ বলতে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এমন এক আন্তক্রিয়াজনিত প্রক্রিয়াকে বুঝানো হয় যাতে যে কোনো রাষ্ট্রের একটি মৌলিক বা প্রকৃত ক্রিয়াকর্ম সৃষ্টি করে আরেকটি রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া এবং তারও পরে সৃষ্টি হয় পাল্টা প্রতিক্রিয়া। এভাবে একটি দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের উত্তরোত্তর ক্রমঅবনতি ঘটতে থাকে।

দ্বান্দ্বিক প্রতিক্রিয়ায় বিজড়িত প্রতিপক্ষ এভাবে একে অপরকে গৃহীত পদক্ষেপের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী কর্মপন্থা গ্রহণে প্ররোচিত করে এবং দু'পক্ষই জড়িয়ে পড়ে সম্প্রসারিত যুদ্ধের অশুভ পাঁয়তারায়।[১] অন্যদিকে, নিবারণ তত্ত্ব অনুসৃত পদক্ষেপের মাধ্যমে সম্ভাব্য শত্রুকে এরূপ বুঝানোর প্রচেষ্টা চালানো হয় যে প্রতিপক্ষ তার পরিকল্পিত সামরিক কর্মপন্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে লাভবান হবার চাইতে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্তই হবে।[২] তার মানে, নিবারণ তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, যে কোনো দ্বন্দ্বের সম্ভাব্য সম্প্রসারণ এড়িয়ে যাওয়া অথবা যে কোনো ভীতিপ্রদ পরিস্থিতিকে সীমিত করা।

উল্লেখ্য, যুদ্ধ ও দ্বন্দ্ব নিরসনকল্পে নিয়োজিত শান্তি গবেষকরা পরাশক্তিদ্বয় কর্তৃক সাম্প্রতিককালে গৃহীত নিবারক রণনীতির প্রতি সমালোচনাসূচক বক্তব্য রেখে আসছেন। কেননা, পারমাণবিক রাজনীতি প্রসূত রণনীতি ও নিবারক তত্ত্বভিত্তিক যৌক্তিকতার পরাশক্তিদ্বয়ের জাতীয় বাজেটের সিংহভাগের শুধু অপচয় ঘটায় না, এতে তাদের কদাচিৎ বাস্তব নিরাপত্তা লাভ হয়, অথচ এ জাতীয় রণনৈতিক চিন্তাধারার বিশ্বব্যাপী ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ বেধেঁ যাবার ঝুঁকি অত্যন্ত প্রকট।[৩] পরাশক্তিদ্বয়ের অস্ত্র সংবরণ সম্পর্কিত আলোচনা ব্যর্থ

www.pathagar.com

হবার মূলে নিহিত রয়েছে নিবারক তত্ত্বজনিত কৌশলমূলক অস্ত্রলাভের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা।[৪] উপরন্তু, নিবারক তত্ত্ব প্রয়োগের মাধ্যমে স্থায়ী শান্তি অর্জনের পরিকল্পনা একেবারে অবাস্তব, কল্পলোকের ব্যাপার বলে মনে হয়।[৫] এ প্রবন্ধের অনেকটা একইরূপ অভিমত পোষণ করা হয়েছে। ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন হস্তক্ষেপের অন্তর্নিহিত ধারা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রবন্ধ এরূপ বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে যে, একটি অপ্রতিসম দ্বন্দ্বের।[৬] প্রেক্ষাপটে নিবারক তত্ত্ব বিরচিত ও বাস্তবায়িত হলে এতে কথিত দ্বন্দ্ব এড়িয়ে যাওয়া বা সীমিত করা তো সম্ভব নয়ই, বরং এতে এরূপ দ্বন্দ্ব অধিকতর সম্প্রসারিত রূপ পরিগ্রহ করবে। প্রবন্ধে উপস্থাপিত এরূপ বক্তব্য বুঝা সহজতর হবে যদি নিবারক তত্ত্বের বিষয়টি যথাযথ প্রেক্ষাপটে আলোচনা করা হয়; বিশেষত এ প্রসঙ্গে জানা প্রয়োজন যে কি ধরনের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভিয়েতনামে নিবারণ তত্ত্ব বিরচিত ও প্রয়োগ হয়?

নিবারণ তত্ত্ব

বিষয়টি ভালোরূপে বুঝতে হলে নিবারণ তত্ত্ব আরো বিশাদভাবে বুঝা দরকার। সাধারণত প্রায় সব বিপদসংকুল বা দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতিতে নিবারণ তত্ত্বজনিত প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়ায়। একটি দ্বন্দ্বে বিজড়িত এক পক্ষ যখন আরেক পক্ষকে কোনো একটি পদক্ষেপ গ্রহণ না করতে প্ররোচিত করে তখন বাস্তবে প্রতিপক্ষকে 'নিবৃত্ত' বা 'বারণ' ('deter') করা হয়। সত্যিকার অর্থে, প্রতিটি দ্বন্দ্বেই উভয় পক্ষ একে অপরকে বাঞ্ছিত পদক্ষেপ গ্রহণে প্ররোচিত করে কিংবা অবাঞ্ছিত পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এক্ষেত্রে ব্যবহৃত রণনীতি হচ্ছে শাস্তি প্রদানের হুমকি বা প্রতিপক্ষকে বঞ্চিত করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ, যাতে শত্রুর গ্রহীত পদক্ষেপে সম্ভাব্য লাভের চাইতে তার অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হবার ভয় সম্পর্কে তার মধ্যে নিশ্চিত প্রত্যয় জন্মে, আর এতেই শত্রু তার পরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে নিবৃত্ত হয়। যেসব পদ্ধতির মাধ্যমে পরাশক্তিদ্বয় তাদের নিবারক রণনীতি বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট হয় তার মধ্যে রয়েছে সার্বিক সামরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি, ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ চালাবার মত পারমাণবিক মারণাস্ত্র তৈরি, মৈত্রীযোগ সংগঠন এবং প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকি প্রভৃতি।[৭]

অন্যকথায়, সাম্প্রতিককালে ব্যবহৃত নিবারক রণনীতি পুরনো কৌশলগত প্রবাদের সঙ্গে সংগতিপূর্ণঃ 'যদি শান্তি চাও তবে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ কর।'[৮] আরো উল্লেখ্য,- যে কোনো একটি নিবারণ তত্ত্বপ্রসূত হুমকি কার্যকররূপ পরিগ্রহ করতে হলে এটা যে পক্ষের উদ্দেশ্যে পরিচালিত তার কাছে বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে এবং এ জাতীয় হুমকি বিশ্বাসযোগ্য রাখার প্রবণতা

www.pathagar.com

আমেরিকাকে উত্তরোত্তর ভিয়েতনামে অপ্রতিসম যুদ্ধে সম্প্রসারিত হারে বিজড়িত হতে প্ররোচিত করে। আরেকটি বিষয়ও প্রণিধানযোগ্য। নিবারক তত্ত্বের উন্নয়ন ঘটে পারমাণবিক অস্ত্র ও ক্ষেপণাস্ত্রের উদ্ভাবন ও উন্নয়নের পটভূমিতে।

সম্ভবত একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক মূল্যায়নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে নিবারক রণচিন্তাবিদ গোষ্ঠীর প্রভাব অত্যন্ত প্রকট।[৯] এই বিষয়ে তত্ত্বীয় উন্নয়ন ঘটে তিন পর্যায়ে: পারমাণবিক যুগ সূচিত হবার পর প্রথম কয়েক বছরের দিকে নিবারণ তত্ত্ব সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা উত্থাপিত হয়, যদিও এসবের প্রভাব ছিল অত্যন্ত সীমিত; ১৯৫০ দশকের শেষপাদের দিকে নিবারণ তত্ত্ব দ্বিতীয় পর্যায়ে উন্নীত হয়, কিন্তু এই পর্যায়েও এ তত্ত্বের প্রভাব সাধারণ জ্ঞান-বিচক্ষণতার ঊর্ধ্বে পৌঁছায় নি; সত্তর দশকে শুরু হয় তৃতীয় পর্যায় আর এই পর্যায় নিবারণ তত্ত্ব ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বাস্তব রাজনীতির যোগসূত্র সন্ধানের প্রচেষ্টা চলে।[১০]

মার্কিন নিবারণ তত্ত্ব

সম্ভাব্য পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়াবহ রূপ সম্পর্কে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে আমেরিকায় নিবারণ তত্ত্বের উদ্ভাবন করা হয়। পারমাণবিক অস্ত্রের উন্নয়নের ফলে এ তত্ত্ব শুধু বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে নি ; এ তত্ত্বের এক অন্তর্নিহিত অভিব্যক্তিও ঘটে। পঞ্চাশ দশকের প্রথম দিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন উদ্‌যান বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে পরামাণবিক শক্তিসম্পন্ন হয় আমেরিকা তখন এরূপ এক রণনীতি গ্রহণে প্রবৃত্ত হয় যাতে ওয়াশিংটন ও মার্কিন মিত্ররা মোটামুটি কম ব্যয়ে যথাসম্ভব অধিক প্রতিরক্ষা-শক্তি অর্জন করতে পারে।[১১] এই সময় নিবারণ তত্ত্ব সম্পর্কিত যে ধারণার উন্মেষ ঘটে তার মূলে ছিল গুপ্ত বা প্রকাশ্য কম্যুনিস্ট সম্প্রসারণ প্রবণতাকে নিবৃত্ত করা এবং 'মুক্ত বিশ্বের' আদর্শকে সমুন্নত রাখা।[১২]

উল্লেখ্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর থেকে আমেরিকা বিশ্বের সেরা সামরিক শক্তি হিসেবে এরূপ এত অভিমত পোষণ করে যে, একটি অবিচ্ছিন্ন বন্ধনে আবদ্ধ কম্যুনিস্ট জোট নতুন বিশ্ব শক্তিসাম্যের প্রতি হুমকি প্রদর্শন করছে। কেননা এ হুমকির সূত্র হচ্ছে এমন এক আদর্শগত জোটের বন্ধন যাতে বিশ্বব্যাপী শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সক্রিয় কম্যুনিস্ট পার্টিসমূহ অত্যন্ত তৎপর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। কম্যুনিস্ট পার্টিসমূহ সর্বত্র মস্কোর কেন্দ্রস্থ নির্দেশে পরিচালিত হয় এবং ১৯৪০-এর দশকের শেষপাদ থেকে ইউরোপের মহাদেশীয় অঞ্চলে কম্যুনিস্টদের শক্তি উত্তরোত্তপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। কম্যুনিস্টদের ক্রমবর্ধমান শক্তিতে আমেরিকা শঙ্কিত হয়, আর বিবর্ধিত

www.pathagar.com

শক্তিসাম্যের প্রতি কম্যুনিস্টদের হুমকি মোকাবিলা করে এদের অগ্রযাত্রা প্রতিরোধ করার মানসে মার্কিন সরকার একটি দমননীতি ঘোষণা করে এবং এ নীতি লালন ও বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়। এই ধরনের মার্কিন বিঘোষিত নীতির উদ্দেশ্যে শুধু সোভিয়েত সম্প্রসারণমূলক প্রবণতাকে সীমিত করা ছিল না, ওয়াশিংটন সোভিয়েত আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে এভাবে পরিমার্জিত করতেও সক্রিয় হয় যাতে মার্কিন কৌশলগত স্বার্থের প্রতি কম্যুনিস্টদের হুমকি যথাসম্ভব হ্রাস পায়।[১৩]

এই ধরনের উদ্দেশ্য সাধনে বিশ্ব কৌশলগত সম্পর্কের পর্যায় আমেরিকার রণনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের মানসে নিবারণ তত্ত্বজনিত ক্রিয়াকর্মের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, যদিও পরিশেষে এসব নিবারণমূলক কলাকৌশল আমেরিকাকে ভিয়েতনামের মতো স্থানীয় দ্বন্দ্বে বিজড়িত হতে প্ররোচিত করে। কেননা দমন নীতির প্রেক্ষাপটে ভিয়েতনামী কম্যুনিস্ট নেতৃবৃন্দকে ক্রেমলিন কর্তৃক প্রশিক্ষিত সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদের দালালরূপে চিহ্নিত করা হয় যাতে ঐ অঞ্চলে কম্যুনিস্টদের কোনোরূপ অভিলাষ দমনে সার্বিক মার্কিন কৌশলগত প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা যেতে পারে। মার্কিন দৃষ্টিতে, হ্যানয় ছিল ইন্দোচীনে বিপ্লবী আন্দালনের প্রাণকেন্দ্র, কিন্তু এই আন্দোলনের শক্তি ও সম্পদের উৎস ছিল ইন্দোচীনের বাইরে–কম্যুনিস্ট চীন এতে ইন্ধন যুগিয়ে চলে আর সোভিয়েত ইউনিয়ন যোগায় নৈতিক ও আর্থিক সমর্থন।[১৪]

মার্কিন নেতৃবৃন্দ বিশ্বব্যাপী কম্যুনিস্টদের হুমকির যথাযথ মোকাবিলায় তাদের কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গিতে নিবারণ তত্ত্বজনিত কর্মপন্থা গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। ১৯৫৩ সনের ১২ আগস্ট তারিখে মস্কো পারমাণবিক উদ্‌যান বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে আমেরিকা তার পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডার আরো জোরদার করতে সচেষ্ট হয়। এই সময়কার নিবারণ তত্ত্বের এক ব্যবহারিক হাতিয়ার ছিল তথাকথিত 'ভয়াবহ প্রত্যুত্তর নীতি' ('doctrine of massive response'); ১৯৫৪-১৯৬০ সময়কালে মার্কিন বৈদেশিক আচরণে এই নব-বিঘোষিত নীতি বহুল প্রচলিত ছিল।[১৫] এই রণনীতির মূল উপাদান ছিল এরূপ: প্রয়োজনবোধে শ্রেষ্ঠতর মার্কিন সামরিক শক্তি নিবারক উদ্দেশ্য সাধনে সবার্ধিক যোগ্যতা ও দক্ষতা সহকারে তাৎক্ষণিকভাবে স্ব-নির্বাচিত পদ্ধতি ও পছন্দমাফিক শত্রু ঘাঁটিতে আঘাত হানা হবে।[১৬] পারমাণবিক প্রেক্ষপটে রচিত এই রণনীতির ভিত্তি ছিল সুনিশ্চিতভাবে শ্রেষ্ঠতর পারমাণবিক আঘাত হানার মার্কিন ক্ষমতা ('first nuclear strike')। এতে এরূপ ধরে নেয়া হয় যে, যে-কোনো ধরনের কম্যুনিস্ট অস্ত্রাভিযান, অনেকটা স্বয়ংক্রিয় ধারায় শ্রেষ্ঠতর মার্কিন কৌশলগত বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র ক্ষমতাকে কম্যুনিস্ট লক্ষ্য স্থলের উপর আঘাত হানার কাজে সক্রিয় করে তুলবে।[১৭]

www.pathagar.com

ভিয়েতনামে মার্কিন নিবারণ তত্ত্বের প্রয়োগ

স্থানীয়ভবে এরূপ মার্কিন রণনীতিকে বাস্তবায়িত করতে একাকী মার্কিন সরকার ভিয়েতনাম এনং এর সঙ্গে লাওস ও কম্বোডিয়ায় ফরাসিদের ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার নিমিত্তে মার্কিন বাহিনীকে মুখ্য সহযোগীর ভূমিকায় নামাতে অনিচ্ছুক ছিল। তবু সামগ্রিকভাবে ইন্দোচীনের স্থানীয় শক্তি ও বাহিনীসমূহকে জোরদার করা ছিল মার্কিন নিবারক রণনীতির পূর্ব পরিকল্পিত উদ্দেশ্য। সেই পরিকল্পিত রূপরেখায় বলা ছিল যে, যদি স্থানীয় প্রতিরক্ষাবাহিনী কম্যুনিস্টদের হুমকি দমনে ব্যর্থ হয় সে ক্ষেত্রে ব্যাপকতর মার্কিন প্রতিশোধমূলক ক্ষমতা ব্যবহৃত হবে স্থানীয় বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধিকল্পে। তাই স্থানীয়ভাবে ভিয়েতনামের মত এলাকায় নিবারক নীতির অবিচ্ছেদ্য বিধান ছিল এমন এক সুসংহত ও একাত্ম নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাতে ভিন্ন আদর্শের অনুগামী কারোর অনুপ্রবেশ বা উপদ্রব না ঘটতে পারে।[১৮] এ ধরনের বিধান রাখার অর্থ এই যে, স্থানীয় ক্ষেত্রে কম্যুনিস্ট হুমকির মোকাবিলায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই তয়াবহ প্রত্যুত্তর নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে কম্যুনিস্টদের স্তব্ধ করে দিতে হবে এমন নয়– এরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন তদানীন্তন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডালেস স্বয়ং। এ ব্যাখ্যার অনুরূপে তিনি আরো বলেন যে, কৌশলগত বিমান বাহিনী ও কৌশলমূলক পারমাণবিক অস্ত্রই চিহ্নিত শত্রুকে নিবৃত্ত করার একমাত্র পদ্ধতি নয় ; শত্রুর সম্ভাব্য আগ্রাসন প্রতিরোধকল্পে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যাপকতর কলাকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকবে।[১৯]

ইন্দোচীন উপদ্বীপে অন্তর্ভুক্ত একটি দেশ হিসেবে ভিয়েতনামে আমেরিকা তার নিবারক রণনীতি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে। কেননা, এই এলাকাকে দূরপ্রাচ্যের চাবিকাঠি রূপ দেখা হয়, একে বলা হয় "দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবেশ-দ্বার"।[২০] স্বাভাবিকভাবেই একে আমেরিকার কৌশলগত স্বার্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়। মার্কিন সরকার জানতো, এ এলাকায় কম্যুনিস্টরা বিপ্লবী আন্দোলন প্রসার করছে যথার্থ স্থানীয় গণসমর্থন লাভের মাধ্যমে, কিন্তু এই আন্দোলনে ইন্ধন যোগাচ্ছে বাইরের কম্যুনিস্ট শক্তিসমূহ, আর তাই ওয়াশিংটন মনে করে যে ইন্দোচীনের দেশসমূহের সত্যিকার স্বাধীনতা লাভের সম্ভাবনা অতি দুরূহ। বরং মার্কিন দৃষ্টিতে, কম্যুনিস্টদের অনুসৃত রণনীতি এসব দেশের স্বাধীনতার উন্নয়ন প্রয়াসে হস্তক্ষেপের শামিল।[২১]

• অন্যদিকে, ভিয়েতনামে ফরাসিদের উপনিবেশবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার প্রেক্ষাপটে আমেরিকা পরিস্থিতিকে বিপদসংকুল বলে মনে করে।[২২] কেননা ওয়াশিংটন ফরাসি উপনিবেশবাদের মিত্র হিসেবে সরাসরি চিহ্নিত হতে চায়

www.pathagar.com

নি। এসব কারণে আমেরিকা একদিকে ফরাসিদের প্রতি আহ্বান জানায়-তারা যেন ইন্দোচীনের দেশসমূহের প্রতি দেয়া ওয়াদা মোতাবেক প্রকৃত স্বাধীনতা প্রদান করে, আর অন্যদিকে মার্কিন সরকার আমেরিকার শক্তিসামর্থ্য এভাবে প্রয়োগে সচেষ্ট হয় যা' সামরিকভাবে কার্যকর এবং রাজনৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়। এভাবে এই এলাকায় প্রথম দিকে গৃহীত মার্কিন পদক্ষেপসমূহ ছিল বেশ সতর্কতামূলক। কম্যুনিস্টদের নিবৃত্ত করার পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে ফরাসিদের প্রয়োজনীয় সব আর্থিক ও সামরিক সাহায্য দেয়া হয় বটে, কিন্তু ঐ সময়ে আমেরিকা ভিয়েতনামে ফরাসি ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠায় প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করে নি।

অবশ্য এরূপ দোদুল্যমান মার্কিন নীতি দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নি। ১৯৫৪ সনের জানুয়ারির দিকে ফরাসিদের ঔপনিবেশিক পরিকল্পনা যখন নস্যাৎ হবার পথে ওয়াশিংটন তখন এক আক্রমণমুখী সামরিক রাজনৈতিক ও মানস্তাত্ত্বিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। গোপন অভিযান চালিয়ে ১৯৯৫ সনের মাঝামাঝি সংঘবদ্ধ কম্যুনিস্ট বাহিনীকে উচ্ছেদ করার প্রচেষ্টা এই পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২৩] নিবারক রণনীতি প্রসূত দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও এভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রসারণমূলক তৎপরতার পথে প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়, আর প্রত্যক্ষভাবে ভিয়েতনামে হস্তক্ষেপ করে।

নিবারণ তত্ত্ব ও সম্প্রসারিত যুদ্ধ

পরবর্তী কয়েক মাস কিছু কিছু নিবারক কৌশল-সঙ্কেত ব্যবহার করে আমেরিকা এই অঞ্চলে তার রণনৈতিক চাপ বৃদ্ধি করে চলে। ওয়াশিংটন ১২ জানুয়ারি ১৯৫৪ তারিখে এ ধরনের প্রথম সঙ্কেত প্রদান করে। ঐ সময় যুক্তরাষ্ট্র গণচীনকে ইন্দোচীনে আগ্রাসনমূলক ভূমিকা গ্রহণের বিরুদ্ধে এর 'ভয়াবহ পরিণতি' সম্পর্কে প্রকাশ্যে হুশিয়ার করে এবং ঘোষণা করে যে এর ফল শুধু ইন্দোচীন এলাকায়ই সীমাবদ্ধ থাকবে না।[২৪] আমেরিকা কর্তৃক গৃহীত দ্বিতীয় নিবারক পদক্ষেপ ছিল এই সময়ে ভিয়েতনামে ফরাসি ঔপনিবেশিক বাহিনীকে চল্লিশটি বি-২৯ (মাঝারি ধরনের) বোমারু বিমান সরবারহ করা। সৈন্য চলাচলের জন্য ইতিপূর্বে দেয়া সি-১১৯ বিমানসমূহ ছিল এসবের অতিরিক্ত।[২৫] এতে ভিয়েতনামে সম্প্রসারিত মার্কিন হস্তক্ষেপের আরো প্রমাণ বহন করে।

৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে আমেরিকা এ এলাকায় তার তৃতীয় নিবারক পদক্ষেপ গ্রহণ করে; এর মাধ্যমে ভিয়েতনামে মার্কিন উপদেষ্টা দল, মার্কিন সামরিক সাহায্য ও উপদেষ্টা দলের (US Military Aid and Advisory Group বা MAAG) ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। এর মধ্যে ছিল দু'শয়ের মত সামরিক

যন্ত্রবিদ ও বিমান কারিগর। জঙ্গী বিমানসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার ছিল এদের কাজ। মার্কিন সরকার বুঝাতে চায় যে, সামরিক যন্ত্রবিদ-কারিগরদের এ দল ক্রমবর্ধমান হারে মার্কিন সৈন্য বৃদ্ধির পরিকল্পনার অংশবিশেষ মাত্র।[২৬] ২৪ মার্চ তারিখে আমেরিকা চতুর্থ নিবারক কর্মপন্থা গ্রহণ করে ; এ সময় দক্ষিণ কোরীয় সেনাবাহিনী অনুরূপ ফরাসিদের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আরো অতিরিক্ত বি-২৯ বোমারু বিমান সরবরাহ করে।[২৭]

পঞ্চম মার্কিন পদক্ষেপ ছিল প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মার্কিন বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল জন ডবিলও ডানিয়েলকে ভিয়েতনামস্থ মার্কিন সাহায্য ও উপদেষ্টা দলের প্রধান হিসেবে নিয়োগ প্রদান। এর মাধ্যমে আমেরিকা ভিয়েতনামে তার গভীরতর সামরিক আগ্রহ প্রদর্শন করে। ওয়াশিংটন তার ষষ্ঠ নিবারক পদক্ষেপ গ্রহণ করে এই অঞ্চলের জলাঞ্চলে প্রবল মার্কিন নৌশক্তি জোরদারের মাধ্যমে। ফলে এ অঞ্চলে শুধু মার্কিন সপ্তম নৌবহর সমাবেশ করা হয় নি, ফিলিপাইনের ক্লার্ক ফিল্ড এবং সুবিক উপসাগরেও ঘাঁটি স্থাপন করা হয়। আরো মার্কিন ঘাঁটি ছিল ফরমোজা প্রণালীতে, ছিল জাপানের ওকিনাওয়ায়, থাইল্যান্ড ও দক্ষিণ কোরীয়ায় এবং গোয়ামে ছিল কৌশলগত বিমান ঘাঁটি (Strategic Air Command বা SAC)। পরিশেষে পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত দু'টি মার্কিন বিমানবাহী জাহাজ, "দি বক্সার" (The Boxer) ও "দি ফিলিপাইন সী" (The Philippines Sea) ১৯৫৪ সনের এপ্রিলের দিকে ফিলিপাইন উপকূলবর্তী এলাকা থেকে দক্ষিণ চীন সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হবার নির্দেশ দেয়া হয়।[২৮] উপর্যুক্ত সব কর্মপন্থা স্পষ্টতই এ অঞ্চলে কার্যকর ও বিশ্বাসযোগ্য মার্কিন নিবারক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয় যাতে আমেরিকার বিশ্ব প্রতিযোগী ও আঞ্চলিক কম্যুনিস্ট শত্রুদ্বয় যথার্থ নিবৃত্ত হয়।

এসব পদক্ষেপ ছিল ব্যাপকতর মার্কিন নিবারক কূটচালের অংশবিশেষ মাত্র। ৭ মে ১৯৫৪ তারিখে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডালেস দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় একযোগে প্রতিরক্ষা বিধানে একটি বৃহত্তর জোট প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব রাখেন। মূলত এটা ছিল নিবারক সঙ্কেতের অংশবিশেষ আরেকটি পদক্ষেপ। ডালেস স্বয়ং বলেন, "কম্যুনিস্টদের এটা অবশ্য বুঝাতে হবে যে তারা যথেষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তির বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে নিয়োজিত এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই পরিকল্পিত সম্প্রসারণ প্রচেষ্টা থেকে তাদের বিরত হতে বাধ্য করা হবে।"[২৯] চার্চিলকে লিখিত আইজেনহাওয়ারের পত্র থেকে এ অঞ্চলে জোট গঠনের নিবারক দিক আরো সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়।" "এ প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই যে, লিখেন আইজেনহাওয়ার সংঘটিত জোট অবশ্য শক্তিশালী হতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে এই জোটকে যুদ্ধে লিপ্ত হতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

www.pathagar.com

আপনাদের কিংবা আমাদের সত্যিকার কোনো স্থলবাহিনী এতে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আমি দেখছি না।"[৩০]

অন্যকথায়, আমেরিকা এ সময় চেয়েছে তার মিত্রদের প্রকাশ্য একাত্মতা ও যুদ্ধে যোগদানের ব্যাপারে আগ্রহ প্রদর্শন যাতে নিবারক তত্ত্বজনিত ক্রিয়াকর্ম শত্রুর কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়। প্রকৃতপক্ষে ডালেস বলেন যে, এ সময় মিত্রদের দৃঢ়তা ও একাত্মতা প্রদর্শনই ছিল মার্কিন নীতির মৌলিক উদ্দেশ্য।[৩১] পরবর্তী বছরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র তার নিবারক দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বাসযোগ্য করার নিমিত্তে আরো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়, যদিও এসবের ফলে ভিয়েতনাম দ্বন্দ্ব অধিকতর সম্প্রসারিত ও চরমরূপ ধারণ করে।

১৯৫৪ সনের জেনিভা সম্মেলনের পর মার্কিন নিবারক কূটচাল স্পষ্টতর রূপ লাভ করে। উল্লেখ্য, ঐ সময় ১৭ সমান্তরাল রেখা মাঝামাঝি ভিয়েতনামকে 'সাময়িকভাবে' ভাগ করা হয়; এই রেখার উত্তর পার্শ্বস্থ কম্যুনিস্ট এলাকায় যে রাষ্ট্রের পত্তন হয় সেটা জন-গণপ্রজাতান্ত্রিক ভিয়েতনাম নামে পরিচিত হয়, আর অকম্যুনিস্ট দক্ষিণাঞ্চল মার্কিনপন্থী সরকারের কর্তৃত্বে আসে। উত্তরাঞ্চলের কম্যুনিস্ট সরকার হ্যানয়তেই রাজধানী বহাল রাখে এবং একটি সমাজতান্ত্রিক সরকারের অধীনে ভিয়েতনামকে পুনরেকত্রিত করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। অন্যদিকে, মার্কিনপন্থী সাইগন সরকার ভিয়েতনামের ঐক্যের কথা বললেও বাস্তবে দক্ষিণ ভিয়েতনামের 'স্বাধীন' সত্তা ও এর মার্কিনপন্থী রূপ বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়।

ওয়াশিংটন এর পর ম্যানিলা চুক্তি সম্পাদনে উদ্যোগ গ্রহণ করে (৩ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪) এবং সৃষ্টি করে দক্ষিণ পূর্ব এশীয় চুক্তি সংস্থা (South East Asia Treaty Organization বা SEATO)। ডালেসের ভাষার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যায়, এ সংস্থার সৃষ্টি হয় "দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় কম্যুনিস্টদের অভিলাষ নিবারককল্পে" এবং এ অঞ্চলে একে "আক্রমণ ও অগ্রাসনের বিরুদ্ধে সচল আঘাত হানার ক্ষমতাসহ একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা যন্ত্র" হিসেনে গড়ে তোলার অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়। এ অঞ্চলে মিত্রদের কোনোরূপ স্থলবাহিনী নিয়োগ করে এই নিবারক ক্ষমতা বৃদ্ধি পরিকল্পনা করা হয় নি ; বরং এতে কৌশলগত রিজার্ভ বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করে নিবারক ক্ষমতা উন্নীত করার জন্য সচল আঘাত হানার শক্তি জোরদার করা হয়।[৩২]

বস্তুত, ঐ সময়কার মার্কিন সামরিক পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই "পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় যে কোনো আগ্রাসনকে আঘাত হানার ক্ষমতাসহ বাছাইকৃত পদ্ধতি ও আমাদের পছন্দসহ স্থানে সর্বদা শক্তিশালী নৌ ও বিমান বাহিনী মোতায়েনের প্রস্তাব রাখে", বলেন ডালেস স্বয়ং; "এভাবে যে নিবারক

www.pathagar.com

শক্তি আমরা সৃষ্টি করবো এর মাধ্যমে এক বা একাধিক [রাষ্ট্রকে] কার্যকরভাবে রক্ষা করা যাবে।"[৩৩] একই উদ্দেশ্য সাধনে ১ জুলাই ১৯৫৭ তারিখে এ অঞ্চলে মার্কিন বিমান বাহিনীর তখনকার একটি পৃথক কম্যাণ্ড, দূরপ্রাচ্যের বিমান বাহিনীকে (Far Eastern Air Forces বা FEAF) পুনর্গঠিত করা হয়। প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিমান বাহিনী (Pacific Air Forces বা PACAF) হিসেবে এটা ছিল ঐক্যবদ্ধ মার্কিন প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিমান বাহিনীর কম্যাণ্ডের অংশবিশেষ।[৩৪] প্রকৃতপক্ষে, ঐ সময়ে এ আঞ্চলিক মার্কিন বিমান বাহিনীর উন্নতমানের পরমাণুবোমা সংগ্রহ-ভাণ্ডার, এর বিমান চালক দলের বর্ধিত প্রস্তুতি ও যোগ্যতা, এর কৌশলগত সচলতা এবং এর বি-৪৭ বিমান (পোতবহর) তেমন একটা প্রতিশোধমূলক পাল্টা পরিস্থিতির সম্মুখীন না হয়েই সম্ভবত সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংস করে দিতে পারতো।[৩৫] এভাবে ওয়াশিংটন কার্যকর নিবারক ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, যে ক্ষমতার ব্যবহার মার্কিন সরকার করতে পারতো তার চিহ্নিত বিশ্ব প্রতিযোগীর সম্ভাব্য আগ্রাসনমূলক পদক্ষেপ প্রতিহত করতে। একই সঙ্গে স্থানীয়ভাবে হ্যানয়ভিত্তিক কম্যুনিস্ট সরকারের আগ্রাসী পরিকল্পনাও নস্যাৎ করতে মার্কিন বাহিনী সমর্থ ছিল।

আমেরিকা তাই আঞ্চলিক নিবারক চালবাজির মধ্যে এর তৎপরতা সীমাবদ্ধ রাখে নি। ১৯৫৪ সনের জানুয়ারিতে গৃহীত কৌশলগত কর্মপন্থা অনুযায়ী ওয়াশিংটন স্থানীয়ভাবে বেশ কিছু গুপ্ত উস্‌কানিমূলক রণকৌশল গ্রহণ করে যাতে উত্তর ভিয়েতনামের কম্যুনিস্ট সরকারের স্থিতি ব্যাহত হয় এবং হ্যানয় বিরত থাকে দক্ষিণ ভিয়েতনামে হস্তক্ষেপ করা থেকে।

এ ধরনের রণকৌশল প্রথমে গ্রহণ করা হয় ফিলিপাইনে প্রতি-বিপ্লবী অভিযানে কর্ণেল এডওয়ার্ড ল্যান্সডেল'র নেতৃত্বে। তার অধীনে সাইগন সামরিক মিশন একটি আধা সামরিক দল গঠন করে ১৯৫৪ সনের আগস্টে। এই দল দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে টংকিন এলাকায় গিয়ে নাশকতামূলক কাজ সম্পাদনে বিভিন্ন দলকে প্রশিক্ষিত ও সজ্জিত করে।[৩৬] সেপ্টেম্বরে উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন বাহিনী একই ধরনের কাজ করার জন্য "লিয়েন নিন"(Lien Ninh) নামক টাই নিন প্রদেশের কাও ডাই উপজাতীয় কম্যুনিস্টবিরোধী একদল ভিন্ন মতাবলম্বী গেরিলাদের অর্থ যোগায়। একই মাসে 'টাস্কফোর্স-৯৭'(Task Force-98) নামক একটি মার্কিন নৌ জাহাজ উত্তর ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক ও মনস্তাত্ত্বিক অভিযান পরিচালনার জন্য হাইফং বন্দরের মাধ্যমে বেশ আধা-সামরিক দল চালান দেয়। চতুর্থত, সাইগন সামরিক মিশন মার্কিন নৌ বাহিনীর সাহায্যে কয়েকটি আধা সামরিক দল ও অনুচরের সাহায্যে উত্তর ভিয়েতনামের পরিবহণ ব্যবস্থায় আঘাত হানার

www.pathagar.com

জন্য অস্ত্রশস্ত্র পাচার করে। এরূপ প্রচেষ্টা ১৯৫৫-৫৬ সন অবধি অব্যাহত থাকে।[৩৭]

পরিশেষে, সাইগন সরকার ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের ক্যাথলিক যাজক ও পুরোহিতদের সহযোগিতায় উত্তর ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন সরকার এক ব্যাপক উদ্বাস্তু অভিযান সংগঠিত করে। বস্তুত, যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে মার্কিন নৌবাহিনী নিয়োগ করে 'অভিযান উদ্বাস্তু' ('Operation Exodus') নামক এক অত্যন্ত সুপরিকল্পিত কর্মপন্থার মাধ্যমে উত্তর থেকে দক্ষিণ ভিয়েতনাম গমনেচ্ছুক শরণার্থীদের সাহায্য প্রদান করে। শুধু তাই নয়, সম্ভাব্য শরনার্থীদের ইন্ধন যোগাবার নিমিত্তে যুক্তরাষ্ট্র এমন কি এক ব্যাপকতর সফল প্রচারাভিযান পরিচালনা করে এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামে এসব শরণার্থীদের পুনর্বাসনে 'অভিযান-ভ্রাতৃত্ব' (Operation Brotherhood) নামক এক প্রকল্পে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে।[৩৮] এসব কৌশলমূলক চালের মাধ্যমে আমেরিকা তার স্থানীয় শত্রুর আগ্রাসনমূলক প্রবণতাকে নিবৃত্তকরণে সচেষ্ট হয়।

ভিয়েতনামের কম্যুনিস্ট বিপ্লবীদের পাল্টা ব্যবস্থা

কিন্তু মার্কিন নিবারক কর্মপন্থা সত্ত্বেও ভিয়েতনামী বিপ্লবীরা আদৌ নিরস্ত হয় নি। হ্যানয়ের নেতৃবৃন্দ বুঝতে পারেন যে, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ইন্দোচীন থেকে হাত গুটোয় নি, শুধু পাল্টায় এর আচরণ, পরিবর্তিত হয় সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপের প্রেক্ষাপট। কেননা, ডিয়েন বিয়েন ফু'তে ফরাসিদের পরাজয় এবং ১৯৫৪ সানের জেনিভা সম্মেলন শেষে পর তাদের প্রত্যাবর্তনের পর পরই আমেরিকা ইন্দোচীনে পুনরায় বিজড়িত হয়। হ্যানয় দেখতে পেল, শক্তিশালী আমেরিকা ক্রমবর্ধমান হারে দুর্বল ফ্রান্সের পরিবর্তে একটি প্রধান বহিঃশক্তি হিসেবে ইন্দোচীনে হস্তক্ষেপে ব্রত হয়। ভিয়েতনামী বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের কাছে এটা ছিল এক বিরাট পরিবর্তিত কৌশলগত প্রেক্ষাপট-এতে তাদেরও কৌশলগত পরিকল্পনা ও রণকৌশলের পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।[৩৯]

১৯৫৪ হতে হ্যানয় অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে পারিপার্শ্বিক শক্তি ও অবস্থাদি অনুধাবন করার চেষ্টা করে এবং প্রলম্বিত বিপ্লবী যুদ্ধের এক রণনীতি গ্রহণে প্রবৃত্ত হয় যাতে কম্যুনিস্টদের কৌশলগত উদ্দেশ্য আদায়ে তারা সমর্থ হয় এবং এই উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল সব মার্কিন সামরিক ও রণনৈতিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে ভিয়েতনামকে পুনরেকত্রিত করা। এসব উদ্দেশ্য সাধনে হ্যানয় প্রথম উত্তর ভিয়েতনামে একটি শক্তিশালী ভিত গড়ে তোলার কাজে তার প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত রাখে, প্রয়াসী হয় সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে, সুদৃঢ় করে তাদের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ এবং অতীতের বছরগুলোতে ফরাসিদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধে হারানো শক্তি পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হয়।[৪০] পরবর্তী বছরগুলোতে

www.pathagar.com

কম্যুনিস্ট আদর্শের ভিত্তিতে হ্যানয় এক ব্যাপক কৌশলগত তত্ত্ব প্রণয়ন করে। সেই তত্ত্বে এরূপ এক রণনৈতিক প্রক্রিয়ার কথা বলা হয় যাতে চূড়ান্ত বিজয় লাভে পর্যায়ক্রমে হিংসাত্মক কর্মপন্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়।[৪১]

হ্যানায়ের সামরিক ও রণনৈতিক চিন্তাধারা পরিচালিত হয় ভিয়েতনামের কম্যুনিস্ট পার্টি দ্বারা। এই পার্টি ভিয়েতনাম শ্রমিক দল (Vietnam Worker's Party বা Dang Lao Dong) নামে পরিচিত ছিল। এর চিন্তা-ধারায় "মার্ক্সীয় বিপ্লবী হিংসাত্মক কর্মপন্থার সৃজনশীল প্রয়োগ" করার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। হ্যানয়ের চিন্তাধারায় এমন এক জনযুদ্ধের রূপরেখা রচিত হয় যাতে "সমগ্র জাতি মেহনতি শ্রেণীর নেতৃত্বে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।" এতে জনগণের শক্তিকে সশস্ত্র সংগ্রামের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয় এবং এতে "সাম্রাজ্যবাদের বৃহৎ বাহিনীকে পর্যুদস্ত করার জন্য" এক দুর্জয় শক্তি হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টার পরিচয় মেলে।[৪২] হ্যানয়ের প্রলম্বিত সংগ্রামকে সার্বিকভাবে দেখা হয় "শত্রুর বিরুদ্ধে একটি অব্যাহত আক্রমণমুখী প্রক্রিয়া হিসেবে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে শত্রুকে সর্বতোভাবে ঘায়েল করা। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শত্রুকে ভাগ ভাগ করে নিঃশেষ করতে হবে, পিছু হটাতে হবে এক এক পদক্ষেপে, নিশ্চিহ্ন করতে হবে টুকরো টুকরো করে এবং ধূলিসাৎ করতে হবে পর পর শত্রুর সব কৌশলগত ফন্দিফিকির। এর মাধ্যমে আসবে আমাদের উপর্যুপরি সাফল্য এবং আমরা জয়যুক্ত হবো চূড়ান্ত যুদ্ধে।"[৪৩]

হ্যানয়ের বিপ্লবী যুদ্ধের তত্ত্বে ছিল 'সুবর্ণ সুযোগের' সন্ধানে সর্বদা ওঁত পেতে থাকা, শত্রুকে ফাঁদে ফেলা, শত্রুর দুর্বলতার সুযোগ নেয়া এবং কৌশলগত উদ্দেশ্য সাধনে বিভিন্নতর নিপুণ ও কার্যকর সংগ্রামী কার্যকলাপ উদ্ভাবন।[৪৪] এই তত্ত্বে উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামকে পারস্পরিকভাবে একক সংগ্রামে পরিপূরক হিসেবে দেখা হয়ঃ উত্তর ভিয়েতনামকে চিহ্নিত করা হয় বিপ্লবের "পশ্চাদ ভাগ" ("The rear") হিসেবে এবং এখান থেকে প্রকৃত রণক্ষেত্র "সম্মুখ ভাগ" ("The front") দক্ষিণ ভিয়েতনামের জন্য সংগ্রামের রসদ উৎপাদন ও সরবরাহ করা হয়।[৪৫]

একই জাতীয় সংগ্রামী উদ্দেশ্য সাধনে উত্তর ভিয়েতনাম তাই বিপ্লবে সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। বিপ্লবের পশ্চাদ্‌ভাগ হিসেবে উত্তর ভিয়েতনাম একাই শুধু বিপ্লবের সম্মুখ ভাগের সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় নি, দু'টো ভাগ "সুবিশাল পশ্চাদভাগ"("the immense rear") বা সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সাহায্য ও সমর্থন লাভ করে।[৪৬] বস্তুত, মাও জেডং-এর ত্রি-ধাপ তত্ত্বভিত্তিক বিপ্লবী হিংসাত্মক প্রক্রিয়ার অনুরূপে ভিয়েতনামী বিপ্লবীরা নিরবছিন্নভাবে প্রলম্বিত যুদ্ধে নিয়োজিত থাকে। শত্রুকে পুরোপুরি পরাভূত

www.pathagar.com

করে ভিয়েতনামকে পুনরেকত্রিত করার নিমিত্তে বিপ্লবীরা বহুবিধ রণকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে, জোরদার করে তাদের কৌশলগত ক্ষমতা।

ভিয়েতনামে মার্কিন নিবারক তত্ত্ব প্রয়োগের যৌক্তিকতা

আমেরিকার কৌশলগত তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে কঠোরভাবে বিচার করলে বলা চলে, ভিয়েতনাম কিংবা ইন্দোচীন বিষয়ে নিবারক কর্মপন্থার অধীন প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করার তেমন কোনো সুযোগ ছিল না। তবু মার্কিন কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গিতে চালবাজির উপাদান বিদ্যমান ছিল।[৪৭] আমেরিকার রণনীতি হচ্ছে বিশ্বভিত্তিক এবং বিশ্বে আমেরিকার প্রতিপত্তিতে হুমকি দেখা দেয় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কম্যুনিস্ট চীন থেকে; এই উভয় দেশ ভিয়েতনামী কম্যুনিস্টদের মতো মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী নীতিতে আস্থাবান। যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ব প্রতিযোগী কম্যুনিস্ট শত্রুরা যখন প্রলম্বিত সংগ্রামে নিয়োজিত হয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে একটি অব্যাহত দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিত রূপে উপস্থাপিত করে, যুক্তরাষ্ট্রকে বাধ্য হয়েই একটি "প্রতিযোগী-রণনীতি" গ্রহণে প্রবৃত্ত হতে হয়, যাতে চিহ্নিত শত্রুর হুমকির মোকাবিলার পরিশেষে আমেরিকার বিজয় হয় সুনিশ্চিত। তাই ভিয়েতনামে প্রতিটি উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রে তার তৎকালীন কৌশলগত অবস্থান পুনর্মূল্যায়ন করে এবং তাৎক্ষণিকভাবে রচনা করে নতুন নতুন রণনীতি। উপরন্তু এসব নব-গৃহীত রণনীতি ও কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে যুক্তরাষ্ট্রকে আরো নতুন সম্প্রসারিত কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হয় যাতে শত্রুর অগ্রাভিযান প্রতিহত করা যায়।[৪৮]

অতীত মার্কিন উপদেষ্টামূলক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত ও নিবারক পরিকল্পনার উন্নতি বর্ধনের লক্ষ্যে আমেরিকা তার প্রাথমিক সম্প্রসারণমূলক কর্মপন্থা গ্রহণ করে। অবশ্য এর সবই ছিল আমেরিকার সাহায্য ও উপদেষ্টা ব্যবস্থার অন্তরালে আবৃত। ১৯৫৪ সনের জানুয়ারিতে পরিকল্পিত কর্মপন্থায় এমন শক্তিশালী স্থানীয় সামরিক বাহিনী গড়ে তোলার কথা বলা হয় যার স্বকীয় চলাচল, সরবরাহ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাদিসহ অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিধানের সার্বিক চূড়ান্ত দক্ষতা নিশ্চিত হবে।[৪৯] ১৯৫৪ সনের জেনিভা শান্তি চুক্তির কিছুকাল পর উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থায় নিযুক্ত মার্কিন প্রতিনিধি জে.এল. কলিন্সকে সাইগনে পাঠানো হয়। তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্বের মধ্যে ছিল দক্ষিণ ভিয়েতনামে সব মার্কিন সংস্থাসমূহের কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন করা, সাইগন সরকারের শক্তি বৃদ্ধিকল্পে সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য যোগাড় করা এবং কোরিয়া, গ্রীস, তুরস্ক ও বিশ্বের অন্যান্য এলাকায় বিশেষ মার্কিন পদ্ধতির কার্যকর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে ভিয়েতনামী সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা।[৫০]

www.pathagar.com

১৯৫৪ সনের অক্টোবরে ওয়াশিংটন মার্কিন বাহিনীর কাঠামোর অনুকরণে দক্ষিণ ভিয়েতনামে দ্রুত সেনাবাহিনী সৃষ্টির এক ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য ছিল অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিধানে 'ভিয়েতনামের মুক্ত বাহিনীর' আনুগত্য ও কার্যকারিতার উন্নতি সাধন।[৫১] এছাড়া একটি দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচিও হাতে নেয়া হয়। ইতিপূর্বেই দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় চুক্তি সংস্থাকে এ অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহের নিরাপত্তা জোরদার করার অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয় নাশকতামূলক কাজের বিরুদ্ধে।

ঐ সময়ে গৃহীত মার্কিন নিবারক কর্মপন্থা আরো ছিল দক্ষিণ ভিয়েতনামের সশস্ত্র বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দানের বিষয়টি। এ কাজ সম্পন্ন করার নিমিত্তে মার্কিন সাহায্য উপদেষ্টা দল কর্তৃক ১৯৫৫ সনে ফরাসিদের থেকে প্রশিক্ষণ কাজ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে এবং প্রায় একই সঙ্গে দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন উপদেষ্টা ব্যবস্থা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে নতুন কয়েকটি সামরিক মিশন প্রবর্তন করে।[৫২] তদুপরি, মার্কিন 'উপদেষ্টা বাহিনী' দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিমান ও নৌ ব্যবস্থাদির ব্যবহার শুরু করে।[৫৩] যুক্তরাষ্ট্রে নিজস্ব বাহিনীর প্রচলিত ধারার অনুকরণে ওয়াশিংটন সাইগনে একটি বিমান ও নৌ-সেনাবাহিনী (marine corps) সৃষ্টি করে। এসব ছিল প্রধান অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা অভিযান পরিচালনার জন্য সৃষ্ট আঞ্চলিক ও গণবাহিনীর অতিরিক্ত।[৫৪] পরিশেষে, হ্যানয়ের বিঘোষিত সাম্যবাদ আদর্শের সমুত্তর দেয়ার জন্য তথাকথিত তুষ্টি বিধান নীতির (doctrine of pacification) অধীন একটি পাল্টা আদর্শ বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়। এ নতুন 'আদর্শের' মাধ্যমে মার্কিন সরকার তার নিজস্ব পরিকল্পকদের চিহ্নিত রূপরেখার ভিত্তিতে দক্ষিণ ভিয়েতনামের সমাজ ও প্রশাসনকে কম্যুনিস্ট-বিরোধী ডানপন্থী ধারার পুনর্বিন্যাস ও রাজনৈতিক দীক্ষা প্রদানে প্রয়াসী হয়।[৫৫]

এভাবে আমেরিকা তার বিশ্বভিত্তিক নিবারক রণনীতি ও এর থেকে উদ্ভূত উপদেষ্টা ব্যবস্থা ভিয়েতনামে প্রয়োগ করে দক্ষিণ ভিয়েতনামে একটি "স্বাধীন" ও স্ব-নির্ভর অকম্যুনিস্ট রাষ্ট্র গঠনে তৎপর হয়। এ কাজ সম্পন্ন করতে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি পরাশক্তি হিসেবে তার সম্মান ও প্রতিপত্তি ব্যবহার করে দক্ষিণ ভিয়েতনামের একটি লেজুড় সরকাররের সমর্থনে যে সরকার খোদ মার্কিন উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে ওয়াশিংটন ভিয়েতনামের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে পক্ষপাতদুষ্ট কারণে এবং হ্যানয়ের কম্যুনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে অপ্রতিসম যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।[৫৬]

www.pathagar.com

মার্কিন নিবারক তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা

আমেরিকা তার নিবারক রণনীতি ব্যবহার করতে চেয়েছে সাইগনে অবস্থিত অকম্যুনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে যে কোনো ধরনের সামরিক আক্রমণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে হ্যানয়কে নিবৃত্ত করতে। কিন্তু খুব শীঘ্রই মার্কিন নেতৃবৃন্দে দক্ষিণ ভিয়েতনামে নিম্নতর পর্যায়ে একটি বিপ্লবী গেরিলা যুদ্ধের সূচনা উপলব্ধি করতে পারেন, যা ছিল ক্রমবর্ধমান হারে ' অপ্রচলিত' ধারায় পরিচালিত।[৫৭] এর পরপরই উদ্ভূত বিপদসংকুল পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াশিংটনে কৌশলগত বিতর্ক চলে। এসব বিতর্কে সমগ্র মার্কিন কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গির উত্তরোত্তর সমালোচনা করা হয়।

ভিয়েতমান কিংবা ইন্দোচীনে নিবারক পরিকল্পনা প্রয়োগ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, কেননা প্রকৃতপক্ষে এ পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ মার্কিন হস্তক্ষেপ বা যুদ্ধ-অভিযান এড়িয়ে যাবার কথাই ছিল। নিবারক রণনীতি এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভয়াবহ প্রত্যুত্তরজনিত কৌশলগত প্রক্রিয়া সত্যিকার অর্থে ইন্দোচীনের প্রেক্ষাপটে ছিল নিতান্তই অবান্তর, কারণ এ এলাকায় অব্যাহত কৌশলগত বিমান আক্রমণ পরিচালনার মত তেমন কোনো লক্ষ্যস্থল ছিল না।[৫৮] ইন্দোচীনের কোনো উপযুক্ত লক্ষ্যবস্তু না থাকায় যুক্তরাষ্ট্র সম্ভবত তার কৌশলগত আক্রমণ পরিকল্পনা গণচীন কিংবা সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরে বিস্তার করতে পারতো, কেননা এ দুটো দেশই তখন উত্তর ভিয়েতনামকে পরোক্ষভাবে যুদ্ধে ইন্ধন যোগাচ্ছিলো। কিন্তু এ জাতীয় বিকল্প পরিকল্পনার ফলপ্রদ সার্থকতা তিন কারণে সন্দেহের উদ্রেক করে। প্রথমত ওয়াশিংটন যথার্থই যে কোনো কম্যুনিস্ট আগ্রাসনমূলক ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে ভয়াবহরূপে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতো কিনা। দ্বিতীয়ত, সোভিয়েত ইউনিয়ন কিংবা চীন যেহেতু ভিয়েতনামীদের পরোক্ষভাবে সাহায্য ও সমর্থন দিয়ে চলে সেহেতু তারা পাশ্চাত্য জগৎ কিংবা যুক্তরাষ্ট্রকে ভয়াবহ প্রত্যুত্তর কর্মসূচির মতো ব্যবস্থায় প্ররোচিত হতে এরূপ কোনো সুস্পষ্ট হুমকি প্রদান করতো কিনা। এবং তৃতীয়ত দ্রুত পরিবর্তিত পারমাণবিক সাম্যাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র আদৌ এরূপ এক রণনীতি বাস্তবায়নে সক্ষম হতো কিনা।[৫৯]

প্রকৃতপক্ষে ওয়াশিংটন এ বাস্তবতা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিল যে খুব শীঘ্রই মস্কো শুধু আমেরিকার অগ্রবর্তী ঘাঁটিসমূহ ও মার্কিন মিত্রদের ওপর ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক হামলা চালাবার ক্ষমতা লাভ করবে না, খোদ মার্কিন মিত্রদের ঘনবসতিপূর্ণ শহরাঞ্চলেও আঘাত হানতে সক্ষম হবে। পরাশক্তিদ্বয়ের ক্রমবর্ধমান সমরূপ পারমাণবিক ক্ষমতা লাভের প্রেক্ষাপটে এটা বলা চলে যে,

www.pathagar.com

শ্রেষ্ঠতর পারমাণবিক হামলা পরিচালনা করার মার্কিন তত্ত্বীয় চিন্তাধারা নিতান্তই অবান্তর হয়ে পড়ে।

এরূপ পরিবর্তিত কৌশলগত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ওয়াশিংটন ভিয়েতনামে উদ্ভূত যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে এমন এক বিকল্প রণনীতি প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে যার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র কম্যুনিস্টদের দেয়া সব ধরনের হুমকির প্রতিবিধানে সমর্থ হয়, দ্রুততার সঙ্গে হস্তক্ষেপ করতে পারে এবং যথাযথ বিচার-বিবেচনা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে শত্রুর ওপর মার্কিন ক্ষমতার গভীর প্রভাব রাখতে পারে।[৬০] এসবের সারকথা এই, আমেরিকাকে পুরনো রণনীতির ধারায় ফিরে যেতে হয় যার ফলে সম্প্রসারিত যুদ্ধবিগ্রহে যুক্তরাষ্ট্রকে আণবিক বা সনাতন যুদ্ধ-প্রক্রিয়ায় সমুত্তর দেয়ার প্রস্তুতি নিতে হয়। বাস্তবিকপক্ষে, ১৯৭৫ সনে সাইগনের পতন অবধি মার্কিন সরকার ক্রমান্বয়িকভাবে তার নিবারক কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে প্রবৃত্ত থাকে এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধে এক প্রত্যক্ষ পক্ষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এর ফলে উদ্ভূত কৌশলগত আন্তক্রিয়ায় ওয়াশিংটন ভিয়েতনামী কম্যুনিস্টদের হুমকি মোকাবিলা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং প্রতিপক্ষের কৌশলগত পদক্ষেপ প্রতিহত বা নিষ্ক্রিয় করার জন্য আরো অধিক সম্প্রসারিত কর্মপন্থা গ্রহণে পরোচিত হয়।[৬১]

এভাবে ওয়াশিংটন হ্যানয়ের প্রলম্বিত সংগ্রামভিত্তিক রণনীতির প্রত্যুত্তরে তার স্বকীয়, অপ্রতিসম রণনৈতিক ধারায় মার্কিন নিজস্ব কৌশলগত নীতির নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। ভিয়েতনামের বিপ্লবীরা তাদের প্রলম্বিত বিপ্লবী যুদ্ধের একটি সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ রণনৈতিক কাঠামোর অধীন যখন বিভিন্নতর কৌশলমূলক চালবাজির আশ্রয় গ্রহণ করে প্রত্যুত্তর আমেরিকা বিভিন্ন পর্যায়ে পাঁচটি রণনীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায় এবং প্রতিটি পর্যায়ে রণনীতির সঙ্গে বহুলাংশে সামঞ্জস্য রেখে অনেক ধরনের রণকৌশল উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন করে। আমেরিকা প্রথমে তার সমুদ্রভিত্তিক নৌবহর ও স্থল ঘাঁটিভিত্তিক বিপুল সামরিক শক্তি সমাবেশ করে চিহ্নিত কম্যুনিস্ট শত্রুকে নিবৃত্ত করতে, আর সচেষ্ট হয় উপদেষ্টামূলক ভূমিকা গ্রহণের মাধ্যমে সাইগনস্থ তার তাবেদার সরকারকে সাহায্য ও সমর্থন দিয়ে পরিপুষ্ট করতে। এসবের প্রত্যুত্তরে ভিয়েতনামী কম্যুনিস্টরা জনগণকে রাজনৈতিক সংগ্রামে দীক্ষিত করে এবং পুনরায় সশস্ত্র সংগ্রামও শুরু করে। কম্যুনিস্ট শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করার মানসে যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামে বিপ্লবী অভ্যুত্থান ও বিদ্রোহ দমনমূলক রাজনৈতিক-সামরিক যন্ত্র ও প্রক্রিয়া প্রবর্তন করে। এসবের জবাবে হ্যানয় ও তার সহযোগীরা রাজনৈতিক এবং সশস্ত্র সংগ্রাম অধিকতর জোরদার করে।

www.pathagar.com

এর পর যুক্তরাষ্ট্র সনাতন ধারায় সীমিত যুদ্ধের রণনীতি নিয়ে ভিয়েতনামে বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায় এবং এ উদ্দেশ্যে খোদ মার্কিন নৌ-সেনা ও সামরিক বাহিনী মোতায়েন করে ভিয়েতনামের রণাঙ্গনে যাতে কম্যুনিস্ট শত্রুর ওপর মার্কিন অভিলাষ চাপিয়ে দেয়া যায়। আগ্রাসী পরাশক্তির অভিলাষ ব্যর্থ করে দিতে গিয়ে ভিয়েতনামী বিপ্লবীরা শুধু তাদের রাজনৈতিক ও সামরিক কর্মপন্থা তীব্রতর করে নি, শত্রুর অভ্যন্তরীণ বিরোধ বা প্রতিপক্ষের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ নেয়ার উদ্দেশ্যে কূটনৈতিক কলাকৌশলেরও আশ্রয় গ্রহণ করে। বিপ্লবীদের গৃহীত কূটনৈতিক কৌশল ও চালবাজির আরো উদ্দেশ্য ছিল বিশেষত অপ্রতিসম মার্কিন শক্তির বিরুদ্ধে গণচীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের উদার এবং সক্রিয় সাহায্য ও সমর্থন আদায় করা। কম্যুনিস্ট শক্তিদ্বয় তাদের ক্রমবর্ধমান বিরোধ ও পরস্পরবিরোধী রণনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থতায় ভিয়েতনামী বিপ্লবীদের সমর্থনে সক্রিয় সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসে।

উল্লেখ্য, ভিয়েতনামের রণাঙ্গনে আমেরিকা চিরাচরিত কিন্তু উন্নতমানের সামরিক প্রযুক্তি, দ্রুতগামী বিমানযান, ভয়াবহ ক্ষমতাসম্পন্ন জঙ্গী বিমান ও মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্রের সমাবেশ ঘটায়। আণবিক বা চিরাচরিত রণক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের এই অপ্রতিসম অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক শক্তির দৌরাত্ম্য প্রতিহতকল্পে এবং যুদ্ধে সামগ্রিক ভারসাম্যতা অর্জনে হ্যানয় ও তার মিত্রবাহিনী গেরিলা ও জনযুদ্ধের পথ বেছে নেয়। এ যুদ্ধে তারা আকস্মিকতা, দ্রুত গতিশীলতা ও প্রতারণামূলক বহুবিধ রণকৌশল অবলম্বন করে। কম্যুনিস্ট বাহিনীর চলাচল বা পাচারপথসমূহ ভালোরূপে খুঁজে বের করা এবং রাতের আঁধারে গেরিলাদের অবস্থান সুষ্ঠুরূপে চিহ্নিত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র অতি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন তল্লাশি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্রবর্তন করে ভিয়েতনামের রণাঙ্গনে। এর জবাবে হ্যানয় ও তার সহযোগী বাহিনী অধিকতর কঠোর পরিশ্রমের ব্রতী হয় যাতে গোপনীয়তা সহকারে, ছদ্মবেশী হয়ে বা আচ্ছাদিত থেকে বিপ্লবী তৎপরতা সম্প্রসারণ করা যায়। আমেরিকা ও তার মিত্রবাহিনী বর্ধিত হারে হেলিকপ্টার ও জঙ্গী বিমান ব্যবহার করে যাতে যুদ্ধরত কম্যুনিস্ট-বিরোধী বাহিনী পূর্বের চাইতে দ্রুততর গতিতে সাহায্য ও সমর্থন পেতে পারে। প্রত্যুত্তরে হ্যানয় ও তার সহযোগী বাহিনী শত্রুর ভয়াবহ বিমান শক্তি এড়িয়ে যাবার জন্য প্রবলতর প্রচেষ্টা চালায় এবং শত্রুর অলক্ষ্যে প্রচণ্ডতর হামলা পরিচালনা করার কাজে সক্রিয় সংগ্রাম অব্যাহত রাখে। যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রবাহিনী প্রতিপক্ষকে পরাভূত ও পর্যুদস্ত করার জন্য কম্যুনিস্ট শত্রুসেনা ও তাদের সমর্থকদের হতাহতের সংখ্যা অধিকতর বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। অন্যদিকে উত্তর ভিয়েতনামী বিপ্লবী জনতা ও তাদের দক্ষিণাঞ্চলীয় সহযোগীরা বৃহত্তর সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে জনগণকে এমনি সমাবেশ করে যে

www.pathagar.com

মাও'র ভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বলা যায়, "তারা সৃষ্টি করে এক মানব-সমুদ্র আর শত্রুকে তলিয়ে দেয় এর মাঝে।"[৬২]

সত্তর দশকের প্রথম দিকে ভিয়েতনাম যুদ্ধের আপোষ নিষ্পত্তিকল্পে প্যারীতে অনুষ্ঠিত কূটনৈতিক দরকষাকষিকালে আমেরিকা প্রকৃতপক্ষে কৌশলগত চালবাজিতে রত থাকে। এ সময়ে যুক্তরাষ্ট্র একটি শান্তি চুক্তির সপক্ষে সম্মতি প্রদান করে, কেননা এতে মার্কিন যুদ্ধবন্দিদের অবিলম্বে মুক্তিদানের বিধান ছিল এবং এতে পরবর্তী কূটনৈতিক আলোচনায় কোরীয় শান্তি আলোচনার অনুকরণে অব্যাহত অচলাবস্থা উদ্ভূত হবে বলে ধরে নেয়া হয় যাতে সাইগনস্থ আমেরিকান তাবেদার সরকার তার স্বাধীন সত্তা জিইয়ে রাখতে পারবে। কিন্তু হ্যানয় সরকারও কৌশলগত ধোকাবাজিতে কম পটু ছিল না। তারা তাদের প্রলম্বিত যুদ্ধজনিত রণনীতির আক্রমণমূলক ধারা আরো জোরদার করে এবং এরূপ কৌশলমূলক ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত হয় যাতে ভিয়েতনামে পুনরায় কোনোরূপ অচলাবস্থা উদ্ভব না হয়। একথা আর বলার অবকাশ নেই যে, শেষাবধি আমেরিকার প্রায় অবিরামভাবে যুদ্ধ সম্প্রসারণমূলক কর্মপন্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সত্ত্বেও প্রতিপক্ষের গুণগত শ্রেষ্ঠতর কৌশলগত প্রচেষ্টার সম্মুখে ভিয়েতনামে তাদের হার মানতে হয়।

এভাবে ভিয়েতনামে আমেরিকার সামরিক ও কৌশলগত অভিজ্ঞতা একটি শিক্ষাপ্রদ অধ্যায়রূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে, কেননা এতে একটি অপ্রতিসম যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আমেরিকার নিবারক রণনীতির বাস্তবায়নের ব্যর্থ প্রচেষ্টার পরিচয় মেলে। উল্লেখ্য, ১৯৬২ সনের পর প্রথমে আন্তঃমহাদেশীয় দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র, পরে পোলারিস বাহিনী (Polaris forces) এবং পরিশেষে প্রতি নিবারক ব্যবস্থা (Counter-deterrent systems) বা তথাকথিত দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র-বিধ্বংসী (anti-ballistic missiles) অস্ত্রশস্ত্র যখন পারমাণবিক ভাণ্ডারে সন্নিবিষ্ট হয় তখন উদ্ভূত বিশ্ব কৌশলগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতর মার্কিন পারমাণবিক প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকি সম্ভাব্য সোভিয়েত আগ্রাসন নিবৃত্তকরণে এর যথার্থ নিবারক ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এর পর থেকে আমেরিকার পারমাণবিক বিতর্ক ক্রমশ আপেক্ষিকভাবে নিম্নতর পর্যায়ে নেমে আসে এবং অনুরূপ হারে অতীতের ধাঁচে প্রণীত মার্কিন কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটে।[৬৩] তবু নিবারক দৃষ্টিভঙ্গি সংরক্ষণ ও জোরদার করা ছিল আমেরিকার রণনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।[৬৪]

অবশ্য, বিশ্বপর্যায়ে দু'টো পরাশক্তি দ্যঁতত বা সংলাপের মাধ্যমে তাদের কঠোরতর নিবারক দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছুটা নমনীয় রূপদান করে; দু'টো পরাশক্তিই তাদের সামরিক বাহিনী ও শক্তিতে মোটামুটি ভারসাম্যতা বিধানে সম্মত হয় এবং পরবর্তীকালে, ১৯৭২ সনের কৌশলগত অস্ত্র সীমিতকরণ চুক্তিতে

www.pathagar.com

তাদের পারস্পরিক সমঝোতা বিধিবদ্ধ হয়, যদিও এর ফলে ভিয়েতনামের মতো ক্ষুদ্র দেশসমূহের প্রতি পরাশক্তিদ্বয়ের জাতীয় নীতির সামরিক মাত্রা প্রভাবিত হয় নি, কিংবা তাদের পরস্পরের তাবেদার সরকারসমূহের নীতি-কৌশলও এতে পরিবর্তিত হয় নি।

আরো স্পষ্টতরভাবে বুঝাতে হলে বলতে হয়, পরাশক্তিদ্বয় তাদের কৌশলগত নিবারক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের মাধ্যমে একে অপরকে বিশ্ব পর্যায়ে নিবৃত্ত করে বটে, কিন্তু প্রতিপক্ষের তাবেদার সরকারসমূহকে নিবৃত্ত করা তাদের পক্ষে সহজ হয় নি। তাই নিবারক দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত কূটনৈতিক চালবাজির বড় ভয় বিশ্ব পর্যায়ে বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে সরাসরি দ্বন্দ্বে বিজড়িত হওয়া নয়, বিপদ হচ্ছে স্থানীয় পর্যায়ে বৃহৎ শক্তিসমূহের স্থানীয়ভাবে অপ্রতিসম যুদ্ধে বিজড়িত হবার সম্ভাবনা।[৬৫] এটাই হচ্ছে সমসাময়িক আন্তর্জাতিক ভাবধারা-উদ্ভূত কৌশলগত প্রক্রিয়ার এক পরিহাস। কেননা নিবারক দৃষ্টিভঙ্গি কার্যকর হতে হলে কিছুটা সম্প্রসারণমূলক কর্মপন্থা অবধারিত হয়ে পড়ে এবং অপ্রতিসম দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটে এ জাতীয় দ্বন্দ্বেরত প্রতিযোগী দু'পক্ষের মৌলিক প্রত্যক্ষ ব্যবধান বোধের কারণে উভয়ই নির্বারক বিমুখ বা দুর্নিবৃত্ত থাকে, দ্বন্দ্ব আরো সম্প্রসারিত হয় এবং অনিবার্য হয়ে পড়ে বিপথগামী সকল সামরিক কৌশলগত আন্তক্রিয়া।[৬৬]

উপসংহার

ভিয়েতনামে মার্কিন অভিজ্ঞতা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আমেরিকার নিবারক রণনীতি তার চিহ্নিত শত্রুকে নিবৃত করতে ব্যর্থ হয় এবং এ ধরনের নীতি উত্থাপন করে ঠিক যে সম্প্রসারণমূলক চালবাজি ও যুদ্ধ ওয়াশিংটন এড়াতে চেয়েছিলো তাতেই আমেরিকা বিজড়িত হয়ে পড়ে। আমেরিকার তত্ত্বীয় চিন্তাধারা ও বাস্তব নীতির মধ্যে এরূপ ফারাক বা অন্তর্দ্বন্দ্বের ব্যাখ্যা মিলবে ভিয়েতনামের সঙ্গে স্থাপিত অপ্রতিসম মৈত্রী সম্পর্কের সূত্র থেকে। এই অপ্রতিসম প্রেক্ষাপটের আলোকে এক প্রথিতযশা সামাজিক ঐতিহাসিকের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে নিবারক তত্ত্বকে "একটি দুঃখদায়ক, অন্তঃসারশূন্য তত্ত্বরূপে" অভিহিত করা যেতে পারে;[৬৭] কেননা, ভিয়েতনামে এর ব্যবহার যথার্থই এক দুঃখকর পরিস্থিতির উদ্ভব করে। এ তত্ত্বই আমেরিকাকে সামরিক কর্মসূচি গ্রহণের প্রত্যয়ে অত্যাসক্তভাবে ধাবিত করে। কিংবা ভিয়েতনামের যুদ্ধ সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ায় এ তত্ত্ব 'আদর্শগত পিচ্ছিলতা' সংযোজন করে[৬৮]–এও বলা যেতে পারে। এ তত্ত্বজনিত সামরিক কর্মপন্থা গ্রহণের ফলেই ভিয়েতনামে কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে এবং বার বার শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

www.pathagar.com

পরাশক্তিদ্বয়ের পারস্পরিক প্রতিসম সম্পর্কের পর্যায়ে সম্ভবত বলা চলে যে, নিবারক রণনীতি অনুসরণ আপেক্ষিকভাবে প্রাসঙ্গিক হয়েছে, কেননা এর ফলে দু'টো বিশ্বশক্তিকে বিজড়িত করে বৃহত্তর যুদ্ধ-বিগ্রহের সম্ভাবনা অনেকটা লাঘব হয়েছে। অবশ্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, এ ধরনের পরিস্থিতি এরূপ ইঙ্গিতও বহন করে যে, দু'টো প্রতিযোগী পরাশক্তি তাদের পারস্পরিক মতপার্থক্য দূরীকরণের মাধ্যমে শান্তি স্থাপনার্থে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্বুদ্ধ না হয়ে শুধুমাত্র তাদের মধ্যে অনিবার্য যুদ্ধ স্থগিত রাখার প্রচেষ্টাতেই লিপ্ত। বিগত তিন দশকের অধিককাল পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র যুদ্ধ ও হিংসাত্মক প্রক্রিয়ার এক অভাবিত ভয়াবহ সম্ভাবনা জিইয়ে রাখে এবং বিশ্ব পর্যায়ে পারস্পরিক সম্পর্ক সম্প্রসারণমূলক ভয়ভীতি বিজড়িত অতি সূক্ষ্ম কলাকৌশল উদ্ভাবন ও অত্যাধুনিক অস্ত্র লাভের প্রতিযোগিতায় নিমগ্ন।[৬৯] তাই এটা যথার্থই মন্তব্য করা হয়েছে যে নিবারক ভিত্তিক রণনীতি "কূটনৈতিক ও আদর্শিক নীতিমালাসমূহকে এক অপরিজ্ঞাত ধাঁচের বন্ধনে বিদ্ধ করে; এতে যুদ্ধ স্থগিত হয় বটে, কিন্তু একই সঙ্গে শান্তিবিধানও স্থগিত হয়।"[৭০]

ভিয়েতনামে ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র নিবারক রণনীতির প্রতি নিষ্ঠা অব্যাহত রাখে, কেননা আমেরিকার শান্তির অভিলাষ ও অধিকতর শক্তিশালী নিরাপত্তার কামনা-দু'টোই এ জাতীয় কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সম্পৃক্ত। ওয়াশিংটনের দৃষ্টিকোণ থেকে, তার বিশ্ব প্রতিযোগী শক্তিকেন্দ্র, মস্কো, তাঁর সামরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে, আর সে তার ক্ষমতার প্রসার কাজে নিয়োজিত রয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় এবং সর্বত্র সোভিয়েত রাজনৈতিক ও সামরিক ভূমিকা গ্রহণ করে মার্কিন স্বার্থের ওপর প্রত্যক্ষ আঘাত হানছে। তাই ভিয়েতনাম যুদ্ধকালীন সময়ের মতো আমেরিকা এখনো নিবারক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি অক্ষুণ্ন নিষ্ঠা রক্ষা করে চলছে এবং এ দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্বাসযোগ্যতা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে আমেরিকা তার বিভিন্নমুখী প্রত্যুত্তর দেয়ার মতো বলিষ্ঠ যোগ্যতা বজায় রাখাতে সক্রিয়।[৭১] এটা প্রতীয়মান হয় যে আমেরিকার নিবারক হুমকি, সামরিক বাহিনীর অবস্থানগত দৃষ্টিভঙ্গি ও পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র এরূপে নিয়োজিত রাখে যাতে সোভিয়েত ইউনিয়নকে যে কোনো ধরনের বিজয় লাভের অভিলাষে ব্যর্থ মনোরথ হতে হয়।[৭২] কিন্তু পারমাণবিক যুগে নিবারক রণনীতির ভিত্তিতে গৃহীত প্রতিরক্ষা দৃষ্টিভঙ্গি অতি ভয়াবহ ব্যাপক হত্যাযজ্ঞের সূত্রপাতই শুধু করবে না, রেগানের উদ্ধৃতি দিয়েই বলা যায়, এতে মানুষকে "প্রতিশোধমূলক দুর্দশার অপচ্ছায়ায় নিগৃহীত হতে হয়-আতঙ্কিত থাকতে হয় পারস্পরিক হুমকির মোকাবিলায়, আর এ হচ্ছে বর্তমানে মানুষের অবস্থার দুঃখদায়ক হলেও এক বাস্তব চিত্র।"[৭৩]

www.pathagar.com

তবু পরাশক্তিদ্বয়ের প্রতিসম সম্পর্কের পর্যায়ে, সার্বিক রাজনৈতিক বিষয়াদিতে তাদের সামগ্রিক দ্বান্দ্বিক প্রতীতি সত্ত্বেও কৌশলগত সমস্যাসমূহের প্রতি মস্কো ও ওয়াশিংটন উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় সমরূপ বলে প্রতিভাত হয়। তাদের সামরিক প্রযুক্তি প্রায় একই ধরনের ; উভয়ে একে অপরের অস্ত্র ব্যবস্থার গুণগত ও সংখ্যাগত দিক সম্পর্কে মোটামুটি অবহিত। বিগত দু'দশকব্যাপী দু'পক্ষ এমন কি অনেকটা প্রলম্বিত ধারায় অস্ত্র সংবরণ আলোচনায় নিযুক্ত এবং এ ক্ষেত্রে পারস্পরিকভাবে সম্মত কিছুটা সুফলও পাওয়া যায়। কিন্তু অপ্রতিসম সম্পর্কের পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্র একটি ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের সঙ্গে সংলাপে প্রযুক্ত হওয়া তার আন্তর্জাতিক প্রতিপত্তি ও বিশ্বাসযোগ্যতার পক্ষে হানিকর হতে পারে মনে করে আলাপ-আলোচনার পথ পরিহার করে চলে, অধিকতর আগ্রহী হয় সম্প্রসারণমূলক ক্রিয়াকর্মে। প্রকৃতপক্ষে, ওয়াশিংটন তার নিবারক ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় এখনো সক্রিয়ভাবে তৎপর যাতে বিশ্বাসযোগ্য হুমকির মাধ্যমে এ ক্ষমতা অধিকতর প্রসার লাভ করে, যদিও এর ফলে অপ্রতিসম পর্যায়ে আমেরিকাকে সম্প্রসারণমূলক প্রতিযোগিতায় আবার প্রবৃত্ত হতে হয়। ভিয়েতনামে আমেরিকার অভিজ্ঞতার আলোকে এরূপ অভিমত রাখা যেতে পারে যে, ওয়াশিংটনকে এমন সব নিবারক কূটচাল প্রক্রিয়ায় বিজড়িত হওয়া সম্পর্কে সজাগ হতে হবে যাতে একটি অপ্রতিসম দ্বন্দ্বের সম্প্রসারণমূলক সচল-সিঁড়িতে আবার জড়াতে না হয়। সম্ভবত, আমিরকার উচিত হবে ক্ষুদ্রদেশসমূহের সঙ্গে অধিকতর স্থায়ী স্বার্থের ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়ে তোলা, যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অবৈরীসুলভ মৈত্রী গড়ে উঠবে পারস্পরিক বন্ধনের ভিত্তিতে, আমেরিকা বুঝতে পারবে তার স্থায়ী স্বার্থ ও সাময়িক সুবিধের মধ্যে প্রকৃত ব্যবধান, আর ওয়াশিংটন বিরত থাকবে বিদেশের একটি পরনির্ভরশীল তাবেদার শোষক সরকারের প্রতি সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদর্শন থেকে।

পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট

১৯৮৪ সনে প্রবন্ধটি লেখা হয় নিবারক তত্ত্বের ব্যবহার ও যুদ্ধ সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া সম্পর্কিত পরাশক্তির চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনাকল্পে। প্রবন্ধে মুখ্যত ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিবারক তত্ত্বের চিন্তাধারা প্রসূত সম্প্রসারণমূলক কর্মকাণ্ডগুলো পর্যালোচনা করা হয়।

ভিয়েতনাম যুদ্ধ ছিল একটি অপ্রতিসম যুদ্ধ। এটা অবিদিত নয় যে, বিশ্বের সেরা পরাশক্তি হয়েও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামে কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে বিজড়িত হয় ১৯৫৪ সনে এবং ১৯৭৫ সনে সাইগনের পতন অবধি ওয়াশিংটন নিরন্তরভাবে সেই অপ্রতিসম যুদ্ধে জড়িয়ে

www.pathagar.com

ছিল। এই সময়ে মার্কিন পদক্ষেপগুলো গৃহীত হয় নিবারণ তত্ত্ব বাস্তবায়নের নামে, সাইগনে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি তাবেদার সরকার, যে সরকারের ভিত্তি ছিল মার্কিন সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা, ভিয়েতনামী জনগণের জনপ্রিয় সমর্থন নয়। সেই তাবেদার সরকারকে সমর্থন দিতে গিয়ে এবং ভিয়েতনামী কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে সম্প্রসারণমূলক যুদ্ধের কর্মপন্থা গ্রহণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্ররোচিত হয়, ২১০ বিলিয়ন ডলারের ওপর ব্যয় করে, প্রায় ৫৬০০০ মার্কিন সামরিক বেসামরিক প্রাণ হারায়, ভিয়েতনাম রণাঙ্গনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চেয়েও বেশি টন বোমা ফেলা হয়। পারমাণবিক বোমা ছাড়া প্রায় সব ধরনের অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার চলে, ভিয়েতনাম রূপান্তরিত হয়, একটি ইলেকট্রনিক রণাঙ্গনে। এসব বহুবিধ রণকৌশল ও অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োগ হয় নিবারক তত্ত্বের নামে, পর্যায়ক্রমে যুদ্ধ হয়েছিল সম্প্রসারিত। অথচ এ যুদ্ধে মার্কিন বিজয় ছিল সুদূরপরাহত।

তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে, যে বিষয়টির ওপর জোর দেয়া হয় তাহলো অপ্রতিসম যুদ্ধে নিবারক তত্ত্ব অকার্যকর বা অপ্রাসঙ্গিকতার বিষয়। এতে যুদ্ধের সম্প্রসারণ প্রবণতা অত্যন্ত প্রকট থাকে, অথচ প্রকৃত সাফল্যের নিশ্চয়তা অতি তুচ্ছ। ভিয়েতনামে একুশ বছরের মার্কিন অপ্রতিসম যুদ্ধের অভিজ্ঞতা, নিবারণ তত্ত্বের প্রয়োগ এ যুদ্ধের, সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে এসব যুদ্ধে অপ্রতিসম শক্তির বিপর্যয় প্রভৃতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ ছিল অত্যন্ত কঠিন কাজ। বরং ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভুল স্বীকার করে পুনরেকত্রিত ভিয়েতনামের বাস্তবতা মেনে নিতে অনেক সময় নেয়। তবে ভিয়েতনামের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একই ধরনের অপ্রতিসম যুদ্ধে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকে।

অন্যদিকে, অন্য পরাশক্তি, সোভিয়েত ইউনিয়ন, অনেকটা একই ধরনের প্রক্রিয়ায় আফগানিস্তানে অপ্রতিসম যুদ্ধে বিজড়িত হয়। মস্কো ভিয়েতনামে মার্কিন অভিজ্ঞতা থেকে আদৌ কোনোরূপ শিক্ষা গ্রহণ করে নি এবং প্রায় এক দশকব্যাপী সকল শিক্ষাকে উপেক্ষা করে বিজড়িত থাকে আফগানিস্তানে। এর ফলাফল এখন আর অজানা নয়। খোদ সোভিয়েত রাষ্ট্র ভেঙ্গে যায়, পরিসমাপ্তি ঘটে পরাশক্তিদ্বয়ের স্নায়ুযুদ্ধকালীন বিশ্বব্যাপী দ্বন্দ্বের এবং স্নায়ুযুদ্ধেরও অবসান হয়।

তাই এটা নিশ্চিত করে বলা চলে যে পরাশক্তির অপ্রতিসম যুদ্ধ এবং এ যুদ্ধে নিবারণ তত্ত্বের প্রয়োগ শুধুমাত্র যুদ্ধের প্রক্রিয়াকে সম্প্রসারণের দিকে ধাবিত করতে পারে, রুদ্ধ করে শান্তি ও স্থিতিশীলতার পথ। তাই এ ধরনের যুদ্ধ থেকে বিরত থাকাই শ্রেয় এবং এসব যুদ্ধে সম্প্রসারণশীল নিবারক তত্ত্বের প্রয়োগ করা বোকামির শামিল।

www.pathagar.com

তথ্যনির্দেশ

১. Herman Khan, *On Escalation* (New York : Hudson Institute, 1965); আরো দেখুন তাঁর *Thinking About the Unthinkable* (New York; Horizpn Press, 1962. পৃ. ১৮৫; Quincy Wright, "The Escalation of International Conflicts", *The Journal of Confict Resolution*, 9:4 (1965), পৃ. ৪৩৪-৪৪৯.

২. Patrick Morgan, *Deterrence* (Bevery Hills, Calif, : Sage, 1977); Noel Gayler, "Opposition to Nueclear Armament", *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* (September, 19830, পৃ. ১৭; Glenn H. Snyder, "Deterrence and Defense: A Theoretical Introduction", in John E. Endicott and Roy W. Staffond, Jr. (eds.) *American Defense Policy*. Fourth Edition (Baltimore and London: The John Hopkins University Press, 1977), পৃ. ৩৯.

৩. Juergen Dedring, *Recent Advances in Peace and Conflict Research. A Critical Survey* (London: Sage Publications, 1976), পৃ. ৮১, ১২৫, আরো দেখুন, Dieter Senghaas, "Conflict Formations in Contemporary International Society", *Journal of Peace Research*, No. 3 (1973), পৃ. ১৬৩-১৮৪.

৪. Klaus Jiirgen Gantzel, "Armament Dynamics in the East-West conflict; An Arms Race"? *Peace Science Society* (International). Papers, XX (1973) পৃ. ১-১২৪।

৫. Egbhert John, "Peace Researchers and Politics within the Field of Societal Demands." *Journal of Peace Research*, Vol. 20, No. 3 (1983), পৃ. ২৫৭

৬. অপ্রতিসম দ্বন্দ্বের তত্ত্বীয় প্রেক্ষাপট উপস্থাপিত করেন হোয়ান গালটুং নামক একজন নরওয়েজীয় প্রথিতযশা সমাজবিজ্ঞানী যিনি শান্তি গবেষণাকে একটি স্বতন্ত্র গবেষণা বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। এ সম্পর্কিত আরো ব্যাখ্যার জন্য এ গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য

৭. দ্রঃ Morgan, 'পূর্বোক্ত', Bernard Brodie, "The Anatomy of Deterrence", *World Politics*, XI (January 1959); Frederick H. Gareau, "Nuclear deterrence: A Discussion of the Doctrine", *Orbis*, V (Summer 1961)

৮. Paul F. Diehl, "Arms Races and Escalation: A Closer Look", *Journal of Peace Research*, Vol. 20, No. 3 (1983) পৃ. ২০৫

৯. Robert Jervis, "Deterrence Theory Revisited", *World Politics* (1979), পৃ. ২৮৯।

১০. বিশদ ব্যাখ্যার জন্য দেখুন 'ঐ' পৃ. ২৮৯-৩২৪, নিবারক আচরণ বিশ্লেষণ সম্বলিত একটি সাম্প্রতিক গ্রন্থ হচ্ছে, Allen S. Whiting, *The Chinese Calculus of Deterrence, India and Indochina* (Ann Arbor, Mass University of Michigan Press,1975)

www.pathagar.com

১১. Harry S. Truman, Memoris: Years of Trial and Hope (London: Hodder and Stoughton, 1965), পৃ. ৯

১২. Hans J. Morgenthau, The Political and Military Strategy of the United States," *The Bulletin of the Atomic Scientists*, 10:8 (October, 1954), পৃ.২৩২-৩২৭।

১৩. Chalmers M. Roberts, "How Containment Worked?" *Foreign Policy*, 7 (Summer 1972), পৃ. ৪১, আরো দেখুন, J. F. MacMaton, "Vietnam: Our world War II Legacy", *Air University Review*, 19: 5 (1968), পৃ. ৬০-৯৫

১৪. Lyndon Johnson's speech at John Hopkins University on 7 April 1965, U. S. Congress Senate Committee on Foregin Relations, *Background Information Relating to Southeast Asia and Vietnam,* Revised Edition, (Washington, D. C: U. S. General Printing Office, 1974), পৃ. ২৭১

১৫. Morton H. Halpenin, *Defense Strategies for the Seventies* (Boston: Little, Brown and Co., 1971) পৃ. ৪৩-৪৫, আরো দেখুন তাঁর *Contemporaty Military Stragegy* (London: Little, Brown and Co., 1967), পৃ. ৫০-৫৩; Urs Schwartz, American Strategy: The New Perspective (New York: Doubleday and Co., Ltd., 1960), পৃ. ৮০-৯৪

১৬. "*The Doctrine of Massive Response*", in American Foreign Policy, 1950-1955: Basic Documents, Vol. I (Washington, D. C.: General Printing Office, 1957), পৃ. ৮০

১৭. Col. Slavko N. Bjedaiac, "Unconventional Warfare, in the Nuclear Age", in Franklin Mark Osanka (ed.) Modern Guerrilla Warfare (New York: Free Press of Glencoe, 1962), পৃ. ৪৪৪

১৮. Documents on American Foreign Policy, 1954, পৃ. ৭-১৫, cit in Robert F. Randle, Geneva 1954: The Settlement of Indochinese War (Princeton : Princeton University Press, 1969), পৃ. ৩৬-৩৭

১৯. উদ্ধৃত, in 'ঐ', পৃ. ৭১.

২০. V. P., "Indochina : Gateway to South East Asia", The World Today, 7 : 6 (1971), পৃ. ২৪৭-৪৮

২১. John Foster Dulles, International Unity, Press Release, No. 316 Series 5., No. 19 (Wsashington, D. C. : General Printing Office, 1954), পৃ. ৬-৭

২২. John Foster Dulles, "Peace in Southeast Asia", Department of State Bulletin (14 June 1954), পৃ.৯২১-২৫

www.pathagar.com

২৩. NSC Policy Statement of January 1954, in United States-Vietnam Relations. 1954-1967. U.S. Department of Defense (Washington : U. S. General Printing Office, 1971), Book 9, পৃ. ২৩০

২৪. John Foster Dulles, "The Red Threat" in Department of State Bulletin (25, January 1954), পৃ. ১০৮

২৫. Randle, 'পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯

২৬. 'ঐ' পৃ. ৩০; আরো দেখুন, The United States Air Force in Southeast Asia, 1961-1973 (ed.) Carl Berger, Office of Air History (Washington, D. C. : General Printing Office, 1977), পৃ. ৫

২৭. Philippe Devillers and eam Lacouture, End of a War, Indochina, 1954 (New York : Prager, 1969; পৃ. ৭১-৭২, আরো দেখুন, Randle, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫-৫৭

২৮. NYT report (8 April 1954) cit. in Peter Chang, "United Action in Indochina : Dulles and the Alliance" Issues and Studies, VII:5 (February, 1972), পৃ. ৬৭

২৯. The Issues at Geneva, Press Release, No. 238, Series S. No. 15, 7 May 1954 (Washington, D. C. : General Printing Office, 1954), পৃ. ৫; আরো দেখুন, Cyrusal. Sulzerberger, A Long Row of Candles : Memoris and Diaries 1934-1954 (London : Macmillan, 1969), পৃ. ৮৩২-৩৩.

৩০. Dwight D. Eisenhower, The White House Years Mandate for Change, 1953-1956 (New York : Doubleday, 1963), পৃ. ৩৪৭

৩১. Anthony Eden. Full Circle : The Memoris of Sir Antaony Eden (London : Cassell and Co., 1960), পৃ. ১২৪

৩২. "Alliance and Deterrence", Department of State Bulletin (27 September, 1954), পৃ. ৪৩২

৩৩. 'ঐ'

৩৪. "Pacific Air Force," Air Force (May, 1973), পৃ. ৮৩

৩৫. Sannuel P. Huntington, The Common Defense (New York : 1961), পৃ. ৬৫

৩৬. Lansdate Team's Report on Covert Missions in 1954-55, in The Pentagon Papers, The Defense Department History of United States Decisionmaking on Vietnam. The Senator Gravel Edition, (Boston : Beacon Press, 1971), Vol. I. পৃ. ৫৭৪-৫৭৫

৩৭. 'ঐ', পৃ. ৫৭৮-৫৮৩

৩৮. 'ঐ', পৃ. ৫৭৬-৭৭; আরো দেখুন Donald Lancaster, The Emancipation of French Indochina (London : Oxford University Press, 1961), পৃ. ৩৪৩-৪৪; Bernard B.

www.pathagar.com

Fall, The Two Vietnams: A military and Political Analysis, Second Edition (New York : Praeger, 1967), পৃ. ১৫৩-৫৪

৩৯. Devillers and Lacouture 'পূর্বোক্ত পৃ. ৩৮৭-৩৯৫

৪০. Marvin Leonard Kalb and Elie Abel, The Roots of Involvement: The US in Asia, 1784-1971 (New York : Praeger, 1971), পৃ. ১০১-১০২

৪১. Washington Post report (30 September 19670, cit. in Jon N. Van Dyke, North Vietnam's Strategy for Survival (Palo Alto, Calif.; 1971 পৃ. ৩০

৪২. Vo Nguyen Giap, National Liberation War in Vietnam : General Line, Strategy and Tactics (Hanoi : Foreign Langwages Publishing House, 1971), পৃ. ৩১-৩৩।

৪৩. 'ঐ' পৃ. ৯২

৪৪. 'ঐ' পৃ. ৯২-৯৩

৪৫. দ্রঃ Who will win in South Vietnam? Hanoi : Foreign Lanruages Publishing House, 1663), পৃ. ৯; আরো দেখুন, On Problems of War and Peace (Hanoi : Foregin Languages Publishing House, 1964), পৃ. ৩০

৪৬. Bernard B. Fall. (ed.) llo Chi Minh on Revolution (London : Pall Mall Press, 1967), পৃ. ৩০৩ আরো দেখুন, Van Dyke, 'পূর্বোক্ত', পৃ. ৩০

৪৭. দ্রঃ Abul Kalam, "American Straegic Outlook vis-a-vis Indochina : An Appraisal," Bangladesh Ilistorical Studies, Vol. VII (1983), পৃ. ১০৭-১১৯

৪৮. 'ঐ'

৪৯. MSC Policy Statement of January 1954, United States-Vietnam Relations, 'পূর্বোক্ত' Book 9, পৃ.২৩০

৫০. NYT (18 November 1954) cit. in Kalb and Abel, 'পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭

৫১. The Pentagon Papers, 'পূর্বোক্ত' Gravel Edn. Vol. II, পৃ. ৪৩২

৫২. 'ঐ' পৃ. ৪৩৮ আমেরিকা কর্তৃক এ সময়ে প্রবর্তিত অন্যান্য সামরিক মিশনের মধ্যে ছিল যুদ্ধাস্ত্র প্রশিক্ষণ সংস্থা (Combat Arms Training Organization বা CATO). সাময়িক যন্ত্রাদি পুনরুদ্ধার মি•• (Temporary Equipment Recovery Mission বা TERM) এবং প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত শিক্ষক মিশন (Training Relations Instruction Mission বা TRIM).

৫৩. দ্রঃ The Pentagon Papers, 'পূর্বোক্ত' Gravel Edn. Vol. II পৃ. ২৪৯-৫০; আরো দেখুন দ্রঃ 'ঐ' Vol. II. ৪৩৩

৫৪. 'ঐ' Vol. II. পৃ. ৪৩৪-৩৫

www.pathagar.com

৫৫. বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন, Fall, The Two Vietnams, 'পূর্বোক্ত', পৃ. ২৪২-২৫৯, আরো দেখুন, Appendix II. পৃ. ৪১৯; Denis J. Duncanson, Government and Revolution in Vietnam (London : Oxford University Press, ১৯৬৭) পৃ. ২৬১-২৬৫

৫৬. এ জাতীয় অভিমতের সপক্ষে বিশদ ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, Abul Kalam, Peacemaking in Indochina ১৯৫৪-১৯৭৫, দ্বিতীয় অধ্যায় বিশেষ করে দ্রষ্টব্য

৫৭. Walt W. Rostow, "Countering Guerrilla Attack", in Osanka (ed.), 'পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৮-৬৯; আরো দেখুন Dean Rusk's News Conference, 17 November, 1961 in Background Information, 'পূর্বোক্ত', পৃ. ২৭৮

৫৮. Randle, 'পূর্বোক্ত' , পৃ. ৭১

৫৯. Col. Slavko N. Bjedajac, "Unconventional Warfare in the Nuclear Age." in Osanka (ed.), 'পূর্বোক্ত', পৃ. ৪৪৪

৬০. দ্রঃ Maxwell D. Taylor, The Unceriain Trumphet (New York : Harper and Row, 1960), পৃ. ৬-৭

৬১. আরো বিশ্লেষণের জন্য দেখুন Kalam, Peacemaking in Indochina, পৃ.৩৩৬-৩৮৬

৬২. "On Protracted War", in Mao Tse Tung, Selected Works (Paking : Foreign Languages Press, 1965), Vol. II. পৃ. ২০৪

৬৩. Michael Banks, "The Foreign Policy of the United States", in F. S. Northedge (ed.) The Foreign Polices of the Powers (London : Faber and Faber, 1968), পৃ. ৬০

৬৪. বর্ধিত ব্যাখ্যার জন্য দ্রঃ Kalam, Peacemaking in Indochina, পৃ. ৩৪৮-৩৮৩

৬৫. একটি স্থানীয় পর্যায়ের দ্বন্দ্বের এরূপ সম্ভাব্য সম্প্রসারণ সম্পর্কিত মতবাদ উপস্থাপিত করেছেন Curt Gasteyger in "Moscow and the Mediterranean", Foreign Affairs 46; 4 (July 1968), পৃ. ৬৮৫

৬৬. বিশদ ব্যাখ্যার জন্য দ্রঃ Abul Kalam, "Rerception and Peacemaking; The Case of American Intervention in Indochina 1954-1975", Journal of the Asiatic Society of Bangladesh, Vol. XXVII, No. 2 (December 1982), পৃ. ১৬৬-১৯৩

৬৭. E. P. Thomposn, "Deterrence and Addiction", The Yale Review (Autumn 1982), পৃ. ৩

৬৮. 'ঐ' ১৩

www.pathagar.com

৬৯. John J. Weltman, "Nuclear Devolution and World Order", World Politics, XXXII, No. 2 (January 1980), পৃ. ১৭০-১৭২

৭০. Thomposn, 'পূর্বোক্ত', ১-২

৭১. Ronald Reagan, "Peace and National Security", Vital Speeches, XLIX : 13 (15 April 1983), পৃ. ৩৮৬-৩৯০

৭২. Keith B. Payne, "Deterrence, Arms Control and US Strategic Doctrines", Orbis (Fall 1981), পৃ. ৭৫৩-৫৫

৭৩. Reagan, 'পূর্বোক্ত', পৃ. ৩৮৯

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

পরাশক্তি ও মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি *

ভূমিকা

মধ্যপ্রাচ্য মানব সভ্যতার জন্মস্থান। সভ্যতার শৈশব লগ্ন থেকে বিশ্বের এই ঘটনাবহুল অঞ্চলে উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করে আসছে। মধ্যপ্রাচ্যের অভ্যন্তরে যেমন বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক শক্তি অশান্ত অবস্থা সৃষ্টি করে আসছে, তেমনি বাইরের ক্ষমতালিপ্সু শক্তিসমূহ এর শুষ্ক মরুপ্রান্তর ও এর উর্বর উপত্যকার উত্তাল ধারায় আনাগোনা অব্যাহত রেখে আসছে। ১৯৪০এর দশকের শেষপাদ থেকে এ অঞ্চলে সংঘটিত হয় বেশ কয়টি মারাত্মক যুদ্ধ, ঘটে অনেক অভ্যুত্থান। বিপ্লবী যুদ্ধবিগ্রহ ও গেরিলা অভিযান এখানে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। এ অঞ্চলে আরো পরিলক্ষিত হয় বহুরূপী রাজনৈতিক লেনদেন, গড়ে ওঠে মৈত্রী যোগাযোগ, চলে অনেক ধরনের আর্থ-সামাজিক বৈপ্লবিক আন্দোলন এবং ঘৃণা-প্রচারণাও দেখা দেয়। এরূপ আরো বিচিত্র ধরনের সহিংস প্রক্রিয়ার পরিচয় মিলে মধ্যেপ্রাচ্যে।

তাই এ অশান্ত মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা করার চেয়ে অধিকতর মহতী উদ্দেশ্য আর কি হতে পারে? কিন্তু সহিংস ঘটনার কেন্দ্রভূমি মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি স্থাপনের বিষয় একটা নিছক অভিলাষ বা শুভ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ইচ্ছা মাফিক বা কোনোরূপ ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার মাত্র বলে বিবেচিত নয়। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত যে কোনো ভাবনা-চিন্তা বা পরিকল্পনা অবশ্যি হতে হবে সমকালীন আন্তর্জাতিক সিস্টেমের গতি প্রকৃতি ও মধ্যপ্রাচ্যের প্রক্রিয়াগত ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মধ্যপ্রাচ্যে পরাশক্তিদ্বয়ের অবস্থা, বিশেষ করে আরব-ইসরাইলী দ্বন্দ্বে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর আলোকপাত করে এ প্রবন্ধের এরূপ বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে যে, এ অঞ্চলে তখনি শান্তির পক্ষে অনুকূলে অবস্থা সৃষ্টি হবে যখন বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রধান সিস্টেম (System) কারক বা পরাশক্তিদ্বয় মধ্যপ্রাচ্যে তাদের নিজস্ব, পৃথক অপ্রতিসম (Asymmetric) উদ্দেশ্য ও অভিলাষ হাসিলের প্রক্রিয়া থেকে বিরত হবে, আর যখন তারা

---

* এ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর মানববিদ্যা কেন্দ্রের সেমিনার প্রবন্ধমালায়, প্রথম খণ্ড, জুন ১৯৮৫ সংখ্যায়।

www.pathagar.com

সক্রিয় হবে তাদের পারস্পরিক স্বার্থ ও তাদের আঞ্চলিক মিত্রদের স্বার্থ ও মতামতের প্রতিসমরূপ (Symmetric) সমন্বয় সাধনে।[১]

সিস্টেম কাঠামো ও মধ্যপ্রাচ্য

উপর্যুক্ত যুক্তির যথার্থতা ভালোরূপে বুঝতে হলে সমকালীন আন্তর্জাতিক সিস্টেমে পরাশক্তিদ্বয়কে নিয়ে গঠিত উপ- সিস্টেমের অবস্থা অনুধাবন করতে হবে এবং এ অবস্থাকে দেখতে হবে মধ্যপ্রাচ্য উপ-সিস্টেমের (Sub-system) সঙ্গে তাদের সমকালীন সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে।[২] এটা সম্ভবত বলা সঙ্গত যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষাবধি একটি নতুন আন্তর্জাতিক সিস্টেম (Internationa System) জন্মলাভ করে, যে সিস্টেম ক্রমশ ব্যাপক সংখ্যক রাষ্ট্রের সমন্বয়ে বিশ্বসম্প্রদায়ের একটি সার্বিক প্রতিনিধিত্বমূলক ভূমিকা গ্রহণ করে। অনেকটা প্রতীকধর্মী হলেও এ সিস্টেমে জাতিসংঘকে কেন্দ্র করে একটি বিশ্বকর্তৃত্বের সৃষ্টি হয়েছে, বিশ্বজুড়ে রয়েছে এর সাংগঠনিক অভিব্যক্তি ও যোগাযোগ।

এটা অস্বীকার করার বকাশ নেই যে, এ আন্তর্জাতিক সিস্টেমে দু'টি পরাশক্তির আন্তক্রিয়া হচ্ছে মৌলিক। দুটো পরাশক্তি এই সিস্টেমে এক অভাবিত সম্পর্কের ধারায় সম্পৃক্ত-এ সম্পর্কে কখনো চলছে লড়াই, কখনো বা দ্বন্দ্ব, আর কখনো কখনো একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলছে। দু'টি পরাশক্তি প্রতিযোগী সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তিজোটের নেতা হিসেবে, অপরিসীম সামরিক ও কৌশলগত ক্ষমতা বলে এবং জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসেবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের আন্তর্জাতিক সিস্টেমে কর্ণধারের ভূমিকায় অবতীর্ণ। দু'টো পরাশক্তির সিস্টেমকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ের বিশ্লেষকদের শিথিলভাবে ব্যবহৃত শব্দ দ্বি-মেরুকেন্দ্র-এর (Bipolarity) তাৎপর্য সামনে রেখে আন্তর্জাতিক সিস্টেমে তাদের অবস্থান ও আন্তক্রিয়াকে প্রধান উপ-সিস্টেম ('Dominant sub-system') বলা চলে।

অবশ্য মধ্যপ্রাচ্যকে দু'টি পরাশক্তি কিংবা অন্য কোনো শক্তিপুঞ্জের মাঝে অবস্থিত একটি সমন্বিত অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা ভ্রান্তিমূলক হবে। কেননা এ অঞ্চলে এরূপ অনেক "অতি স্থিতিহীন জাতির সমাবেশ ঘটে যারা প্রতিনিয়ত বৃহৎ শক্তিসমূহের নিরন্তর লড়াইয়ের শিকার হয়ে আসছে, আর যারা হচ্ছে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত— বলা চলে অনেকটা পরিচয়বিহীন।"[৩] তবু ১৯৫০-এর একদশকের মাঝামাঝি থেকে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন পশ্চিমী নিরাপত্তা পরিসীমার এক প্রান্ত ডিঙ্গিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের কৌশলগত রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ করে তখন থেকে এটা বলা সঙ্গত হবে যে সমগ্র আন্তর্জাতিক

www.pathagar.com

সিস্টেমের মতো মধ্যপ্রাচ্যে পরাশক্তি একরূপ প্রধান সিস্টেমের ভূমিকা গ্রহণ করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মধ্যপ্রাচ্যকে পরাশক্তির 'অধীন উপ-সিস্টেম' (Sub-ordinate System) রূপে অভিহিত করা যেতে পারে।[৪] তত্ত্বীয় আলোকে পরাশক্তির প্রধান ও মধ্যপ্রাচ্যের অধীন উভয় উপ-সিস্টেমকে বৃহত্তর আন্তর্জাতিক সিস্টেমের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বললে ভুল হবে না।

পরাশক্তিদ্বয়কে প্রধান সিস্টেমের ভূমিকায় তুলে ধরার মাধ্যমে অবশ্য এরূপ বুঝানো হচ্ছে না যে আন্তর্জাতিক সিস্টেমের দু'টি উপ-সিস্টেমের মধ্যে কোনোরূপ হুকুম-নির্দেশ ভিত্তিক কাঠামোগত সম্পর্কের বন্ধন রয়েছে বা পরাশক্তিদ্বয়ই একমাত্র মধ্যপ্রাচ্যের ভাগ্য-নিয়ন্তা বা এ অঞ্চলের শান্তির বিধায়ক। এরূপ বক্তব্য রাখা হয়েছে শুধুমাত্র এ অর্থে যে ঃ ১. পরাশক্তিদ্বয়ের প্রধান সিস্টেমে যে কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্ধন মধ্যপ্রাচ্যের অধীন সিস্টেমে অধিকতর প্রভাব ফেলতে পারে;[৫] ২. পরাশক্তিদ্বয় আন্তর্জাতিক সিস্টেমে তাদের বিশেষ অবস্থা ও পদাধিকারবলে মধ্যপ্রাচ্যকে নিয়ে বিশ্বপর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিশেষ বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে; ৩. পরাশক্তির সিস্টেমের তুলনায় মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্র বা কর্তৃপক্ষসমূহের কর্মপরিধি বা আশা-অভিলাষের পরিসর সীমিত ৪. পরাশক্তিদ্বয় আন্তর্জাতিক সিস্টেম সম্পর্কে তাদের নিজ নিজ ধ্যান-ধারণা ও বহুবিধ রণনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মধ্যপ্রাচ্যে অনুপ্রবেশ করে, এবং এসব কারণে উভয় পরাশক্তি অঞ্চলে সামরিক ও কৌশলগত উপস্থিতি স্থাপন করে, গড়ে তোলে মৈত্রী ব্যবস্থা, বন্ধুপ্রতিম মৈত্রী সম্পর্ক সংগঠনেও এ ইন্ধন যোগায়, অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করে - এমন কি, আঞ্চলিক দেশ ও জাতিসমূহের আচরণ নিয়ন্ত্রণে উভয়ে সচেষ্ট হয় এবং প্রকৃতপক্ষে পরাশক্তিদ্বয় তাদের নিজেদের ও তাদের আঞ্চলিক অনুগামীদের মধ্যে অপ্রতিসম ধারার পৃষ্ঠপোষক-তাবেদারভিত্তিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে।[৬]

বস্তুত, নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি–যেমন জাতীয় নিরাপত্তা - পরাশক্তিদ্বয়ের নিজস্ব নিরাপত্তা বিষয় এবং একই সঙ্গে তাদের আঞ্চলিক তাবেদারদের নিরাপত্তা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ, সাহায্য সহানুভূতি ও সরবরাহ, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনৈতিক-কূটনৈতিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি, যোগাযোগ ও কৌশলগত সুযোগ-সুবিধার অধিকার লাভ, এমন কি সাম্প্রতিককালে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতিবিধান, অর্থ বিনিয়োগ বা উদ্বৃত্ত অর্থের লগ্নির মত বিষয়াদিও পরাশক্তি এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের সঙ্গে প্রধান-অধীন মডেলভিত্তিক অপ্রতিসম সম্পর্কের মূলে কাজ করে।

উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত বিষয়াদির সঙ্গে বিজড়িত রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অবস্থান, রয়েছে এ অঞ্চলের অপরিসীম প্রকৃতিদত্ত ধনসম্পদ। এসবের ফলে মধ্যপ্রাচ্য একটি অতি লোভনীয় অঞ্চলে পরিগণিত হয়,

www.pathagar.com

বিশ্বশক্তিসমূহের শ্যানদৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এতে, আর আন্তর্জাতিক সিস্টেমে শক্তিসাম্যের দ্বন্দ্বে মধ্যপ্রাচ্য একটি বিশেষ শক্তিদ্বন্দ্বের অধিক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু বিগত কয়েক দশকে মধ্যপ্রাচ্যে উত্তরোত্তর একটি বিচিত্রধর্মী-বহুমেরুরূপা (Heterogeneous-multipolar) সিস্টেম হিসেবে প্রতিভাত হয়। কেননা এ সিস্টেমের ধারাবাহিকতায় শুধু যে অভাব রয়েছে তা' নয়, রয়েছে এর কেন্দ্র ও উপকেন্দ্র যা আবার বিভিন্ন সময়ে রূপান্তরিত হয়ে চলছে। এ অঞ্চলের দেশগুলোতে আদর্শ এবং আনুগত্য নিয়ে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বও বর্তমান। এছাড়া এ অঞ্চলের রয়েছে সহজাত স্থিতিহীনতা এবং সর্বোপরি এ অঞ্চলের রাষ্ট্র ও জাতিসমূহের মধ্যে সদা-সর্বদা দ্বান্দ্বিক ক্রিয়াকর্ম চলে আসছে, যদিও এরূপ আচরণ অনেকটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করে। এ ধরনের দ্বন্দ্বমুখর ও স্থিতিহীন অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে হলে স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বশান্তির পথও সুগম হবে।

মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি কাঠামো

এর পর প্রশ্ন থাকে-মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতির বিচিত্রধর্মী-অপ্রতিসম প্রকৃতির পেক্ষাপটে এ অঞ্চলের জন্য কি ধরনের শান্তি কাঠামো প্রস্তাব করা যেতে পারে?[৮] পরাশক্তিদ্বয় নিজেরা-ই যদি এ অঞ্চলে রাজনৈতিক কৌশলগত স্বার্থলাভের নিমিত্তে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত না হতো ত'াহলে হয়তো এরূপ প্রস্তাব করা যেত যে তাদের উচিত হবে মধ্যপ্রাচ্যে জোরপূর্বক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয় হওয়া। অবশ্য 'জোর' কথাটা শান্তির সঙ্গে বেমানান, আর রাজনৈতিক বিবর্তন প্রক্রিয়া বিরুদ্ধ। উপরন্তু, মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে পরাশক্তির সম্পর্ক-ই তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মৌলিক প্রতিপাদ্য বিষয় নয়; বরং তাদের বিশ্বব্যাপী বহুমুখী সম্পর্কের ক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্ব অন্যান্য পারস্পরিক বিষয়ের চাইতে অপেক্ষাকৃত কম। দ্বিতীয়ত, শান্তির অনুকূল পদক্ষেপ হিসেবে সম্ভবত এরূপ দাবি করা যেত যে, মধ্যপ্রাচ্যকে বৃহৎ শক্তির দ্বন্দ্বমুক্ত বা নিরপেক্ষ অঞ্চল বলে ঘোষণা করা হোক।[৯] কিন্তু আন্তর্জাতিক সিস্টেমে সার্বিকভাবে মাধ্যপ্রাচ্য এরূপ অপরিহার্য অঞ্চল ও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে এ অঞ্চলকে কখনো যথার্থ নিরপেক্ষ রূপ দেয়া যাবে না যে-অর্থে পরাশক্তির প্রভাব ও স্বার্থবলয় থেকে সুদূরে অবস্থিত বলে অন্য কোনো এলাকাকে এভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কেননা, এ অঞ্চলে ইতিমধ্যেই দু'টি পরাশক্তির উপস্থিতির ফলে বেশ অনেকটা মেরুকরণ ভাব পরিলক্ষিত হয় এবং আরো লক্ষণীয় এই যে এ অঞ্চলে মেরুকরণ রূপ পরিগ্রহ করে বিচিত্রধর্মী - অপ্রতিসম (Hetero-asymmetric) প্রেক্ষাপটে।[১০]

www.pathagar.com

এসব বহুবিধ কারণে পরাশক্তিদ্বয়কে নিয়ে মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কিত একটি ব্যাপক শান্তি পরিকল্পনা প্রণয়ন কঠিন। তবু এই উপ-সিস্টেমের শান্তি প্রক্রিয়ায় পরাশক্তিদ্বয়ের অগ্রাধিকার ভিত্তিক ভূমিকা বা করণীয় কর্তব্য হিসেবে কিছুটা রূপরেখা উপস্থাপন করা যেতে পারে। সর্ব প্রথমে এটা উল্লেখ করা সমীচীন হবে যে, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির একটি পূর্বশর্ত হচ্ছে উভয় পরাশক্তির একরূপ মোটামুটি সমঝোতা। প্রস্তাবিত বিষয়টি আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলা যেতে পারে – মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে কোনো স্থিতিবিধান করতে হলে বা এ অঞ্চলে শান্তির অনুকূলে বিবর্তন ঘটাতে হলে দু'টি পরাশক্তিকে নিয়ে গঠিত প্রধান দ্বি-মেরুকেন্দ্রিক সিস্টেমের (Dominant bipolar system) পুরোপুরি পারস্পরিক যোগাযোগ, আলাপ-আলোচনা, সহযোগিতা এবং সম্ভবত উভয়ের নিশ্চয়তা বিধান অবধারিত। এরূপ প্রস্তাবনার পেছনে বর্তমানকালের রাজনৈতিক, সামরিক এবং কৌশলগত বাস্তবতা ছাড়া ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটও তুলে ধরা যেতে পারে। আরব-ইসরাইলি দ্বন্দ্বে পরাশক্তিদ্বয়ের ভূমিকার প্রেক্ষিতে এ যুক্তির ঐতিহাসিক পরিচয় মিলবে। ১৯৪৭ সনে দু'টো পরাশক্তির যৌথ উদ্যোগে জাতিসংঘে ফিলিস্তিন বিভক্তিকরণ পরিকল্পনা উত্থাপিত হয়, উভয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে ইসরাইলি রাষ্ট্রের পত্তনে, আর শুরু হয় বর্তমান পর্যায়ের আরব-ইসরাইলি দ্বন্দ্ব। স্বাভাবিকভাবেই এ দ্বন্দ্বের নিরসনও উভয় পরাশক্তির-ই দায়িত্ব।

প্রকৃতপক্ষে পরবর্তীকালে উভয় পরাশক্তির সক্রিয় প্রচেষ্টার ফলে মধ্যপ্রাচ্যে আগ্রাসী তৎপরতা নিবারণ সম্ভব হয়। উল্লেখ্য, ১৯৫৬ সনে সুয়েজ যুদ্ধের সময়ে জাতিসংঘে দু'টি পরাশক্তি কৌশলমূলক কূটনৈতিক যোগাযোগের ফলে মিশরে যৌথ ইঙ্গো-ফরাসি-ইসরাইলি আগ্রাসন বন্ধ করা সম্ভব হয়, আগ্রাসী বাহিনী হাত গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়, আর জাতিসংঘের শান্তিবাহিনী মিশরে ইসরাইলি সীমানা বরাবর শান্তিরক্ষার কাজে মোতায়েন হয়। ১৯৬৭ সনে জুন যুদ্ধের সময়ে দু'টি পরাশক্তির উচ্চতম পর্যায়ে 'হট-লাইন' কূটনৈতিক যোগাযোগের (Hot-line communication) ফলে জাতিসংঘে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব হয়, গৃহীত হয় নিরাপত্তা পরিষদে প্রখ্যাত প্রস্তাব-২৪২, যেটা কিছুটা দোষক্রটি সত্ত্বেও, এখনো আরব-ইসরাইলি সমস্যার সমাধানের মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত। ১৯৭৩ সনে অক্টোবর যুদ্ধের প্রথম দিকে দু'টি পরাশক্তি তাদের নিজ নিজ অনুগামী রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেও পরে উভয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে দ্বন্দ্ব-বিরতি প্রস্তাবসহ সমস্যার সার্বিক সমাধানে যৌথ ভূমিকা পালনে সম্মত হয় (দ্রঃ প্রস্তাব ৩৩৮) এবং পরবর্তীকালে উভয়ের সহ-সভাপতিত্বে জেনিভা শান্তি

www.pathagar.com

সম্মেলনেও অনুষ্ঠিত হয়। উভয় পরাশক্তির সহযোগিতার ফলেই তখন দ্বন্দ্ব-বিরতি কার্যকর করা ও বিবদমান পক্ষসমূহের সৈন্য পিছিয়ে নেয়া সম্ভব হয়।[১১]

দুই পরাশক্তির যৌথ সহযোগিতার এরূপ ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত মধ্যপ্রাচ্য শান্তির ব্যাপারে যেমন তাদের সাফল্যের স্বাক্ষর বহন করে, তেমনি তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এ বলা সঙ্গত যে মধ্যপ্রাচ্যে কোনো পরাশক্তি শুধুমাত্র তার নিজস্ব স্বার্থের অনুকূলে একক বা একতরফাভাবে কোনো শান্তি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সক্রিয় হলে তা' ব্যর্থ হতে বাধ্য। কেননা এ জাতীয় একতরফা শান্তি পরিকল্পনা স্বাভাবিকভাবেই উদ্যোক্তা পরাশক্তির অপ্রতিসম অভিলাষের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা, বঞ্চিত করা প্রতিযোগী পরাশক্তিকে। কিন্তু একদিকে মধ্যপ্রাচ্যে দ্বি-মেরুকরণের প্রভাব, অন্যদিকে এ অঞ্চলের বিচিত্রধর্মী-বহুমেরুকেন্দ্রীক সিস্টেম চরিত্রের ফলশ্রুতিতে চূড়ান্ত পর্যায়ে এ জাতীয় একতরফা 'শান্তি পরিকল্পনা'ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। কেননা আঞ্চলিক সিস্টেমের বিচিত্রধর্মী-বহু মেরুকেন্দ্রীক চরিত্র অন্য পরাশক্তিকে শূন্যমানজনিত পাল্টা-কূটচাল অব্যাহত রাখার সুযোগ প্রদান করবে যাতে তার রাজনৈতিক যোগসূত্র বা বন্ধন সুদৃঢ় থাকে, আর সামরিক ও কৌশলগত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হতে হয়। এ জাতীয় প্রতিযোগী শূন্যমান কূটচাল প্রক্রিয়া শেষাবধি তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক শুধু বিনষ্ট করে না, প্রকৃত অর্থে আঞ্চলিক শান্তি ক্ষুণ্ন করে।

১৯৭০-এর দশকের শেষপাদ থেকে মার্কিন পৃষ্ঠপোষকতায় বাস্তবায়িত ক্যাম্প ডেভিড শান্তি মডেলের দৃষ্টান্ত ও এর পরিণতি উল্লেখ করা যেতে পারে। মস্কোর সঙ্গে যোগাযোগ যথাসম্ভব পরিহার করে মার্কিন প্রশাসনের মধ্যস্থতায় মিশর ও ইসরাইলের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক শান্তি প্রক্রিয়া সূচনা করা হয় এ আশায় যে ক্রমশ এ পৃথক দ্বি-পাক্ষিক মডেল ভিন্ন ভিন্নভাবে লেবানন, জর্ডন ও সিরিয়ার সঙ্গে ইসরাইলের শান্তি স্থাপনে সহায়ক হবে, ফিলিস্তিন উদ্বাস্তু সমস্যা'র সমাধান সম্ভব হবে। ওয়াশিংটনের দৃষ্টিতে, এসবের ফলশ্রুতিতে মধ্যপ্রাচ্যে সোভিয়েত প্রভাবের মূলোৎপাটন ঘটবে, আর বৃদ্ধি পাবে মার্কিন একক অপ্রতিসম প্রভাব ও প্রতিপত্তি।

বাস্তব পরিণতি কিন্তু অন্যরূপ। মার্কিন পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত একতরফা শান্তি প্রক্রিয়া এবং শান্তি রক্ষার ও পর্যবেক্ষণের নামে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদেশসমূহের বিমানবাহী ডিভিশন ও গোয়েন্দা যন্ত্রপাতি সহকারে সুয়েজখালের ওপারে উপস্থিতি, প্রায় একই সঙ্গে পারস্য উপসাগরে মার্কিন দ্রুত অভিযান বাহিনী (Rapid Deployment Force) মোতায়েন প্রভৃতি মস্কোর সন্দেহের উদ্রেক ঘটায়, সোভিয়েত হাত সম্প্রসারিত হয় আফগানিস্তানে। অংশত এর প্রত্যুত্তরে মার্কিন কংগ্রেস দ্বিতীয় কৌশলগত অস্ত্র সীমিতকরণ চুক্তি

www.pathagar.com

(Strategic Arms Limitation Treaty II) প্রত্যাখান করে, আর পরাশক্তি সম্পর্কে শুরু হয় দ্বিতীয় স্নায়ুযুদ্ধ। আঞ্চলিক পর্যায়ে ক্যাম্প ডেভিড মডেল শান্তি প্রক্রিয়া শুধু ব্যাহত হয় নি - মার্কিন অপ্রতিসম শক্তির কৌশলগত সহযোগিতা বন্ধনের চেতনা ও অব্যাহত মার্কিন সাহায্যে প্ররোচিত ইসরাইলি আগ্রাসনের শিকার হয় লেবানন, আর সেই দেশে তাদের-ই অশুভ মৈত্রী-ইন্ধনে বার বার আগ্রাসী তৎপরতা চলে ফিলিস্তিনী জনগণের ওপর শাব্‌রা ও শাতলায় নিরীহ শিশু-নারীপুরুষের ওপর সংঘটিত হয় ইতিহাসের এক জঘন্যতম হত্যাযজ্ঞ। (এভাবে মিশরের আনোয়ার সাদাতের কৌশলমূলক চালের (Tractical maneauvre) ফলশ্রুতিতে কায়রো বিনা যুদ্ধে ফিরে পায় তার বেশ কিছু ভূ-সীমানা, কিন্তু আরব জাতি হেরে যায় কৌশলগতভাবে (Strategically), হারায় তাদের অগণিত প্রাণ আর অমূল্য আত্মা) এ হচ্ছে একটি পরাশক্তির একতরফা শান্তি প্রতিষ্ঠার ফসল। একটি পরাশক্তির অপ্রতিসম মৈত্রী অভিলাষভিত্তিক শান্তি প্রক্রিয়ার নামে শূন্যমান ক্রীড়াজড়িত ("Zero-sum game") তৎপরতার পরিবর্তে প্রতিসম সম্পর্কের ভিত্তিতে পরাশক্তিদ্বয়কে অবশ্য সমঝোতায় পৌঁছতে হবে।[১২]

কিন্তু এই আশির দশকে পরাশক্তি সম্পর্ক হচ্ছে স্নায়ুযুদ্ধ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ঃ বিশ্বব্যাপী দু'টি পরাশক্তি যখন স্নায়ুযুদ্ধের ভাষা ও আচরণে একে অপরের মুখোমুখি তখন মধ্যপ্রাচ্যকে নিয়ে তাদের মধ্যে সংলাপ ও সমঝোতার প্রস্তাব রাখা নিরর্থক। মস্কো শুধুমাত্র ইউরোপে-ই সামরিক দ্যঁতাতের পাশাপাশি রাজনৈতিক দ্যঁতাত বাস্তবায়নে অভিলাষী নয়, ক্রেমলিন বলে আসছে যে "আন্তর্জাতিক সম্পর্কে প্রশমিত উত্তেজনা সর্বব্যাপীরূপ ধারণ করুক, দ্যঁতাত বিস্তৃত হোক এশিয়াসহ সব মহাদেশে, হোক অপরিবর্তনীয়"।[১৩] কিন্তু প্রতিপক্ষ থেকে এখনো অনুরূপ সাড়া মিলে নি। প্রকৃতপক্ষে, এ অঞ্চলের দ্বন্দ্বে দু'টি পরাশক্তি অপ্রতিসম ধারায় অব্যাহতভাবে বিজড়িত হয়ে থাকলেও তাদের বুঝতে হবে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি কতখানি বিস্ফোরক প্রকৃতির, অনুধাবন করতে হবে বিশ্বপর্যায়ে পারমাণবিক দ্বন্দ্ব কত আত্মঘাতী হতে পারে। তাই শান্তি সম্পর্কিত তাদের উদ্বিগ্নতা যদি কোনোরূপ তাৎপর্য বা অর্থ বহন করে তাহলে উভয়ের উচিত হবে আঞ্চলিক ও বিশ্বপর্যায়ে সমঝোতায় পৌঁছতে একযোগে কাজ করে যাওয়া।

সোভিয়েত কূটনৈতিক সীমাবদ্ধতা ও মার্কিন উদ্যোগ

এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয়ও উল্লেখ্য। মধ্যপ্রাচ্য হচ্ছে এমন একটি অঞ্চল যাতে বিশ্বের ছোট-বড় সবদেশের স্বার্থবিজড়িত এবং এতে শান্তি প্রক্রিয়া এরূপ জটিল বিষয়াদির সম্মুখীন যে এসবের সমাধানে/সমঝোতায় পৌঁছতে

www.pathagar.com

হলে দু'টি পরাশক্তির যে কোনো একটির মধ্যস্থ ভূমিকা অপরিহার্য। এই ভূমিকা ঐ পরাশক্তি যথাযথরূপে পালন করতে পারে যে - শক্তির মধ্যপ্রাচ্যে সংলাপভিত্তিক সমঝোতা সাধনের সাধ্য রয়েছে। আরব-ইসরাইলি সংকটময় এলাকায় ১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে মস্কোর প্রকাশ্য ইহুদিবাদ ও ইসরাইল-বিরোধী প্রচারণা, এমন কি তেল আবিষ্কারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন, সোভিয়েত উদ্দেশ্য সম্পর্ক বেইজিং-এর সংশয়, একইরূপ সন্দেহ ইসলামি বিশ্বে-বিশেষ করে আফগানিস্তানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপের পর থেকে এবং পশ্চিম ইউরোপে বাস্তব বা কল্পিত সোভিয়েত আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবিশ্বাস -এসব কিছুর ফলে মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি প্রক্রিয়ায় সোভিয়েত ভূমিকা স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন। তাই এ অঞ্চলের দ্বন্দ্ব-বিবাদসমূহের নিষ্পত্তি বিধানে ওয়াশিংটন মস্কোর চাইতে অধিকতর অগ্রণী ভূমিকা পালনে সক্ষম।

আরব-ইসরাইলি দ্বন্দ্বরেখার উভয় প্রান্তে নিঃসন্দেহে আমেরিকার অপেক্ষাকৃত সুষম কূটনৈতিক যোগাযোগ রয়েছে। আরো উল্লেখ্য, অতীতে এ দ্বন্দ্বের সংকটময় মুহূর্তগুলোতে সহিংস তৎপরতা সীমিতকরণে আমেরিকা সমস্যা-নিরসনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির নিদর্শন রাখে। কিন্তু বর্তমানে শান্তিবিধান কর্তা হিসেবে ওয়াশিংটন যথার্থই যদি বিশ্বাসযোগ্যতার প্রমাণ রাখতে চায় তাহলে তাকে সর্বতোভাবে এ ধরনের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে যাতে মস্কো তার কোনো পদক্ষেপ শত্রুতামূলক আলোকে দেখার কোনোরূপ সুযোগ না পায়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মার্কিন মধ্যপ্রাচ্য নীতির হাবভাব থেকে মনে হয় যে মার্কিন নেতৃবর্গ আঞ্চলিক শান্তি প্রক্রিয়ায় সোভিয়েত ভূমিকা উদ্দেশ্যমূলকভাবে হেয়প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট। এ অঞ্চলে দীর্ঘমেয়াদি সোভিয়েত কৌশলগত উদ্দেশ্যাবলী এবং এ অঞ্চলে মস্কোর শক্তি ও স্বার্থজনিত বাস্তবতার নিরিখে এটা কিছুতেই ভাবা সঠিক হবে না যে সোভিয়েত ইউনিয়ন মধ্যপ্রাচ্য থেকে হাত গুটিয়ে নেবে বা মার্কিন প্রভাব বলয় অঞ্চল হিসেবে এখানে সোভিয়েত স্বার্থকে বিকিয়ে দেবে। প্রকৃতপক্ষে মস্কো অভিযোগ করে আসছে যে, যুক্তরাষ্ট্র এ অঞ্চল ও সারা বিশ্বব্যাপী সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের উদ্দেশ্যে সক্রিয়। মস্কোর মতে এসব উদ্দেশ্য চরিতার্থতায় ওয়াশিংটন মধ্যপ্রাচ্যে বহুজাতিক পর্যায়ে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাধান খোঁজার পরিবর্তে দ্বি-পাক্ষিক পর্যায়ে পৃথক কূটচালে সক্রিয়-যাতে লাভবান হবে আমেরিকা স্বয়ং, হবে তার সম্প্রসারণবাদী মিত্র ইসরাইল এবং প্রতিক্রিয়াশীল আরব শাসকবর্গ।[১৪] যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যি বুঝতে হবে যে, পরাশক্তিদ্বয়ের পারস্পরিক পারমাণবিক নিবারক ক্ষমতা (Mutual nuclear deterrence) তাদের পরস্পরকে বাধ্য করছে সহযোগিতার পথে উদ্বুদ্ধ হতে, অবধারিত

www.pathagar.com

করেছে যথাসম্ভব দ্বন্দ্বমূলক পরিস্থিতি পরিহার করতে। লেবাননে মার্কিন ও মিত্রবাহিনী বিপর্যয় এবং ব্যর্থতা থেকেও আঞ্চলিক পর্যায়ে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে।

অতীতে আরব-ইসরাইলি বিষয় পরাশক্তিকে এক বিরাট চুম্বকের মত মধ্যপ্রাচ্যে আকৃষ্ট করে, কিন্তু বর্তমানে এটি আর একমাত্র বিষয় নয় যার ফলে তাদের সম্পর্কে তিক্ততার সৃষ্টি হচ্ছে। ভারতীয় উপকূলাঞ্চলে উত্তেজনা ও দ্বন্দ্বের চাপ সৃষ্টি মস্কো ওয়াশিংটনকে দায়ী করে আসছে।[১৫] অন্যদিকে আফগানিস্তানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপ মস্কোর মৌলিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যাপক সন্দেহের অবতারণা করে। আফগান সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধানে ক্রেমলিন অব্যাহত আগ্রহ ব্যক্ত করছে,[১৬] যদিও তথাকথিত সোভিয়েত "সীমিত সামরিক উপস্থিতির" ("Limited military contingent") কোনোরূপ পরিবর্তন হচ্ছে বলে মনে হয় না। সোভিয়েত ইউনিয়নের দক্ষিণ প্রান্তে সম্ভাব্য শত্রুভাবাপন্ন প্রতিবেশী সম্পর্কে মস্কোর উদ্বেগ ও আশংকা জাগা স্বাভাবিক, আর তাই অন্যদের উচিত হবে এ ধরনের পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকা যাতে সোভিয়েত নিরাপত্তার প্রতি হুমকি দেখা দিতে পারে। একই সঙ্গে, প্রত্যুত্তরে মস্কোরও উচিত হবে এ ধরনের কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া যাতে অন্যদের আশঙ্কাজনক অনুভূতি বা নিরাপত্তাহীনতা লাঘব পেতে পারে।

উল্লেখ্য, আঞ্চলিক ও বিশ্বপর্যায়ে উভয় পরাশক্তি পরস্পরের বিশ্বাসযোগ্য নিবারক ক্ষমতা অর্জন করে ও এরূপ ক্ষমতা উভয়ে বহাল রেখে চলেছে। এটাই হচ্ছে তাদের নিরাপত্তার প্রধান বাহন। তাই তাদের উচিত হবে মধ্যপ্রাচ্যের মত গ্রহপ্রভাবদুষ্ট অঞ্চলে অব্যাহত এবং প্রায়শ ব্যয়বহুল পৃষ্ঠপোষক- তাবেদারভিত্তিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার চাইতে শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতায় অধিকতর আগ্রহ প্রদর্শন করা। দু'টি পরাশক্তির উচিত হবে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে আর্থিক ও বাণিজ্যিক লেনদেন বাড়াতে সক্রিয় হওয়া। পশ্চিমা মিত্র ও সোভিয়েত জোটভুক্ত দেশসমূহের তৈল আমদানি ও বন্টন সম্পর্কিত স্বার্থের মত বিষয়াদি বিভিন্ন দেশের সার্বিক প্রয়োজন অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য, পশ্চিমা প্রযুক্তি হস্তান্তর ও পুঁজি বিনিয়োগ, মস্কো সাইবেরিয়ায় তার তৈল রিজার্ভ আহরণের উদ্দেশ্য কামনা করে আসছে। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সহযোগিতা ও বোঝাপড়ায় এ জাতীয় বিষয়াদি প্রয়োজন বিশেষে পরস্পরের কূটচাল বা দরকষাকষি ব্যবহার করা যেতে পারে।[১৭] ইরান-ইরাক যুদ্ধের মত আন্তঃরাষ্ট্রিক বিরোধজনিত বিষয় বা আন্তঃআরব কলহের মতো বিষয়াদিও জটিল এবং যথাসম্ভব উভয় পরাশক্তির উচিত হবে এসবের থেকে দূরে থাকা। অবশ্য যখন সম্ভব আরব লীগ বা ইসলামি সম্মেলন সংস্থার মতো আঞ্চলিক সংগঠন, এমন কি জোট-নিরপেক্ষ

www.pathagar.com

আন্দোলনকে উভয়ের উচিত হবে এসব বিরোধ-বিবাদের মীমাংসার যথাযথ ভূমিকা পালনে সাহায্য ও সমর্থন দেয়া।

মার্কিন মধ্যপ্রাচ্য নীতির সীমাবদ্ধতা

আরব-ইসরাইলি উত্তেজনা হ্রাস করতে হলে পরাশক্তিদ্বয়কে অবশ্যি প্যালেস্টাইনী জনগণের রাজনৈতিক অভাব-অভিযোগ বা তাদের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও রাষ্ট্র কায়েমের দাবি মেটাতে হবে। প্যালেস্টাইনের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি মস্কো প্রায় বিগত দু'দশক থেকে অব্যাহত রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সমর্থন দিয়ে আসছে, কিন্তু ইহুদি সম্প্রসারণবাদের শিকার এই ছিন্নমূল লক্ষ লক্ষ জনমানুষ এখনো মার্কিন মধ্যপ্রাচ্য নীতিতে কোনো ঠাঁই লাভ করে নি। বরঞ্চ অন্তরালবর্তী মার্কিন কূটচালের ফসল ক্যাম্প ডিভিড মডেল অনুসৃত পৃথক 'শান্তি' চুক্তি ধারা চলতে থাকলে প্যালেস্টাইনীদের নিছক ভবঘুরে উদ্বাস্তু হিসেবে আত্মসমর্পণ করতে হবে, আর প্যালেস্টাইনী সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান অন্ধকূপে নিপতিত হবে। প্রকৃতপক্ষে, বিগত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা সোভিয়েত বক্তব্যের সত্যতা বহন করে যে, ক্যাম্প ডেভিড ধারায় অনুসৃত ওয়াশিংটনের 'মধ্যস্থতা' ও ইসরাইলের প্রতি জোর মার্কিন সাহায্য ও সমর্থনের ফলে ইহুদি রাষ্ট্র উত্তরোত্তর আরো কঠোর ও আগ্রাসনমূলক তৎপরতা চালিয়ে আসছে এবং এসব কারণে মার্কিন নীতি শান্তি বিধানের চাইতে পক্ষপাতদুষ্ট ও আগ্রাসনের সক্রিয় সমর্থনে পরিচালিত বলে মনে হয়।[১৮] এর কারণ হচ্ছে একটি সতত পরিলক্ষিত 'ফিডব্যাক' (Feed-back) যোগসূত্রের উপস্থিতি ঃ মার্কিন-ইসরাইলি মৈত্রী যতই ঘনিষ্ঠতর হয়ে চলেছে যুক্তরাষ্ট্র ততই ইসরাইলের জুয়াড়ি সদৃশ আগ্রাসী তৎপরতায় সমর্থন যোগাতে বাধ্য হচ্ছে। ইসরাইল বর্তমানে, অন্তত বাহ্যত মার্কিন সমর্থনপুষ্ট হয়ে, প্যালেস্টাইনী মুক্তি সংস্থার যে কোনো অংশের সঙ্গে সংলাপে প্রবৃত্ত হতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে আসছে, আর প্যালেস্টাইনী কট্টরপন্থীরাও প্যালেস্টাইনী নরমপন্থীদের সীমিত লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে সংলাপে অংশগ্রহণ প্রত্যাখ্যান করে চলেছে।[১৯]

আরব-ইসরাইলি দ্বন্দ্বের এই বিষিয়ে উঠা পরিস্থিতি নিরসনে মস্কো মার্কিন প্রস্তাবিত আরব-ইসরাইলি সমস্যার একটি সার্বিক নিষ্পত্তির অংশ হিসেবে পর্যায়ক্রমিক পদক্ষেপের বিরোধিতা করছে না। নীতিগত বিষয় সামনে রেখে ক্রেমলিন যুক্তি প্রদর্শন করছে যে, শান্তি সম্পর্কিত যে কোনো মধ্যম পর্যায়ে সিদ্ধান্ত পূর্বনির্ধারিত, মৌলিক শান্তির রূপরেখার সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে হবে।[২০] এ যুক্তির যথার্থতা অস্বীকার করার উপায় নেই। আরব-ইসরাইলি দ্বন্দ্বের মূলে

www.pathagar.com

রয়েছে প্যালেস্টাইন সমস্যা। এই সমস্যার পাশ কেটে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির বিধান করা যায় না। প্যালেস্টাইনী জনগণের আর কিছুতেই ভাগ্যাহত ভবঘুরে হিসেবে আগ্রাসনের শিকার হতে দেয়া ও বিবদমান আরব রাষ্ট্রসমূহের পদলেহীর ভূমিকা গ্রহণ করতে দেয়া উচিত হবে না। এ বিষয়ে দু'টি পরাশক্তি ও তাদের স্থানীয় অনুগামী বা তাঁবেদারদের বক্তব্যের মধ্যে একটি আপোষ-রফা খুঁজে বের করতে হবে। ওয়াশিংটনকে অবশ্যি আমেরিকার "ইহুদিবাদ মহলের" (Jewish lobby) কঠোর প্রভাব থেকে মুক্ত হতে হবে, আঞ্চলিক ও বিশ্বপর্যায়ে সাম্প্রতিক অনুকূল পরিবর্তনের সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। ওয়াশিংটনকে যথার্থ একটি সৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত শান্তি বিধানকর্তা হিসেবে তার কার্যকারিতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে হবে।

উপসংহার

পূর্ব বক্তব্যের সূত্র ধরে আবার বলা চলে ঃ ওয়াশিংটনের উচিত হবে মস্কোর সঙ্গে পরাশক্তির মতৈক্যে পৌঁছার উদ্দেশ্যে একযোগে কাজ করা। এ প্রসঙ্গে প্রথিতযশা মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জোসেফ নাঈ জুনিয়র-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য।[২১] তাঁর মতে, যুক্তরাষ্ট্রের উচিত হবে সোভিয়েত ক্ষমতার প্রতিসাম্য বিধানের পাশাপাশি আর্থিক ও বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা, অব্যাহতভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে চলা, ক্রেমলিনকে সুসম্পর্কে উৎসাহ দেয়া-যাতে পরাশক্তির সম্পর্ক ক্রমশ স্বচ্ছরূপ ধারণ করে, নিরসন হয় ভ্রান্তিমূলক সংশয়, সমঝোতার পরিধিও বৃদ্ধি পায়। বিশ্বপর্যায়ে যদি পরাশক্তিদ্বয় এভাবে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কে উন্নতি সাধন করতে পারে তবেই তারা আরব-ইসরাইলি সম্পর্কে শান্তিপূর্ণ বিবর্তন ঘটাতে পারে, আঞ্চলিক দেশসমূহের সঙ্গেও তাদের সম্পর্কের স্থিতি বিধান করতে পারে।

পরাশক্তিদ্বয়ের সম্ভাব্য সহযোগিতা সম্পর্কে উপস্থাপিত এরূপ বক্তব্য সত্ত্বেও এটা বলা যেতে পারে যে, মধ্যপ্রাচ্যে সরাসরি ও স্থায়ী শান্তির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। পরাশক্তি সম্পর্কে জটিলতা বর্তমান আন্তর্জাতিক জীবনে বাস্তবতার-ই প্রতিফলন। যদি মধ্যপ্রাচ্য শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হতে হয় আন্তর্জাতিক সিস্টেম সম্পর্কে পরাশক্তিদ্বয়ের নিজ নিজ প্রত্যাশা ও এর বিভিন্ন উপসিস্টেমে বিরাজমান বাস্তবতার মধ্যে সমন্বয় সাধন প্রয়োজন হবে। মধ্যপ্রাচ্য ও বিশ্বশান্তি সমস্যা সম্পর্কে রাষ্ট্রনায়ক ও নীতি নির্ধারকদের অধিকতর সুস্থির ও বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টি সহকারে ভাবতে হবে, অসাড় বোলচাল যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে যার ফলে শান্তিপ্রক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে।

কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান বাস্তব পরিস্থিতির নিরিখে এ জাতীয় প্রস্তাবনা নিছক প্রকল্পিত ভাবনা-চিন্তা মনে হবে, মনে হবে দূরকল্পনামূলক বা অলীক

www.pathagar.com

ব্যাপার বলে। পূর্বেই বলা হয়েছে, মধ্যপ্রাচ্য শান্তির চাবিকাঠি এখন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে। কিন্তু সম্প্রসারণমুখী ও স্বার্থান্বেষী ইহুদিবাদের অশুভ প্রভাবের ফলে বর্তমানে ওয়াশিংটন মধ্যপ্রাচ্য সংকটের মর্মস্থল প্যালেস্টাইনের জনগণের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন।[২২] তবু নিরূপায় নরমপন্থী প্যালেস্টাইনী ও আরব নেতৃত্ব ওয়াসিংটনের সহানুভূতি আকর্ষণ করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত। রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে শান্তি প্রক্রিয়ার সাফল্য মূলে রাজনৈতিক সামধান বা নিগৃহীত মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দেয়া ছাড়া অন্য কোনো স্বতঃসিদ্ধ ধারা রয়েছে বলে আমার জানা নেই। এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের অব্যাহত ব্যর্থতা প্যালেস্টাইনী ও আরব জাতির সঞ্চিত ভাবাবেগে সম্ভবত বিপ্লবী স্বতঃস্ফূর্ততা সংযোজন করবে, আবার তাদের উদ্বুদ্ধ করবে প্রলম্বিত সংগ্রামের পথে–যে সংগ্রাম শুধু প্যালেস্টাইন ও মধ্যপ্রাচ্যে বিপ্লবী জনগণকে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে একাত্ম করবে না, যে সংগ্রাম অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিকভাবে চলবে খোদ আমেরিকা ও ইউরোপে স্বার্থান্বেষী ইহুদিবাদের অশুভ প্রভাবের বিরুদ্ধে, আর হয়তো সেই প্রলম্বিত বিপ্লবী সংগ্রামের ভিত্তিতেই প্যালেস্টাইনী ও আরবজনগণ চূড়ান্ত বিজয় লাভ করবে, ছিনিয়ে নেবে তাদের শান্তি। খ্যাতনামা সমাজ বিজ্ঞানীরাও সায় দেন ঃ[২৩] দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম অনিবার্য, এবং এ সবের মাধ্যমেই সৃজনশীল ও ইতিবাচক শান্তি খুঁজে পেতে হবে।

স্নায়ুযুদ্ধ উত্তর কালে পরাশক্তি ও মধ্যপ্রাচ্য শান্তি

১৯৮০ দশকের শেষ পাদ থেকে বর্তমান কালঅবধি আন্তর্জাতিক সিস্টেমে বিশাল পরিবর্তন ঘটেছে, ব্যাপকভাবে রূপান্তরিত হয়েছে তথাকথিত পরাশক্তি সম্পর্ক, প্রভাবিত হয়েছে উপ-সিস্টেম সম্পর্ক এবং এসবের ফলে মধ্যপ্রচ্য যুদ্ধ ও শান্তির মাঝে দোদুল্যমান অবস্থায় নিপতিত হয়।

প্রথমে আন্তর্জাতিক সিস্টেমের কাঠামো ও পরাশক্তি সম্পর্কের বিষয়ে আসা যাক। ১৯৮০ এর দশক অবধি আন্তর্জাতিক সিস্টেম ছিল মোটামুটিভাবে দ্বি-মেরু কেন্দ্রিক-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে বিশ্বব্যাপী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে লিপ্ত থাকে। পরাশক্তিদ্বয়ের এই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াই ছিল সর্বব্যাপী আদর্শিক রাজনৈতিক, সামরিক কৌশলগত এবং ভৌগোলিকভাবে বিশ্বের সর্বস্তরে বিস্তৃত। মোদ্দা কথা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যে স্নায়ুযুদ্ধের, সূত্রপাত ঘটেছিল তা অব্যাহত থাকে। স্নায়ুযুদ্ধ কখনো তীব্র হয়ে সংকটের রূপ পরিগ্রহ করে আবার কখনো স্তিমিত হয়, হ্রাস পায় উভয় পক্ষ একে অপরের সঙ্গে ভাবের বিনিময় করে, আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়, এমনি সমঝোতায়ও উপনীত হয়। কিন্তু তবু সার্বিকভাবে পরাশক্তিদ্বয়ের

www.pathagar.com

সম্পর্ক ছিল প্রতিযোগী, প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক। অনেক ক্ষেত্রে উভয়ে শূন্যমানভিত্তিক হারজিতের খেলায়ও লিপ্ত হয়। মধ্যপ্রাচ্য ছিল এমন একটি উপ-সিস্টেম বা অঞ্চল যেখানে উভয় পরাশক্তি হারজিতের খেলায় নিমিত্ত হয়। ফলে মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলি বা এখানকার জনগণ ছিল অনেকটা পণ বন্দির মতো।

স্নায়ুযুদ্ধের শেষ দশকে কম্যুনিস্ট পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরে ব্যাপক পরিবর্তনের হাওয়া বয়ে চলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরিসমাপ্তির পর থেকে প্রায় চার দশকের মস্কো বিশ্বব্যাপী আদর্শিক রাজনৈতিক ও সামরিক কৌশলগত প্রতিযোগিতার ওপর জোর দিয়ে আসে। স্নায়ুযুদ্ধের এ দেশগুলোতে মস্কো অভ্যন্তরীণ সোভিয়েত সম্প্রীতি ও অর্থনীতি অবহেলা করে চলে। সমগ্র সোভিয়েত ব্যবস্থা ছিল গোপনীয় ও সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু আদর্শিক কৌশলগত দ্বন্দ্বের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে ক্রেমলিন সে দেশের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, মস্কো বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে, অথচ অভ্যন্তরীণভাবে সোভিয়েত অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। ক্রেমলিনে আশির দশকের মাঝামাঝি মিথাইল গরবাচেব ক্ষমতা গ্রহণের পর সোভিয়েত ব্যবস্থার এরূপ ভেঙ্গে পড়া অবস্থা দেখে তিনি সামগ্রিক সোভিয়েত ব্যবস্থার পর্যালোচনা ও পুনর্মূল্যায়নের জন্য দু'টি নীতি ঘোষণা করেন এর একটি 'পেরেস্ত্রোইকা' (পুনর্গঠন) এবং দ্বিতীয়টি 'গ্রামনস্ত' (উন্মুক্ত)। এ উভয়বিধ নীতি গ্রহণের ফলে পরাশক্তি সম্পর্কেও প্রভাব পরিলক্ষিত হয় দুপক্ষের দ্যঁতত ভিত্তিক সম্পর্ক জোরদার হয়, ঘনিষ্ঠতর হয় পারস্পরিক যোগাযোগ। গরবাচেব আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত বাহিনী প্রত্যাহার করেন, যদিও সোভিয়েত সাহায্য ও সরবরাহ অব্যাহত থাকে বেশ কিছুকাল তাবেদার সরকারের প্রতি।

অবশ্য এসব সাহায্য ও সরবরাহ আফগানিস্তানে সোভিয়েত তাবেদার সরকারকে নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থ, এর পতন ঘটে অচিরেই আফগান মুজাহিদদের হাতে, যদিও নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে মুজাহিদরা তখন আফগানিস্তিানে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত। 'পেরেস্ত্রোয়কা' ও 'গ্লাসনস্তের' ফলে পরাশক্তিদ্বয়ের সম্পর্ক উন্নত্তর হয় এবং অধিকতর আত্মসচেতন সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানের মতো দেশ থেকে হাত গোটাতে বাধ্য হয় বটে, কিন্তু মস্কোর নতুন পুনর্গঠন ও উন্মুক্ত নীতির কারণে প্রথমবারের মতো সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রসমূহের অন্তঃকলহ তুঙ্গে ওঠে এবং অচিরেই খোদ সোভিয়েত ইউনিয়নে ভাঙ্গন দেখা দেয়। বিলোপ হয় কম্যুনিস্ট সাম্রাজ্য। তিনটি বাল্টিক প্রজাতন্ত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাধীন সত্তা লাভ করে, আর বাকি পনেরটি 'কমনওয়েলথ অব ইনডিপেনডেন্ট স্টেটস' বা 'সি. আই. এস.'

www.pathagar.com

নামক এক শিথিল বন্ধন গড়ে তোলে। কিন্তু মস্কো লাভ করে 'রুশ ফেডারেশন'-এর প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব। সোভিয়েত পরাশক্তির। স্নায়ুযুদ্ধের অবসান এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙ্গন সত্ত্বেও নব সৃষ্ট রুশ ফেডারেশন তখনো পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র যথেষ্ট মারণাস্ত্রের অধিকারী। এর চেয়েও বাস্তব সত্য হচ্ছে মধ্য প্রাচ্য রুশ ফেডারেশনের প্রতিবেশী অঞ্চল। ঐতিহাসিভাবে মস্কো এ অঞ্চলে জড়িত ছিল। ঐতিহাসিক আগ্রহের পাশাপাশি এ অঞ্চলে মস্কোর আর্থিক ব্যবসায়িক ও কৌশলগত নিরাপত্তার স্বার্থ বিদ্যামন। তাই পরাশক্তির অসাধারণ শক্তি খর্ব হওয়া সত্ত্বেও মস্কো মধ্য প্রাচ্যের যুদ্ধ দ্বন্দ্বও শান্তি প্রক্রিয়া বিষয়ে তার আগ্রহ হারায় নি।

বরং স্নায়ুযুদ্ধ উত্তরকালে মস্কো ও ওয়াশিংটনের মধ্যে রাজনৈতিকভাবে ও আদর্শিক যোগাযোগ বৃদ্ধির ফলে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ দ্বন্দ্ব ও শান্তি সম্পর্কিত বিষয়াবলী নিয়ে সংলাপ ও ঘনিষ্ঠতর সমঝোতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। অন্ততপক্ষে তাদের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধকালীন বৈরী মনোভাব বা প্রতিপক্ষসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। ফলে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ও স্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টির পক্ষে অনুকূলে পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

এ প্রসঙ্গে এও মনে রাখা প্রয়োজন যে, স্নায়ুযুদ্ধকালের একেবারে শেষের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্য নীতিতে কিছুটা গুণগত পরিবর্তন দেখা যায়। এ পরিবর্তন প্রতিফলিত হয় আরব জোটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগে, বিশেষ করে প্যালেস্টাইনে ইসরাইলের দখলদার কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে 'ইনতিফাদাহ' বা প্যালেস্টাইনীদের বিপ্লবী অভ্যুত্থানের পর বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত প্যালেস্টাইনী সংগঠন 'প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থা' বা পি. এল. ও. (P.L.O.)-এর সঙ্গে অব্যাহত আলাপ আলোচনার ক্ষেত্রে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আরব ইসরাইলি শান্তি স্থাপন বিষয়ে ওয়াশিংটন মস্কোর সংলাপ ও সমঝোতা শান্তি প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে, যদিও নেতৃত্ব ও গ্রহণযোগ্যতার কারণে ওয়াশিংটনকেই উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

বস্তুত, মধ্যপ্রাচ্যর মূল দ্বন্দ্ব, প্যালেস্টাইনী ইসরাইলি দ্বন্দ্বের সমাধানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার উদ্যোগী ভূমিকা অব্যাহত রাখে। শান্তি প্রয়াস চলে তিন পর্যায়ে ঃ জেনিভা, অসলো এবং ওয়াশিংটন-ডেটন-এ বিভিন্নভাবে শান্তি আলোচনা চলে এবং শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। শান্তি চুক্তির ও শান্তি প্রক্রিয়ায় স্থানীয় অংশগ্রহণকারী দু'পক্ষ অবশ্যই এতে সরাসরি আলোচনায় নিয়োজিত থাকে। এ আলোচনায় ইসরাইলের পক্ষ থেকে ইসরাইলের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী ইয়াসাক রানিন এবং শান্তি প্রক্রিয়া বিরোধী আততায়ীর হাতে তাঁর মৃত্যুর পর শিমন পেরিস চুক্তি স্বাক্ষর করেন। 'ভূমির বিনিময়ে শান্তি'-এ নীতির ভিত্তিতে দু'পক্ষে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করে। পর্যায়ক্রমে পাঁচ বছরব্যাপী

www.pathagar.com

প্যালেস্টাইনের দাবিকৃত ও ইসরাইলের দখলকৃত পাশা ও জর্ডন নদীর পশ্চিম তীরবর্তী এলাকা থেকে কর্তৃত্ব হস্তান্তর করেন এটাই ছিল শান্তি প্রক্রিয়ার মৌলিক বৈশিষ্ট্য। পাঁচ বছর মেয়াদ শেষে জেরুজালেমের ভবিষ্যৎ ও প্যালেস্টাইন স্বায়ত্তশাসিত এলাকার ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে। প্যালেস্টাইনীদের প্রত্যাশা নিজেদের রাষ্ট্রীয় সত্তার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি এবং জেরুজালেম হবে সেই রাষ্ট্রের রাজধানী। ১৯৯৯ সনে সেই পাঁচ বছর মেয়াদ সম্পূর্ণ হবে।

মধ্য প্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ার এ অবধি মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রই শান্তির রূপরেখা অনুযায়ী নেতৃত্ব দিয়ে আসছে বিভিন্নভাবে। তবু শান্তি আলোচনার বিভিন্ন সংকটকালে এবং আনুষ্ঠানিক বৈঠকের পর্যায়ে রুশ প্রতিনিধি বা রুশ সরকারকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। ফলে মস্কো নেতিবাচক ভূমিকার প্রবৃত্ত হয় নি।, বরং শান্তি প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ততা দেখিয়ে আসছে।

শান্তি প্রক্রিয়ায় সাম্প্রতিককালীন জটিলতা দেখা দিয়েছে অন্য কারণে। প্যালেস্টাইন ইসরাইলি শান্তির পথে বর্তমানে মূল বাধা আসছে ডানপন্থী ইসরাইলি সরকার থেকে। তথাকথিত নিরাপত্তার নামে ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনইয়ামিন নাতান ইয়াহু মূলত তার রাজনৈতিক কর্মসূচি অনুযায়ী জেরুজালেমসহ অধিকৃত পশ্চিম তীরে ইহুদি বসতি স্থাপন করে চলছে এবং চুক্তি মোতাবেক অধিকৃত এলাকা থেকে দখলদার স্বত্ব ছাড়তে নারাজ। এতে আরব ইসরাইলি শান্তি প্রক্রিয়ায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। একমাত্র অব্যাহত মার্কিন কূটনৈতিক হস্তক্ষেপ ও চাপ এবং রুশ ইউরোপয় ও বিশ্বজনমত ডানপন্থী ইহুদি সরকারকে শান্তি চুক্তির ধারা অনুযায়ী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য করতে পারে। প্যালেস্টাইনে শান্তি প্রক্রিয়ার প্রকৃত অগ্রগতির পাশাপাশি ইসরাইলের সঙ্গে সিরিয়া ও লেবাননের শান্তি প্রক্রিয়া করতে হবে। তা না হলে আরব ইসরাইলি শান্তি ও সহ অবস্থান সর্বদাই হুমকির মুখোমুখি হবে। উভয়পক্ষেই মার্কিন উদ্যোগী ভূমিকা অপরিহার্য।

আরব ইসরাইলি সমস্যা মধ্যপ্রাচ্যে একমাত্র শান্তির সমস্যা নয়। গুরুত্বপূর্ণ আরো দু'টি সমস্যা হচ্ছে আফগানিস্তানের অব্যাহত গৃহযুদ্ধ এবং ইরাক কুয়েত বা পারস্য উপসাগরীয় সংকট। আফগানিস্তানের বর্তমান 'গৃহযুদ্ধ' শুধুমাত্র গৃহযুদ্ধ বলে অভিহিত করা যথার্থ হয় না। কেননা এ গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হয় বহিঃহস্তক্ষেপ, সোভিয়েত হস্তক্ষেপের মাধ্যমে। অভিযোগ রয়েছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙ্গন, রুশ ফেডারেশন গঠন এবং স্নায়ুযুদ্ধের অবসান সত্ত্বেও মস্কো এখনো পরোক্ষভাবে আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপ করে চলছে। এছাড়া আফগান সংকট যখন তুঙ্গে তখন লক্ষ লক্ষ আফগান শরণার্থী প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান ও ইরানে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং

www.pathagar.com

গৃহযুদ্ধের কারণে তাদের বেশিরভাগই এখনো এ দু'দেশে অবস্থান রেখে চলছে। এমন কি তারা গৃহযুদ্ধ প্রতিবেশী পক্ষ-বিপক্ষের সঙ্গে পক্ষালম্বন করে যুদ্ধেও লিপ্ত হচ্ছে। এর সঙ্গে রয়েছে আফগান সংযোগ সবকিছু মিলে আফগান সংকট জটালো রূপ ধারণ করেছে। এক্ষেত্রে ওয়াশিংটন ও মস্কোর যৌথ যোগাযোগ ও উদ্যোগী ভূমিকা প্রয়োজন। আফগান দ্বন্দ্বের বিগত দু'দশকের ইতিহাস বলে ওয়াশিংটন ও মস্কো উভয়েই কোনো না কোনোভাবে আফগানিস্তানে জড়িত ছিল আর প্ররোচিত করে অসহায় আফগান জনগণকে বর্তমান গৃহযুদ্ধের পথে। তাই উভয়ের উচিত হবে আফগান পক্ষ-বিপক্ষ ও প্রতিবেশী দেশগুলোকে শান্তির পথে উদ্বুদ্ধ করতে।

পারস্য উপসাগরীয় সংকটের রূপ বিগত দু'দশকে রূপান্তরিত হয়েছে কয়েকবার। সংকট শুরু হয় মূলত ইরানকে কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনপুষ্ট ইরানি শাহ পাহলভী রাজবংশবিরোধী আন্দোলন ও খোমেনী বিপ্লবের মাধ্যমে। ইরানে বিপ্লবী অরাজকতা ও বিশৃংখলার সুযোগ নিয়ে ইরাক কর্তৃক অতর্কিতভাবে ইরানের অভ্যন্তরে আক্রমণ এবং অর্ধ দশকের অধিককালব্যাপী দু'দেশের মধ্যে নৃশংস পর্যায়ের যুদ্ধ বিগ্রহ শুধুমাত্র দু' দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বৃহৎ শক্তিবর্গ বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বিরুদ্ধে ইরাকের পক্ষাবলম্বন করে, রাজনৈতিকভাবে ইন্ধন যোগায় এমন কি প্রচুর পরিমাণ সামরিক সরঞ্জামও সরবরাহ করে।

কিন্তু অচিরেই মার্কিন সাহায্য সমর্থনে পুষ্ট হয়ে ইরাকের আগ্রাসী প্রবৃত্তি ও স্পৃহা ভিন্নরূপ ধারণ করে। ইরাক পার্শ্ববর্তী তেলসমৃদ্ধ পারস্য উপসাগরীয় দেশসমূহের দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। এক ঝটিকা সামরিক অভিযান চালিয়ে ইরাক প্রতিবেশী দেশ কুয়েত গ্রাস করে, অন্তর্ভুক্ত করে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র কুয়েতকে ইরাকি রাষ্ট্রের সঙ্গে। স্বাভাবিক কারণে ইরাকের এ আগ্রাসী আচরণ পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল ও আরব বিশ্বসহ সমগ্রবিশ্বে নিন্দিত হয়। বিশ্ব পরিবারে জাতিসংঘের একটি সদস্য রাষ্ট্রকে আরেকটি প্রতিবেশী দেশ কর্তৃক গ্রাস করার এরূপ দৃষ্টান্ত নজিরবিহীন। বিশ্বের সেরা পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকটও এটা ভয়ানক আপত্তির কারণ ছিল। কেননা এটা ছিল আন্তর্জাতিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার পরিপন্থী। তার চেয়েও বড় কথা এ অঞ্চলে ইরাকের আগ্রাসী তৎপরতা মার্কিন ও পশ্চিমা বিশ্বের আর্থ-বাণিজ্যিক ও কৌশলগত স্বার্থের প্রতি হুমকি হিসেবে দেখা হয়। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘের সমর্থন নিয়ে ইরাকের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক কোয়ালিশন গঠনে নেতৃত্ব প্রদান করে। এমন কি বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্ব ও আরব লীগের সদস্যবর্গের বেশিরভাগ মার্কিন নেতৃত্বের প্রতি আস্থা স্থাপন করে এবং ইরাক বিরোধী কোয়ালিশনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। এভাবে ১৯৯১

www.pathagar.com

সনে সংঘটিত উপসাগরীয় যুদ্ধে ইরাককে বাধ্য করা হয় কুয়েত থেকে হাত গুটিয়ে নিতে। কুয়েত তার রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা ফিরে পায়। এটা অবশ্য অবিদিত নয় যে, কুয়েত তার রাষ্ট্রীয় সত্তা ফিরে পেলেও ইরাকের সম্ভাব্য আগ্রাসী মনোভাব এখনো প্রশ্নের সম্মুখীন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিকভাবে। তাই ইরাক এখনো আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন। বিশেষ করে ইরাকের রাসায়নিক ও জীবধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন ক্ষমতা এবং প্রতিবেশী দেশসমূহে এসবের ব্যবহার সম্পর্কে অনেক সন্দেহ ও সংশয় রয়েছে।

এক্ষেত্রেও সাম্প্রতিককালে রুশ মার্কিন মতভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, যদিও ১৯৯১ সনের উপসাগরীয় যুদ্ধ চলাকালে রাশিয়া ও মার্কিন নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক কোয়ালিশনের প্রতি সমর্থন প্রদান করে। সাম্প্রতিকালে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত রুশ ফেডারেশন নিজ স্বার্থ অন্বেষায় ইরাকের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব প্রদর্শন করে। তেল সমৃদ্ধ ইরাক এমনিতেই বহুকাল থেকে মস্কোর সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ ছিল। বিশ্ব ও আঞ্চলিক রাজনীতির পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেই বন্ধন এখন অনেকখানি শৈথিল হয়ে পড়ে, তবু স্বার্থগত কারণে উভয়ে কাছাকাছি আসতে প্রয়াসী। জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আন্নান-এর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ও মধ্যস্থতার ফলে ইরাকের অস্ত্রভাণ্ডার পরিদর্শন সম্পর্কিত সাম্প্রতিক জটিলতা কেটে উঠতে কিন্তু ইরাক সম্পর্কে সন্দেহ ও সংশয়ের ঘোর কাটছে বলে মনে হয় না।

এক্ষেত্রে বর্তমানে বিশ্বের একক পরাশক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আচরণ সবদিক থেকে সমালোচনা ও পরীক্ষার সম্মুখীন। ইরাককে ঘিরে যেমন সন্দেহ ও সংকট রয়েছে, তেমনি মার্কিন সমর্থনপুষ্ট ইসরাইলের শান্তি বিরোধী ও সম্প্রসারণমূলক আচরণ নিয়েও অবিশ্বাস ও উৎকণ্ঠা বিরাজমান। শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য প্রয়োজন সমরূপ দৃষ্টিভঙ্গি। বিশ্বে শান্তি সংস্থাপক হিসেবে বিশ্বাসযোগ্যতা লাভ করতে হলে মধ্যপ্রাচ্যের দু'টি সংকটেই ওয়াশিংটনকে সমরূপ কঠোরতা প্রদর্শন করতে হবে। ইরাককে ঘিরে সন্দেহ ও সংশয়ের মোকাবিলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্ব সম্প্রদায় অবশ্যই কঠোর মনোভাব গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু মার্কিন উদ্যোগ ও মধ্যস্থতার স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তি ও প্যালেস্টাইনী ইসরাইলি শান্তি প্রক্রিয়ার প্রতি ইসরাইলের ডানপন্থী সরকার, বৃদ্ধাঙ্গুল প্রদর্শন করেও পার পেয়ে যাবে তা হতে পারে। এতে বিশ্বব্যাপী ওয়াশিংটনের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ন হবে, বিপন্ন হবে মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি প্রক্রিয়া। মার্কিন নেতৃত্বের এ বিষেয়ে সজাগ থাকতে হবে।

www.pathagar.com

তথ্যনির্দেশ

১. প্রতিসাম্য (Symmetry) ও অপ্রতিসাম্য (Asymmetry) প্রত্যয় দু'টি ব্যবহার করেন প্রথিতযশা নরওয়েজীয় সমাজবিজ্ঞানী হোয়ান গালটুং। তিনি তাঁর বিশ্লেষণী রূপরেখায় সমকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্কে দু'ধরনের মৌলিক দ্বন্দ্বের বিষয় বিষয় উল্লেখ করেন। এর একটি হচ্ছে প্রতিসম সম্পর্ক এবং আরেকটি হচ্ছে অপ্রতিসম সম্পর্কজনিত। এ দু'টির প্রথমটি হচ্ছে, মোটামুটি সমতুল্য গুণাগুণবিশিষ্ট বা সমান (সঠিক) পদমর্যাদাসম্পন্ন ও সমান ধনসম্পদের অধিকারী দু'দেশের মধ্যে, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে "ভিন্নতর পদমর্যাদাসম্পন্ন দু'পক্ষের মধ্যে যাদের সংস্থান বা সঙ্গতি সমতুল্য নয়, এমন কি যারা হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের।" গালটুং যথার্থই অপ্রতিসম সম্পর্ককে অনভিপ্রেত মনে করেন। কেননা এর থেকে সৃষ্টি হয় অপ্রতিসম মৈত্রীধারা এবং এর ফলশ্রুতিতে সংঘটিত হয় অপ্রতিসম দ্বন্দ্ব। বস্তুত, এ সবের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সমাজে যে আধিপত্যবাদী বা কর্তৃত্বসুলভ নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টা চলছে সেদিকে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ জাতীয় নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টার ফলে পরাশক্তিদ্বয়ের মত বিশ্বশক্তি ও তাদের স্থানীয় মিত্ররাষ্ট্রের মধ্যে পৃষ্ঠপোষক-তাবেদার ভিত্তিক একটি উলম্ব (Vertical) যোগসূত্র স্থাপিত হয়, পরাশক্তিদ্বয়ে প্রভাব-বলয় সৃষ্টির প্রচেষ্টা থেকে বিশ্বে কাঠামোগত সহিংস প্রবণতা (Structural violence) দেখা দেয়, চলে শূন্যমান রণনীতিপ্রসূত আন্তক্রিয়া, সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হয় শান্তি। এ প্রসঙ্গে গালটুং-এর বক্তব্যের জন্য দেখুন Johan Galtung, *Peace Research : Education, Action Essays, in Peace Research*,Vol. I, (Copenhayen : Christian Ejlers Forlag, 1975, পৃ. ৭৯ -৮০। অপ্রতিসম সম্পর্কজনিত দ্বন্দ্বের বিশদ সমীক্ষার জন্য দেখুন, Abul Kalam, *Peacemaking in Indochina 1945-1975* ((Dhaka : Dhaka University Press, 1983), দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য। এ জাতীয় দ্বন্দ্বে বিবদমান পক্ষের কৌশলগত আচরণের জন্য দেখুন, আবুল কালাম, ভিয়েতনামের রণাঙ্গন ঃ বিপ্লবীযুদ্ধের কলাকৌশল (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫)।

২. সাম্প্রতিককালে আন্তর্জাতিক রাজনীতির রীতিবদ্ধ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সিস্টেম তত্ত্ব ব্যবহৃত হয়ে আসছে। একজন বিশিষ্ট সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ লিখেছেন যে, "বর্তমান যুগ হচ্ছে সক্রিয় শক্তিজনিত গতিশীল ধারায় পরিব্যাপ্ত, আর তাই এ যুগের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সমাজ-জীবনের যে কোনো দিকের চাইতে অধিকতর সর্বগত দৃষ্টিভঙ্গি সহকারে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। এ জন্য আন্তর্জাতিক সমাজের নতুন রূপ বুঝার সপক্ষে সিস্টেম বিশ্লেষণ হচ্ছে সবচাইতে যথোপযুক্ত। কেননা এতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সার্বিক রূপও একই সঙ্গে প্রকাশ পায়।" এর পূর্বে একজন খ্যাতনামা মার্কিন চিন্তাবিদ-বিশ্লেষকও একইরূপ বক্তব্য পেশ করেন। সিস্টেম বিশ্লেষণীকে একটি পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে যথার্থরূপে তুলে ধরা যায় বলে তিনি মনে করেন এবং উল্লেখ করেন যে, সিস্টেম দৃষ্টিভঙ্গির সুবিধা এই যে এর মাধ্যমে কিছুটা যোগসূত্রভিত্তিক এসব বন্ধন বা আচরণ চিহ্নিত, পরিমাপণ বা পারস্পরিক আন্তক্রিয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যেতে পারে-যেসব আন্তক্রিয়ার সূত্রপাত হয় এক সিস্টেমে, এবং

www.pathagar.com

পরিসমাপ্তি ঘটে আরেক সিস্টেমে। এরূপ অনুক্রমিক আন্তক্রিয়াজনিত সম্পর্ক চিহ্নিত ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হলে আন্তর্জাতিক সিস্টেম এবং এর উপ-সিস্টেমের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি লাভ সম্ভব।

বিষয়টি ভিন্নভাবেও বলা যেতে পারে। সমাজ-জীবনের যে কোনো পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে সিস্টেম তত্ত্বীয় বিশ্লেষণ প্রযোজ্য, কেননা সমাজের বিভিন্ন অংশসমূহ পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যেহেতু একটি সিস্টেম বেশ কিছু ক্রিয়াকর্মের সমরূপ উপাদান বা সমন্বয়ে গঠিত সেহেতু এর আচরণগত ধারা বা এসব উপাদানের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য এই সিস্টেমের মাধ্যমে তুলে ধরা যেতে পারে। এভাবে কল্পিত সিস্টেম ছোট বা বড় উভয় ধরনের হতে পারে। একটি বড় সিস্টেম অপেক্ষাকৃত ছোট সিস্টেমের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। এছাড়া প্রতিটি সিস্টেম স্বয়ং একটি সিস্টেম হওয়া সত্ত্বে আরেকটি সিস্টেমের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক একটি উপ-সিস্টেমের রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। উপর্যুক্ত রূপরেখার আলোকে পরাশক্তি ও মধ্যপ্রাচ্যকে আন্তর্জাতিক সিস্টেমের উপ-সিস্টেম হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। প্রবন্ধে তাই মধ্যপ্রাচ্যকে পালাক্রমে কখনো উপ-সিস্টেম, কখনো অঞ্চল হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। উল্লেখিত সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ, F. M. Burlatskii. "Systems Analysis of World Politics and the Planning of Peace", Sovetskoe gousdarstvo, pravo, No. 8 (1973), Translated in *International Journal of Politics*, III, No. 4 (Winter 1973-74, পৃ. ১৫। মার্কিন বিশ্লেষক, Charles A McClelland, Theory and the International System (New York : The Macmillan Company, 1960), পৃ. ৯২-৯৫; আরো দ্রঃ একই লেখকের, "Systems Theory and Human Conflict," in Elton B. McNail (ed.) *The Nature of Human Conflict* (Englewood Cliffs. N. J.: Prentice-Hall, 1965) পৃ. ২৫৮

৩. Tareq Y. Ismail, The Middle East in World Politics (Syracus : Syracuse University Press, 1974) পৃ. ২৫৫

৪. ১৯৬০-এর দশক থেকে কয়েকজন বিশ্লেষক 'প্রধান' ('Dominant') ও 'অধীন' ('subordinate') এ দুটো প্রত্যয় ব্যবহার করে আসছেন সিস্টেম/কাঠামো প্রেক্ষাপটে যথাক্রমে বিশ্বপর্যায়ে পরাশক্তিদ্বয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের সম্পর্কের ধারা নিরূপণে। এই আলোকে বর্তমান প্রবন্ধেও পরাশক্তির আন্তক্রিয়াকে 'প্রধান' ও মধ্যপ্রাচ্যকে 'অধীন' উপ-সিস্টেমরূপে অভিহিত করা হয়েছে। এ জাতীয় বিশ্লেষণী রূপরেখার বিশদ আলোচনার জন্য দেখুন, Leonard Binder, *The Ideological Revolution in the Middle East* (New York : John Wiley and Sons, 1964) Chap. 9; আরো দ্রঃ তাঁর "Transformation in the Middle East Subordinate System after 1967", in Michael Confine and Shimon Shamir (eds), *The USSR and the Middle East* (Jerusalem : Jerusalem University Press, 1973); Michael Brecher, "The Subordinate State system of Southern Asia, " *World Politics*, 15 (January, 1963); আরো একই লেখকের "The Middle East

www.pathagar.com

Subordinate System and its Impact on Israeli Foreign Policy" *International Studies Quarterly* 13:2 (June 1969).

৫. Brecher, "TheSubordinate State System of Southern Asia", প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮-২১৯।

৬. Raymond Aron, *Peace and War: A Theory of International Relations.*, Translated by R. H. Howard and A. B. Fox (New York : Praeger Publishers, 1968). পৃ. ৩৯০।

৭. একটি বিচিত্রধর্মী-বহুমেরুরূপা (Heterogeneous-multipolar) সিস্টেমকে বলতে এমন একটি সিস্টেমে বুঝানো হয় যাতে একক কেন্দ্রীভূত কর্তৃত্বের পরিবর্তে পর্যায়ন্বিত বা পালাক্রমে বহুকেন্দ্র-উপকেন্দ্র সৃষ্টি হয়, আর যে সিস্টেম সংগঠিত হয় "ভিন্নতর দ্বন্দ্বমুখর মূল্যবোধের ভিত্তিতে অথচ এতে ইতিবাচক বা নেতিবাচক আন্তক্রিয়া চলে অহরহ"। দ্রঃ ঐ, পৃ. ১০১

৮. যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কিত যে কোনো প্রণালীবদ্ধ ও বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা ও চিন্তাধারায় সমষ্টিগত মানব আচরণের দুরূহ দিকগুলো তুলে ধরতে হয়। জ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রে এরূপ জটিল কাজ তখনি সম্পন্ন করা সম্ভব হয় যখন তত্ত্বীয় আলোকে সমাজ ও রাজনীতিতে পরিলক্ষিত ধারা চিহ্নিত করা যায় এবং গবেষণালব্ধ জ্ঞান, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনেরনীতি নির্ধারণে প্রাসঙ্গিক হয়। তাই বিশ্লেষণী রূপরেখা ভিত্তিক অতীতের গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে প্রাসঙ্গিক করতে হবে বর্তমান বাস্তবতার নিরিখে, আর চেতনাদীপ্ত বিবেক-নৈতিকতা ও যৌক্তিকতার আলোকে অতীতের জ্ঞান ও বর্তমান বাস্তবতার সমন্বয়ে ভবিষ্যতের নীতিগত বিকল্প ও রূপরেখা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতে হবে গবেষক ও বিশ্লেষককে। তবেই জ্ঞানচর্চা ফলপ্রসূ হবে, গবেষণা ও জ্ঞান সাধনা পরিপূর্ণতা লাভ করবে। এ জাতীয় কিছু বক্তব্যের জন্য দেখুন Johan Galtung, "Peace Research" *The Social Sciences: Problems and Orientations* (Paris : Mouton / UNESCO, 1968) পৃ. ২০২-২০৩, একই লেখকের Peace Research, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০; Lawrence K. Frank, "Research for What," *Journal of Social Issues*, Suplement Saries, No. 10 (1957), পৃ. ১০-২০, এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকের ভূমিকা সম্পর্কে দেখুন, আবুল কালাম, "অলংকৃত ইতিহাস", আবুল কালাম (সম্পাদিত), শিক্ষা ভ্রমণ (ঢাকা : ইতিহাস বিভাগ, ১৯৮৪)

৯. এ ধরনের উপস্থাপিত এক প্রস্তাবের জন্য দেখুন, Marck Thee, "Detente and Security in the Aftermath of the Fourth Middle East War", *Bulletin of Peace Proposals*, No. 1 (1974).

১০. 'বিচিত্রধর্মী-অপ্রতিসম' ('hetero-asymmetric') প্রত্যয় ব্যবহার করা হয় মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে পরাশক্তিদ্বয়ের সার্বিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে। মধ্যপ্রাচ্য সিস্টেমকে এ প্রবন্ধে বিচিত্রধর্মী সিস্টেমরূপে চিহ্নিত করা হয়। যেহেতু এ সিস্টেমের বেশ কিছু রাষ্ট্রের সঙ্গে দু'টি পরাশক্তি অপ্রতিসম ধারায় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী সেহেতু এ দু'টি সিস্টেমের সার্বিক যোসূত্রকে বিচিত্রধর্মী-অপ্রতিসম বলাই সঠিক হবে।

www.pathagar.com

১১. আরব-ইসরাইলি দ্বন্দ্বের সংকটময় বছরগুলোতে দু'টি পরাশক্তির বিপরীতমুখী ভূমিকা এবং অভিন্ন উদ্দেশ্য সম্পর্কিত আরো বিশদ ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, Abul Kalam, "American Peacemaking and the Arab Israeli Tangle", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh* (Hum.) Vol. XXVII, No. II (December 1983), পৃ. ১০৩-১৩১। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব ২৪২ এবং ৩৩৮ এর প্রেক্ষাপট ও পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে বিশদ আলোচনার জন্য দেখুন, Jacob Majus, "Storms and Shifts in the Middle East", *International Peace Research Newsletter*, Vol. XXII, No. 3 (1984).

১২. শূন্যমান ক্রীড়া ('Zero-sum-game') মূলত ক্রীড়াতত্ত্ব বা Game theory থেকে নেয়া। এই তত্ত্বে আন্তর্জাতিক কৌশলগত সম্পর্ক অনেকটা "ক্রীড়ার" অনুরূপ। এ তত্ত্ব মতে, পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আন্তক্রিয়া চলে প্রতিযোগী দু'পক্ষের রণনৈতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে। ক্রীড়াতত্ত্ব মতে, প্রতিযোগিতা বা দ্বন্দ্বরত দু'পক্ষের কৌশলগত উদ্দেশ্য চরিতার্থতায় উভয় পক্ষে দু'ধরনের রণনীতিপ্রসূত তৎপরতায় লিপ্ত হতে পারেঃ শূন্যমান ও অশূন্যমান ('zero-sum' ও 'non-zero-sum')। শূন্যমান ক্রীড়া চলে দু'পক্ষের মধ্যে, যেমন 'ক' ও 'খ' এর মধ্যে-দু'পক্ষ ও দু'ব্যক্তির মধ্যেও হতে পারে। প্রত্যেকটি ক্রীড়া বা খেলা হার-জিত ভিত্তিক। তার মানে, একের জিত হলে অন্যের হার হবে, কেননা এ জাতীয় রণনীতি প্রসূত আচরণ 'একক' মানভিত্তিক। বাস্তব জীবনে এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে যেমন একই নির্বাচনী এলাকার দু'ব্যক্তির একই আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাঃ এতে একজনের জয় হলে অপর জনকে অবশ্যই পরাজয় বরণ করতে হয়। পরাশক্তিদ্বয়ের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, উভয় পরাশক্তি এ অঞ্চলে এ ধরনের পারস্পরিক প্রতিযোগিতামূলক তৎপরতায় লিপ্ত যাতে প্রতিটি পক্ষ অপ্রতিসম মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে এককভাবে মধ্যপ্রাচ্যে স্বীয় আধিপত্য ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে, আর বহিস্কার বা বঞ্চিত করতে পারে তার বিশ্ব প্রতিযোগীকে। ক্রীড়াতত্ত্ব সম্পর্কিত তত্ত্বীয় ব্যাখ্যার জন্য দেখুন Thomas C., Schelling "What is Game Theory" in James C. Charles Worth (ed). *Contemporary Political Analysis* (New York : Free Press 1967); Morton A. Kaplan, "A Note on Game Theory and Bargaining" , in Morton A. Kaplan (ed0 New Approaches to International Relations (New York : St. Martin's Press, 1968).

১৩. Andrei Gromyko, *On the International Situation and Foreign Policy of Soviet Union* (Moscow : Novosti News Agency Publishing Hous, 1983); পৃ. ২৫-২৬; *USSR Supports the Arab Peoples of Palestine* (Moscow : Novosti News Agency publishing House, 1983) K. U. Chernenco, *Safeguard Peace and Ensure the People's Well-being* (Moscow : Novosti News Agency Publishing House, 1984); পৃ. ২৯; N. Kapchenko, "Foreign Policy and Ideological Struggle Today", International Affairs, No. 3 (1985); পৃ. ৪৫-৫৪; "Mikhail Gorbachev's

www.pathagar.com

Interview to Pravda Eaition", New Times, No. 16 (April 1985) পৃ. ৯-১০; "Speech by Mikhal Gorbachev, General secretary of the CPSU Central Committe at the CPSU CC" *Speech by Mikhail Gorbachev, General Secretary of the CPSU Central Committee at the CPSU CC Plenary Meeting" International Affairs*, No. 4 (1985).

১৪. D. F. Ustinov, *To Avert the Threat of Nuclear Wars* (Moscow : Novosti Press Agency Publishing House, 1982), পৃ. ২৭; A. A. Gromyko and B. W. Ponomarev (eds.) *Soviet Foreign Policy 1971-1980*, Vo,. II (Moscow : Progress Publishers, 1980).

১৫. Nikolai Lebedev, *The USSR in World Politics* (Moscow : Progress Publishers; 1982), পৃ. ২৮৮ ।

১৬. 'ঐ', Gromyko and Ponomarev (eds.) প্রগুক্ত, পৃ. ৬১৫-৬১৭; Gromyko, *On the International Situation*, প্রাগুক্ত পৃ. ২৬ ।

১৭. অনেকটা একইরূপ অভিমতের জন্য দেখুন, Eugene V. Rostow. "The Middle East Conflict in Perspective", *Vital Speeches* 40, No. 4 (1 December, 1973) পৃ. ১০৫ ।

১৮. সোভিয়েতের মতামতের জন্য দেখুন, Lebedev, প্রাগুক্ত পৃ. ২৮৯; Gromyko and Ponomarev, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১২; (D. Volesky, " Middle East : The Mercenery Sword of Tel Aviv", New Times, No. 9 (February, 1985), পৃ. ১০-১২; O. Fomin "Middle East :Trying to Revive the Camp David Deal", New Times, No. 18 (April 1984), পৃ.১৪-১৫

১৯. "Arab world Where Trouble for US Never End", *U. S. News and World Report*, Vol. 96, No. 5 (6 February, 1984) পৃ. ২৭

২০. Zvyagelskaya, "Who is obstructing the Settlement of the Middle East Conflict", Zionism, The Enemy of Peace and Social Progress, Issue 2, (Moscow : Progress Pbulishers, 1983), পৃঃ ১৬৩; Leonid Medvedko, "War and Anti-peace, the Washington tel-Aviv Alliance", *New Times* (January 1984), পৃ. ১০

২১. Joseph S. Nye, Jr. "Can America Manage its Soviet Poicy ?" Foreign Affairs (Spring 1984),পৃ. ৮৭৮; একই প্রবন্ধ দেখুন, Joseph. S. Nye, Jr. (ed.) *The Making of American Soviet Policy* (New Haven and London : Yale University Press, 1984) পৃ. ৩৫৪ ।

www.pathagar.com

২২. ওয়াশিংটনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ইহুদিবাদের বহুমুখী প্রভাব সম্পর্কে দেখুন, Edward Bernard Glick,, "What Binds America to Israil?" *Midstream* (December, 1984), পৃ. ১৯-২১ ।

২৩. দ্রঃ Georg Simmel, *Conflict*, Translated by Kurt H. Wolff. (Glencoe III : The Free Press, 1955); Lewis Coser, *The Functions of Social Conflict* (New York : Free Press, 1956).

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

মস্কো ও মধ্যপ্রাচ্য

মধ্যপ্রাচ্য ঐতিহ্যিকভাবে বিশ্ব রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাতের কেন্দ্রবিন্দু রূপে বিবেচিত। বর্তমানে এ অঞ্চল দুটো পরাশক্তি, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিদ্বন্দ্বিতার লক্ষ্যস্থল হিসেবে পরিগণিত। এ অঞ্চলের রাজনৈতিক দুর্বলতা, এখানে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য, এর গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অবস্থান প্রভৃতি কারণে এতে পরাশক্তিদ্বয়ের শ্যেনদৃষ্টি নিক্ষিপ্ত ; প্রচেষ্টা চলে এতে রাজনৈতিক প্রভাব বলয় সৃষ্টির এবং দেখা দেয় সামরিক দ্বন্দ্ব-বিরোধ। এসবের ফলে মধ্যপ্রাচ্য আন্তর্জাতিক সম্পর্কে একটি শক্তিসাম্যের কেন্দ্রে পরিণত[১] বস্তুত, ওয়াশিংটন ও মস্কো উভয়ে, তাদের নিজ নিজ কৌশলগত পরিকল্পনা ও চিন্তাধারার নিরিখে মধ্যপ্রাচ্যের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় আগ্রহ প্রদর্শন করে চলেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য মধ্যপ্রাচ্য গুরুত্ব অপরিসীম। এ গুরুত্ব শুধু মধ্যপ্রাচ্যের কৌশলগত অবস্থান এবং এতে মস্কোর স্বার্থজনিত আগ্রহের কারণে নয় ; এ গুরুত্বের আরো কারণ হচ্ছে এ অঞ্চলের অব্যাহত দ্বন্দ্ব ও আঞ্চলিক শান্তি স্থাপনে সাম্প্রতিককালে পরিলক্ষিত জটিলতা। মস্কো স্বয়ং এসব জটিলতার নিরসন, দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি এবং আঞ্চলিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।[২] এই প্রবন্ধে মধ্যপ্রাচ্যে সোভিয়েত কৌশলগত উদ্দেশ্যাবলি পর্যালোচনা করে এরূপ বক্তব্য উপস্থাপন করা হয় যে, এ অঞ্চলে শান্তি স্থাপন সোভিয়েত স্বার্থ ও নিরাপত্তার অনুকূলে বলেই মস্কো মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ায় যথার্থ আগ্রহী এবং আঞ্চলিক শান্তি সংস্থাপক হিসেবে সোভিয়েত ভূমিকা সীমিত হলেও মস্কোর যৌথ উদ্যোগ এবং সক্রিয় সমর্থন ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

দুই

প্রশ্ন হতে পারে, সোভিয়েত ইউনিয়নের কৌশলগত উদ্দেশ্যাবলির কাঠামো কি ধরনের এবং কিভাবে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ তাঁদের দেশের এসব উদ্দেশ্যাবলি আঞ্চলিক সোভিয়েত শান্তিনীতির সঙ্গে সমন্বয় বিধানের প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছেন? মস্কোর কৌশলগত ধারণা সোভিয়েত বিশ্ব আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। মার্কীয় তত্ত্বের অনুকরণে সোভিয়েত নীতিতে সামরিক ও

www.pathagar.com

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে পার্থক্য করা হয় না। কেননা উভয় ধরনের ক্রিয়াকর্মে দ্বন্দ্ব পরিচালিত হয়, আর দ্বন্দ্বই হচ্ছে ইতিহাসের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। সোভিয়েত কৌশলগত কাঠামোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে দুটো প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় এর একটি 'রণনীতি' (Strategy), আরেকটি 'রণকৌশল' (Tactics)। কৌশলগত রূপরেখায় শুধুমাত্র যুদ্ধের সমস্যাবলি মোকাবিলা করা হয় না, এর মাধ্যমে সম্ভাব্য যুদ্ধের পরিসীমা অতিক্রম করে শান্তির সম্ভাবনা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়েও চিন্তা করা হয়।[৩] সোভিয়েত রণনীতি ক্লজভিৎসের চিন্তাধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁর সংজ্ঞায় রণনীতি হচ্ছে 'লড়াইয়ের কাজে ব্যবহৃত এমন এক কলা যার মাধ্যমে যুদ্ধের উদ্দেশ্য সাধন করা যায়'। যুদ্ধকে তিনি শুধু একটি রাজনৈতিক কর্ম হিসেবে দেখেন নি, তিনি একে দেখেন যথার্থ একটি রাজনৈতিক যন্ত্র, অব্যাহত রাজনৈতিক ধারা, বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া হিসেবেও যার মাধ্যমে অরাজনৈতিক পন্থা অবলম্বন করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা যায়।[৪] বিভিন্ন ধরনের যে সব পন্থা বা উপায় অবলম্বন করে মস্কো তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে সক্রিয় থাকে সে সবকে বলা যায় 'রণকৌশল'। রণকৌশলকে রণনীতির নিম্নতর পর্যায়রূপে চিহ্নিতকরা হলেও এ দুই প্রত্যয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখানো মুশকিল। কেননা এর একটি আরেকটিকে শুধু প্রভাবিত করে না বাস্তবে উভয়ে পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্তও হয়।[৫] মস্কোর কৌশলগত চিন্তাধারা সম্পর্কে এরূপ বলা চলে যে, সোভিয়েত রণকৌশল পরিবর্তিত হতে পারে, কিন্তু তাদের রণনীতি থাকে অপরিবর্তিত।

তিন

একটি পরাশক্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের মতো সোভিয়েত ইউনিয়নের কৌশলগত চিন্তাধারা বিশ্বব্যাপী সোভিয়েত আদর্শ এবং উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যুক্তরাষ্ট্রের মতই সোভিয়েত রণনীতির মৌলিক কার্যকর উদ্দেশ্য হচ্ছে মস্কোর কর্তৃত্বের সম্প্রসারণ। এ জাতীয় উদ্দেশ্য সাধনে মস্কো সম্ভবত ওয়াশিংটনের মতো যে কোনো উপায় অবলম্বন করতে প্রস্তুত। শুধু সজাগ থাকে একটি ক্ষেত্রেঃ সম্প্রসারণমূলক প্রক্রিয়ায় সোভিয়েত নিরাপত্তা বা সোভিয়েত রাষ্ট্রের অস্তিত্বের প্রতি কোনো হুমকি দেখা না দেয়। বস্তুত, একজন সোভিয়েত বিশ্লষকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা চলে যে, সোভিয়েত কৌশলগত নীতি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় প্রমাণিত, সরকারিভাবে অনুমোদিত এমন কিছু মতবাদ নিয়ে সন্নিবিষ্ট যাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরক্ষায় কূটনৈতিক সাফল্য ও যুদ্ধে বিজয় লাভের প্রস্তুতি সুনিশ্চিত হয়।[৬]

www.pathagar.com

উপর্যুক্ত বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সোভিয়েত আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কিত কতিপয় তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান বা অনুসিদ্ধান্তের বিষয় উল্লেখ করা চলে। যেমনঃ (১) মস্কোর লক্ষ্য হচ্ছে একটি পরাশক্তি হিসেবে শক্তিশালী অবস্থান থেকে বাদবাকি বিশ্বের মোকাবিলা করা এবং ওয়াশিংটনের বিশ্ব-প্রতিযোগী হিসেবে সোভিয়েত ভূমিকা অক্ষুণ্ন রাখা।[৭] (২) মস্কো চাচ্ছে ইউরোপীয় মহাদেশে একটি শক্তিশালী সামরিক অবস্থান বজায় রাখতে যাতে ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় সোভিয়েত স্বার্থ সংরক্ষণ করা যায়, মোকাবিলা করা যায় সম্ভাব্য চীনা হুমকি।[৮] (৩) মস্কো একটি ব্যাপকতার যুদ্ধের সম্ভাবনা পরিহারকল্পে উদ্দেশ্যমূলক পদক্ষেপ বা মারাত্মক ঝুঁকি গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে প্রয়াসী। (৪) একই সঙ্গে মস্কো প্রয়াসী অধিকতর সচল ও বহুমুখী কর্মক্ষমতাসম্পন্ন নৌ ও সামুদ্রিক ক্ষমতা অর্জন করতে যাতে তৃতীয় বিশ্বে সোভিয়েত স্বার্থের অনুকূলে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ সম্ভব হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ব প্রতিযোগী হিসেবে সোভিয়েত অবস্থান দৃঢ়তর হয়।[৯] (৫) মস্কো চায় শান্তিপূর্ণ উপায়ে সোভিয়েত প্রভাব ও প্রতিপত্তির সম্প্রসারণ এবং জানে যে এটা সম্ভব হবে শান্তি, নিরস্ত্রীকরণ, প্রগতি ও জাতীয় মুক্তি প্রভৃতি আদর্শের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার মাধ্যমে। (৬) মস্কো প্রতিপক্ষের প্রতি নিবারক রণনীতিতে দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করতেও প্রয়াসী। তার মানে শত্রুর নিবারক রণনীতিজনিত অগ্রাভিযানমূলক তৎপরতা বানচাল করতে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দকে সজাগ থাকতে হয়। (৭) পরিশেষে, সোভিয়েত নিবারক রণনীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে শত্রুর চাপিয়ে দেয়া যে কোনো যুদ্ধে বিজয় লাভ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে মস্কোকে সচেতন থাকতে হয়।[১০]

এভাবে সোভিয়েত আন্তর্জাতিক আচরণে ভূ-কৌশলগত বিষয়াদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রূপে বিবেচিত। একটি পরাশক্তি হিসেবে সোভিয়েত বিশ্বমর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের কৌশলগত নীতি বাস্তবায়নে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় না দিয়ে তার পরাশক্তিজনিত পদমর্যাদাকে অধিকতর জোরদার করা মস্কোর ঈপ্সিত লক্ষ্য। উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত সোভিয়েত অনুসিদ্ধান্তসমূহ মস্কোর বিঘোষিত উদ্দেশ্যাবলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মস্কোর এসব উদ্দেশ্যাবলির মধ্যে রয়েছে সোভিয়েত রাষ্ট্রীয় স্বার্থের প্রতিরক্ষাকল্পে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বর্তমান সোভিয়েত ভৌগোলিক সীমারেখার অখণ্ডতা বজায় রাখা।

আরো উল্লেখ্য, সোভিয়েত কৌশলগত নীতিতে দুটি উপাদান অব্যাহত প্রভাব রেখে আসছে। এর প্রথমটি হচ্ছে সোভিয়েত রাজনৈতিক ব্যবস্থার দু'ধরনের ভিত্তি; কেননা মস্কো একটি জাতীয় সরকারের কেন্দ্রই শুধু নয়, সোভিয়েত সরকার আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনেও নেতৃত্ব প্রদান করে

www.pathagar.com

আসছে। সোভিয়েত কৌশলগত নীতির দ্বিতীয় উপাদান হচ্ছে যুদ্ধবিগ্রহে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের প্রভাব। একটি পারমাণবিক বিশ্বশক্তি হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে দু'ধরনের সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়। প্রথমত নিজস্ব কৌশলগত নীতির প্রতিরক্ষা ও আক্রমণমূলক প্রয়োজনীয়তার দিকে নজর রেখে মস্কোকে দেখতে হয় কিভাবে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় না দিয়ে আপন স্বার্থোদ্ধারে শক্তির ব্যবহার করা যায়; দ্বিতীয়ত, কিভাবে পররাষ্ট্রনীতির ভূ-কৌশলগত বিষয়াদির সঙ্গে আদর্শগত উদ্দেশ্যাবলির সমন্বয় বিধান করা যায়। ১৯৫০ এর দশকেই পরাশক্তিদ্বয়ের পারমাণবিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয় যা অতি শীঘ্রই 'সন্ত্রাসের সাম্য' (Balance of terror) নামে পরিচিতি লাভ করে। তাই সোভিয়েত নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ভূ-কৌশলগত উপাদান মুখ্য উদ্বেগের বিষয়রূপে বিবেচিত হওয়া সত্ত্বেও মস্কো এ জাতীয় স্বার্থ ও বিশ্বব্যাপী তার আদর্শগত প্রতিশ্রুতির মধ্যে কিছুটা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী।

ফলে দ্বি-জোট তত্ত্ব ও বিশ্ব বিপ্লবের প্রতি পূর্বেকার সোভিয়েত অঙ্গীকার সংশোধিত হয়, গৃহীত হয় 'নতুন দৃষ্টির' নীতি। এই নীতি 'শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান' নীতি নামে পরিচিতি লাভ করে। এ নীতিই সোভিয়েত বিশ্ব রণনীতির মূলমন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়।[১১] ফলে স্তালিন আমলে তত্ত্বীয় ভাবধারা পরিত্যক্ত হয়, বিশেষ করে কম্যুনিস্ট আদর্শ ও সোভিয়েত জাতীয় স্বার্থের মধ্য প্রত্যক্ষ বন্ধন গড়ে তোলার প্রবণতা পরিহার করা হয়। এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয়ও উল্লেখ করা চলে। ১৯৫০-এর দশক থেকে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদবিরোধী জাতীয় আন্দোলনের ফলে তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। এসব দেশ কম্যুনিস্ট আদর্শকে তাদের জাতীয় নীতি-আদর্শ হিসেবে গ্রহণ না করলেও তাদের বৃহত্তর জনগণ সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের বিরোধী শাসন এবং শোষণে নিষ্পিষ্ট হয়। তাই ক্রেমলিন এমন একটি উদার দর্শন ভিত্তিক রণনীতি গ্রহণে প্রবৃত্ত হয় যাতে তৃতীয় বিশ্বের বৃহত্তর জনসমষ্টির কাছে সোভিয়েত বিশ্ব রণনীতির তাৎপর্য প্রকাশ পায়। এরূপ পরিবর্তিত সোভিয়েত রণনীতি বিশ্বের বহু এলাকায় পশ্চিমা শক্তিগুলোকে তাদের পূর্বেকার প্রভাব বা কর্তৃত্ব থেকেই শুধু বঞ্চিত করবে না, নব স্বাধীনতালব্ধ রাষ্টসমূহকে যথাসম্ভব বন্ধুপ্রতিম সম্পর্কের বন্ধনেও আবদ্ধ করবে এবং সুযোগমত মস্কো জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সাহায্য ও সমর্থন যোগাতে পারবে।

www.pathagar.com

চার

১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে সোভিয়েত কৌশলগত চিন্তাধারার এরূপ পরিবর্তন প্রকাশ পায়। এ সময়ে একের পর এক সরকারি ভাষ্য ও প্রকাশ্য বক্তব্যে নতুন সোভিয়েত নীতির অভিব্যক্তি ঘটে। এ সবের মধ্যে ছিল ১৯৫৫ সনের প্রথম দিকের এক সরকারি ভাষ্য, পরে বান্দুং সম্মেলনের প্রাক্কালে বিঘোষিত হয় আরেকটি বক্তব্য এবং পরিশেষে সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসে (ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬) ক্রুশ্চেভ প্রদান করেন তথাকথিত 'গোপন ভাষণ'। নতুন সোভিয়েত দিকনির্দেশনায় নব স্বাধীনতাপ্রাপ্ত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে 'শান্তির এলাকা' হিসেবে একত্রে চিহ্নিত করা হয়. কেননা মস্কোর দৃষ্টিকোণ থেকে পশ্চিমানীতি আদর্শিক ভাবধারার বিরুদ্ধে তারা এক অভিন্ন বন্ধনে আবদ্ধ। মস্কোর এ ধরনের বক্তব্য প্রকাশিত হবার পর থেকে তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোর প্রতি ক্রেমলিন 'সমতা ও পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে' আর্থিক সাহায্য এবং সমর্থন দিয়ে চলে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মুক্তি ও স্বাধীনতায় মস্কো গভীর আগ্রহ প্রদর্শন করে, কেননা এ সব দেশ সোভিয়েত সীমান্তে অবস্থিত।[১২] এরূপ নতুন দৃষ্টি গ্রহণের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন রাজনৈতিক ও সামরিক উভয় অর্থেই বিশ্বশক্তির ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চলে। সোভিয়েত আন্তর্জাতিক সম্পর্কে এরূপ নীতিসূত্র অব্যাহত ধারায় গতি সঞ্চার করে আসছে।

সোভিয়েত কৌশলগত চিন্তাধারায় এ জাতীয় নমনীয়তাকে সুবিধাবাদী বা উদ্দেশ্যপূর্ণ বলে উপস্থাপিত করা যেতে পারে, কিন্তু মস্কো মনে করে যে নীতি প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় প্রতিটি নতুন পদক্ষেপ উদ্ভূত বিভিন্ন অবস্থার 'পারস্পরিক আপেক্ষিক মানের' ভিত্তিতে গৃহীত। অর্থাৎ সোভিয়েত নীতি একেবারে অপরিবর্তনীয় কাঠামো বা নিছক তত্ত্ব দ্বারা আড়ষ্ট নয়, পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে মস্কো তার আদর্শগত দায়দায়িত্বে পরিসীমা নির্ধারণ করে ও বিশ্বাসযোগ্য সমর্থন জোরদার করে চলে। উপর্যুক্ত বিশ্লেষণ থেকে মধ্যপ্রাচ্যে সোভিয়েত আচরণের কৌশলগত প্রেক্ষাপট (কৌশলগত অর্থাৎ এবং স্বার্থোদ্ধারে ব্যবহৃত রণনীতি ও রণকৌশল) বুঝা সম্ভব হবে।

পাঁচ

মধ্যপ্রাচ্য অনুপ্রবেশে মস্কো প্রকৃত সাফল্য লাভ করে ১৯৫৫ সনে। এ বছর সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মিশরের একটি অস্ত্র সরবরাহ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তথাকথিত 'চেক অস্ত্র চুক্তি' নামে পরিচিত এ চুক্তির আওতায় মস্কো

www.pathagar.com

চেকোশ্লোভাকিয়ার মাধ্যমে মিশরকে অস্ত্র সরবরাহ করে। পরে মিশরের বিশাল আসওয়পান বাঁধ বাস্তবায়নেও ক্রেমলিন একশত কোটি ডলার সাহায্য প্রদানে ওয়াদাবদ্ধ হয়। এসব পদক্ষেপ হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে সোভিয়েত আগ্রহের সাম্প্রতিক নিদর্শন। ঐতিহাসিককাল থেকে মস্কো মধ্যপ্রাচ্যে বৃহৎ শক্তিসুলভ স্বার্থ অন্বেষার পাশাপাশি আদর্শগত স্বার্থের অন্বেষণও করে আসছে। আদর্শগতভাবে বহু শতক থেকে রুশ আর্থোডকস চার্চ মধ্যপ্রাচ্যের পবিত্র ধর্মীয় এলাকায় সক্রিয়ভাবে বিজড়িত ছিল। মার্কসপন্থী সোভিয়েত রাষ্ট্রের জন্য সেরূপ ঐতিহ্যিক ধর্মীয় আদর্শ আর প্রাসঙ্গিক বিষয় বলে বিবেচিত নয়।

অবশ্য এছাড়া আরো ঐতিহাসিক স্বার্থের ব্যাপারও বিদ্যমান।[১৩] এর একটি নিরাপত্তা স্বার্থ সম্পর্কিত। শুধু রাশিয়া কেনো, প্রত্যেক দেশ তার ভৌগোলিক সীমানা স্থিতিশীল ও নিরাপদ রাখতে সচেষ্ট। জাতীয় নিরাপত্তা এখনো সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতিতে একটি মৌলিক উদ্বেগের বিষয়। এর কারণ, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো সোভিয়েত সীমান্তে দক্ষিণ প্রান্তীয় প্রতিরক্ষা বাফার স্বরূপ।

মধ্যপ্রাচ্যে মস্কোর আরেকটি ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য হচ্ছে উষ্ণ সমুদ্র বন্দরের অন্বেষা। সোভিয়েত সমুদ্র উপকূল ভাগের বন্দর অনেক কম. যে কয়টি আছে তাও বছরের প্রায় ছয় মাস বরফাবৃত থাকে। তাই ভূমধ্যসাগর ও পারস্য উপসাগর এলাকায় কৌশলগত অবস্থান লাভ করা সর্বদাই ছিল মস্কোর উদ্দেশ্য। এরূপ উদ্দেশ্যে সমকালীন সোভিয়েত মধ্যপ্রাচ্যে নীতিকে ভূমধ্যসাগর এলাকায় সোভিয়েত নৌবহরের পাশাপাশি পারস্য উপসাগরেও মস্কোর আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছে। মস্কোর দৃষ্টিতে পারস্য উপসাগর হচ্ছে ইরান ও আরব উপদ্বীপের মাঝামাঝি অবস্থি দুদিকে ধারালে তরবারি স্বরূপ। এখানে বিশেষ করে মার্কিন ও ন্যাটো নৌবহরের সক্রিয় উপস্থিতি সোভিয়েত নিরাপত্তার প্রতি হুমকি রূপে বিবেচিত।[১৪]

ভূমধ্যসাগর ও পারস্য উপসাগর ছাড়া আরেকটি দিকেও সোভিয়েত ঐতিহাসিক স্বার্থ বিজড়িত। এ হচ্ছে তুর্কী প্রণালী বসফরাস ও ডর্ডানেলিস - এর দিকে। এসব প্রণালী বন্ধ করে দেয়া হলে রাশিয়া প্রায় স্থলভাগবেষ্টিত দেশে পরিণত হবার আশঙ্কা। এ জাতীয় বহুবিধ ঐতিহাসিক উপাদান রুশ মনস্তত্ত্বে স্থায়ী বৈশিষ্ট্যের চাপ রাখে।[১৫]

বলা প্রাসঙ্গিক যে, মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিককালীন সোভিয়েত আচরণ শুধু রাশিয়ার ঐতিহাসিক উদ্দেশ্যাবলি অর্জনের চেতনায় সঞ্জীবিত। এ অঞ্চলে সাম্প্রতিক সোভিয়েত নীতির উদ্দেশ্য কিছুটা নেতিবাচক, কিছুটা ইতিবাচক। নেতিবাচক উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে পশ্চিমা প্রভাব হ্রাস বা উচ্ছেদ করা এবং

www.pathagar.com

ন্যাটো জোট ও পশ্চিমা নিরাপত্তা স্বার্থ ব্যাহত করা। ইতিবাচক উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে সোভিয়েত রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি করা।[১৬]

বিষয়গুলো আরো কিছুটা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। মধ্যপ্রাচ্য মস্কোর সাম্প্রতিক উদ্দেশ্যাবলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এ অঞ্চলে মার্কিন ও পশ্চিমা মৈত্রীবন্ধন ও কৌশলগত ঘাঁটি অসাড় করে দেয়া, সম্ভব হলে এসব উৎখাত করা। এভাবে পশ্চিমা ও ন্যাটো জোটকে পার্শ্বভাগ থেকে পরিবেষ্টিত করা যায়।[১৭] দ্বিতীয়ত, অধুনা বিলুপ্ত বাগদাদ চুক্তি বা পরে সেন্টো জোটভুক্ত দেশগুলোকে পশ্চিমা প্রভাব বলয় থেকে মুক্ত করে সার্বিকভাবে পশ্চিমা মৈত্রী ব্যবস্থা ক্ষুণ্ন করাও ছিল সোভিয়েত উদ্দেশ্য। পরিশেষে সোভিয়েত মধ্যপ্রাচ্য নীতির আরো উদ্দেশ্য হচ্ছে এ অঞ্চলের দেশগুলোর সঙ্গে স্বার্থ ও মৈত্রী বন্ধন গড়ে তোলা।

এ জাতীয় সোভিয়েত উদ্দেশ্যাবলী মস্কোর ঐতিহাসিক নিরাপত্তা অন্বেষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বললে অত্যুক্তি হবে না। এছাড়া এ অঞ্চলের দেশগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী হওয়া সত্ত্বেও ক্রেমলিন সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ সংহতির প্রতি সম্ভাব্য হুমকি সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ, আর তাই মস্কো অতি সতর্কতার সঙ্গে মধ্য এশীয় সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রসমূহের মুসলিম জনগণকে এ অঞ্চলের মৌলবাদী বা গোড়া ধর্মীয় প্রভাব থেকে বিমুক্ত রাখতে সচেষ্ট।

মধ্যপ্রাচ্যে মস্কোর সাম্প্রতিক উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে এই এলাকার তেলের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভের প্রত্যাশা। এ উদ্দেশ্য শুধু মস্কোর কৌশলগত স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত। সোভিয়েত অবশ্য তেলে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সাইবেরিয়াতেও তার প্রচুর পরিমাণ তেল মজুদ রয়েছে। কিন্তু ঐ তেলের আহরণ বেশ জটিল এবং উত্তোলন অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। এছাড়া, মস্কো লাভজনক হারে জাপান ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে তেল রপ্তানি করে থাকে। এমন কি মধ্যপ্রাচ্যের তেল বাজারজাত করার প্রক্রিয়ায় মস্কো ব্যবসায়িক সুবিধা আদায়ের পাশাপাশি রাজনৈতিক এবং কৌশলগত স্বার্থও করতে পারে। সর্বোপরি, তেলের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভের আশার পিছনে মস্কোর একটি 'নীতিগত কারণ' বর্তমান ঃ তাহলো পূর্ব ইউরোপের সোভিয়েত মিত্ররাষ্ট্রসমূহের প্রয়োজনীয় তেল সরবরাহের ওপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করে চলা, কেননা ওয়ারস জোটভুক্ত এ দেশগুলো সোভিয়েত সরবরাহকৃত তেলের ওপর খুব নির্ভরশীল।

www.pathagar.com

মধ্যপ্রাচ্যে মস্কোর আগ্রহের আরেকটি কারণ হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়া, পারস্য উপসাগর ও ভারত মহাসাগরের দিকে যোগাযোগ পথে অভিগমন বা সম্ভব হলে এর নিয়ন্ত্রণ লাভ। এ যোগাযোগ পথ হচ্ছে সুয়েজখাল। এর গুরুত্ব বিশেষভাবে বেড়ে যাবার কারণ হচ্ছে চীনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা। বস্তুত, বিগত দু'দশকের ওপরে চীন সম্পর্কে মস্কো অনেকখানি বিচলিত। তাই সমকালীন সোভিয়েত নীতির যে কোনো পর্যালোচনায় একটি পারমাণবিক শক্তি হিসেবে চীনের উদ্ভব এবং ক্রেমলিনে প্রণীত নীতির প্রতি চীনের বিরোধী মনোভাব যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। এ প্রসঙ্গে মস্কো অনেকখানি বিচলিত। তাই সমকালীন সোভিয়েত নীতির যে কোনো পর্যালোচনায় একটি পারমাণবিক শক্তি হিসেবে চীনের উদ্ভব এবং ক্রেমলিনে প্রণীত নীতির প্রতি চীনের বিরোধী মনোভাব যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের ব্যাপকতর সীমানা প্রান্তে চীনের অবস্থান, চীনের পারমাণবিক সম্ভাবনা, চীন ও পশ্চিম ইউরোপের সম্পর্কের ব্যাপক উন্নতি, গভীরতর চীন-মার্কিন সম্পর্ক-বিশেষ করে মার্কিন 'পারমাণবিক নিবারক' নীতির প্রতি চীনা সমর্থন এবং চীনকে দেয়া মার্কিন সামরিক প্রযুক্তি ও উভয়ের কৌশলগত লেনদেন প্রভৃতি সোভিয়েত সরকারের ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।[১৮]

উল্লেখ্য, ১৯৬০-এর দশকের শেষপদ থেকে চীন তার অন্তরণমূলক স্বতন্ত্রবাদ নীতি পরিহার করে। এর পূর্ব থেকেই মস্কো চীনের বিরুদ্ধে 'বেষ্টনকর' রণনীতি। চীনের এই রণনীতির অন্তর্নিহিত অর্থ ছিল দু'পায়ে ভর করা কৌশল অবলম্বন। কার্যকর পর্যায়ে এতে 'সশস্ত্র সংগ্রাম' ও 'কূটনৈতিক সংগ্রামের' মধ্যে কিছুটা ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়াস মেলে। চীনের সশস্ত্র রণকৌশল অবলম্বনের উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবীদের সমর্থন প্রদানের মাধ্যমে 'সোভিয়েত সংশোধনবাদী পথভ্রষ্ট দ্বারা' উন্মোচিত করা, চিহ্নিত করা 'সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীদের' মুক্তিকামী আরব জনগণের শত্রুরূপে।[১৯] কূটনৈতিক সংগ্রামের মাধ্যমে চীন চায় মধ্যপ্রাচ্যের জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃবর্গের আস্থাভাজন হতে যাচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নকে কূটনৈতিকভাবে একঘরে করা যায়।

উপর্যুক্ত দ্বৈত রণকৌশল অনুযায়ী চীন একদিকে যেমন পরাশক্তিদ্বয়ের আধিপত্যবাদের বিরোধিত করে ১৯৬০-এর দশক থেকে তেমনি প্যালেস্টাইন গণমুক্তি ফ্রন্টের ফেদাইন বা গেরিলাদের মতো বিপ্লবী দলগুলোর সঙ্গে গোপন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। এসব দলগুলো চীনা গণযুদ্ধের নীতি প্রকাশ্যে গ্রহণ করে, কিন্তু বেইজিং প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থা এবং মধ্যপ্রাচ্যের সরকারগুলোর সঙ্গেও সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে।[২০] চীনের মতো সোভিয়েত ইউনিয়নও বিপ্লবীদের

www.pathagar.com

প্রতি অব্যাহত সমর্থন দিখিয়ে চলে, যদিও একটি পারমাণবিক পরাশক্তি হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন সতর্কতার সঙ্গে এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত থাকে যাতে সোভিয়েত সীমানা ঘেষা এ অঞ্চলের কোনোরূপ বড় ধরনের যুদ্ধে মস্কোকে জড়াতে না হয়।

১৯৭০-এর দশকের শেষভাগ থেকে কম্পুচিয়ায় সোভিয়েত সমর্থনপুষ্ট অব্যাহত ভিয়েতনামী অভিযান এবং আফগানিস্তানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপের ফলে চীন আমেরিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে, এমন কি মস্কোর আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে 'যৌথ ফ্রন্ট' গঠনের কথাও বলে। ১৯৮০-এর দশকে চীন তার নিজস্ব প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন পরিকল্পনায় সাহায্য লাভকল্পে উভয় পরাশক্তির প্রতি ভারসাম্যমূলক নীতি গ্রহণ করে বটে, কিন্তু চীন-সোভিয়েত সম্পর্কে এখনো প্রতিপক্ষসুলভ পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং সন্দেহের ধারা বর্তমান।[২১] চীনের প্রতি নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ সত্ত্বেও মস্কো তাই মধ্যপ্রাচ্যের জলভাগে তার শক্তিশালী ও গতিশীল কৌশলগত উপস্থিতি জোরদার করে চলেছে।

ছয়

এভাবে মধ্যপ্রাচ্যে সার্বিক সোভিয়েত কৌশলগত উপস্থিতির প্রসঙ্গ এসে পড়ে। মস্কো তার কৌশলগত সচলতা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি চাচ্ছে এমন নিবারক ক্ষমতা অর্জন করতে যা সমুদ্রগামী মার্কিন কৌশলগত ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা অসাড় বা নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে, সম্প্রসারিত করতে পারে তার নিজস্ব সামুদ্রিক বাণিজ্য। মধ্যপ্রাচ্য ও বিশ্বব্যাপী কৌশলগত সচলতা লাভে সোভিয়েত আকাঙ্ক্ষার পেছনে কাজ করছে পরাশক্তি হিসেবে তার সচেতন অনুভূতি। কেননা একটি পরাশক্তির সংজ্ঞা শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত ও পারমাণবিক ক্ষমতার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা চলে না, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্কের সম্প্রসারিত বেড়াজাল সৃষ্টি করে মস্কোকে মধ্যপ্রাচ্য সোভিয়েত কৌশলগত উপস্থিতি সর্বোচ্চ পর্যায়ে বাড়াবার সক্রিয় ইচ্ছাও প্রদর্শন করতে হবে।[২২] এরূপ উদ্দেশ্য সাধনে সোভিয়েত ইউনিয়নকে নমনীয়তা এবং সময় ও সুযোগ মতো তার শক্তি প্রদর্শন করতে হবে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, স্থল বা বিমান বাহিনী এ জাতীয় কাজ সমাধা করতে পারে না ; একমাত্র একটি শক্তিশালী নৌ-বাহিনী বিশ্বব্যাপী সোভিয়েত স্বার্থবলয় সৃষ্টির কাজে দৃশ্যমান ভূমিকা পালন করতে পারে।

এভাবে কৌশলগত সচলতা লাভে মস্কোর সার্বিক উদ্দেশ্য সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতির প্রতি সমর্থন যোগানো যাতে বিশ্বের 'সব মহাদেশগুলোতে সাম্রাজ্যবাদীদের ওপর মারাত্মক আঘাত হানা যায়' বলে এ সোভিয়েত

www.pathagar.com

রণনীতি।[২৩] ১৯৬৪ সনে মস্কো প্রথম মধ্যপ্রাচ্যের জলভাগে 'সোভিয়েত স্কোয়ার্ডন' নামক একটি রণপোতবহর প্রবর্তন করে। এ থেকেই সোভিয়েত কৌশলগত সচলতার ধারণা বাস্তবায়িত হয়। পশ্চিমা রণপোতবহরের তুলনায় আপেক্ষিকভাবে নতুন হলেও 'সোভিয়েত স্কোয়ার্ডন' নামক একটি রণপোতবহর প্রবর্তন করে। এ থেকেই সোভিয়েত কৌশলগত সচরাচর ধারণা বাস্তবায়িত হয়। পশ্চিমা রণপোতবহরের তুলনায় আপেক্ষিকভাবে নতুন হলেও সোভিয়েত স্কোয়াড্রোন শক্তিশালী, বেগবান এবং বহুমুখী শক্তিসম্পন্ন। এতে অন্যান্য উপকরণের মধ্যে রয়েছে একেবারে নতুন মডেলের বিমানবাহী জাহাজ। ক্রমশ ভূমধ্যসাগর থেকে সোভিয়েত নৌবাহিনী ভারত মাহাসগর এবং পারস্য উপসাগরের দিকেও তার শক্তি বিস্তৃত করে। বর্তমানে সোভিয়েত নৌবাহিনী কার্যকরভাবে ভারত মহাসাগর বা পারস্য উপসাগর এলাকা নিজ প্রহরায় রাখার মতো ক্ষমতা রাখে, সমর্থন যোগাতে পারে মিত্রদেশ ভারতের প্রতি, অসাড় করতে পারে চীনের স্থাপিত 'বিশ্ব ছাদের' (পামির মালভূমির) ওপর দিয়ে স্থল যোগাযোগ। উল্লেখ্য, এই স্থল যোগাযোগ ব্যবহার করে পাকিস্তান চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে চলেছে, আর এর ফলে ব্যাহত হয় ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে স্থল যোগাযোগ।[২৪] এছাড়া, এই অঞ্চলে নৌবহর প্রবর্তন করে মস্কো আফ্রিকার সঙ্গে চীনা যোগাযোগ ক্ষুণ্ন করতে পারে। সম্ভবত রোধ করতে পারে পাশ্চাত্যের দিকে চীনের যোগাযোগ পথ।

আরো উল্লেখ্য যে, মস্কো এখন আর শুধু সোভিয়েত 'অভ্যন্তরভাগের' প্রতিরক্ষায় ব্যতিব্যস্ত নয় বলে তার পক্ষে 'সমুদ্র দর্শন শক্তি' লাভ করা সম্ভব হয়। মার্কিন সমুদ্রগামী কৌশলগত উৎক্ষেপণ ব্যবস্থা অসাড় করে দেয়া সোভিয়েতদের পক্ষে আর কঠিন নয়। প্রবদা জানায় যে, 'সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি কৃষ্ণ সাগর অঞ্চলীয় শক্তি, আর সে কারণে ভূমধ্যসাগরীয় রাষ্ট্রও বটে। তাই মস্কো এ অঞ্চলের জনগণের স্বার্থ বিজড়িত সব সমস্যার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত।[২৫] পরিশেষে এ অঞ্চলের সোভিয়েত নৌবহরের উপস্থিতির ফলে মস্কো তার ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক বহরের পাশাপাশি বিশাল নৌ 'মৎস্য বহর' অধিকতর ভালোরূপে রক্ষা করতে সমর্থ হবে। সোভিয়েত নৌবহরের সামর্থ্য ও শক্তি জোরদারকল্পে মস্কো প্রগতিপন্থী আরব দেশগুলোর বিমান ঘাঁটির ব্যবহারও।

মধ্যপ্রাচ্যে মস্কোর ক্রমবর্ধমান নৌশক্তি প্রায় স্থলাবদ্ধ সোভিয়েত ইউনিয়নকে তার ভৌগোলিকভাবে সীমিত অবস্থা থেকে অব্যাহতি প্রদান করে। মস্কোর কম-বেশি কোনোরূপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের যে কোনো সংকট বা দ্বন্দ্বের নিরসন এখন অচিন্তনীয়। এ অঞ্চলে সোভিয়েত নৌ

www.pathagar.com

উপস্থিতির ফলে মস্কোর প্রভাব-বলয় বিস্তৃতির সম্ভাবনা বাড়ছে এবং বাড়ছে মস্কোর বিকল্প কর্মকাণ্ডের সুযোগও। এ অঞ্চলের জলভাগে মার্কিন ষষ্ঠ নৌবহর বহুকাল থেকে তৎপর। সোভিয়েত নৌবহর ততখানি ক্রিয়াশীল নয় বটে, কিন্তু সোভিয়েত নৌবহর তার কর্মকাণ্ডে ক্রমবর্ধমান হারে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে আসছে। এ অঞ্চলে যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র রাষ্ট্রগুলোকে সম্ভাব্য সোভিয়েত প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে হবে যাতে তাদের নিজস্ব কোনো সিদ্ধান্ত বি-প দৃষ্টিতে দেখে মস্কো ক্ষিপ্ত না হয়, প্ররোচিত না হয় বিপক্ষসুলভ স্বার্থোদ্ধারে। অন্য কথায়, মধ্যপ্রাচ্যে সোভিয়েত নৌবহর বহুমুখী আক্রমণ ও প্রতিরক্ষামূলক দক্ষতা লাভের ফলে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতায় মস্কোর নিম্নতম শর্ত আমেরিকা কিংবা অন্য কোনো শক্তির পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব হবে না।

সাত

ক্রুচেভের গৃহীত 'নতুন দৃষ্টিকোণ' থেকে এভাবে সোভিয়েত মধ্যপ্রাচ্য নীতি মস্কোর কৌশলগত উদ্দেশ্যাবলি অর্জনে প্রণীত হয়। এসব উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত 'আদর্শগত কাঠামো' স্বাভাবিক কারণে মধ্যপ্রাচ্যের মতো একটি মূলত অকম্যুনিস্ট অঞ্চলে ব্যবহৃত সোভিয়েত রণকৌশলের মূল ধারায় রয়েছে (১) আন্তর্জাতিক বিষয়ে সাধারণ সোভিয়েত নীতির ইতিবাচক দিকগুলোর ওপর গুরুত্ব আরোপ, যেমন 'শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান', জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সংহতি, পারস্পরিক সহযোগিতা ও পরস্পরের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা;[২৬] (২) জাতীয়তাবাদ, উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনসমূহের প্রতি রাজনৈতিক সমর্থন প্রদান; (৩) জাতীয় আন্দোলন যুদ্ধের প্রতি সমর্থন প্রদান; (৪) আঞ্চলিক জনগণের ক্রমবর্ধমান আশা-আকাঙ্ক্ষা বা উগ্র পরিবর্তনকামী আরব জনমতে ও আরব দেশগুলোর বৃহত্তর জনসাধারণের উদ্দেশ্যাবলির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ;[২৭] (৫) সামরিক ও প্রযুক্তিগত সাহায্য প্রদান; (৬) 'নিঃশর্ত সাহায্য' ও বড় ধরনের পরিকল্পনায় সাহায্য প্রদান; (৭) রপ্তানি আয়ত্তাধীন রাখার উদ্দেশ্যে, বহির্বাণিজ্যকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার; (৮) জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি চীনা প্রচারণামূলক বাহ্যিক সমর্থন উন্মোচিত করা এবং চীনকে সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলতার শরিক রূপে চিহ্নিত করা;[২৮] এবং (৯) পশ্চিমা জোট, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রকে ইসরাইলি সম্প্রসারণবাদ ও আগ্রাসনের অবিচ্ছিন্ন মিত্ররূপে উপস্থাপিত করা।[২৯] এই শেষোক্ত প্রয়াসে আরব জাতীয়তাবাদকে পশ্চিমা এবং পুঁজিবাদবিরোধী ভাবধারায় সম্পৃক্ত করে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে 'জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের শরিক' বা মিত্র হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়। এভাবে

www.pathagar.com

ইসরাইলের বিরুদ্ধে আরবদের সংগ্রামকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার তাবেদার মিত্রদের বিরুদ্ধে একক সংগ্রাম হিসেবে চিহ্নিত হয়, কেননা, আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ ও ইহুদিবাদ একই সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত; তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত মুক্তি সংগ্রামকে সমাজতান্ত্রিক শক্তিসমূহের অভিন্ন সংগ্রামরূপে দেখা হয়।[৩০]

১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে মিশর প্রথমত মস্কোর আওতাভুক্ত দেশভুক্ত দেশরূপে গণ্য হয়। এর কারণ মিশরের ভৌগোলিক অবস্থান, বিশেষ করে কৃষ্ণ সাগরের সন্নিকটে এর অবস্থান, সুয়েজখালে এর নিয়ন্ত্রণ এবং সর্বোপরি আরব বিশ্বে কায়রোর ঐতিহ্যিক প্রভাব ও জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে মিশরের নেতৃস্থানীয় ভূমিকা। মধ্যপ্রাচ্যে সিরিয়া হচ্ছে মস্কোর বিকল্প শক্তিশালী মিত্রদেশ। ইসরাইলের ঘোরতর উগ্র-বিরোধী দেশ এবং বামপন্থী সরকারি দলের (বাথ দল বা Ba'th Party) মার্কসীয় আদর্শিক প্রবণতার কারণে সিরিয়া হচ্ছে মস্কোর কৌশলগত আওতাধীন দেশরূপে বিবেচিত। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে লিবিয়ার জঙ্গী পাশ্চাত্য ও ইসরাইলিবিরোধী মনোভাব। লিবিয়ার সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্কে মস্কোর বাড়তি লাভ হয়, কেননা মস্কো থেকে প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্রের জন্য লিবিয়া যথাযোগ্য মূল্য প্রদান করে থাকে।

পরিশেষে আফগানিস্তানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপ ও অবস্থানের বিষয় উল্লেখ করা চলে। সোভিয়েত দৃষ্টিকোণ থেকে, আফগানিস্তানে তাদের 'সীমিত সামরিক বাহিনী' পাঠাতে হয় সেই দেশকে 'সাম্রাজ্যবাদের কোটরে' আনার প্রচেষ্টা প্রতিহত করতে, সেই দেশে নিবৃত্ত করতে হয়, সাম্রাজ্যবাদের সেতুবন্ধন ও আগ্রাসনের ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস।[৩১] মস্কোর মতে, আফগানিস্তানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপ ১৯৭৮ সনের সোভিয়েত আফগান চুক্তি ও জাতিসংঘ ৫১ ধারা অনুযায়ী যুক্তিযুক্ত। উপরন্তু, আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনী প্রেরণের কারণ সৃষ্টি হয়েছে সোভিয়েত নিরাপত্তাহীনতার জন্য। মার্কিন উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতায় মিশর এবং ইসরাইলের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক, পৃথক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর, শান্তি রক্ষার নামে সাইনইতে মার্কিন বাহিনী ও আমেরিকার তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা মোতায়েন, পারস্য উপসাগর এলাকায় দ্রুত মোতায়েন বাহিনী সৃষ্টি এবং ভারত মহাসাগর এলাকায় সার্বিকভাবে মার্কিন নৌবাহিনীর উপস্থিতি জোরদার করার কারণে ক্রেমলিনে নিরাপত্তাহীনতার ভার সঞ্চার হয়। পরিশেষে মস্কো মনে করে যে, আফগানিস্তানে সোভিয়েত উপস্থিতি দীর্ঘকাল থেকে বহুমুখী সোভিয়েত সাহায্য-সহযোগিতার অব্যাহত ফসল এবং এর ফলে সেই দেশে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ ও স্থানীয় প্রতি-বিপ্লবীদের যৌথ

www.pathagar.com

চক্রান্তের জাল ছিন্ন করে বৃহত্তর আফগান জনগোষ্ঠীর জন্য শোষণমুক্ত নবজীবন গড়ে তুলতে সাহায্য করে আসছে।[৩২]

উল্লেখ্য, সময়কাল এবং আঞ্চলিক পরিস্থিতি উভয় দিক থেকে মস্কোর পক্ষে তার আঞ্চলিক উদ্দেশ্যাবলী চরিতার্থ ও তার আঞ্চলিক স্বার্থাদি বাড়ানোর অনুকূল পরিবেশ ছিল। তদুপরি, সোভিয়েত রণকৌশল এরূপ নৈপুণ্যের সঙ্গে পরিকল্পিত যে মস্কোকে লাঞ্চিত ও অবহেলিতদের পরিত্রাণরূপে উপস্থাপিত করা চলে, সমাদৃত হয় মস্কো এ অঞ্চলের বেশিভাগ রাষ্ট্রের নিকট, খ্যাতি লাভ করে সুমহান আদর্শে অনুপ্রাণিত সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা রূপে। এসব বহুবিধ রণকৌশলগত উদ্দেশ্য সামনে থাকা সত্ত্বেও প্রাক্তন সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চভ স্বয়ং অবশ্য স্বীকার করেন যে, ক্রেমলিন গৃহীত নীতি ছিল যথার্থ-ই সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় স্বার্থের কারণে।[৩৩] ১৯৫০-এর দশকের দিকে মধ্যপ্রাচ্যে সোভিয়েত অনুপ্রবেশ থেকে মস্কো এই অঞ্চলে তার কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যাপক সাফল্য লাভ করে। সোভিয়েত রণবিশারদগণ এরপর থেকে দাবি করে আসছেন যে, মধ্যপ্রাচ্য সোভিয়েত নিরপত্তা আওতাধীন অঞ্চল এবং এখানে সোভিয়েত অবস্থান ও উপস্থিতি অবধারিত।

আট

মধ্যপ্রাচ্যে মস্কোর ব্যাপক সাফল্য সত্ত্বেও এ অঞ্চলে তার রাজনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থের অন্বেষা কোনোরূপ সামঞ্জস্যপূর্ণ কাঠামো রণনৈতিক কাঠামো বা রূপরেখার সঙ্গে মিলানো কঠিন। আফগানিস্তান, মিশর, আলজেরিয়া, ইরাক, লিবিয়া, গণপ্রজাতান্ত্রিক (দক্ষিণ) ইয়েমেন এবং সিরিয়ার মতো দূর-দূরান্তে অবস্থিত দেশগুলোর সঙ্গে মস্কোর দীর্ঘমেয়াদি মৈত্রীচুক্তি রয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই এসব দেশকে মস্কো বিভিন্ন সময়ে অস্ত্রশস্ত্র, আর্থিক ও কূটনৈতিক সাহায্য প্রদান করে। কিন্তু এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের আরো কিছু দেশকেও মস্কো আর্থিক সাহায্য ও অস্ত্র সরবরাহ করে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ইরান, জর্ডান, তিউনিসিয়া, মরক্কো, সুদান, লেবানন, (উত্তর) ইয়েমেনী প্রজাতন্ত্র, তুরস্ক ও পাকিস্তান। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উপর্যুক্ত প্রায় সবগুলো রাষ্ট্রই পরস্পরের সঙ্গে আঞ্চলিক বিবাদে জড়িত।

উল্লেখ্য, সোভিয়েত ইউনিয়ন মধ্যপ্রাচ্যে তার স্বার্থ সুসংহত করার লক্ষ্যে আরব ও অনারবদের নিয়ে আঞ্চলিক ঐক্য গড়ার প্রস্তাব রাখে, কিন্তু এরূপ কাজ সমাধা করা বহু কারণে বিপজ্জনক। প্রথমত, সমগ্র অঞ্চল আন্তঃরাষ্ট্র ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিবাদ-বিসম্বাদে জর্জরিত। দ্বিতীয়ত, সমগ্র আরব, তথা মুসলিম অধ্যুষিত মধ্যপ্রাচ্যের বৃহত্তর ঐক্য আন্দোলনের প্রতি সোভিয়েত সমর্থন শুধু

www.pathagar.com

মস্কোর মার্ক্সীয় আদর্শের পরিপন্থীই নয়, এ জাতীয় ধ্যান-ধারণা সোভিয়েত মধ্য এশিয়ার মুসলিমদের প্রভাবিত করতে পারে। এছাড়া, এ অঞ্চলের বিবদমান বা দ্বন্দ্বরত রাষ্ট্রগুলোর প্রতি সোভিয়েত সমর্থন উভয় সংকটমূলক হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুত, মধ্যপ্রাচ্যের জটিল কাঠামোতে আদর্শ নীতিগত ভারসাম্য রক্ষা করার যে কোনো প্রয়াস শুধু অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, স্বার্থের প্রতি হুমকিও সৃষ্টি করতে পারে।

মধ্যপ্রাচ্যে মস্কোর কৌশলগত অন্বেষা, এখানে ঝুঁকি ও ব্যয়ের দিক বিবেচনা করে এই অঞ্চলে মস্কোর স্থায়ী রাজনৈতিক বা রণনৈতিক স্বার্থ কতখানি অর্জন হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্নের অবতারণা করা যেতে পারে। কেননা এ অঞ্চলে মস্কোর প্রাপ্ত প্রায় সব সুবিধা বা সুযোগ অনিশ্চয়তার সম্মুখীন। যাদের সঙ্গে সোভিয়েত রাজনৈতিক মৈত্রী বন্ধন রয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও এরূপ বক্তব্য প্রযোজ্য। মিশর, সিরিয়া কিংবা প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থার প্রতি বিপুল পরিমাণ সোভিয়েত অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র প্রদান সত্ত্বেও এ অঞ্চলের অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এদের কোনোটি সোভিয়েত প্রভাবাধীনভাবে তার নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারবে না। বস্তুত, এদের প্রত্যেকটি নিজ নিজ কূটচাল ক্ষমা ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলেছে।

বলা প্রাসঙ্গিক যে, মধ্যপ্রাচ্যে সোভিয়েত স্বার্থ ও আগ্রহ এবং এ অঞ্চলের তাবেদার মিত্র দেশগুলোর প্রতি সোভিয়েত স্বার্থজনিত বন্ধনের কারণে এসব দেশের জন্য অব্যাহত সোভিয়েত কূটনৈতিক সমর্থন ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহে ক্রেমলিনের বিশেষ বাধ্যবাধকতা রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে স্বার্থের অন্বেষায় অবশ্য মস্কোকে অনেক ক্ষেত্রে হতাশাগ্রস্ত হতে হয়, কিংবা হতে হয় বাধা-প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন, কিন্তু পারস্পরিক নির্ভরশীলভিত্তিক সম্পর্ক বজায় রাখার কারণে এবং মার্কিনপন্থী প্রবণতা রোধকল্পে মস্কো মধ্যপ্রাচ্যে তার অর্থ ও অস্ত্র সরবরাহনীতি অব্যাহত রাখে। তবু দু'মুখো রণকৌশলমূলক নীতি মস্কোকে মধ্যপ্রাচ্যে তার অন্তর্নিহিত উভয় সংকট অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি দেয় নি। এ ছাড়া, মধ্যপ্রাচ্যের তেল নিয়ন্ত্রণ লাভে সোভিয়েত আকাঙ্ক্ষা এবং ঐতিহ্যিক পশ্চিমা গ্রাহকদের তেল সরবরাহ থেকে বঞ্চিত করার ইচ্ছাও উভয় সংকটমূলক : মিত্র আরব দেশগুলো তেল বেচা অর্থ থেকে অনুদান পাবে কম, আর এ ঘাটতির ফলে মস্কোর ওপর বিনামূল্যে সাহায্য সরবরাহ প্রদানের চাপ বৃদ্ধি পাবে।

মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, মস্কোর মধ্যপ্রাচ্য নীতি সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। এ অঞ্চলে স্বার্থের অন্বেষায় মস্কো আদর্শগত বিশুদ্ধতা পরিহার করে। সনাতনপন্থী এবং প্রতিক্রিয়াশীল শাসক ও সরকারসমূহের সঙ্গে মস্কোর সহযোগিতার প্রবৃত্তি থেকে এরূপ বক্তব্য উপস্থাপন করা চলে। স্থানীয়

www.pathagar.com

কম্যুনিস্টদের ভাগ্য সোভিয়েত সিদ্ধান্তে তেমন প্রভাব রেখেছে বলে মনে হয় না। বরং মস্কোর জাতীয় বা বিশ্ব কৌশলগত স্বার্থের অন্বেষা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে বারংবার মার্ক্সীয় রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর বিধিনিষেধ আরোপ, এমন কি নিষিদ্ধ ঘোষণাতেও আদৌ ব্যাহত হয় নি।

মস্কোর মধ্যপ্রাচ্য নীতিতে আরো অসঙ্গতি ও দুর্বলতা প্রকাশ পায়। ইসরাইলের সঙ্গে আরবদের দ্বন্দ্বের তীব্রতার কারণে মস্কো আরব রাষ্ট্রগুলোর ওপর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পাচ্ছে। কিন্তু আরবদের দুর্বলতার সুযোগ নেয়া হলে স্থায়ী সোভিয়েত স্বার্থের বন্ধন গড়ে ওঠার সম্ভাবনা কম। যেমন, আরব-ইসরাইলি দ্বন্দ্ব নিরসন হলে ক্রেমলিনের কূটনৈতিক সাহায্য বা কৌশলগত সমর্থন লাভের ইচ্ছা আরবদের মধ্যে থাকবে কি না সন্দেহ। পক্ষান্তরে ভৌগোলিকভাবে সন্নিকট বলে মধ্যপ্রাচ্য সোভিয়েত নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, আর তাই এ অঞ্চলে মস্কো তার সার্বিক আর্থ বাণিজ্যিক স্বার্থও জোরদার করার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। এসব করণে আঞ্চলিক বিবাদ-বিসম্বাদ ও স্থিতিহীনতায় ইন্ধন যোগানো প্রকৃত সোভিয়েত স্বার্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

বস্তুত, মস্কো মধ্যপ্রাচ্যে আঞ্চলিক শান্তি দেখতে চায়। ১৯৭৩ সনের অক্টোবর যুদ্ধ থেকে এ অঞ্চলে প্রায় চিরস্থায়ী অশান্ত অবস্থা বিরাজ করছে। ফলে ব্যাপকতর যুদ্ধ ও পরাশক্তিদ্বয়ের মুখোমুখি হবার ঝুঁকি ব্যাপক। তাই এ অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা মস্কোর কাম্য। অক্টোবর যুদ্ধের কিছুকাল পর একজন সোভিয়েত বিশ্লেষক লিখেন, মধ্যপ্রাচ্য বহুকাল থেকে বিচিত্র ধরনের ভাবপ্রবণতায় সন্নিবিষ্ট। এ অঞ্চলের ঘটনাপ্রবাহ সর্বদাই পরস্পরবিরোধী এবং কখনো কখনো আঁকাবাঁকা ধারায় আবর্তিত। এসব বাস্তবতা আশ্চর্য মনে হতে পারে কিন্তু তবু এ অঞ্চলেও আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তিতে ন্যায়নিষ্ঠ শান্তির প্রত্যাশা জোরদার হচ্ছে। সামাজতান্ত্রিক দেশগুলোর নীতি একই রূপ সাফল্য অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত।[৩৪]

প্রকৃত মধ্যপ্রাচ্যে সোভিয়েত কৌশলগত স্বার্থ যুদ্ধের চেয়ে শান্তিপূর্ণ অবস্থায় অধিকতর সুসংহত হতে পারে। এ অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি দেশে মস্কো ইতিমধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-বাণিজ্যিক স্বার্থ লাভ করে, আর তাই এ অঞ্চলে যুদ্ধ-দ্বন্দ্ব হ্রাস পেলে মস্কোর আঞ্চলিক স্বার্থ অক্ষুণ্ন থাকতে পারে। আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব-বিবাদে ইন্ধন যোগালে মস্কোর আঞ্চলিক শক্তি বর্তমান সময়ের চেয়ে অধিকতর বৃদ্ধি পাবে বলে মনে হয় না। পক্ষান্তরে, এ অঞ্চলে উত্তেজনা অব্যাহত থাকলে বা সম্প্রসারিত হারে যুদ্ধ চললে বর্তমান ফলপ্রসূ সোভিয়েত আর্থ-বাণিজ্যিক সম্পর্ক অব্যাহত হবে। ইরানের মতো অন্যত্র বিপ্লবী আলোড়ন হলে মার্কিন স্বার্থ ব্যাহত হতে পারে বটে, কিন্তু এতে সোভিয়েত স্বার্থ আদৌ বৃদ্ধি পাবে কি না সন্দেহ। আরব-ইসরাইলি এলাকায় পুনরায় যুদ্ধ

www.pathagar.com

বেধে গেলে সুয়েজখালে যোগাযোগ ব্যাহত হতে পারে, ক্ষুণ্ন হতে পারে সোভিয়েত স্বার্থ, সোভিয়েত আঞ্চলিক নিবারক রণনীতি তার কার্যকারিতা হারাতে পারে। তাছাড়া, এ অঞ্চলে সম্প্রসারিত যুদ্ধ দেখা দিলে সোভিয়েত সীমানা প্রান্তের এ দেশগুলোতে চীন অধিকতর অনুপ্রবেশ লাভের সুযোগ পাবে। সম্প্রতি ইরান ও ইরাক উভয় দেশে চীনের অস্ত্র সরবরাহের খবর এরূপ মতবাদের যথার্থতার পরিচয় রাখে।

নয়

এ জাতীয় যুদ্ধ দ্বন্দ্বের পরিস্থিতি সোভিয়েত নিরাপত্তার অনুকূলে হতে পারে না। তাই মস্কো এরূপ যুদ্ধকে নিরর্থক যুদ্ধ রূপে অভিহিত করে।[৩৫] এ পর্যায়ে কিছুটা তত্ত্বীয় প্রসঙ্গও উত্থাপন করা যেতে পারে। মস্কোর দৃষ্টিতে, মধ্যপ্রাচ্যে সংকটের মৌলিক কারণ জাতীয় বা ধর্মীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব নয়, এর মূলে রয়েছে শ্রেণী, সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব।[৩৬] এরূপ অভিমত নিছক তত্ত্ব রূপে প্রতিভাত হলেও সোভিয়েত রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এরূপ উচ্চমার্গের দর্শনের কথার মারপ্যাঁচে আন্তঃরাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্বের জটিলতা এড়িয়ে যাবার প্রয়াস মেলে। মুখ্য কথা হলো ঃ মস্কো সম্ভবত অবহিত যে মধ্যপ্রাচ্যে আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব - বিরোধের নিরসন ঘটলে বর্তমানে আর সোভিয়েত স্বার্থের তেমন ব্যাঘাত ঘটবে না ; কেননা মধ্যপ্রাচ্যের মতো বিচিত্রধর্মী অঞ্চলে এমন কোনো শান্তি ব্যবস্থা কায়েম হতে পারে না যাতে দ্বন্দ্বরত বা বিবদমান পক্ষসমূহের স্থায়ী মিত্রের সন্ধান মিলবে, সমাপ্ত হবে অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা। মধ্যপ্রাচ্যে বিচিত্র ধরনের দ্বন্দ্ব-বিবাদ শুধু নেই, এখানে উদ্ভব ঘটে বহু স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের দাপট প্রয়াসী শক্তিকেন্দ্রেরও। তাই মস্কোর পক্ষে এখানে মৈত্রী সম্পর্ক গঠন বা অস্ত্রের বাজার লাভ করা তেমন কঠিন হবে বলে মনে হয় না।

তদুপরি, সোভিয়েত ইউনিয়ন হচ্ছে স্বীকৃত শান্তি সংস্থাপক, মধ্যপ্রাচ্য সংক্রান্ত জেনিভা শান্তি সম্মেলনের সহ-সভাপতি। উল্লেখ্য, ১৯৭৩ সনের আরব-ইসরাইলি যুদ্ধের পর অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনকে মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি প্রক্রিয়ার অংশবিশেষ রূপে গণ্য করা হয়। একটি আঞ্চলিক শান্তি সংস্থাপক হিসেবে তাই শান্তির পথে মধ্যপ্রাচ্য বিরোধের নিষ্পত্তি ও অগ্রগতি সাধনে মস্কোর সুনামও বিজড়িত। বস্তুত, ১৯৭৩ সনের পর থেকে মস্কো আনুষ্ঠানিকভাবে ওয়াশিংটনের সঙ্গে 'যৌথ শান্তি সংস্থাপক' হিসেবে আঞ্চলিক শান্তির উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উপরন্তু, মধ্যপ্রাচ্যের মতো উত্তপ্ত পরিবর্তনশীল একটি অঞ্চলে মিত্রদেশগুলোর প্রতি দেয়া বহুবিধ অঙ্গীকার থাকা সত্ত্বেও মস্কো স্বীকার করে যে, শুধুমাত্র যেসব প্রতিশ্রুতি পারস্পরিক ও সমরূপ ধরনের সে

www.pathagar.com

সব যথার্থভাবে পালন করা হলে এ অঞ্চলে স্বাভাবিক আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা মিলতে পারে।[৩৭]

মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মস্কোর সদিচ্ছা বা অভিপ্রায়কে কিন্তু এ অঞ্চলে অব্যাহত সোভিয়েত উপস্থিতি সম্পর্কিত দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বিভ্রম করা ঠিক হবে না। বরং এটা দৃঢ়ভাবে বলা চলে যে, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিজড়িত পক্ষগুলোর যথার্থ সদিচ্ছা থাকলে তাদের উচিত হবে এ অঞ্চল থেকে মস্কোকে বহিষ্কার করার পরিকল্পনা ত্যাগ করা। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি সুনিশ্চিতকল্পে মস্কো পরাশক্তিদ্বয়ের পুরোপুরি শরিকি ভূমিকার ওপর জোর দিয়ে আসছে। বস্তুত, মধ্যপ্রাচ্য, এমন কি পুরো ভারত মহাসাগর অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় মস্কো শুধু অবদান রাখতে আগ্রহী নয়, একটি আঞ্চলিক শান্তি ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় নিশ্চয়তা বিধানেও ক্রেমলিন ইচ্ছুক।[৩৮] সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মস্কো বারংবার এরূপ ইচ্ছা ব্যক্ত করে আসছে।

দশ

এ পর্যায়ে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি নিয়ে দুটি পরাশক্তির যোগাযোগ সম্পর্কে কিছু বলা যেতে পারে। স্নায়ুযুদ্ধের ভাষায় পরাশক্তিদ্বয় যখন প্রায়শ একে অপরের মোকাবিলায় তৎপর তখন আঞ্চলিক শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে তাদের পারস্পরিক সংলাপের প্রস্তাব রাখা অমূলক। বস্তুত আশির দশকে পরাশক্তিদ্বয়ের সম্পর্ক ছিল অনেকটা স্নায়ুযুদ্ধ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। ক্রেমলিন মনে করে নি যে, আঞ্চলিক শান্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপকভাবে বিদ্যমান, কেননা সোভিয়েত দৃষ্টিতে, মার্কিন দ্যঁতত নীতি ভয়ানক প্রতারণামূলক। বর্তমান দশকেই মার্কিন সামরিক বাজেট দু'গুণ বেড়েছে. যুক্তরাষ্ট্র ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করে চলছে তার কৌশলগত পারমাণবিক শক্তি।[৩৯] মস্কো তার বক্তব্য আরো সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে সমকালীন বিশ্ব অতি ক্ষুদ্র, যুদ্ধ ও শক্তির নীতি প্রদর্শনের জন্য এ অতি পলকা।[৪০] তাই মস্কো শুধু ইউরোপেই সামরিক বা রাজনৈতিক ভাব দ্যঁতত নীতির বাস্তবায়ন চাচ্ছে না, সার্বিক আন্তর্জাতিক সম্পর্কে মস্কো উত্তেজনার প্রশমন চাচ্ছে যাতে দ্যঁতত বিশ্বরূপ ধারণ করবে, বিস্তৃতি লাভ করবে এশিয়াসহ সব মহাদেশে, দ্যঁতত হবে অপরিবর্তনীয়। এক দশকের ওপর থেকে এটাই হচ্ছে সোভিয়েত নীতির মূলধারা।[৪১]

প্রকৃতপক্ষে, শান্তি সংস্থাপক হিসেবে পরাশক্তিদ্বয় যদি কোনো ফলপ্রসূ অবদান রাখতে চায় তাহলে উভয়কে প্রথমত দ্বি-পাক্ষিক পর্যায়ে সমঝোতায় আসতে হবে, কেননা উভয় পরাশক্তি পৃষ্ঠপোষক ও তাবেদার সম্পর্কের ভিত্তিতে অঞ্চলে অপ্রতিসমভাবে বিজড়িত। বলা সঙ্গত যে, কোনো একটিমাত্র

www.pathagar.com

পরাশক্তির উদ্যোগে যদি আঞ্চলিক শান্তিকাঠামো গড়ে তোলা হয় যা 'অপর পরাশক্তি হুমকি হিসেবে দেখে তা' কিছুতেই স্থিতিশীল হতে পারে না। তাই উভয় পরাশক্তিকে অবশ্যই সহ-অবস্থান করতে শিখতে হবে। যদি জেনিভা কিংবা অন্য কোথাও মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে কোনো আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে হয় তার পূর্বে পরাশক্তিদ্বয়ের মধ্যে এ অঞ্চলের ব্যাপকতর বিষয়াদি নিয়ে কিছুটা সমঝোতা অত্যাবশ্যক। অন্যথায় মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানের লক্ষ্যে প্রকৃত অগ্রগতি সাধন সম্ভব হবে না।

এটা অবশ্য সত্য যে, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি সংস্থাপকের ভূমিকায় মস্কোর চেয়ে ওয়াশিংটন সম্ভবত অধিকতর প্রভাব বিস্তারে সমর্থ। কেননা পরাশক্তি দু'টির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রই হচ্ছে একমাত্র শক্তি যার ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইল ও আরব রাষ্ট্রসমূহের দ্বন্দ্বের উভয় দিকে অব্যাহত কূটনৈতিক যোগাযোগ রয়েছে, প্রভাব রয়েছে জাপান ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোর ওপর যাদের জীবন ও জীবিকা অনেকখানি নির্ভরশীল। মধ্যপ্রাচ্যের তেল সরবরাহ এবং সেই অঞ্চলের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর। তাছাড়া, চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়ের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের অনেকটা ভারসাম্যমূলক কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে যাতে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির ব্যাপারে ওয়াশিংটনের পক্ষে উভয় কম্যুনিস্ট দেশের সমঝোতামূলক সম্মতি আদায় করা সম্ভব হতে পারে। সর্বোপরি, মধ্যপ্রাচ্যে সংকট ও সমস্যা নিরসনে, বিশেষ করে আরব-ইসরাইলি এলাকায় সহিংসতা নিয়ন্ত্রণে ১৯৫৬ সন থেকে যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষাকৃতভাবে অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে।

উপর্যুক্ত কারণে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ায় সম্ভবত ওয়াশিংটন মস্কোর চেয়ে অধিকতর সাফল্য যোগাতে পারে, কিন্তু আঞ্চলিক শান্তি সংস্থাপক হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ওয়াশিংটনের উচিত হবে প্রতিটি ক্ষেত্রে এমনি সজাগ থাকা যাতে মস্কো কোনো মার্কিন পদক্ষেপকে বিরূপ দৃষ্টিতে না দেখে। মধ্যপ্রাচ্যের কৌশলগত গুরুত্ব এমন যে একে পরাশক্তির সীমানা প্রান্ত ও স্বার্থবলয় থেকে দূরে অবস্থিত অন্য কোনো অঞ্চলের মতো নিরপেক্ষ অঞ্চলরূপে বিবেচনা করা যেতে পারে না। এই অঞ্চল ন্যূনপক্ষে এরূপ হওয়া উচিত যাতে কোনো শক্তিই তার ন্যায় ন্যায্য স্বার্থের প্রতি হুমকি না দেখে, সবাই যেন এখানে শন্তিপূর্ণ উদ্দেশ্য সাধন করার সুযোগ লাভ করে। উপরন্তু, এ অঞ্চলে মস্কোর দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্যাবলি এবং তার আঞ্চলিক শক্তির বাস্তব প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে এটা ভাবা অচিন্তনীয় হবে যে, মধ্যপ্রাচ্য থেকে মস্কো হাত গুটিয়ে নেবে কিংবা এ অঞ্চল ছেড়ে দেবে শুধুমাত্র মার্কিন প্রভাবের অধীন। তাই প্রাক্তন মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী হেনরী কিসিঞ্জার এক যুগেরও অধিক পূর্বে সতর্কবাণী উচ্চারণ

www.pathagar.com

করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশগ্রহণ, সোভিয়েত সহযোগিতা ও সম্ভাব্য নিশ্চয়তা ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের কোনো স্থায়ী শান্তি ব্যবস্থা কায়েম করা যাবে না।[৪২] প্রকৃতপক্ষে, মধ্যপ্রাচ্যে কি ধরনের নিরাপত্তা কাঠামো শান্তি স্থাপনে সহায়তা হতে পারে এ জাতীয় যে কোনো বিচার বিবেচনায় এ অঞ্চলে সোভিয়েত সামরিক শক্তির বাস্তবতা থেকে মূল্যায়ন শুরু করতে হবে।

কিন্তু সাম্প্রতিককালে মার্কিন মধ্যপ্রাচ্য নীতি থেকে মনে হয় যেন যুক্তরাষ্ট্র উদ্দেশ্যমূলকভাবে আঞ্চলিক শান্তি প্রক্রিয়ায় সোভিয়েত ভূমিকাকে হেয়প্রতিপন্ন করতে প্রয়াসী। এ অঞ্চলে মার্কিন কূটনৈতিক মধ্যস্থতা যদি প্রকৃতই সাফল্যমণ্ডিত হতে হয় তাহলে ওয়াশিংটনকে তার ঐতিহ্যিক বিশ্ব প্রতিযোগী শক্তির নিকট থেকে সমর্থন ও সহযোগিতা চাইতে হবে। কেননা উভয় পরাশক্তির পারমাণবিক নিবারণের দ্বিমেরু-কেন্দ্রিক উপাদান তাদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি ও দ্বন্দ্ব সীমিত রাখার প্রয়াসে কিছুটা নিশ্চিত বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে।[৫৩] পারমাণবিক যুদ্ধের আত্মঘাতী সম্ভাবনা সম্পর্কে উভয় পরাশক্তি নিশ্চয়ই সচেতন। তাই পরাশক্তিদ্বয়ের অবশ্যই উচিত হবে বিশ্ব ও আঞ্চলিক সমস্যাদি নিরসনে সমঝোতায় পৌঁছানো যদি শান্তির ব্যাপারে তাদের উদ্বেগ অর্থবহ বা প্রাসঙ্গিক রূপে বিবেচিত হতে হয়। শুধুমাত্র পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে দু'টো পরাশক্তি মধ্যপ্রাচ্যে গড়ে তুলতে পারে একটি আঞ্চলিক শান্তিকাঠামো এবং এমন এক দীর্ঘমেয়াদি কূটনৈতিক প্রক্রিয়া সূচনা করতে পারে যাতে স্থিতিশীল বিশ্বশান্তির কৌশলগত মৌলিক পরিবর্তনে উৎসাহ যোগাবে। কৌশলগত অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি ইরান-ইরাক যুদ্ধের ব্যাপারে অতি সাম্প্রতিক তাদের পারমাণবিক আলোচনা শুভ সূচনা রূপে বিবেচিত হতে পারে যদি এ জাতীয় আলোচনা উভয় পরাশক্তির মধ্যে একটি আঞ্চলিক ও বিশ্বপর্যায়ের শান্তি এবং নিরাপত্তা কাঠামো নিয়ে সমঝোতায় পৌঁছাতে সাহায্য করে।

মস্কো ও মধ্যপ্রাচ্য ঃ স্নায়ুযুদ্ধ উত্তরকালীন পরিস্থিতি

স্নায়ুযুদ্ধকালীন ব্রেজনেভ, এমন কি মিথাইল গরবাচেব-এর কর্তৃত্বাধীন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং স্নায়ুযুদ্ধ উত্তরকালীন রুশ ফেডারেশনের মধ্যে বিশাল আদর্শিক রাজনৈতিক ব্যবধান লক্ষণীয়। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মস্কো হচ্ছে রাজধানী হিসেবে একক বন্ধন। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও শক্তিদ্বন্দ্বে

www.pathagar.com

মস্কো তার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তরকালীন কর্তৃত্ব ও আধিপত্য হারিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন, ওয়ারশো জোটের বিলোপ এবং শিল্পখাত ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিদারুণ মন্দাভাব প্রভৃতির ফলে মস্কো তার ঐতিহ্যিক পরাশক্তির মর্যাদা হারায়। স্বাভাবিকভাবেই মস্কো আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাঁর পূর্বেকার উচ্চমাত্রা পর্যায়ের কূটনৈতিক ধারা পরিহার করে চলে, গ্রহণ করে অনেক অন্তর্মুখী নীতি।

এ সবের অর্থ অবশ্য এ নয় যে, শক্তি হিসেবে মস্কোর কোনোরূপ গুরুত্ব নেই কিংবা আঞ্চলিক বিষয়াদিতে মস্কো কোনোরূপ আগ্রহের অভাব রয়েছে। বরং এটা বলা সমীচীন যে, পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের মজুদের দিক থেকে রুশ ফেডারেশন বিশ্বে এখনো শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে এবং বৈচিত্র্যের দিক থেকে এসব অস্ত্রশস্ত্রে ব্যাপকতর ক্ষতি সাধনের ক্ষমতা রাখে। স্বার্থ বলয়ের দিক থেকে মধ্যপ্রাচ্যের মতো কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে সন্নিকট অঞ্চলে মস্কোর আগ্রহেরও অভাব নেই।

মস্কোর দুর্বলতা তার নিজস্ব, অভ্যন্তরীণ। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের পর থেকে মস্কো তার সেই ঐতিহ্যিক রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি হারিয়েছে। হারিয়েছে আরো তার সামরিক কৌশলগত মনোবল ও স্পৃহা। এসবের মূলে আঘাত হেনেছে মৌলিক অর্থনৈতিক দুর্বলতা, এমন কি পঙ্গুত্ব। যুগ যুগ ধরে সোভিয়েত মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদে উদ্দীপ্ত মস্কো বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক ও আদর্শের লড়াইয়ে সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি ব্যাপক আকারে ক্ষেপণ করেছে সমগ্র বিশ্বব্যাপী। সেই প্রক্রিয়ায় অধিকতর ব্যতিব্যস্ত থাকার কারণে মস্কো অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দৃষ্টি প্রদানে ব্যর্থ হয়। ফলে বহির্বিশ্বে মস্কোর রাজনৈতিক-কৌশলগত প্রতাপ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেলেও অভ্যন্তরীণভাবে মস্কো ক্রমান্বয়ে দুর্বল হতে থাকে। অথচ অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন ও বহির্বিশ্বে প্রভাব বলয় সৃষ্টির বিষয়ে বিরাজমান সংযোগ সম্পর্কে তৎকালীন সোভিয়েত নেতৃত্ব প্রায় উদাসীন ছিল বললেই চলে। তাই আন্তর্জাতিকভাবে যখন মস্কোর কৌশলগত সামরিক প্রয়াস ও রাজনৈতিক প্রভাব বলয় সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলছিলো অভ্যন্তরীণভাবে তখন সোভিয়েত রাষ্ট্র দেওলিয়া হচ্ছিলো। ফলে মস্কো শুধু তার পরাশক্তির পদমর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয় নি মধ্যপ্রাচ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে তার ঐতিহ্যিক ভূমিকা পালনেও ব্যর্থ হয়।

তবু ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতা এরূপ যে মধ্যপ্রাচ্য থেকে মস্কো বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। ঐতিহাসিকভাবে মস্কো এ অঞ্চলে আগ্রহী ছিল, যার সূত্র রয়েছে রুশ সাম্রাজ্যকাল থেকে। কম্যুনিস্ট শাসনের নির্বাসনের পর

www.pathagar.com

ঐতিহ্যগত রুশ অর্থডক্স চার্চের পুনরাগ্রহের সঞ্চারও অস্বাভাবিক নয়। তার চেয়ে বড় কথা, অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া রাশিয়া এই সম্পদশালী পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আগ্রহী না হয়ে পারে না। স্নায়ুযুদ্ধকাল থেকেই এ অঞ্চলে মস্কো প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করে। সেই আগ্রহ এখনো বর্তমান। মধ্যপ্রাচ্যের পেট্রোলিয়াম ও তেলজাত দ্রব্য স্বাভাবিকভাবেই মস্কোর আকৃষ্ট হবার আরো একটি বড় কারণ চেচনিয়া ও তাতারিস্তানসহ রুশ ফেডারেশন অন্তর্ভুক্ত কিছু কিছু অঙ্গরাজ্যের দেশগুলোর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য।

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে, একটি স্পর্শকাতর অঞ্চল হিসেবে মধ্যপ্রাচ্য তার খ্যাতি অব্যাহত রেখেছে। স্নায়ুযুদ্ধ উত্তরকালে বিশ্বে উত্তেজনা হ্রাস সত্ত্বেও রাজনৈতিক ও কৌশলগত প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের মতো বিবদমান ও দ্বন্দ্বময় অঞ্চলে বৃহৎ শক্তিবর্গের কৌশলগত ও স্বার্থবলয় সৃষ্টির প্রতিযোগিতা অব্যাহত থাকবে এটা স্বাভাবিক। পারস্য উপসাগরীয় উপ-অঞ্চলে ইরান ও ইরাকের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহের দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে মস্কো দু'দেশের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলছে। এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে মস্কো ইরাককে সমর্থনও প্রদান করে। আরব-ইসরাইলি দ্বন্দ্বের জটিলতার কারণে এক্ষেত্রে মস্কো অধিকতর সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। বিশেষ করে প্যালেস্টাইন -ইসরাইলি শান্তি প্রক্রিয়ায় মস্কো মার্কিন নেতৃত্ব নিয়ে খুব একটা প্রশ্ন তোলেন নি ; বরং এ বিষয়ে রুশ নেতৃত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগীর ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রয়োজনবোধে ওয়াশিংটনও ক্রেমলিনের সঙ্গে এ বিষয়ে যোগাযোগ স্থাপন করে চলছে। কেননা দু'পক্ষই অবহিত যে প্যালেস্টাইন-ইসরাইলের অব্যাহত দ্বন্দ্বে মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি বিপন্ন হলে বিশ্বশান্তি পুনরায় হুমকির সম্মুখীন হবে। মস্কোর পক্ষে তা কিছুতেই অনুকূল হবে না, কেননা কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ মধ্যপ্রাচ্য মস্কোরই অধিকতর সন্নিকট এবং এ অঞ্চলে যুদ্ধের পুনরাবৃত্তির অর্থ হচ্ছে খোদ রুশ ফেডারেশনের জন্য সম্প্রসারিত নিরাপত্তা হুমকি। এমন বহুবিধ কারণে মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে পূর্বের মতই মস্কো অত্যন্ত সচেতন। ইতিহাস ও ঐতিহ্য, কৌশলগত গুরুত্ব ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন, ভৌগোলিক নৈকট্য ও রাজনৈতিক স্পর্শকাতরতা— এসব দৃষ্টিকোণ থেকেই মধ্যপ্রাচ্য মস্কোর আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নীতিতে বিশেষ স্থান দখল রেখে চলছে। একইভাবে মধ্যপ্রাচ্যও তার নিজস্ব প্রয়োজনের কারণে এখনো মস্কোর মুখাপেক্ষী। রুশ অস্ত্রশস্ত্র ও কৌশলগত সমর্থন, এমন কি কূটনৈতিক সহযোগিতা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর

www.pathagar.com

জন্য ইসরাইলি বা ইসরাইলি-পশ্চিমা সামরিক কৌশলগত চাপ মোকাবিলার জন্য পাল্টা ব্যবস্থা বলে এখনো স্বীকৃত।

তথ্যনির্দেশ

১. Lawrence S. Eagelburger, "U. S. Policy Toward Lebanon", *Department of State Bulletin*, vol. 84, No. 2084. (March 1984) Gragik Dram by arts, "Middle East : Terrors and Struggle," *International Affairs* (Moscow), No. 7 (1987) p. 55.

২. ২৮, এপ্রিল ১৯৭৬, অক্টোবর ১৯৭৬-এর সোভিয়েত সরকারি ভাষ্য এবং অক্টোবর ১৯৭৭-এর পরাশক্তির যুক্ত ইস্তেহারের মাধ্যমে মস্কো উপর্যুপরি মধ্যপ্রাচ্য দ্বন্দ্বের শান্তিপূর্ণ সমাধানে সক্রিয় সহযোগিতা প্রদানকল্পে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। দ্রঃ Ammon Silla, *Soviet Political and Military Conduct in the Middle East* (New York : 1981). Aleksandr Mishanin, "Entrapped in Senseless War", *International Affairs* (Moscow) No. 4 (1987), "Eduard Shevardnadze Receives Delgation of League of Arab States," *News* (Press Release, USSR Embassy in Dhaka) No. 15/58 (30 April 1987).

৩. B. H. Liddll-Hart, *Strategy, The Indirect Approach* (London 1967).

৪. Gen, Von Clausewitz, *On War Translated*, J. J. Graham (London : 1962), Vol. I p, 23, 165.

৫. Liddel-Hart, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৫

৬. Raymond L. Garthoff, *The Soviet Image of Future War* (Washington : 1962) p. 2.

৭. Malcolm Mackintosh, "The Soviet Stragetic Policy", *The World Today* (July 1970) p-290.

৮. Uri Rala'nan, "Soviet Strategic Doctrine and Soviet America Global Contest", *Annals*, No. 475 (September 1981)

৯. Thomas W. Wolfe, *Worldwide Soviet Militray Strategy* (Santa Monica : 1973), পৃ. ৬

১০. Col. H. Sidorov, "Foundation of the Soviet Military Doctrine, " *Soviet Military Review*, No. 9 (September, 1972).

১১. Yefremov, *Nuclear Disarmament* (Moscow : 1982)

১২. A. A. Gromyko and B. W. Ponomarev (eds.) *Soviet Foreign policy* 1971-1980 Vol. II (Moscow : 1980) পৃ. ২২৮-২২৯।

১৩. Bemard Lewis, "Russia in the Middle East; Reflections on Some Historical Parallels", *Ronnd Table* (July 1970).

www.pathagar.com

১৪. Leonid Medvedko "Persian Gulf: A Double-edged Sword", *New Times* No. 35 (7 September, 1987), পৃ. ৮-৯ ; আরো দ্রঃ News (Press REIease, USSR Embassy, Dhaka), 24 June 1987, 8 May 1987.

১৫. Lt. Col. James M. Thompson, "Some Goals and Strategy in the Middle East", *Army Quarterly and Defence Journal,* 78 (1969)

১৬. Robert S. McNamara, *The Essence of Security : Reflections in Office* (New York : পৃ. ২৭-২৮)

১৭. A Osipov, "Anti-Arab" Strategic Cooperation", *International Affairs* (Moscow), No. 1 (January 1984) পৃ. ৫৫-৫৬।

১৮. Yefremov, প্রাগুক্ত। পৃ. ৩১১, চীন মার্কিন সম্পর্ক এবং এ বিষয়ে সোভিয়েত প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত বিশদ ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, Abul Kalam, *The Communist Triangle: Foreign Policy Interactions* (Dhaka and New Delhi: University Press Ltd and Sterling Publishers, 1987).

১৯. Translated editorial of the People's Daily, *Peking Review* (9 Jun 1972), p 10

২০. W. A. C. Adie, "Peking's Pevised Line, " *Problems of Communism*, 21 (September 1972) p 54-68: Donald S. Zagoria, China and the Superpowers, *Recent Trends in the Strategic Triangle* (Manila : The Third International Congress of PWPA, 25 August 1987), পৃ. ১.

২১. Zagoria, প্রাগুক্ত, পৃ. ১-৭

২২. Thomas W. Wolfe, *The Soviet Quest for Globally Mobile Power* (Santa Monica : 1987).

২৩. Marshall Gorshkov cited in Malcolin Mackintosh, "Soviet Mediterramean Policy", *Atlantic Paper,* 1 (January, 1970), পৃ. ২৬

২৪. Rear Adm Kemp Talley in *United States Naval Insitute Proceedings*, 97 (June 1971), পৃ. ৪৫

২৫. উল্লেখিত, Jonh G. Pappageorge, "The Development of Soviet Military Policy", *Military Review*, Vol. 42, No. 7 (July 1973), পৃ. ৪০

২৬. দ্রঃ Vladimir Foyodorov, *Newly Liberated Countries: Ways of Development* (Moscow : 1970), A Policy of Equality and Friendship (Moscow : 1972)

২৭. Pyotor Khlebnkov, The United States : *The Prop of Reactionary Regime* (Moscow : 1987), পৃ. ১০৮-১২১

২৮. Gromyko and Ponomarev (eds.) প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২০

২৯. Professor Yu Panbov (ed.) *Political Terrorism An International Imperialism* (Moscow : 1987), Khlebrikov, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২-১১৫

www.pathagar.com

৩০. Osipov, "Anti-Aran "Strategic Cooperation", প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

৩১. Nikolai Lebedeb, *The USSR in World Politics* (Moscow : 1982), পৃ. ২৮৭-২৮৮, Gromyko and Ponomarev (eds.) প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৫-১৬

৩২. Leonid Mironov, "Afghanistan : Olives and Bulltes", *New Times* No. 19 (18 May 1987), p-14-15; Vesvolods eymyonov, "Under the Guise of Defending Islam", *International Affairs* (Moscow), No. 2 (1987, P, 80-82)

৩৩. *Khrushchev Remembers,* Translated and edited by Strab Talbou (Boston : 1970), পৃ. ৩৩১-৩৩২

৩৪. Dimitry Volshky, "Support the Arab peoples can count on", *New Times*, Nos. 18-19 (May 1974), পৃ. ১৮, অনেকটা একইরূপ বক্তব্যে জন্য দ্রঃ Gagh Dramnbytants, "Middle East : Tension and Struggle", প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫-৭২

৩৫. Drambynats, "Middle East...", প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

৩৬. Mishanin, "Entrapped in Senseless War", *News* (Press Release, USSR Embassy, Dhaka), (5 July 1987)

৩৭. "A.A. Gromyko at the Geneva Talks", *Current Digest of the Soviet Press*, 25, No. 51 (16 January, 1974)

৩৮. *News*, No. 14/57 (Press Release, USSR Embassy, Dhaka, 29, April, 1987)

৩৯. Vladimir Leska, "The Folly of power Politic", *International Affairs* (Moscow), No. 6 (1987) p 114-15.

৪০. *Political Report of the Central Committee of the CPSU to the 27th Party Congress* (Moscow: 1986), p. 83

৪১. A. Kiva, "detente and the National Liberation Movement," *Soviet Military Review* (July 1974), p, 51; K. U. Chemenkil, *Safeguard Peace and Ensure the People's Well-being* (Moscow : 1984), p.23 A Gromyko, On The International Situation and the Foreign Policy of the Soviet Union (Moscow 1983) p. 25-26; *USSR Support for the Foreign Policy of the Palestine* (Moscow: 1983)

৪২. উদ্ধৃত *Manchester Guardian Weekly* (15 July 1974)

৪৩. Henry A Kissinger, *American Foreign Policy* (New York : 1974), পৃ. ৮৫। প্রায় একই ধরনের সোভিয়েত অভিমতের জন্য দ্রঃ Makar, *To Abolish the Nuclear Menace* (Moscow : 1973) ; D. F. Ustinov, *To Avert the Threat of Nuclear War* (Moscow : 1982) p. 22 A. Y. Yefrenov, Nuclear Deal (Moscow : 1974) p. 7.

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

মস্কো-বেইজিং হ্যানয় ঃ কম্যুনিস্ট প্রতিবন্ধী সম্পর্ক থেকে স্বাভাবিক পর্যায়ে উত্তরণ *

ভূমিকা

আমেরিকা ১৯৭৫ সন অবধি যখন ইন্দোচীন যুদ্ধে বিজড়িত ছিল তখন ভিয়েতনাম, চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পারস্পরিক সম্পর্ক বাহ্যত ছিল বন্ধুপ্রতিম ও ভ্রাতৃত্ববোধ ভিত্তিক,[১] কিন্তু ১৯৭৫ সনের এপ্রিল মার্কিন সরকার শেষাবধি ইন্দোচীন থেকে তার হাত গুটিয়ে নেয়। এরপর ইন্দোচীন উপদ্বীপকে ঘিরে এই অঞ্চলে অনেক নাটকীয় ঘটনা ঘটে। তিনটি কম্যুনিস্ট দেশের সম্পর্ক দারুণভাবে পরিবর্তিত হয়। সত্তরের দশক শেষ হবার পূর্বেই তিনটি কম্যুনিস্ট দেশের মৈত্রী সম্পর্ক প্রায় সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে যায়। বেইজিং ও হ্যানয় তাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক শুধু ছিন্নই করে নি, তারা একে অপরের ওপর এরূপ সূচাঁলো আঘাত হানে যা' দু' হাজার বছরের অধিককালের মধ্যে ছিল সবচেয়ে ক্ষুরধার। চীন ও ভিয়েতনাম এই দু'দেশের সম্পর্কের এরূপ রাতারাতি অবনতি এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। একটি কম্যুনিস্ট দেশ আরেকটি কম্যুনিস্ট দেশের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সামরিক কর্মপন্থা গ্রহণ করে, অথচ এ অভিযানকালে আক্রমণকারী দেশ চীনের পক্ষ থেকে স্বভাবসিদ্ধ কম্যুনিস্ট ধারায় এমন কোনো ইঙ্গিতও দেয়া হয় নি যে, আক্রান্ত দেশ ভিয়েতনামের জনগণের অনুরোধে শৃংখলা পুনরুদ্ধারের স্বার্থে চীনের এই সামরিক হস্তক্ষেপ অবধারিত হয়ে পড়ে।[২] বরং ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে চীনের এই সামরিক অভিযানকে বেইজিং অভিহিত করে "আত্মরক্ষামূলক প্রতি হামলা" হিসেবে-[৩] কম্পুচিয়ায় ভিয়েতনামের "কৌশলগত অভিযানের" প্রত্যুত্তর হিসেবে [৪]; কিন্তু অতি সত্তর সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনা অভিযানকে একটি "অপরাধমূলক আগ্রাসন" বলে এর নিন্দা করে।[৫]

চীন-ভিয়েতনামী সম্পর্ক এখনো তুষারাবৃত ; এমন কি বলা চলে তিক্ত, আর সার্বিক কম্যুনিস্ট ত্রিকোণ আন্তর্জাতিক সম্পর্কও মোটামুটি বিশ্বাসহীনতায়

* প্রবন্ধটি 'সমাজ নিরীক্ষণ' পত্রিকার ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬-এর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

আচ্ছন্ন, যদিও বিগত কয়েক বছর থেকে বেইজিং ও মস্কোর পারস্পরিক সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের প্রক্রিয়া চলে আসছে। হ্যানয়ের দৃষ্টিতে বেইজিং হচ্ছে এক নতুন যুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী।[৬] মস্কোও চীনের সম্পর্কে অনেকটা একরূপ অভিমত পোষণ করে এবং চীনা নেতৃবৃন্দকে "লেনিনবাদ ও সমাজতন্ত্র বিরোধী জাতীয় নীতি" গ্রহণের দায়ে অভিযুক্ত করে, চীনকে "সোভিয়েতবিরোধী দুঃসাহসিক কর্মপন্থা গ্রহণ ও সাম্রাজ্যবাদের সাথে একাত্ম হবার" দায়ে দোষারোপ করে।[৭] অন্যদিকে, বেইজিং এ ধরনের অভিমত ব্যক্ত করে যে, হ্যানয় মস্কোর সমর্থনপুষ্ট ও পক্ষ হয়ে "চীন ও কম্পুচিয়ার বিরুদ্ধে উচ্ছৃংখলভাবে আগ্রাসন চালায়"।[৮] বেইজিং তাই অনমনীয়ভাবে খেমাররুজ মিত্রদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কম্পুচিয়ায় ভিয়েতনামী দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের পেছনে অব্যাহত সমর্থন যুগিয়ে চলেছে।

কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রত্রয়ের কৌশলগত প্রতিযোগিতা এভাবে দুর্দান্ত রূপ ধারণ করে। বিগত কয়েক বছরে এ প্রতিযোগিতা স্বাভাবিক ধারা হিসেবে প্রতিভাত হয়ে আসছে, কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোর পূর্বে কেউ পুরোপুরি ভাবতে পারে নি যে মার্ক্সবাদী বিশ্বাসের অনুশাসন ও বাহ্যত আন্তর্জাতিক মেহনতিবাদ ভিত্তিক সৌহার্দ্যের বন্ধনে আবদ্ধ একটি আদর্শিক আন্দোলন এত দ্রুত বহুকেন্দ্রবাদ ও জাতীয়তাবাদের মোহমায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে এক তিক্ত কৌশলগত ধারার সংগ্রামে মোড় নেবে।[৯] চীন-সোভিয়েত-ভিয়েতনামী কৌশলগত আচরণের মূল্যায়ন করে প্রবন্ধে এরূপ যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে যে, উল্লিখিত কম্যুনিস্ট দেশসমূহের ত্রিকোণ সম্পর্ক বিগত দশকব্যাপী একটি প্রতিবন্ধী রূপ পরিগ্রহ করে এবং প্রতিটি কম্যুনিস্ট দেশের মেহনতিবাদ ভিত্তিক শ্রেণী-সৌহার্দ্যের প্রতি মৌখিক সম্মান সত্ত্বেও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের এই পরিণতির জন্য অংশত দায়ী করা চলে মার্ক্সীয় প্রলম্বিত সংগ্রাম ভিত্তিক আদর্শের প্রতি তাদের নিষ্ঠার অভাব এবং অংশত তাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ জাতীয় কৌশলগত স্বার্থের সন্ধান।

কম্যুনিস্ট দেশসমূহের রণনীতি

উপর্যুক্ত বক্তব্য আরো সুষ্ঠুরূপে ব্যাখ্যা করতে হলে সমগ্র বিষয়টি তিনটি কম্যুনিস্ট দেশের রণনীতির প্রেক্ষাপট উপস্থাপিত করতে হবে। কম্যুনিস্টদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের মানসে প্রলম্বিত সংগ্রামের ওপর বেশ জোর দেয়া হয়।[১০] সকল কম্যুনিস্ট তত্ত্বগতভাবে মনে করে যে মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ পদ্ধতির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের শ্রেণীগত প্রকৃতি নিরূপণ করতে হবে–এ তো "পররাষ্ট্রনীতির সামাজিক চরিত্র" যথার্থরূপে প্রকাশ পাবে ; সব কম্যুনিস্টই আন্তর্জাতিক আচরণ ও পররাষ্ট্র নীতির

www.pathagar.com

কার্যধারা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে দ্বান্দ্বিক পন্থা ব্যবহার করে ; এ সবকে তারা একটি স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয় শক্তিজনিত প্রক্রিয়ার অংশ বিশেষ হিসেবে দেখে। তাই কম্যুনিস্ট নেতৃবৃন্দ বাস্তব ঐতিহাসিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে নীতি পরিবর্তনের ওপর জোর দেন।[১১] আলোচ্য তিনটি কম্যুনিস্ট দেশের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন হচ্ছে প্রথম ও নেতৃস্থানীয় দেশ। মস্কোর কৌশলগত ধারণা বিশ্বব্যাপী সোভিয়েত উদ্দেশ্য ও অভিলাষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত।[১২] সোভিয়েত তত্ত্বে সামরিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য তুলে ধরা হয় না, কেননা উভয় পন্থার মাধ্যমে সংগ্রাম চলে, আর এই সংগ্রাম-ই হচ্ছে ইতিহাসের পরম সত্যরূপ। প্রকৃতপক্ষে, সোভিয়েত কৌশলগত নীতি সম্পর্কে এরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন একজন সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সোভিয়েত কৌশলগত নীতি "বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় প্রমাণিত সরকারিভাবে অনুমোদিত এমন কিছু মতবাদ বহন করে যাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরক্ষার কূটনৈতিক ও যুদ্ধে বিজয় লাভের প্রস্তুতি সুনিশ্চিত হয়।"[১৩]

এভাবে সোভিয়েত রণনীতির উদ্দেশ্যাবলির মৌলিক প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে সোভিয়েত কৌশলগত ক্ষমতার সার্বিক সম্প্রসারণ যাতে সোভিয়েত নিরাপত্তা ও স্থিতির প্রতি কোনোরূপ হুমকি দেখা না দেয়।[১৪] মস্কোর লক্ষ্য হচ্ছে (১) একটি পরাশক্তি হিসেবে শক্তিশালী অবস্থান থেকে বাদবাকি বিশ্বের মোকাবিলা করার মত যোগ্যতা অর্জন করা এবং আমেরিকার বিশ্ব-প্রতিযোগী হিসেবে বিশ্বে সোভিয়েত ভূমিকা অক্ষুণ্ন রাখা; (২) মহাদেশীয় ইউরোপের একটি শক্তিমান সামরিক অবস্থান বজায় রাখা যাতে ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় সোভিয়েত স্বার্থ সংরক্ষিত হয়, আর সম্ভাব্য চীনা হুমকির মোকাবিলা করা যায়; (৩) শান্তিপূর্ণ উপায়ে তৃতীয় বিশ্বে সোভিয়েত প্রভাব ও প্রতিপত্তি সম্প্রসারিত করা; (৪) শত্রুর 'প্রতি-নিবারক' ('counter-deterrence') রণনীতির দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ এবং তার প্রতিরক্ষামূলক তৎপরতা নিষ্ক্রিয় বা বাঞ্চাল করা; এবং পরিশেষে, (৫) সম্ভাব্য এ ধরনের কোনো পরিস্থিতিতে নিবারক রণনীতি যদি ব্যর্থ হয় এবং শত্রুপক্ষ যুদ্ধ চাপিয়ে দেয় এরূপ যুদ্ধে বিজয়লাভ সুনিশ্চিত করা।[১৫] অল্পকথায়, একটি আদর্শবাদী কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও চিরাচরিত অন্যান্য রাষ্ট্রের মত চলেছে। একটি পরাশক্তি হিসেবে মস্কোর লক্ষ্য হচ্ছে সোভিয়েত আন্তর্জাতিক পদমর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা, আর সোভিয়েত কৌশলগত নীতি বাস্তবায়নের দায়িত্বহীনতার পরিচয় না দিয়ে তার পরাশক্তিজনিত পদমর্যাদাকে আরো অলংকৃত করা।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মস্কোর কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ আপাতদৃষ্টিতে তার বিঘোষিত রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্যাবলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ-এসব

www.pathagar.com

লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সংরক্ষণ এবং সোভিয়েত সীমান্তের অখণ্ডতা বজায় রাখা। অবশ্য, এছাড়াও মস্কো আদর্শগতভাবে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের প্রতি তার অব্যাহত আনুগত্য ঘোষণা করে চলেছে।[১৬] কার্যক্ষেত্রে এর অভিব্যক্তি প্রথমে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত মেহনতি আন্তর্জাতিকতাবাদ ভিত্তিক নীতি গ্রহণ এবং একই সঙ্গে এর অন্তর্নিহিত কর্মপন্থা, যেমন, সমাজতান্ত্রিক জাতিসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধুত্ব, একাত্মবোধ ও পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার বাস্তবায়ন। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের প্রতি মস্কোর আনুগত্যের আরো অভিব্যক্তি ঘটে বিভিন্ন সমাজভিত্তিক রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান সম্পর্কিত নীতির প্রতি সমর্থন প্রদানে।[১৭] মেহনতি আন্তর্জাতিকতাবাদ বাস্তবায়নে মস্কো বিশ্বব্যাপী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের উন্নয়ন ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের প্রতি সাহায্য ও সমর্থন প্রদানকল্পে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এক সক্রিয় "আন্তর্জাতিক দায়িত্ব " গ্রহণ করে, আর শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি হচ্ছে মূলত সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের দ্বন্দ্বজনিত এবং এতে শ্রেণী সত্তাভিত্তিক সামরিক লড়াই বর্জন করার কথা বলা হলেও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আদর্শিক সংগ্রাম অব্যাহত রাখার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়।[১৮]

সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতির আরেকটি বাস্তব সমস্যা হচ্ছে চীন-সোভিয়েত বিরোধের সম্প্রসারিত রূপ। ফলে চীনকে ঘিরে মস্কো এতখানি ব্যতিব্যস্ত থাকে যে সমকালীন সোভিয়েত নীতি প্রকৃতরূপে অনুধাবন করতে হলে একটি পারমাণবিক শক্তি হিসেবে গণচীনের উদ্ভবের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে, দেখতে হবে ক্রেমলিনে প্রণীত নীতির প্রতি চীনের প্রকাশ্য বিরোধিতার গভীরতর রূপ।[১৯] চীনের কাছাকাছি অবস্থান, এর ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক শক্তি, ইউরোপে এর কূটনৈতিক যোগাযোগ এবং ঘনিষ্ঠতর চীন-মার্কিন সম্পর্কের বিদ্যমান ঐতিহাসিক সূত্র, এদের সুদীর্ঘ সাত হাজার মাইল অভিন্ন সীমারেখা নিয়ে উভয়ের মধ্যে বিরোধ এবং তাদের আদর্শগত মতপার্থক্য—এ সব কিছু সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ তাঁদের "মহাশক্তিসুলভ জঙ্গি উদ্দেশ্য" সাধনে বিশ্ব কম্যুনিস্ট আন্দোলনের অভ্যন্তরে একটি পথভ্রষ্ট ক্ষতিকর নীতি গ্রহণ করে। সমাজতান্ত্রিক শিবির এতে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে–সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অভ্যন্তরে ভিন্নপথগামী এরূপ এক রণাঙ্গনের উদ্ভব "সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর ছোবলের মতই বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর।"[২১] চীন সম্পর্কিত মস্কোর এ জাতীয় ধারণা সোভিয়েত নেতৃত্বকে প্ররোচিত করে একটি বেষ্টনকর (encirclement) রণনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে। এর ফলশ্রুতিতে মস্কো রাজনৈতিকভাবে চীনকে একঘরে করার জন্য পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে এক মহাকৌশলগত আন্দোলন গড়ে তোলার অংশ হিসেবে প্রথমে

www.pathagar.com

একটি এশীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রস্তাব রাখে,[২২] এবং পরে তার আঞ্চলিক সামরিক শক্তি জোরদার করতে সক্রিয় হয়, যাতে চীনকে সুষ্ঠুরূপে দমন করা যায়।

চীনের কৌলগত পরিকল্পনাও স্বাভাবিকভাবেই মস্কোকে কেন্দ্র করে প্রণীত হয়।[২৩] এ বিষয়ে মাও'র আমল থেকে মাও-উত্তরকালে তেমন একটা পরিবর্তন ঘটে নি। কেননা, চীনের বর্তমান নেতৃত্ব মাওজেদং বিঘোষিত ত্রি-বিশ্ব কৌশলগত তত্ত্বে পুনরায় আস্থা স্থাপন করেন। দু'পরাশক্তিকে নিয়ে হচ্ছে 'প্রথম বিশ্ব', জাপান ও পশ্চিমা অন্যান্য শিল্পোন্নতদেশসমূহ হচ্ছে 'দ্বিতীয় বিশ্ব', আর চীনসহ বিশ্বের বাদবাকি অংশ হচ্ছে তৃতীয় বিশ্ব'। [২৪] মাও'র তত্ত্বে, বিশ্বব্যাপী শ্রেণী সংগ্রামের যে ব্যাপকতর প্রক্রিয়া চলছে মার্ক্সীয় দ্বান্দ্বিক মতবাদ প্রয়োগের মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তার বস্তুনিষ্ঠ সারমর্ম তুলে ধরা হয়। চীনের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ সুদীর্ঘকালব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও নিপীড়নের শিকার এবং বর্তমানে অনেকটা চীনের মতই এসব দেশ তাদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার প্রতিবিধান কল্পে পরাশক্তিদ্বয়ের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত। উপরন্তু, চীন স্বয়ং আধিপত্য প্রয়াসী না হতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এছাড়াও চীন শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানসহ পঞ্চশীলা নীতির ভিত্তিতে সবদেশের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে প্রয়াসী এবং ভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বৃহৎ শক্তিসুলভ যে কোনো উৎকট স্বাদেশিকতাজনিত অভিব্যক্তির বিরুদ্ধেও চীন সরকার সচেতনভাবে লড়াইয়ের মনোভাব গ্রহণে সংকল্পবদ্ধ।[২৫] চীনের বর্তমান নেতৃবৃন্দ তাদের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতির মধ্যে অধিকতর সংযোগ সাধন করে এবং তাদের দেশের জন্য তিনটি প্রধান কৌশলগত কর্মপন্থা গ্রহণ করেনঃ সমাজতান্ত্রিক আধুনিকায়নের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা ; চীনের পুনরেকত্রীকরণের প্রচেষ্টা জোরদার করা, এবং পরিশেষে, আধিপত্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম অব্যাহত রাখা ও বিশ্বশান্তি বজায় রাখা।[২৬]

উপর্যুক্ত কৌশলগত কর্মপন্থা যে সূক্ষ্ম ও সুপটু কৌশল অবলম্বন ছাড়া বাস্তবায়ন সম্ভব নয় তা' চীনা নেতৃবৃন্দ যথার্থ-ই অনুধাবন করতে পারেন। তাদের গৃহীত কৌশল হচ্ছে দ্বি-মুখী অভিযান ভিত্তিক দু'পায়ে ভর দিয়ে চলার নীতির অনুরূপ, যাতে সশস্ত্র সংগ্রাম ও কূটনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে যথাযথ ভারসাম্য রক্ষা করা যায়। তাঁদের এ জাতীয় কলাকৌশলের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল চীনের একঘরে অবস্থা থেকে অব্যাহতি লাভ ; কিন্তু পরবর্তীকালে বেইজিং কম্যুনিস্ট জগতে মস্কোর নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলে। বিশেষ করে চীন সীমান্তের চারপাশে সোভিয়েত বেষ্টনকর কৌশলগত চালের বেষ্টনী ভেঙ্গে

www.pathagar.com

দেয়ার মানসে চীন সোভিয়েত ইউনিয়নকে লক্ষ্য করে একটি "পাল্টা-বেষ্টনকর" রণনীতি ("strategy of counter-encirclement") গ্রহণ করে। বাস্তবে এর অর্থ হচ্ছে বিপ্লবীদের সশস্ত্র সংগ্রামে অব্যাহত সাহায্য প্রদান যাতে 'সোভিয়েত সংশোধনবাদী পথভ্রষ্ট মতবাদ' উন্মোচিত করা যায় ; চীনের দৃষ্টিতে 'যুদ্ধ-বিগ্রহের অতি ভয়াবহ উৎস' হিসেবে তার স্বরূপ উদঘাটন করে।[২৭] একই সঙ্গে বেইজিং এক অনমনীয় কূটনৈতিক সংগ্রামেও প্রবৃত্ত হয় যাতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিশ্বের জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃবৃন্দের আস্থা অর্জনের মাধ্যমে চীনকে তৃতীয় বিশ্বের নেতার আসনে অধিষ্ঠিত করা যায়। বেইজিং তাই একদিকে আমেরিকাসহ বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের সঙ্গে প্রকাশ্য সম্পর্ক গড়ে তোলে, আর অন্যদিকে বামপন্থী বা বিপ্লবী গেরিলা সংগঠনসমূহের সঙ্গেও গোপন যোগাযোগ রক্ষা করে চলে।[২৮]

চীন-সোভিয়েত কৌশলগত লড়াইয়ের মাঝপথে অবস্থিত ভিয়েতনাম, কিন্তু হ্যানয় তার নিজস্ব তত্ত্বীয় ফর্মুলা বা বিধিসম্মত ধারায় ভিয়েতনামের আন্তর্জাতিক আচরণ নির্ধারণ করে। এককালে ভিয়েতনামী নেতৃবৃন্দ বিপ্লবের জনক মাও জেদংকে সশস্ত্র বিপ্লবের কাণ্ডারী হিসেবে দেখতেন এবং তাঁর প্রণীত প্রলম্বিত রণনীতি হ্যানয়ের নিজস্ব কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গির তত্ত্বীয় ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত ছিল। বস্তুত, হ্যানয় এক সময় প্রকাশ্যে যুদ্ধকে "রাজনীতির অব্যাহত ধারা" রূপে চিহ্নিত করে।[২৯] মার্কিন "নব্য উপনিবেশবাদী" নীতির বিরুদ্ধে বিজয় লাভের পর হ্যানয় দক্ষিণ ভিয়েতনামকে মুক্ত করে, ভিয়েতনামী কম্যুনিস্ট পার্টির কর্মপন্থায় দেশের সকল জনমানুষকে সমাবেশ ও দীক্ষিত করতে সচেষ্ট হয়। একই বছর "একটি বিশদ কৌশলগত কর্মপন্থা" গৃহীত হয় যাতে "একটি সামাজিক বিপ্লব সূচিত" হয় .... যে বিপ্লবের [ভিয়েতনামের] ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য শুধুমাত্র ভিয়েতনামের জাতীয় স্বাধীনতা বজায় রাখা নয়, এতে রয়েছে ইন্দোচীনকে ঘিরে ভিয়েতনামীদের জাতীয় অভিসন্ধির সার্বিক রূপায়ণও। কেননা, হ্যানয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে ভিয়েতনাম, লাওস ও কম্পুচিয়া 'বিপ্লবী বিবর্তনের একক যৌক্তিক' গতিধারায় সম্পৃক্ত এবং এই তিন দেশের জনগণের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ নির্ধারণে তাদের ঐক্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ - এ যেন নিয়তির বিধান।[৩১] হ্যানয় ইন্দোচীনের পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করে প্রধানত চীনা রণনীতির প্রেক্ষাপটে, কেননা হ্যানয়ের দৃষ্টিতে চীনা রণনীতি হচ্ছে, "সাম্রাজ্যবাদের কর্ণধার" আমেরিকা কর্তৃক সমর্থিত ; উভয়ে চাচ্ছে ভিয়েতনামকে দুর্বল করতে যাতে তারা চীনের স্বার্থাধীন থাকতে বাধ্য হয়।[৩২] ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে চীনের "বহুমুখী নাশকতামূলক যুদ্ধ" দমন করা চীনের সম্প্রসারণবাদী দাবিসমূহ বাস্তবে প্রতিরোধ ও নস্যাৎ করার মানসে ভিয়েতনামী নেতৃবৃন্দ তাঁদের চীন বিরোধী সংগ্রামকে অতীতের ফরাসি ও

www.pathagar.com

মার্কিন বিরোধী সংগ্রামের সমরূপে দেখে আসছেন, আর পূর্বের মতই তাঁরা ভিয়েতনামের জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা ও ভিয়েতনামের কর্তৃত্বাধীন ইন্দোচীনে, ঐক্য সাধনকল্পে সর্বতোভাবে প্রলম্বিত বিপ্লবী সংগ্রামী মতবাদের প্রতি নিষ্ঠা প্রদর্শন করে চলেছেন।[৩৩]

এভাবে ভিয়েতনামী নেতৃবৃন্দ মনে করেন যে, এভাবে চীনা নাশকতা কার্যকলাপ প্রতিরোধ করা ও তাদের সব ধরনের আগ্রাসন ব্যর্থ করার মাসসে ভিয়েতনামকে তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করতে হয়। কেননা বেইজিং ইন্দোচীনের শান্তি ও স্থিতি ব্যাহত করে চলেছে, ভিয়েতনামের জাতীয় স্বাধীনতার প্রতিও হুমকি দিয়ে চলছে। হ্যানয় তাই ভিয়েতনামী জনগণকে "দেশাত্মবোধ ও মেহনতি একনায়কত্বের ঘনিষ্ঠ একাত্মতার যথার্থ উদ্দীপনায়" উদ্বুদ্ধ করে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতায় অনুপ্রাণিত করে।[৩৪] একই সঙ্গে, হ্যানয় তার সার্বিক কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতি রেখে চীনের বিরুদ্ধে একটি জঙ্গি মনোভাব প্রসূত রণনীতি গ্রহণ করে। কেননা চীন, ভিয়েতনামের দৃষ্টিতে, ভিয়েতনামী জনগণের "প্রত্যক্ষ ও ভয়ংকর শত্রু", আর এই শত্রুকে নাস্তানাবুদ করতে হলে "দেশের ভেতর ও বাইরে এর বিরুদ্ধে প্রতি-হামলা ও আক্রমণমূলক প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে।"[৩৫]

প্রলম্বিত দ্বন্দ্ব

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দ্বন্দ্বরত তিনটি কম্যুনিস্ট দেশের চিন্তাধারার এরূপ তত্ত্বীয় পটভূমিতে এটা অনুধাবন করা সম্ভবত কঠিন হবে না যে কেন ভিয়েতনাম যুদ্ধ শেষ হবার পূর্বেই হ্যানয় ও বেইজিং-এর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে, কেন চীন সোভিয়েত ইউনিয়নকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বাধীনতার প্রতি প্রধান হুমকি হিসেবে দেখে, আর কেন-ই বা হ্যানয় মস্কোকে মিত্ররূপে বরণ করে? এ সবের উত্তর যথার্থ মেলে মার্ক্সীয় দ্বান্দিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ভিত্তিক তাদের পরস্পরিক কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গিতে। এ এক্ষেত্রে মস্কোর বেষ্টনকর রণনীতির সংযোগ ঘটে হ্যানয়ের জঙ্গিসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে, আর এর প্রত্যুত্তরে বেইজিং আশ্রয় গ্রহণ করে প্রতি-বেষ্টনকর রণনৈতিক চালের। স্বাভাবিকভাবেই ইন্দোচীন থেকে মার্কিন আগ্রাসন প্রত্যাহারের পর এ অঞ্চলে যে শক্তি-শূন্যতার সৃষ্টি হয় সেই সুযোগে সোভিয়েত অনুপ্রবেশ ও চীনকে পরিবেষ্টন করার সোভিয়েত প্রচেষ্টায় বেইজিং উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। তাই প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীন চেয়েছে অব্যাহত মার্কিন সামরিক উপস্থিতি। একই সঙ্গে, চীন তার দ্বি-মুখী রণকৌশল ব্যবহার করে ১৯৭৫ সনেই থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইনের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক পর্যায়ে উন্নীত করে এবং

www.pathagar.com

দু'দেশকে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি প্রত্যাহার সম্পর্কিত দাবি না তোলার আহ্বান জানায়।[৩৬]

১৯৭৫ সনের অক্টোবরে বেইজিং চীন-ভিয়েতনাম খসড়া চুক্তিতে সোভিয়েত "আধিপত্যবাদ-বিরোধী" একটি ধারা সংযোজন করে এতে হ্যানয়ের সম্মতি চেয়ে বসে।[৩৭] উল্লেখ্য, ফিলিপাইন ও থাইল্যান্ড ইতিমধ্যে এরূপ চুক্তিতে সম্মতি প্রদান করে। হ্যানয় কিন্তু চীনের এই সোভিয়েত-বিরোধী প্রস্তাবিত চুক্তি প্রত্যাখান করে। হ্যানয়ের এরূপ সোভিয়েতপন্থী কৌশলগত প্রবণতার পরিবর্তন সাধনকল্পে প্রথমত বেইজিং ভিয়েতনামকে আর কোনোরূপ অনুদান-সাহায্য প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, এবং পরে চীন ভিয়েতনামী নেতৃত্বকে জানিয়ে দেয় যে, দক্ষিণ ভিয়েতনামে ভিয়েতনামী বাহিনী তাদের চূড়ান্ত অভিযানকালে চীন ও ভিয়েতনামের উভয়ের দাবিকৃত স্প্রেটলী ও প্যারাসেল দ্বীপসমূহ দখল করলেও এগুলো তাদের অব্যাহত দখলে রাখতে দেয়া হবে না।[৩৮]

বেইজিং ও হ্যানয়ের মধ্যে উত্তরোত্তর ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি হবার ফলে মস্কো চীন-বিরোধী বেষ্টনকর রণনীতি জোরদার করার নতুন সুযোগ লাভ করে। মস্কো মনে করে, ভিয়েতনাম যেহেতু চীনা চাপের সম্মুখীন সেহেতু এই অঞ্চলে সোভিয়েত উপস্থিতি জোরদারকল্পে ভিয়েতনামকে ব্যবহার করা হবে। মস্কো তাই ভিয়েতনামকে স্বার্থ-সুবিধায় প্রলুব্ধ করতে সচেষ্ট হয়। কেননা, চীনা চাপের সম্মুখীন ভিয়েতনামকে এ অঞ্চলে চীনের সোভিয়েত বিরোধী অভিযানের প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে, চীনা প্রভাব সম্প্রসারণে বাধা দেয়া যাবে এবং একই সঙ্গে চীন ও ভিয়েতনাকে সমর্থন প্রদানকারী অন্যান্য কম্যুনিস্ট দেশসমূহের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি করা যাবে। এ ছাড়াও চীনকে মোকাবিলা করার জন্য মস্কো চায় তার কৌশলগত ক্ষমতা জোরদার করতে, আর এ উদ্দেশ্যে ভিয়েতনাম থেকে বেশ মৌলিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করে এই অঞ্চলে সামরিক উপস্থিতি প্রতিষ্ঠার আশা রাখে। বলাবাহুল্য, এসব বহুবিধ অভিলাষ অর্জনের মানসে মস্কো হ্যানয়কে বিশেষ আর্থিক ও কূটনৈতিক প্রলোভনে প্রলুব্ধ করতে সক্রিয় থাকে। মস্কোর এই সময়ের প্রচেষ্টার মধ্যে ছিল ভিয়েতনামের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তিন বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি। দক্ষিণ চীন সাগরে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে চীন-ভিয়েতনাম বিরোধে ভিয়েতনামের পক্ষাবলম্বনসহ চীনের সম্প্রসারণবাদী উদ্দেশ্যাবলির জন্যও মস্কো চীনের নিন্দা করে।[৩৯] চীন সীমান্তের অতি কাছাকাছি তার কৌশলগত অবস্থান সুসংহত করার মানসে মস্কো হ্যানয়কে সোভিয়েত অর্থনৈতিক গোষ্ঠী কমেকনে ("Council for Mutual Economic Assistance বা COMECON) যোগদান

www.pathagar.com

করতে প্ররোচিত করে, ক্রেমলিন নেতৃবৃন্দের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী ভিয়েতনাম সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদন করে, আর মস্কোকে ভিয়েতনামী বিমান ও নৌ ঘাঁটি ব্যবহারের সুযোগ প্রদানে এগিয়ে আসে। কিন্তু ভিয়েতনামের নিজস্ব কৌশলগত পরিস্থিতির চাহিদার উদ্ভব ছাড়া হ্যানয় তখন সোভিয়েত অনুরোধে ইতিবাচক সাড়া দেয়ার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা অনুভব করে নি।[৪০] তবু হ্যানয় জানতো যে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় চীনা প্রভাব রোধ করার ব্যাপারে সোভিয়েত-ভিয়েতনামী স্বার্থ অভিন্ন ; কেননা এই অঞ্চলে প্রতি-বেষ্টনকর রণনীতির ভিত্তিতে বেইজিং প্রকাশ্যে সোভিয়েত বিরোধী কর্মপন্থা বাস্তবায়নে তৎপর থাকে।

ইতিমধ্যে বেশ কিছু বিষয় নিয়ে চীন-ভিয়েতনাম সম্পর্কে আরো উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এ ধরনের একটি বিষয় হচ্ছে আনুমানিক এগারো লক্ষ চীনা বংশোদ্ভূত 'হোওয়া' (Hoa) গোত্রের প্রতি ভিয়েতনামের আচরণ। ১৯৭৫ সন থেকে চীন ও ভিয়েতনামের সম্পর্কের অবনতি হবার পর হ্যানয় এসব চীনাদের আনুগত্যে সন্দিহান হয়, আর একই সঙ্গে চীন সীমান্তের কাছাকাছি বসবাসকারী বংশগতভাবে সংযুক্ত নাঙ্গ (Nung) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কেও হ্যানয় সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে। ভিয়েতনাম সরকার যখন এসব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর তার নিয়ন্ত্রণ জোরদার করতে সক্রিয় হয় চীন তখন প্রতিবাদ জানায়। উপরন্তু, তদানিন্তন মার্কিন তাবেদার সাইগন সরকার যেভাবে সেই দেশে বসবাসকারী চীনাদের ভিয়েতনামী নাগরিকত্ব গ্রহণে বাধ্য করে। হ্যানয় হালে একতরফাভাবে ১৯৫৫ সনে সম্পাদিত চীন-ভিয়েতনাম চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে নিতান্ত মামুলিভাবে সাইগন কর্তৃপক্ষের জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থাকে বাস্তব সত্য হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে, বেইজিং এতে ক্ষুব্ধ হয়। এছাড়াও, ১৯৭৮ সনের মার্চে হ্যানয় সোলো'র চীনা ব্যবসায়ীদের মজুত তহবিল বাজেয়াপ্ত করে।[৪১] কিন্তু চীন ভিয়েতনামী সম্পর্ক যথার্থ চরম রূপ ধারণ করে ভিয়েতনাম ও কম্পুচিয়ার দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে। কেননা কম্পুচিয়া ছিল সেই সময়ে চীনের ঘনিষ্ঠ মিত্র এবং এই অঞ্চলে চীনের প্রতি-বেষ্টনকর রণনীতির কেন্দ্রবিন্দু। ভিয়েতনাম ও কম্পুচিয়ার মধ্যে উত্তেজনার কয়েকটি কারণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল (১) তথাকথিত "খেমার ভিয়েতমিন" ("Khmer Vietminh") নামক বেশ কিছু ভিয়েতনামী বংশোদ্ভূত খেমারদের কম্পুচিয়ায় ফিরে যাবার বিষয়, যে খেমাররা মূলত উপনিবেশবাদ বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং ১৯৫৪ সনের জেনিভা চুক্তির পর উত্তর ভিয়েতনামে পালিয়ে আশ্রয় লাভ করে; (২) দু'দেশের মধ্যে সীমান্ত বিরোধের মীমাংসা এবং ফুকুক ও থোচু (Phu Quoc and Tho Chu) দ্বীপসমূহ নিয়ে পরস্পরের দাবি সম্পর্কে চূড়ান্ত ফয়সালা; এবং

www.pathagar.com

(৩) পরিশেষে প্রশ্ন ছিল কম্পুচিয়া কি পূর্বের ন্যায় অভিন্ন সংগ্রামী পরিকল্পনার ভিত্তিতে ভিয়েতনামের সঙ্গে "বিশেষ সম্পর্ক" অব্যাহত রাখবে—হ্যানয় কার্যত তাই দাবি করে আসছে।[৪২]

একথা আর অবিদিত নয় যে, পলপটের নেতৃত্বে তৎকালীন খেমাররুজ সরকার দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক উত্তেজনা নিরসনকল্পে ভিয়েতনামের প্রস্তাবাবলি প্রত্যাখান করে। পলপট সরকার খেমার ভিয়েতনামীদের হ্যানয়ের ক্রীড়নক হিসেবে দেখে এবং যথার্থ যৌক্তিকতার সাথে সন্দেহ পোষণ করে যে তথাকথিত বিশেষ সম্পর্কের ফলে হ্যানয়ের কর্তৃত্বাধীন একটি ঐক্যবদ্ধ বা যুক্তরাষ্ট্র-ভিত্তিক ইন্দোচীন রাজনৈতিক সত্তা সংগঠিত হতে পারে। অনেকটা এরূপ সন্দেহের আবেশে পলপট সরকার ১৯৭৫ সনের আগস্টে চীনের সঙ্গো সম্মত এক যুক্ত ইশতেহারে সত্যিকারভাবে চীনের ত্রি-বিশ্ব তত্ত্ব মেনে নেয় এবং চীনের ন্যায় পরাশক্তিদ্বয়ের বিশ্বে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পারস্পরিক দ্বন্দ্ব অবজ্ঞার চোখে দেখে।[৪৩] এর পর পরই কম্পুচিয়া তার সেনাবাহিনী শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়, আর এ কাজে মোটামুটি অস্ত্রশস্ত্র ও প্রশিক্ষণে সাহায্য প্রদান করে চীন।[৪৪]

স্পষ্টতই 'নমপেনের' তৎকালীন নেতৃত্ব সম্প্রসারিত ভিয়েতনামী প্রভাব দমন করতে প্রয়াসী হয়, সজ্জিত করতে চায় নিজেদের ভিয়েতনামের সঙ্গে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সম্মুখ লড়াইয়ের জন্য। হ্যানয়-'নমপেন' সীমানা সংক্রান্ত আলোচনা ব্যর্থ হবার পর কম্পুচিয়া ও ভিয়েতনাম সীমান্তে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়; কম্পুচিয়ার অভ্যন্তরেও ব্যাপক গোলযোগ শুরু-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল একটি অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা। পলপট সরকার অভিযোগ করে যে ভিয়েতনামী 'দালাল, গুপ্তচর, অন্তর্ঘাতক' শত্রুরা কম্পুচিয়ায় এ জাতীয় নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত হয়। উল্লেখ্য, কম্পুচিয়ার তৎকালীন খেমাররুজ সরকার 'সাম্রাজ্যবাদী' আগ্রাসন ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কেও প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং প্রায় বদ্ধমূল ধারণার বশবর্তী হয়। তাই পলপট সরকার শুধু ভিয়েতনামকে ষড়যন্ত্রের দায়ে অভিযুক্ত করে ক্ষান্ত হয় নি; বরং খেমাররুজ কর্তৃপক্ষ আরো ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের রাজনৈতিক দলে ও সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে ব্যাপকভাবে বিশুদ্ধ অভিযান পরিচালনা করে, ভিয়েতনামী ভাবপ্রবণতা বা ভিয়েতনামপন্থী বলে সন্দেহ হলে যে কোনো ব্যক্তিকে বর্জন, এমন কি হত্যাও করা হয়।[৪৫] পলপল সরকারকে তাদের নিজস্ব জনগণের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ এনে হ্যানয় সেই সরকারের নিন্দা করে এক ব্যাপক প্রচারণা অভিযান শুরু করে। এছাড়াও, ভিয়েতনাম কম্পুচিয়ার সীমান্ত এলাকায় একটি বড় ধরনের অভিযান চালানো হয় বলে দাবি করা হয়।

www.pathagar.com

ইতিমধ্যে, কম্পুচিয়ার সঙ্গে সমঝোতা প্রতিষ্ঠার আশায় হ্যানয় এ ব্যাপারে চীনের সমর্থন লাভের চেষ্টা করে। সেই আশায় ব্যর্থ মনোরথ হবার পর হ্যানয় চীনকে তার উন্নয়ন পরিকল্পনা বানচাল করার ব্যাপারে সন্দেহ করে এবং কম্পুচিয়ার জঙ্গী মনোভাবের জন্য চীনকে দায়ী করে। বেইজিং-এর মৌলিক রণনৈতিক উদ্দেশ্য হচ্ছে সোভিয়েত বেষ্টনকর রণনীতির সম্ভাব্য বেড়াজাল প্রসূত প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা, হ্যানয়ের আঞ্চলিক অভিলাষ আদায়ে কম্পুচিয়ার নীতিতে হস্তক্ষেপ করা নয়। বেইজিং তাই কম্পুচিয়াকে অধিকতর পরিমাণ সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করে চলে, সেই দেশে প্রায় দশ হাজার সামরিক উপদেষ্টা পাঠায় এবং কম্পুচিয়ার সঙ্গে একাত্মতার নিদর্শনস্বরূপ 'নমপেনে' একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন দলও প্রেরণ করে।[৪৬]

১৯৭৮ সালের প্রথম ভাগ থেকে চীন-ভিয়েতনাম সম্পর্ক প্রায় ভেঙ্গে পড়ে। ভিয়েতনামে দীর্ঘদিন থেকে বসবাসকারী চীনা বংশোদ্ভূত প্রায় দু'লক্ষ অধিবাসীকে উদ্বাস্তু হতে বাধ্য করা এবং পরবর্তীকালে চীনপন্থী পলপট সরকারকে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে ভিয়েতনামী বাহিনীর কম্পুচিয়ায় অভিযান পরিচালনার পর বেইজিং ভিয়েতনামের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, চীনে অবস্থিত ভিয়েতনামী দূতাবাস বন্ধ করে দেয়, আয়োজন করে চীনে ভিয়েতনাম-বিরোধী গণসমাবেশ। এছাড়া চীন ও উত্তর ভিয়েতনাম সীমান্তের যে সমস্ত স্থানে হ্যানয় চীনা বংশোদ্ভূত উদ্বাস্তুদের দেশত্যাগ করে চীনে অনুপ্রবেশ করতে বাধ্য করে সেইসব স্থানে চলাচল নিষিদ্ধ করে, ভিয়েতনামকে অন্য কোনো চীন-বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ সম্পর্কে সতর্ক করে দেয় এবং পরিণামে ভিয়েতনামের সঙ্গে সীমান্ত এলাকার সামরিক শক্তির সমাবেশ ঘটায়।[৪৭]

চীন-ভিয়েতনাম দ্বন্দ্ব তীব্রতর রূপ ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে একে অপরের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ প্রচার করে চলে। বিশেষ করে হ্যানয় সুদূর অতীতকে টেনে এনে বর্তমানের সম্পর্ক নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করতে প্রয়াসী হয়, প্রচার করে প্রাচীন ও সামন্ত যুগের বাদানুবাদ, আর অন্যদিকে আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করে বিগত কয়েক দশকের আদর্শগত ও সংগ্রামী একাত্মতা। একই সঙ্গে হ্যানয় তের ও পনেরো শতকে চীনা হামলাদারদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামীদের ঐতিহাসিক বিজয়লাভের স্মরণে বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠান আয়োজন শুরু করে। এভাবে হ্যানয় চীনা হুমকি সম্পর্কিত তার বক্তব্যের স্বপক্ষে একটি "ঐতিহাসিক ভিত্তি" দাঁড় করাতে সচেষ্ট হয়।[৪৮] উপরন্তু, হ্যানয় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশকে হুশিয়ার করে দেয় যে চীন বিদেশে অবস্থানরত চীনাদের ব্যবহার করে ভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে।[৪৯]

www.pathagar.com

অন্যদিকে, ১৯৭৮ সালের মাঝামাঝি ভিয়েতনাম থেকে পালিয়ে আসা চীনা উদ্বাস্তুদের সংখ্যা যতই বেড়ে চলে বেইজিং ততই হ্যানয়কে মস্কোর নির্দেশে "ভিয়েতনামী অধিবাসী চীনাদের পরিকল্পিতভাবে হয়রানি, নির্যাতন ও বহিষ্কার করার জন্য" নিন্দা করে এবং একতরফাভাবে ঘোষণা করে যে চীন হ্যানয় সরকার দ্বারা নির্যাতিত চীনা জনগণকে উদ্ধারকল্পে ভিয়েতনামে জাহাজ পাঠাতে যাচ্ছে। একই সঙ্গে বেইজিং দক্ষিণ পূর্ব এশীয় জোট আসিয়ান ভুক্ত দেশসমূহের (Association of Southeast Asian Nations বা ASEAN) কূটনীতিবিদদের জানিয়ে দেয় যে, বিদেশে অবস্থানরত চীনাদের ওপর হয়রানির চাইতেও তার কার্যক্রম অধিকতর সম্পৃক্ত সোভিয়েত-ভিয়েতনাম ঘনিষ্ঠতাজনিত বিষয়াদির সঙ্গে।[৫০] বেইজিং সামন্তবাদী চীন কর্তৃক ভিয়েতনামের শাসন ও শোষণের সঙ্গে বর্তমান চীন সরকারের সম্পর্কের অজুহাত প্রত্যাখ্যান করে, আর ভিয়েতনামী বিপ্লবীদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যুদ্ধে বিশ বিলিয়ান মার্কিন ডলার পরিমাণ চীনের বিপুল সাহায্য প্রদানের বিষয় উল্লেখ করে। চীন সরকার আরো উল্লেখ করে যে, ভিয়েতনাম যুদ্ধে হাজার হাজার চীনা সৈন্য প্রকৌশলী ও বিমান হামলা বিরোধী বাহিনীর অংশ হিসেবে কাজ করে— এমন কি যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করে ; এদের মধ্যে প্রায় এক হাজার চীনা সৈন্য ভিয়েতনাম যুদ্ধে প্রাণ দান করে এবং ভিয়েতনামের মাটিতেই তারা সমাধিস্থ রয়েছে।[৫১] এছাড়াও বেইজিং হ্যানয়ের বিরুদ্ধে "আঞ্চলিক আধিপত্যবাদের" অভিযোগ আনে ঃ চীনের মতে এই ভূমিকায় হ্যানয় "মুখ্য আধিপত্যবাদী" শক্তিসহ সোভিয়েত ইউনিয়নের "ক্ষুদ্রতর আধিপত্যবাদী" দোসরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।[৫২]

শাণিত ত্রিকোণ দ্বন্দ্ব

হ্যানয়-মস্কো মৈত্রীর বিরুদ্ধে চীনের সম্প্রসারিত প্রচারাভিযান আরো প্রভাবিত হয় আমেরিকা ও জাপানের সঙ্গে চীনের গড়ে ওঠা সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে। কেননা চীনের উপলব্ধিতে, এই সম্পর্ক গড়ে উঠে। মস্কোর বিরুদ্ধে এক অভিন্ন কৌশলমূলক স্বার্থরক্ষার কারণে। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে ওয়াশিংটন এই অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান সোভিয়েত সামরিক বিরোধী দৃঢ়তর মার্কিন নীতি গ্রহণের ইঙ্গিত প্রদর্শনের অংশ হিসেবে চীনা রাজধানীতে মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টাকে পাঠায়। জাপানও ইতিমধ্যে চীনের উত্থাপিত "আধিপত্যবাদ বিরোধী" ধারা নিয়ে চীন-জাপানি আলাপ আলোচনায় সৃষ্ট অচলাবস্থা নিরসনকল্পে নতুনভাবে কূটনৈতিক যোগাযোগ স্থাপন করে।[৫৩] চীন সম্ভবত স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে এই সময়ে ভিয়েতনামের ওপর চাপ সৃষ্টি করে যাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর হ্যানয়ের নির্ভরশীলতা

www.pathagar.com

আরো বৃদ্ধি পায় ; এতে হ্যানয় ও মস্কোর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব আরো শাণিত রূপ ধারণ করবে বলে চীন মনে করে। এমনও হতে পারে যে হ্যানয় মস্কোর আধিপত্যজনিত কর্তৃত্ব প্রত্যাখ্যান করে তার নিজস্ব স্বাধীনচেতা প্রত্যয়ের পরিচয় দান করবে।[৫৪] (স্মর্তব্য পঁচিশ বছর পূর্বে যথার্থই এরূপ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে দ্বন্দ্ব বা বিরোধ তীব্ররূপ ধারণ করে)। ১৯৭৮ সালের নভেম্বরে এভাবে হ্যানয় যখন মস্কোর সঙ্গে মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদন করে যে চুক্তিতে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মস্কো "কার্যকর ব্যবস্থা" গ্রহণের ওয়াদা প্রদান করে, বেইজিং তখন এই চুক্তিকে কৌশলগত স্বার্থোদ্ধারের (strategic gain) প্রয়োজন কৌশলমূলক বিসর্জন (tactical sacrifice) হিসেবে ধরে নেয়। কেননা চীন মনে করে সোভিয়েত-ভিয়েতনামী চুক্তি সোভিয়েত রণনীতির "সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের" প্রকৃতি সম্পর্কিত চীনের উত্থাপিত চুক্তির যথার্থতার স্বাক্ষর বহন করে। চীনের দৃষ্টিতে, হ্যানয় প্রকৃতপক্ষে আরো কতিপয় রাষ্ট্রের ন্যায় সোভিয়েত লেজুড়বৃত্তিতে লিপ্ত হয় এবং মস্কোর সঙ্গে এই ধরনের লেজুড়েপনা সম্পর্কের বিরুদ্ধে কালে এশিয়ায় ঘোরতর প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠতে সহায়তা করবে।[৫৫] ইতিমধ্যে, কম্পচিয়ায় ভিয়েতনামের আক্রমণ এবং সেই দেশে ভিয়েতনামের অব্যাহত দখলদার ভূমিকা গ্রহণের ফলে চীনের পক্ষে হ্যানয়ের চীন-বিরোধী নীতি অতি ব্যয়বহুল ও ভ্রান্তিমূলক ব্যাপার রূপে তুলে ধরার আরেকটি সুযোগ মেলে।[৫৬]

১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভিয়েতনামের উত্তরাঞ্চলের গভীর অভ্যন্তরে চীনের ঝটিকা অভিযান শুরু হবার পূর্বে চীন ও ভিয়েতনামের মধ্যে দু'দেশের সীমানা নিয়ে উপর্যুপরি কয়েকবার সহিংস ঘটনা ঘটে। উভয় দেশের মধ্যে বাদানুবাদ হয় রাজকীয় আমলে চিহ্নিত করা সীমানা নিয়ে, আর টংকিন (বেইবু) উপসাগরে অবস্থিত সম্ভাব্য তৈল সমৃদ্ধ দ্বীপসমূহ নিয়ে উভয় দেশের মধ্যে জটলা চলে।[৫৭]

ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে চীন এ অঞ্চলের সবচেয়ে শক্তিধর দেশ হিসেবে তার আত্ম-সচেতনতা প্রদর্শন করতে চায়, বুঝিয়ে দিতে চায় হ্যানয়কে যে মস্কো ভিয়েতনামকে চীনা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা থেকে রক্ষা করতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, এই অঞ্চলে মৌলিক স্বার্থজনিত গুরুত্বপূর্ণ আগ্রহ সমন্বিত অন্য দু'টো দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের নিকট প্রদর্শন করতে চায় যে কঠোরতর চীনা কার্যক্রমের সম্মুখীন হলে মস্কো চীনের ওপর আঘাত হানতে সাহস পাবে না। পরিশেষে, ভবিষ্যতে ভিয়েতনামের ওপর পুনর্বার আক্রমণ পরিচালনা সম্পর্কিত চীনা হুমকির যথার্থতা প্রমাণেও বেইজিং বাস্তব স্বাক্ষর রাখতে প্রয়াসী হয়।[৫৮] প্রকৃতপক্ষে,

www.pathagar.com

চীনা ঝটিকা অভিযানের সামরিক উপযোগিতা সম্পর্কে সামরিক পর্যবেক্ষক বিশ্লেষকরা যাই-ই ভেবে থাকুন না কেন,[৫৯] সোভিয়েত-ভিয়েতনামী মৈত্রী চুক্তি সত্ত্বেও ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগের মানসিকতা প্রদর্শন করতে বেইজিং দ্বিধা করে নি। বরং চীন বাধ্য করে হ্যানয়কে অতিরিক্ত হাজার হাজার সৈন্য সমাবেশ রাখতে যাতে আর্থিকভাবে ভিয়েতনামকে দাবিয়ে রাখা যায়। মার্চের দিকে বেইজিং যদিও দ্রুত তার সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয় এরপর থেকে চীনা নেতৃবৃন্দ মাঝে-মধ্যে হুমকি দিয়ে আসছেন যে প্রয়োজনবোধে তারা "ভিয়েতনামকে আবার শিক্ষা দেবেন।" এ জাতীয় চীনা হুমকির উদ্দেশ্য হচ্ছে হ্যানয়কে তার অতন্দ্র সামরিক পাহারায় প্রবৃত্ত থাকতে বাধ্য করা—যাতে ভিয়েতনামকে সোভিয়েত "আধিপত্যবাদী" প্রহরাধীন থেকে দুঃসাহসিক সামরিক ঝুঁকি গ্রহণের জন্য যথাযথ শাস্তি পেতে হয়। এছাড়াও, বেইজিং চীন-ভিয়েতনাম সীমান্ত এলাকার ব্যাপক সৈন্য মোতায়েন রাখে। এটা শুধু চীনের প্রতিরক্ষামূলক চালের অংশ নয়; বরং এর মাধ্যমে ভিয়েতনামী বাহিনীকে তাদের উত্তর সীমান্তের বিস্তৃত এলাকায় রণসজ্জায় সজ্জিত থাকতে হয়, আর এর ফলে কম্পুচিয়ায় চীনের খেমাররুজ মিত্রদের ভিয়েতনামী দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হয়।[৬০]

এদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৭৮ সনের জুনে সোভিয়েত অর্থনৈতিক জোট কমেকনে হ্যানয়ের যোগদানের সিদ্ধান্ত, উভয় দেশের মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন ও মস্কোর সঙ্গে নতুন সামরিক সহযোগিতায় সম্মতি প্রদানে খুশী হয়। কিন্তু তবু ক্রেমলিন নেতৃবৃন্দ কম্পুচিয়ার খেমাররুজ সরকারের সঙ্গে ভিয়েতনামের সম্প্রসারিত দ্বন্দ্বে অনেকখানি দোদুল্যমান পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়।[৬১] সাধারণভাবে এটা বলা চলে, মস্কো কম্পুচিয়াকে ঘিরে চীন-ভিয়েতনামী বিরোধে হ্যানয়ের প্রতি সমর্থন রাখে। তবু এও সত্য যে, চীনকে পরিবেষ্টিত করা ছাড়া কম্পুচিয়াকে অধীনস্থ রাখার হ্যানয়ের নীতিতে মস্কোর বাস্তব কোনো স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রয়েছে বলে মনে হয় না। কিন্তু ক্রেমলিনের ভয় ছিল, হ্যানয় কর্তৃক পলপট সরকারকে উৎখাত করার কোনো চেষ্টা করা হলে চীন হয়তো কঠোরভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাবে, এমন কি চীন-সোভিয়েত সামরিক সংঘর্ষও বেধে যেতে পারে যা অবশ্যি মস্কো এড়াতে চায়। এতে উন্নততর চীনা-সোভিয়েত সম্পর্কের সম্ভাবনাও দারুণভাবে ব্যাহত হতে পারে। এছাড়াও, এতে এই অঞ্চলের অকম্যুনিস্ট দেশসমূহে চীনা প্রভাব সম্প্রসারিত করার সুযোগ পেতে পারে বেইজিং, আর এর ফলে আমেরিকা ও আসিয়ানের পারস্পরিক সমর্থনসূচক সম্পর্ক আনুষ্ঠানিক সামরিক বন্ধনে রূপান্তরিত হতে পারে।[৬২] উপরন্তু, মস্কো অনুধাবন করতে পারে যে,

www.pathagar.com

ভিয়েতনাম ও কম্পুচিয়াকে কেন্দ্র করে চীন-সোভিয়েতসহ সংঘর্ষ দেখা দিলে কৌশলগত অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও প্রযুক্তি হস্তান্তর সম্পর্কিত পরাশক্তিদ্বয়ের চলতি সংলাপ ব্যাহত হতে পারে। পরিশেষে, সোভিয়েত সমর্থনপুষ্ট হয়ে ভিয়েতনামীরা সরাসরি কম্পুচিয়া আক্রমণ করলে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সোভিয়েত বিরোধী চীন-মার্কিন সমন্বিত সামরিক ও রাজনৈতিক জোট গঠনের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে, আর এতে মস্কোর আঞ্চলিক রণনীতি শত্রুর সমন্বিত হুমকির সম্মুখীন হবে।[৬৩]

ভিয়েতনামী নেতৃবৃন্দ জানতেন যে, মস্কো সামরিক শক্তি ব্যবহারের বিরোধিতা করতে পারে এবং প্রথম দিকে তাঁরাও চীনের সঙ্গে কোনোরূপ যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, এসব কারণেই তাঁরা ১৯৭৭ কিংবা ১৯৭৮ সনের প্রথম দিকেও পলপট সরকারকে উৎখাৎ করার উদ্দেশ্যে সামরিক কর্মপন্থা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু পরবর্তীকালে মস্কো কম্পুচিয়া সম্পর্কিত হ্যানয়ের সামরিক পরিকল্পনার সমর্থনে এগিয়ে আসে, কেননা এর প্রতিদানে ভিয়েতনাম সোভিয়েত বেষ্টনকর রণনীতির বেষ্টনীতে নিজকে আবদ্ধ করতে রাজি হয়। উল্লেখ্য, পূর্বে হ্যানয় এ সম্পর্কিত সোভিয়েত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।[৬৪] অবশ্যি, এছাড়াও এ সময়ে হ্যানয়ে কম্পুচিয় পরিকল্পনায় সোভিয়েত সমর্থনের আরো কারণ ছিল। বিশেষ করে এই অঞ্চলকে ঘিরে সমর্থনের আরো কারণ ছিল। বিশেষ করে এই অঞ্চলকে ঘিরে বহিঃশক্তিসমূহের দৃষ্টভঙ্গিতে মস্কো শঙ্কিত হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৭৮ সনের মে মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কার্টারের বিশেষ দূত হিসেবে তাঁর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জিবনিও ব্রেঞ্জস্কি বেইজিং সফরে আসেন এবং একই বছর আগস্টের দিকে চীন-জাপান শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ সবের ফলে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ আশঙ্কা করেন যে, পশ্চিমা মৈত্রী জোট উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা ন্যাটো'র (North Atlantic Treaty Organisation বা NATO) ন্যায় এশিয়াতেও আমেরিকা, চীন ও জাপানের সমন্বয়ে আরেকটি সোভিয়েত বিরোধী ত্রিকোণ শক্তি জোট গঠন হতে চলছে।[৬৫] ক্রেমলিন নেতৃবৃন্দের আরো সংশয় হয়, এর ফলে এশিয়ায় সোভিয়েত কৌশলগত অবস্থার উন্নয়নকল্পে মস্কো বিগত এক দশকব্যাপী যে তীব্র রণনৈতিক ও কূটনৈতিক ভূমিকা পালন করে আসছে এই অঞ্চলে তা'ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে, সীমিত করবে সোভিয়েত অর্থনৈতিক অভিলাষ এবং পরিশেযে, একটি বিশ্বশক্তি হিসেবে এ অঞ্চলে মস্কোর প্রাচ্য রাজনৈতিক প্রভাব থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে বঞ্চিত হতে হবে, এবং লাভবান হবে বেইজিং। তাই বিশ্বের কৌশলগত ভারসাম্য যাতে আমেরিকা ও চীনের

www.pathagar.com

অনুকূলে না যায় তার নিশ্চয়তা বিধানকল্পে মস্কোকে সক্রিয় কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হয়।[৬৬]

সোভিয়েত-ভিয়েতনামী মৈত্রী চুক্তির ধারা অনুযায়ী ভিয়েতনামের ওপর চীনা আক্রমণ সাময়িকভাবে প্রতিহত করতে মস্কো ব্যর্থ হয় বটে, কিন্তু বিমান ও নৌযোগে ভিয়েতনাম এই সময়ে সোভিয়েত সামরিক সরবরাহ, চীন-সোভিয়েত সীমান্তে সোভিয়েত সৈন্য সমাবেশ, টংকিন উপসাগর এলাকায় সম্প্রসারিত সোভিয়েত বিমান ও নৌ চলাচল এবং পরিশেষে, চীনা সামরিক কার্যকলাপের সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে সতর্কবাণী-এসব বাস্তবতা চীনকে ভিয়েতনামের অভ্যন্তরে তার সামরিক হস্তক্ষেপ সীমিত করতে বাধ্য করে।[৬৭] কৌশলগত অবস্থান জোরদার করার মাধ্যমে তার বেষ্টনকর রণনীতির বাস্তবায়নে অধিকতর তৎপর হয়। ভিয়েতনামী বিমান ঘাঁটিসমূহ ব্যবহার করে সোভিয়েত বৈমানিকরা তখন থেকে দূরপাল্লার পর্যবেক্ষণ বা তল্লাশি অভিযান পরিচালনা শুরু করে। সোভিয়েত যুদ্ধজাহাজ ও সাবমেরিনসমূহ ভিয়েতনামী বন্দরসমূহে নিয়মিত আনাগোনা আরম্ভ করে এবং কামরা উপসাগর ও ডানাং-বন্দর এলাকায় নৌ ও বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে।

চীন-সোভিয়েত সংলাপ

ইতিমধ্যে প্রলম্বিত রণনৈতিক ধারায় চীন-সোভিয়েত কৌশলগত প্রতিযোগিতা চললেও ১৯৭৯ সনের অক্টোবরের দিকে বেইজিং তার কৌশল পরিবর্তন করে মস্কোর সঙ্গে সংলাপে প্রবৃত্ত হয়। এই সংলাপে চীন ১৯৫০ সনের চীন-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তির পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের ভিত্তিতে আরেকটি চুক্তিপত্র নিয়ে আলোচনার আগ্রহ প্রদর্শন করে। উল্লেখ্য, পূর্বোক্ত চীন-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তির মেয়াদ ১৯৭৯ সনের প্রথম দিকে উত্তীর্ণ হয়। দ্বি-পাক্ষিক আলোচনায় চীন যেসব বিষয় উত্থাপন করে তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় ভিয়েতনামকে "যে কোনো ধরনের" সোভিয়েত সাহায্য প্রদান থেকে মস্কোকে নিবৃত্ত রাখার মত বিষয়াদি। ১৯৫০ সনের চীনা-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি না করে বেইজিং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কম্যুনিস্টদের সমন্বিত সংগ্রাম ব্যাহত করেছে বলে সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনকে অভিযুক্ত করে, দোষারোপও করে চীনকে সোভিয়েত-ভিয়েতনামী সম্পর্ক বিষাক্ত করার প্রচেষ্টা চালাবার জন্য। এছাড়াও, ভিয়েতনামকে সমাজতান্ত্রিক শিবির থেকে বিচ্যুত করে সামরিক হুমকির মাধ্যমে সেই দেশকে পদদলিত করার দায়ে মস্কো চীনকে দায়ী করে।[৬৯] উপরন্তু, মস্কো চীনের আদর্শ-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপ উদঘাটন করতে চায়, যে-আদর্শ বিরোধী চিন্তাধারায় ক্রেমলিন নেতৃবৃন্দ উল্লেখ করেন চীনা মার্ক্সবাদের বিষয়, এর সঙ্গে সংযুক্ত করেন একটি

www.pathagar.com

আধিপত্যবাদী ও সোভিয়েত বিরোধী চীনা পররাষ্ট্র নীতি। মস্কোর মতে, এসব হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক নীতি-আদর্শের পরিপন্থী।[৭০]

প্রত্যুত্তরে বেইজিং এরূপ পাল্টা যুক্তি প্রদর্শন করে যে মস্কো চীনকে একটি 'পারমাণবিক আশ্রিত রাষ্ট্রে' রূপান্তরিত করতে সচেষ্ট, চাচ্ছে চীনকে একটি সোভিয়েত তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করতে, আর তাই মস্কো চীনের অবস্থা সম্পর্কে মিথ্যা ও বিকৃত প্রচারণা চালাচ্ছে যাতে চীনকে একটি আগ্রাসী শক্তির অপবাদ দিয়ে কলংকিত করা যায়। বেইজিং আরো মনে করে যে, মস্কো সচেতনভাবে চীনকে হেয়প্রতিপন্ন করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। কেননা ক্রেমলিনের নেতৃবৃন্দের কাছে এটা অবিদিত ছিল না যে চীন বহুবিধ অর্থনৈতিক বাধা-প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে ভিয়েতনামের প্রতি সাহায্য প্রদান বন্ধ রাখে। বিশেষ করে হ্যানয় সরকার যখন চীনের বিরোধিতা করে, ভিয়েতনামস্থ চীনা অধিবাসীদের ওপর নির্যাতন ও নিপীড়ন চালিয়ে এবং একটি ব্যাপকতর উদ্বাস্তু সমস্যা সৃষ্টি করে চীনকে বিপুল আর্থিক ক্ষতির মুখে নিক্ষেপ করে তখন বেইজিং-এর পক্ষে ভিয়েতনামকে সাহায্য দেয়া বন্ধ না রেখে উপায় ছিল না। তদুপরি, চীনা নেতৃবৃন্দ আরো অভিযোগ করেন যে, সোভিয়েত সাহায্য ও সমর্থনপুষ্ট হয়েই হ্যানয় কম্পুচিয়ায় আগ্রাসন চালিয়েছে, দাবি করে চীনের কাছে ভূ-সীমানা, সীমান্তে সংঘর্ষ আরম্ভ করে, এবং সীমানা প্রান্তে একটি বিবদমান পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটায়।[৭১]

নিঃসন্দেহে মস্কো তার চীন-বিরোধী বেষ্টনকর রণনীতি প্রসূত দৃষ্টিভঙ্গি জোরদার কল্পে হ্যানয়ের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণে এগিয়ে আসে, কিন্তু সোভিয়েত আচরণ এরূপ ইঙ্গিতও বহন করে যে মস্কো তখনো বৃহৎ শক্তিসমূহের মধ্যে সংলাপের ওপর বেশ গুরুত্ব আরোপ করে। ভিয়েতনামের ওপর চীনা আক্রমণকে মস্কো মূলত দেখে থাকে মার্কিন-সোভিয়েত সংলাপ ব্যাহত করার প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসেবে, আর তাই খোদ ভিয়েতনামী রাজধানী হ্যানয় আক্রান্ত হবার পূর্বে মস্কো প্রত্যক্ষভাবে চীন-ভিয়েতনামের দ্বন্দ্বে বিজড়িত না হতে সংকল্পবদ্ধ ছিল। একই সঙ্গে মস্কো যদিও সন্দেহ পোষণ করে যে, চীনের ভিয়েতনাম আক্রমণের প্রতি ওয়াশিংটনের যোগসাজশ ও সায় ছিল তা'সত্ত্বেও মস্কো সতর্ক হয়ে চীনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে মুখোমুখি হওয়া থেকে বিরত থাকে এবং আমেরিকার সঙ্গে সংলাপে অব্যাহত আগ্রহ প্রদর্শন করে চলে।[৭২] সোভিয়েত আচরণে পরিদৃষ্ট এরূপ অন্তর্দ্বন্দ্ব মস্কোর বিঘোষিত শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান সম্পর্কিত বিশ্ব কৌশলগত নীতির আদর্শে নিহিত। কেননা এই নীতিতে সামরিক পন্থা ছাড়া অন্য যে কোনো পদ্ধতিতে সংগ্রাম অব্যাহত রাখায় সোভিয়েত সংকল্পের বিষয় সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে কিছু না হলেও মস্কো তার "চীনা কার্ডের" চাল খেলে চীনের সঙ্গে

www.pathagar.com

কৌশলগত ও রাজনৈতিক সম্পর্কের ব্যাপারে ওয়াশিংটনের উদ্বেগ সঞ্চারে প্রয়াসী হয়।[৭৩]

চীনের দৃষ্টিভঙ্গির প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে, মস্কোর সমর্থনপুষ্ট হয়ে ইন্দোচীনে হ্যানয়ের অবাধ্যতা, ভিয়েতনাম অভিযানকালে চীনা সামরিক যন্ত্রের পরিলক্ষিত দুর্বলতা, চীন-ভিয়েতনাম সাম্প্রতিক সংঘর্ষে চীনের ব্যয়-বহুল অভিজ্ঞতা এবং সে অভিজ্ঞতা থেকে চীনের এরূপ সচেতন অনুভূতি জাগে যে এ জাতীয় যুদ্ধে চীনের নিজস্ব ক্ষতিপূরণ বহু অর্থ ও সময়ের অপব্যয় হবে— এসব সম্ভাব্য বহুবিধ কারণে বেইজিং মস্কোর সঙ্গে শান্তি আলোচনা গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। এছাড়াও, চীন তার অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রবৃদ্ধি পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে এরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষী নীতি-কৌশল উপস্থাপন করে যে তাতে মনে হয় চীন সম্ভবত তার আর্থিক প্রবৃদ্ধির বাস্তব প্রয়োজনীয়তার দিক বিবেচনা করে মস্কোর সঙ্গে নতুনভাবে সংলাপভিত্তিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে প্রয়াসী।[৭৪] বাস্তব রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে চীন-সোভিয়েত সংলাপ অনেকের নিকট প্রায় নিরর্থক বলে মনে হতে পারে, কেননা এ ধারার সংলাপ চলে বহুদিন ধরে, যদিও ১৯৭৯ সনের ডিসেম্বর থেকে আফগানিস্তানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপের পর চীন কিছুকাল মস্কোর সঙ্গে সংলাপে যোগদান থেকে বিরত থাকে।

কম্পুচিয়া দ্বন্দ্বের প্রভাব

ইতিমধ্যে কম্পুচিয়াকে ঘিরে কম্যুনিস্ট দেশসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব অব্যাহত থাকার কারণে দ্বন্দ্বের সম্ভাব্য সম্প্রসারণমূলক পরিণতি সম্পর্কে মস্কো কিছুকাল ব্যতিব্যস্ত থাকে। মস্কোর বিশেষ ভয় ছিল যে তার সীমান্তের অভ্যন্তরে ভিয়েতনাম কর্তৃক কম্পুচিয় গেরিলাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হলে আমেরিকা ও আসিয়ান দেশসমূহের সঙ্গে অধিকতর মারাত্মক সংকট দেখা দিতে পারে, তাই মস্কো সচেষ্ট হয় যাতে ভিয়েতনামী বাহিনী থাইল্যান্ডের অভ্যন্তরস্থ কম্পুচিয় উদ্বাস্তু শিবিরসমূহের ওপর বিক্ষিপ্তভাবে হামলা অব্যাহত রাখে। কিন্তু সমগ্র প্রক্রিয়ার শেষপ্রান্তে যেসব পক্ষসমূহকে মস্কো পরিতুষ্ট রাখতে চায় তাদের-ই বিরুদ্ধে আবার একই কারণে নিন্দাসূচক ভাষা ব্যবহার করে। চীনকে তার তথাকথিত আধিপত্যবাদী নীতির জন্য সোভিয়েত সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়, আর আমেরিকাকেও 'সাম্রাজ্যবাদী ক্রিয়াকলাপের' দায়ে চিহ্নিত করে মস্কো।[৭৬]

সোভিয়েত নীতিগত দ্বন্দ্বের আরো পরিচয় মেলে কম্পুচিয়ার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ভিয়েতনামী হস্তক্ষেপ সম্পর্কে সোভিয়েত দৃষ্টিভঙ্গিতে। মস্কো

www.pathagar.com

সম্ভবত কম্পুচিয়ায় রাজনৈাতক সমাধান কামনা করে, কিন্তু এরূপ সমাধানে পৌঁছার লক্ষ্যে নরোদম সিহানুকের সঙ্গে সমঝোতা বা কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রচেষ্টায় হ্যানয়কে প্ররোচিত বা বাধ্য করতে মস্কো সমর্থ হয় নি। ভিয়েতনাম শুধু কম্পুচিয় দ্বন্দ্বের নিরসন কল্পে কোনো ধরনের সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত থাকে নি, যাতে ঐ দ্বন্দ্বের রাজনৈতিক সমাধান ব্যাহত হতে পারে ; বরং হ্যানয় প্রবৃত্ত থাকে তার প্রলম্বিত ধারার দ্বান্দ্বিক বা কূটচালে যাতে কম্পুচিয়ায় ভিয়েতনামের উপস্থিতির স্থায়িত্ব বিধান করা যায়। এ সত্য এখন আর অবিদিত নয় যে, লাওসে ও ভিয়েতনামের হাত থাকে সর্বত্র প্রসারিত।[৭৭] 'নমপেনে' ভিয়েতনামের সাহায্য ও সমর্থনপুষ্ট এবং তাদের কর্তৃত্বাধীন এক তাবেদার থাকে সরকার ক্ষমতাসীন, আর চীন-সমর্থিত গণতান্ত্রিক কম্পুচিয়ার যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বর্তমানে প্রায় ভিয়েতনামের সমর্থিত সরকারের বিরুদ্ধে গেরিলা ভূমিকা গ্রহণে বাধ্য হতে হয়। খুব সম্ভব কম্পুচিয়া থেকে ভিয়েতনামকে প্রত্যাহার করার মত রাজনৈতিক ক্ষমতা মস্কোর নেই। সত্যিকার অর্থে এই এলাকায় ভিয়েতনামের কৌশলগত উদ্দেশ্যাবলির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিচার করলে বুঝা যাবে যে, কম্পুচিয়া থেকে ভিয়েতনামী বাহিনী প্রত্যাহার হ্যানয়ের রণনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী।[৭৮] কেননা, কম্পুচিয়া থেকে ভিয়েতনামী বাহিনী প্রত্যাহার করা হলে সেই দেশে, চীন-সমর্থিত খেমার রুজের নেতৃত্বে গঠিত ভিয়েতনাম-বিরোধী কোয়ালিশন সরকারের ক্ষমতা পুনর্দখলে পথ সুগম হতে পারে।[৭৯] উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, হ্যানয়ের কম্পুচিয় নীতি তার নিজস্ব রণনীতি প্রসূত এবং এর পরিবর্তনে মস্কোর প্রভাব ছিল সীমিত।

তবু ভিয়েতনাম ছিল এক বিশেষ ধরনের সোভিয়েত তাবেদাররূপে পরিগণিত। চীনের বিরুদ্ধে তার প্রতিরক্ষা সুনিশ্চিত করা এবং ইন্দোচীনে তার আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য ভিয়েতনামের প্রয়োজন মস্কোর রাজনৈতিক সমর্থন, সোভিয়েত সামরিক সরবরাহ, আর্থিক সাহায্য ও তৈল সরবরাহ। হ্যানয়ের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক বজায় রাখার উদ্দেশ্যে মস্কোর আর্থিক ব্যয় তার কল্পিত আর্থিক স্বার্থ ও সুবিধের চেয়ে অনেক গুণ বেশি।[৮০] এতদসত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়ন ভিয়েতনামের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক বজায় রাখার ওপর খুব গুরুত্ব আরোপ করে। কেননা ভিয়েতনামের মাধ্যমে লাওস ও কম্পুচিয়ায় বন্ধুপ্রতিম সমাজতান্ত্রিক সরকারসমূহের স্থিতি ও স্থায়িত্ব সুনিশ্চিত করা সম্ভব হবে, হ্যানয়কে ব্যবহার করা যাবে চীনকে পরিবেষ্টিত করে রাখতে, আর এ অঞ্চলে সোভিয়েত প্রভাব-প্রতিপত্তি অধিকতর বৃদ্ধি পাবে।[৮১] মস্কো ইতিমধ্যেই কামরান বে, ডানাং ওটান সোন ন্যুট বিমান ঘাঁটিতে নৌ-বিমান ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধাদিতে অনুপ্রবেশ করার অধিকার লাভ করে এবং দক্ষিণ

www.pathagar.com

চীন সাগরে একটি স্থায়ী নৌ অবস্থান ঘাঁটিও প্রতিষ্ঠা করে। এ সবের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার ভারত মহাসাগরীয় নৌবহরকে অধিকতর সাহায্যের প্রদান ও আরো জোরদান করার ক্ষমতা লাভ করে,[৮২] সমর্থ হয় আঞ্চলিক সমুদ্র পথসমূহের ওপর কড়া নজর রাখতে এবং অর্জন করে চীনকে কার্যকরভাবে পরিবেষ্টিত করার ক্ষমতা। এসবের ফলে মস্কোর পক্ষে এ অঞ্চলে পশ্চিমা কৌশলগত রণনৈতিক চাল নিষ্ক্রিয় করে দেয়া সম্ভব হতে পারে।[৮৩]

উপসংহার

হ্যানয়, বেইজিং ও মস্কো কর্তৃক তাদের স্ব স্ব জাতীয় স্বার্থের নিরন্তর অন্বেষা ও প্রলম্বিত ধারায় তাদের পারস্পরিক কৌশলগত উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়াসের প্রেক্ষাপটে এরূপ উপসংহারে আসা যুক্তিযুক্ত হবে যে, তাদের সম্পর্কে অচলাবস্থা বিদ্যমান। ভিয়েতনামের সীমান্ত এলাকায় চীনা বাহিনী তাদের ঝটিকা অভিযানকালে ভয়াবহ ধ্বংসচিহ্ন রেখে যাওয়া সত্ত্বেও[৮৪] এবং বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহার সম্পর্কিত জাতিসংঘে গৃহীত বার্ষিক প্রস্তাবাবলিসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পৌনঃপুনিক আহবান সত্ত্বেও হ্যানয় এখনো কম্পুচিয়া ও লাওস উভয় দেশেই গভীরভাবে বিজড়িত। ইন্দোচীনে হ্যানয় তার অবস্থান আরো সুসংহত ও সুদৃঢ়করণে অনমনীয় ভাব বজায় রেখে চলেছে।[৮৫] বিশেষভাবে হ্যানয় কম্পুচিয়াকে তার "প্রতিরক্ষা বর্ম" হিসেবে দেখে চলেছে, দাবি করে আসছে যে ভিয়েতনাম ও কম্পুচিয়ার পারস্পরিক সামরিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতা "পবিত্র", এবং দু'দেশের সম্পর্কে নীতি ও নিরাপত্তার প্রশ্ন বিজড়িত। কেননা মস্কো ভিয়েতনামের কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গির সাফল্যের নিশ্চয়তা বিধান করে চলেছে,[৮৬] যদিও একথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে এই নিশ্চয়তা লাভ করতে গিয়ে হ্যানয়কে চীন-বিরোধী সোভিয়েত বেষ্টনকর রণীতির ধারক ও বাহকের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই চীন শত্রুভাবাপন্ন ইন্দোচীনে বেইজিং বা সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক লালিত সামরিক ও রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা মেনে না নিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ইন্দোচীনে হ্যানয়কে স্থায়ীভাবে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ না দিতেও চীন স্থির সংকল্পবদ্ধ। তাই চীনের অব্যাহত নীতি হচ্ছে ভিয়েতনামের অভ্যন্তরে ও বাইরে হ্যানয়ের বিরোধী বাহিনীসমূহকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সাহায্য ও সমর্থন দিয়ে যাওয়া যাতে সোভিয়েত মুখাপেক্ষী সম্প্রসারণবাদী এ সরকার অন্তঃসারশূন্য হয়।[৮৭]

তিনটি কম্যুনিস্ট দেশের রণনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও তাদের গৃহীত কর্মপন্থার আলোকে এটা বলা সমীচীন যে, সাম্প্রতিককালে চীন-সোভিয়েত দ্বিপাক্ষিক

www.pathagar.com

সম্পর্কে শান্তিসূচক ভাব-সঙ্কেত ও তাদের সম্পর্কের পারিপার্শ্বিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি সত্ত্বেও কম্যুনিস্ট দেশত্রয়ের ত্রিকোণ কৌশলগত সম্পর্কে এখনো অনিশ্চিত অবস্থা বিরাজমান। তবু এসব শান্তিসূচক ভাব-সঙ্কেত চীন-সোভিয়েত সম্পর্কের অস্থিরতা যতই লাঘর করবে ততই কমবে এদের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষের সম্ভাবনা, তাই তাদের পারস্পরিক যোগাযোগ অবশ্যি কাম্য। কেননা এ জাতীয় শান্তিসূচক ভাব-সঙ্কেত ও যোগাযোগ অব্যাহত থাকলে সম্ভবত আনুপাতিক হারে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের দ্বান্দ্বিক কূটচালের তৎপরতা সীমিত হবে এবং কম্পুচিয় গেরিলা বা হ্যানয়ের মত তৃতীয় পক্ষের সাথে একযোগে সম্ভাব্য সহিংস ঘটনার বিস্ফোরণ এড়ানো সম্ভব হবে। আপাতত কিন্তু চীন-সোভিয়েত সরাসরি ঘনিষ্ঠতার সম্ভাবনা বা হ্যানয়-বেইজিং এর সমঝোতার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত বলে মনে হয়। কেননা, ত্রিকোণ কোন্দলে রত প্রতিটি পক্ষের দৃষ্টিকোণ তাদের মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী প্রলম্বিত কূটচালের সঙ্গে যতখানি বিজড়িত ততখানি সম্পৃক্ত তাদের পারস্পরিক জাতীয় স্বার্থের কৌশলগত সন্ধানের সঙ্গে। প্রকৃতপক্ষে, দু'টি কম্যুনিস্ট শক্তি-দানব কিংবা বেইজিং ও হ্যানয়ের মধ্যে এ যাবত তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো চুক্তি সম্পাদিত হয় নি যার মাধ্যমে তাদের মুখ্য বিরোধের বিষয়সমূহে সমঝোতা বিধানের পরিচয় মিলবে।[৮৮] তাদের পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস ছাড়াও দ্বন্দ্বরত কম্যুনিস্ট দেশ তিনটির সম্পর্কে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থগত দ্বন্দ্বও বর্তমান।[৮৯] ফলে অতীতে তিনটি কম্যুনিস্ট দেশের পারস্পরিক সম্পর্কে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয় এবং তাদের পরস্পরের প্রতি নিজ নিজ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সুনিশ্চিত পরিবর্তন না ঘটলে ভবিষ্যতেও তাদের ত্রিকোণ কৌশলগত সম্পর্কে অচলাবস্থার ধারা অব্যাহত থাকবে।

প্রতিবন্ধী সম্পর্কের পর্যায় থেকে স্বাভাবিকতার সম্পর্কে উত্তরণ

প্রবন্ধটি মূলত লেখা হয়েছিল তিনটি কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের প্রতিবন্ধী সম্পর্কের পটভূমিতে। এক্ষেত্রে আপাত দৃষ্টিকোণ থেকে তিনটি রাষ্ট্র কম্যুনিস্ট আদর্শের অনুগামী হওয়া সত্ত্বেও কৌশলগত মতভিন্নতা ও ভিন্নতর জাতীয় স্বার্থের অন্বেষার কারণে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়, সম্পর্ক অনেকটা প্রতিবন্ধী পর্যায়ে নেমে আসে। ফলে একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক আচরণে লিপ্ত হয়, প্রয়োগ করে একে অপরের প্রতি যুদ্ধের ভাষা এমন কি পরস্পর পরস্পরের উদ্দেশ্যে রণনীতি ও রণকৌশল প্রণয়ন করে। বিগত এক যুগব্যাপী এই প্রতিবন্ধী সম্পর্কে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয় এবং

www.pathagar.com

ক্রমান্বয়ে এ সম্পর্ক সম্পূর্ণ স্বাভাবিক পর্যায়ে উন্নীত হয়। এমন কি ক্ষেত্রবিশেষ সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতার আমেজও লাভ করে।

প্রসঙ্গটি অধিকতর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হয় তিনটি দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রে এবং সেই পরিবর্তন প্রতিফলিত হয় কৌশলগত সম্পর্ক ও পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে। একই সঙ্গে এও বলা সমীচীন যে, স্নায়ুযুদ্ধের শেষ দশকে, বিশেষ করে আশির দশকের শেষ পাদ থেকে বিশ্ব ব্যবস্থার যে পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করে তা তিনটি কম্যুনিস্ট দেশকেও প্রভাবিত করে, প্রভাব ফেলে তাদের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃসম্পর্কে। অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক ও কৌশলগত নীতি এক্ষেত্রে একে অপরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। কেননা এসব হচ্ছে ক্রিয়াশীল এবং আন্তক্রিয়াভিত্তিক–একে অপরের ওপর প্রভাব রাখতে বাধ্য। ফলে কম্যুনিস্ট ও অকম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের ব্যবধানের বাধ ভেঙে পড়ে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক দ্রুত এগিয়ে চলে স্নায়ুযুদ্ধ উত্তরকালের দিকে। পরিবর্তন সবচেয়ে প্রকট হয়ে দেখা দেয় বিশ্বের বৃহত্তম কম্যুনিস্ট শক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নে। এই সোভিয়েত ইউনিয়নই ছিল আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের হোতা। সমগ্র বিশ্বে অনেকেই ছিল সোভিয়েত ব্যবস্থার অনুরাগী ও অনুগামী এবং কৌশলগত সামরিক দিক থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর থেকে এই সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বে একটি শ্রেষ্ঠতর বৃহৎ শক্তি বা পরাশক্তিরূপে আবির্ভূত হয়। তাই এ সোভিয়েত ইউনিয়নে যে কোনো ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন অপরাপর কম্যুনিস্ট দেশে প্রভাব না ফেলে পারে না।

সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্রেজনেভ যুগের অবসানের পর সেই দেশের অভ্যন্তরীণ রক্ষণশীলতা ও আন্তর্জাতিকভাবে সম্প্রসারণবাদী বা হস্তক্ষেপমূলক নীতি ক্রমশ পরিত্যক্ত হয়। বিশ্বব্যাপী সোভিয়েত সামরিক সরবরাহ ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের বিপুল ব্যয়, আফগানিস্তানে মস্কোর সামরিক বিপর্যয়, সোভিয়েত ইউনিয়নে অর্থনৈতিক বিশৃংখলা ও স্থবিরতা, জাতিগত বিবাদ প্রভৃতি এমন কি শ্রমজীবী ও মেহনতি জনমানুষদের মধ্যে ও ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি করে, দ্বিধা বিভক্ত হয় শাসক শ্রেণী, ক্রেমলিনের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতিতে সূচনা করে মৌলিক পরিবর্তনের ধারা। মিখাইল গরবাচেব কর্তৃক প্রবর্তিত ‘পেরেস্ত্রোয়কা’ ও ‘গ্রাসনস্ত’ ছিল সেই পরিবর্তন ধারার ফসল। ফলে সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতিতে চিরাচরিত সম্প্রসারণবাদী ও হস্তক্ষেপমূলক নীতির পরিবর্তে সামরিক প্রত্যাহার ও রাজনৈতিক সংকোচনমূলক নীতির প্রভাব প্রতিফলিত হয়।

www.pathagar.com

স্বাভাবিকভাবেই চীন সোভিয়েত ও সোভিয়েত-ভিয়েতনাম প্রতিবন্ধী সম্পর্কে পরিবর্তিত সোভিয়েত দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। চীন সোভিয়েত সম্পর্কে দ্যতত কূটনৈতিক প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। দু'দেশের সম্পর্ক অনেকখানি স্বাভাবিক হয়ে আসে—যে-সম্পর্ক ছিল অতীত ঘনিষ্ঠতার মৈত্রী আমেজ বা নিরন্তর দ্বন্দ্বের কলুষতা থেকে অনেকখানি মুক্ত।

পুরো আশির দশক ব্যাপী চীনের অভ্যন্তরীণ নীতিতে দু'ধারা পরিলক্ষিত হয়। এর একটি ছিল উত্তরোত্তর আধুনিকায়নের প্রয়াস। এ উদ্দেশ্যে বিদেশী বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন ধরনের সংস্কার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও সামরিক খাত নিয়ে আধুনিকায়নের শ্লোগান শুরু হয় ১৯৭০-এর দশকের শেষপাদ থেকে। পরে এ শ্লোগান আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে বিদেশী বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও বিনিয়োগের পাশাপাশি আসে বিদেশী রাজনৈতিক প্রভাব, বিশেষ করে গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রসার ঘটে চীনে। সময় সময় চীন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চাপের মুখে ক্ষতবিক্ষত হয়। ১৯৮৯ সনের জুনের গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনে বেইজিং এমন কি চীনের গণমুক্তি বাহিনী ব্যবহার করে। ঐ সময়ে কিছুকালের জন্য চীন অনেকটা একঘরেও হয়ে যায়। কিন্তু চীনের কম্যুনিস্ট নেতৃত্ব কম্যুনিস্ট পার্টির নিয়ন্ত্রণ রক্ষায় অবিচল থাকে, নির্মম হাতে দমন করে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শাখা প্রশাখা ও রাজনৈতিক অবকাঠামো। কিছুকালের জন্য চীন অন্তর্মুখী নীতিও গ্রহণ করে।

কিন্তু চীনের আধুনিকায়ন নীতি ও বহিঃসংযোগ এতো ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী রূপ ধারণ করে যে একঘরে অবস্থা বা অন্তর্মুখী নীতি থেকে বেরিয়ে আসতে তেমন সময় লাগে নি। প্রতিবেশী দেশ ও অঞ্চলসমূহের প্রতি, বিশেষ করে ঐতিহ্যিক শত্রুভাবাপন্ন দেশসমূহের প্রতি চীনের নমনীয় মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভিয়েতনামের সঙ্গে মুখোমুখি রণনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে সহঅবস্থান ও সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের প্রক্রিয়া জোরদার করা হয়।

ইতিমধ্যে ভিয়েতনামেও রাজনৈতিক পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করে। নেতৃত্বে জঙ্গি ও কঠোর মনোভাবের পরিবর্তে নমনীয়তার ভাব পরিলক্ষিত হয়। কম্বোডিয়ায় এক দশকব্যাপী প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ফলে ভিয়েতনামের শক্তি অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু হয়ে, নিন্দিত হয় হ্যানয় আন্তর্জাতিকভাবে এবং বিশেষ করে প্রতিবেশী দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলোর সঙ্গে তার সম্পর্ক বিষিয়ে ওঠে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ভিয়েতনামের জঙ্গি নীতির প্রতি একমাত্র আন্তর্জাতিক সাহায্য-সমর্থন আসতো মস্কো থেকে, অথচ ক্রেমলিন নেতৃত্বের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নীতির পরিবর্তনের ফলে

www.pathagar.com

হ্যানয়ে একেবারে একঘরে হয়ে পড়ে। তাই কম্বোডিয়া থেকে সৈন্য প্রত্যাহার না করে হ্যানয়ের গত্যন্তর ছিল না। তাছাড়া, চীনের মতো একটি ওঠতি সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তির সঙ্গে প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ভিয়েতনাম স্থায়ী শত্রুতার পথ বেছে নিতে পারে না। একই সঙ্গে প্রতিবেশী দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলো যখন আঞ্চলিক সংস্থা আসিয়ানদের মাধ্যমে অর্থনৈতিক-বাণিজ্যিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির দিকে এগিয়ে চলছে তখন অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত ভিয়েতনাম সামরিক কৌশলগত হাঙ্গামায় লিপ্ত থাকা হতো আত্মঘাতী প্রক্রিয়ার শামিল। তাই হ্যানয় প্রতিবেশী চীন, দক্ষিণ-পূর্ব এশীয়ার দেশগুলোসহ পুরনো শত্রু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

মস্কো, বেইজিং এবং হ্যানয়ে এসব বহুমুখী পরিবর্তনের ধারা ত্বরান্বিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙ্গন, ওয়ারশ জোটের বিলোপ ও স্নায়ুযুদ্ধের পরিসমাপ্তির ফলে। মস্কো তার সুবিশাল কম্যুনিস্ট সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব হারায়, সামরিক ও কৌশলগতভাবে অর্থনৈতিকভাবে বুঝতে পারে যে নতুন গঠিত রুশ ফেডারেশনের অবস্থা কতখানি সঙ্গীন। এমন কি রুশ ফেডারেশনের অভ্যন্তরেও গোলযোগ ও বিদ্রোহ দেখা দেয়-- বিশেষ করে, চেচনিয়া স্বাধীনতা লাভে প্রয়াসী হয়। ফলে মস্কোর অন্তর্মুখী নীতি স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখার সংকটময় পর্যায়ে পৌছে। পশ্চিমা সাহায্য মুখাপেক্ষী হয় ক্রেমলিন কিন্তু পশ্চিমা সকল সাহায্যই শর্তাধীন– বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রক্রিয়া সুনিশ্চিতকরণ, সকল পর্যায়ে বাজার অর্থনীতি চালু করা এবং পশ্চিমা বহুজাতীয় কোম্পানিসমূহকে ব্যবসায়িক সুযোগ সুবিধা প্রদান ইত্যাদি। ফলে ক্রেমলিন নেতৃত্ব বহুমুখী চাপের সম্মুখীন হয়, পরাশক্তির দর্পচূর্ণ হয় মস্কোর।

তাই বিকল্প পন্থা হিসেবে মস্কো প্রতিবেশী চীনের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতে আগ্রহী হয়। দু'দেশই স্নায়ুযুদ্ধকালে ভিন্নতর আদর্শিক অবস্থানে হলেও নানাভাবে পশ্চিমা জোটের চাপের সম্মুখীন হয়। উভয়ে অনুভব করে পরস্পরের সঙ্গে সমঝোতা বৃদ্ধি করার। ফলে দু'পক্ষের মধ্যে যোগযোগ বৃদ্ধি পায়, অর্থনৈতিক ব্যবসায়িক, বিজ্ঞান প্রযুক্তিক লেনদেন বেড়ে চলে। উভয় দেশ সীমানা সংক্রান্ত ঐতিহাসিক বিরোধ মেটাবার উদ্দেশ্যে সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করে, শীর্ষ পর্যায়ে দু' দেশ বৈঠকে বসে বহুবার এবং পরিশেষে দু'পক্ষ ১৯৯৭ সনে এক ঘোষণায় কৌশলগত সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করে। লক্ষ্য অবশ্যই পশ্চিমা কৌশলগত চাপ প্রতিহত করা। প্রকৃতপক্ষে এটা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, বর্তমানে আদর্শিক রাজনৈতিক বৈপরিত্য সত্ত্বেও মস্কো-বেইজিং সম্পর্ক এখানকার মতো কোনোকালেই এতখানি ঘনিষ্ঠ ছিল না। পারস্পরিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ব্যবসায়িক স্বার্থে উভয় রাষ্ট্রের একে অপরকে প্রয়োজন। তার চেয়ে বড় কথা, পশ্চিমা শক্তিগুলোর যে কোনো ধরনের কৌশলগত হুমকি

www.pathagar.com

বা চাপ মোকাবিলা করার জন্যও উভয়ে রাষ্ট্রের সমঝোতা প্রয়োজন বিধায় দু'টো শক্তিই বর্তমানে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছে। তাই মস্কো বেইজিং প্রতিবন্ধী সম্পর্ক এখন ইতিহাসের বিষয়। দু'টো রাষ্ট্রই যখন কম্যুনিস্ট মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ ছিল তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এখানকার মতো কখনো এতখানি ঘনিষ্ঠতার আমেজ লাভ করে নি। স্বাভাবিক কারণে কম্যুনিস্ট ভিয়েতনামে মস্কো তার পূর্বেকার কৌশলগত আগ্রহ হারিয় ফেলে। হ্যানয়ের কোন ধরনের জঙ্গি বা সম্প্রসারণবাদী কর্মকাণ্ডের প্রতি মস্কোর সম্পর্কের লেশমাত্রও যোগসূত্র নেই। আফগানিস্তানের বিষয়ে মস্কো বেইজিং অবস্থানেও পরিবর্তন ঘটেছে রুশ ফেডারেশন কোনো প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করছে না। বরং মৌলবাদী মুসলিম আফগান সরকার কাবুলে পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করলে সেটা দু'দেশই একই রাজনৈতিক আলোকে দেখতে পারে।

স্নায়ুযুদ্ধ উত্তরকালীন ক্রান্তিলগ্নে চীনের বিবর্তনও লক্ষণীয়। গণতান্ত্রিক আন্দোলন কঠোর হস্তে দমন করার পর চীনা কম্যুনিস্ট পার্টি নেতৃত্ব সুসংহতকরণে প্রয়াসী হয়। চীনের শক্তিমান সংস্কারবাদী নেতা দাং শিয়াও পিঙ ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক পর্দার অন্তরাল থেকে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন- জিয়াং জেমিন ও লিপং যথাক্রমে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন। তাঁরা উভয়ে কম্যুনিস্ট পার্টির নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে অনমনীয় থাকেন, কিন্তু একই সঙ্গে সংস্কারমুখী পরিকল্পনার প্রতিও তাঁরা তাদের আস্থা পুনর্ব্যক্ত করেন, জোর দেন বহির্বিশ্বের প্রতি উন্মুক্ত দ্বার নীতির ওপর। এভাবে আদর্শিক-রাজনৈতিকভাবে কম্যুনিস্ট শক্তি বলে বিবেচিত হলেও অর্থনৈতিক ব্যবসায়িক দিক থেকে চীন যে কোনো পুঁজিবাদী ও বাজার অর্থনীতিতে বিশ্ববাসী দেশের চাইতেও অধিকতর উন্মুক্ত। এদিক থেকে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ও বাজার অর্থনীতিতে অনুরক্ত রুশ ফেডারেশনের সঙ্গে মস্কোর দ্বন্দ্বের কোনো কারণ নেই। বরং উভয় একই কারণে পরস্পর থেকে লাভবান হতে প্রয়াসী হয়। একে অপরের সঙ্গে জাতীয় স্বার্থের কারণেই কাছাকাছি আসতে বাধ্য বলে অনুভব করে।

এসব ক্ষেত্রে কম্যুনিস্ট দেশ চীনের সাফল্য ভিয়েতনামকে উদ্বুদ্ধ করে। বর্তমানকালে চীনের পরে ভিয়েতনাম দ্বিতীয় বৃহত্তম কম্যুনিস্ট দেশ। বিগত প্রায় এক দশকের কাছাকাছি সময় চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছিল মাথাপিছু প্রায় দশ শতাংশের মতো। চীন ভিয়েতনামের কাছে তাই এদিক থেকে ছিল অনুকরণীয়। কম্বোডিয়া থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের পর দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ ও সমঝোতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তেমন ধরনের কোনো বড় বাধা ছিল না। বরং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও ব্যবসায়িক কারণে দু'টো প্রতিবেশী দেশের একের অপরকে প্রয়োজন। তাই দু'টো কম্যুনিস্ট দেশ পরস্পর

www.pathagar.com

অতীতে প্রতিবন্ধী সম্পর্ক ভুলে গিয়ে কাছাকাছি আসতে সচেষ্ট হয়। সীমান্ত বিরোধসহ সকল বিষয় দু'পক্ষের আলাপ-আলোচনায় স্থান পায় যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। মুখোমুখি রণনৈতিক অবস্থানের পরিবর্তে দু'দেশ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। ভিয়েতনাম এ সময়ে ক্রমশ আসিয়ানেরও নৈকট্য লাভ করে। পর্যবেক্ষকের মর্যাদা থেকে উত্তরণ হয়ে ভিয়েতনাম আসিয়ানের সদস্যপদও লাভ করে।[১]

তবু চীন ভিয়েতনামের ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যগত বিরোধের রেশ ধরে তাদের মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ধারা এখনো বর্তমান। বিশেষ করে দক্ষিণ চীন সাগরে অবস্থিত প্যারাসেলস ও স্প্যারটলী দ্বীপপুঞ্জের অধিকারস্বত্ব ও কর্তৃত্ব নিয়ে উভয় দেশ দাবি ও পাল্টা দাবি করে চলছে। অবশ্য চীনের সঙ্গে ভিয়েতনাম ছাড়া অন্যান্য দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশেরও এ বিষয়ে বিরোধ রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে এও মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভিয়েতনামসহ আসিয়ান দেশগুলোর সঙ্গে বিরোধ সত্ত্বেও চীনের সঙ্গে এসব দেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে চীন আঞ্চলিক সংগঠন আসিয়ান আঞ্চলিক ফোরাম (ASEAN Regional Forum বা ARF) এবং এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থা (Asia-Pacific Economic Cooperation বা APEC) এর সক্রিয় সদস্য। ফলে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিকভাবে চীন এসব দেশের সঙ্গে সম্পর্ক যেমন জোরদার করে চলছে তেমনি স্পর্শকাতর রাজনৈতিক ও কৌশলগত বিষয়াদি নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই আসিয়ান ভুক্ত অন্যান্য দেশের মতো ভিয়েতনামের সঙ্গেও চীন প্রতিবন্ধী সম্পর্কের স্থলে উন্নততর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আগ্রহী। দু'দেশের সম্পর্কের বর্তমান ধারা সেই আগ্রহের ইঙ্গিত বাহক। মোটকথা, মস্কো, বেইজিং ও হ্যানয়ের মধ্যকার বর্তমান সম্পর্কের ধারা স্বাভাবিক বলে অভিহিত করা চলে। তাদের মধ্যে গড়ে ওঠা বিগত দু'দশকের প্রতিবন্ধী সম্পর্ক এখন ইতিহাসের বিষয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এ ধরনের রূপান্তর এক অভাবিত অধ্যায়।

তথ্যনির্দেশ

১. ইন্দোচীনে মার্কিন হস্তক্ষেপ ও পরবর্তীকালে এ এলাকা থেকে আমেরিকার প্রত্যাহার সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য দেখুন, Abul Kalam, *Peacemaking in Indochina* 1954–1975 (Dkaha) University of Dhaka 1983)। ১৯৭৫ সনে ইন্দোচীন থেকে মার্কিন প্রত্যাহার অবধি তিনটি কম্যুনিস্ট দেশের কূটনৈতিক আন্তক্রিয়া ও বিনিময় সম্পর্কে বিশদ

www.pathagar.com

ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, Abul Kalam, "The Indochinese Triangle : Diplomacy Between Hanoi, Beijing and Moscow, "*Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, xxviii, No. 1 (1983)

২. Jonathan Mirsky, "China's 1979 Invasion of Vietnam : A View from the Infantry" *RUSI : Journal of the Royal United Services Institute for Defence Studies*, Vol. 128 No. 1 2 (June 1981), পৃ. ৪৮। উল্লেখ্য বিগত কয়েক দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ওয়ারশ জোটভুক্ত কয়েকটি দেশে সামরিক ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ করে জনগণের আদর্শগত সংহতি সংরক্ষণ ও শৃংখলা পুনরুদ্ধারের নামে সেই সব দেশের জনগণের আহ্বানে সাড়া দিয়ে- অন্তত তাই দাবি করে মস্কো। কিন্তু ভিয়েতনামে ১৯৭৯ সনে ঝটিকা অভিযানকালে বেইজিং এ ধরনের কোনো দাবি করে নি।

৩. The Editorial Board of "Journal of International Studies", "Facts about Sino-Vietnamese Relations", in *China and the World* (1), "Beijing Review Foreign Affairs Series. Ed. Zhou Guo (Beijing : *Beijing Review*, 1982, পৃ. ১০৮, ১২৪.

৪. 'ঐ' পৃ. ১১৪-১১৫.

৫. V. S. Glebov, *Maoism : The Curse of China* (Moscow: Progress Publishers, 1981), পৃ. ৫.

৬. The Editorial Board of "Journal of International Studies, "Facts About Sino "Vietuamese Relations," প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২.

৭. O. Ivanov, *Soviet Chinese Relations Surveyed* (Moscow : Novosti Press Agency Publishign House, 1975) পৃ. ৪ ; Andrei Ledovsky, The USSR, *The USA and the People's Revolution in China* (Moscow: Progerss Publishers, 1979) পৃ. ২১৮

৮. Mirsky, "Chinas 1979 Invasion of Vietnam", প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

৯. Robert A. Scalapino, "Asia" in Peter Duignan and Alvin Rabushka (eds.) *The United States in 1980s* (Stanford: Hover Institution 1980). পৃ. ১৪৮-১৪৯। মেহনতি আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রত্যয়ের প্রতি সব কম্যুনিস্ট দেশই মৌখিকভাবে সমর্থন ও আনুগত্য প্রদর্শন করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এমন কি দাবি করে যে, সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতির ভিত্তি হচ্ছে মেহনতি আদর্শ প্রসূত, সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতাবাদ ভিত্তিক। কিন্তু সোভিয়েত সংবিধানের ২৮ নম্বর ধারায় প্রকৃতপক্ষে বিধান রাখা হয় যে, সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার অনুকূলে আন্তর্জাতিক পরিবেশ সৃষ্টির নিশচয়তা বিধান করা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করা। দ্রঃ Igor Usachev,

www.pathagar.com

USSR Foreign Policy Principles (Moscow Novosti Agency Publishing House, 1982), পৃ. ২২-২৯।

১০. বিশদ ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, John S. Putsy, *Communist Insurgency Warfare* (New York: The Free Press 1965) পৃ. ২৭-২৮; V. I. Lelin, "Partisan Warfare", in Franklin Mark Osanka (ed.) *Modern Guerrilla Warfare* (New York: Free Press of Glencoe. 1962), পৃ. ৬৭-৬৮.

১১. N. Kapchenko, "Marxist-Leninst Methodology of Analyzing International Relations and Foregin Policy", *International Affairs* (Moscow), July 1984), পৃ. ৯৮-৯৯

১২. Col. P. Sidorov, "Foundations of the Soviet Military Doctrine," *Soviet Military Review* (September 1972)

১৩. 'ঐ'

১৪. একইরূপ বক্তব্যের জন্য দেখুন, Raymond L. Garthoff, *The Soviet Image of Future War* (Washington: Public Affairs Press, 1959), পৃ. ২

১৫. Sidorov, "Foundations of Soviet Military Doctrine, "প্রাগুক্ত; Malcolm Macintosh, "The Soviet Strategic Policy, "*The World Today* (July 1970), পৃ. ২৭০; Thomas W. Wolfe, World wide Soviet Military Strategy (Santa Monica: The Rand Corporation, 1973), পৃ. ৬

১৬. *A Study of Soviet Foreign Policy*, Translated from the Russian by David Skvirsky (Moscow: Progress Publishers, 1975), পৃ. ১৭

১৭. ঐ পৃ. ১৫-২৫

১৮. ঐ, পৃ. ২৮-২৯

১৯. Barry Goldwater "The Perilous Conjecture: Soviet Ascendancy and American Isolationism," *Orbis*, vol. 15, No. I (Spring, 1971) পৃ. ৫৬

২০. দ্রঃ Raymond. J. Barnett, "Geography and the Soviet Strategic Thinking, "*Military Review*, vol. 40, No. 1 (January 1970) পৃ. ১৭-২০; Geoffrey Jukes, *The Development of Soviet Strategic Thinking Since* 1972 (Canberra: Australian National University Press, 1972), পৃ. ৪০

২১. Ivanov, 'প্রাগুক্ত', পৃ. ৫-৭

www.pathagar.com

২২. বিশদ বিশ্লেষণের জন্য দেখুন, "The Soviet Union and Security in Asia:, in A. A. Gromyko and B. N. Ponomarev (eds.) *Soviet Foreign Policy*, vol. 11, 1945 (Moscow: Progress Publishers, 1981) পৃ. ৫০৯-৫১১

২৩. Scalapino, "Asia"; প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৭

২৪ Shen Yi, China Belongs For Ever to the Third world", in *China and the World* (1), (Beijing: Review: 1982), পৃ. ৩৯

২৫. *Chairman Mao's Theory of the Differentiation of the Three Worlds is a major Contribution to Marxism-Leninsm* (Peking: Poreign Languages Press, 1977), পৃ. ২-৫, ২৮-২৯, ৫১, ৭৩

২৬. Deng Xiaoping "Opening Speech, September 1, 1982", in *Twelfth National Congress of the Chinese People's-Congress* (Beijing: Foreign Languages Press, 1982), পৃ. ৪

২৭. *Chairman Mao's Theory of the Differentiation of the Three World*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

২৮. দ্রঃ *Peking Review* (8 September 1973), পৃ. ১৯; W. A. C. Adie, "Peking's Revised Line", *Problems of Communism*, 21 (September 1972), পৃ. ৫৪-৬৮, Hu Yaobang, "Create a New Situation in all field of Socialist Modernization", in *Two National Congress*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৪-৬৪ মাও'র মৃত্যু অবধি আদর্শগত চীন তার বিপ্লবী ভাব মেজাজ সোভিয়েত 'সংশোধনবাদী' চিন্তাধারা দ্বারা দূষিত করতে চায় নি, তেমনি চীন চায় নি চেকোশ্লোভাকিয়ার ভাগ্যের শিকার হতে যে দেশে সোভিয়েত সামরিক শক্তির প্রয়োগ করা হয় তথাকথিত ব্রেজনেভ নীতির (Brezhnev Doctrine) অধীন। উল্লেখ্য, এই নীতির মাধ্যমে মস্কো এক স্বঘোষিত ধারায় তার আপন দাবি মোতাবেক 'আন্তর্জাতিক দায়িত্ব' পালনের আবরণে যে-কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকার গ্রহণ করে। একই সঙ্গে, চীনা পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের কাছাকাছি সীমান্তের ওপারে ব্যাপক হারে সোভিয়েত সমরসজ্জা জোরদার এবং দু'দেশের মধ্যে বিবদমান ভূ-সীমানা নিয়ে সোভিয়েত ও চীনা বাহিনীর সঙ্গে রক্তাক্ত সংঘর্ষে চীন বিপর্যস্ত বোধ করে। এ সময় থেকে চীন সোভিয়েত ইউনিয়নকে "সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী" শক্তিরূপে চিহ্নিত করে, আমেরিকার সঙ্গে জরুরি ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়ে তোলার গুরুত্ব অনুভব করে। কেননা চীনের ওপর সোভিয়েত চাপ প্রতিহত করতে হলে বাইরের বিশ্ব থেকে একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ই নিবারক বা প্রতিরোধক ক্ষমতা রাখে

দ্রঃ Donald S. Zagoria, "The Moscow-Beijing Detente", *Foreign Affairs* (Spring 1983), পৃ. ৮৫৪।

www.pathagar.com

২৯. Vo Nguyen Giap, *National Liberation War in Vietnam: General Line Strategy and Tactics* (Hanoi: Foreign Languages Publishig House, 1971), পৃ. ২৪

৩০. Hoang Tung, "Strategy of Building Socialism and Defending its Gains", *Problems of Peace and Socialism*. No. 9 (September 1983). পৃ. ২২-২৩ ।

৩১. ঐ পৃ. ২৩; Carlyle A. Thayer, "Vietnam's New Pragmatism", *Current History*, vol. 82, No. 483 (April 1983), পৃ. ১৮৩ ।

৩২. Gareth Porter "Hanoi Strategic Perspective and the Sino-Vietnamese Conflict", *Pacific Affairs*, vol. 57 No. 1 (Spring 1984), পৃ. ৭

৩৩. Hoang Tung, "Strategy of Building Socialism, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩, Thayer, "Vietnam's New Pragmatism, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩

৩৪. Hoang Tung, "Strategy of Building Socialism", প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩, ২৭, Thayer, "Vietnam's New Pragmatism", প্রাগুক্ত, ১৮৩

৩৫.The Editorial Board of "Journal of International Studies", *Facts About Sino-Vetnamese Relations, China and the World* (I) প্রাগুক্ত, ১২২, Thayer, "Vietnam's New Pragmatism", প্রাগুক্ত, ১৮৩

৩৬. Sheldon Simon, "Peking and Indochina: the Perplexity of Victory", *Asian Survey* (May 1976), পৃ. ৪০৩

৩৭. মস্কোর আন্তর্জাতিক আচরণ সম্পর্কে "আধিপত্যবাদ-বিরোধী" ধারা মূলত সংযোজিত হয় ১৯৭২ সনের চীন-মার্কিন সাংহাই ইশতেহারে। এতে উল্লেখ করা হয় যে, তারা কেউ এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হবে না। এতে আরো উল্লেখ করা হয় যে, চীন ও আমেরিকা উভয়ে তৃতীয় কোনো শক্তি [সম্ভবত সোভিয়েত ইউনিয়ন] কর্তৃক এ অঞ্চলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা প্রতিহত করবে। এই অঞ্চলের দেশগুলো সম্পর্কে চীন পরোক্ষভাবে প্রস্তাব রাখে যে তারা অন্য কোনো শক্তিকে [মানে সোভিয়েত ইউনিয়নকে] সুবিধে প্রদান করা থেকে বিরত থাকা সমীচীন হবে, যে ‥বর ব্যবহার করে বহিঃশক্তি ও অঞ্চলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে

৩৮. Simon "Peking and Indochina," প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৩; Gareth Porter, "The Sino-Vietnamese Conflict in Southeast Asia", *Current History*, vol. 75, No. 442 (December 1978), পৃ. ১৯৪ ।

৩৯. Gareth Porter, "The Great Power Triangle in Southeast Aisa", *Current History*, vol. 79, No. 441 (December, 1980), পৃ. ১৫৩

www.pathagar.com

৪০. ঐ, পৃ. ১৫৩

৪১. Porter, "The Sino-Vieetnamese Conflict", প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬-২৩০

৪২. ভিয়েতনামী বক্তব্যের বিশদ সম্পর্কে দ্রঃ *Dossier Kampuchea* (Hanoi: le Cournier du Vietnam, 1978) ; Poter "The Sino-Vietnamese Conflict", প্রগুক্ত

৪৩. *Beijing Review* (22 August 1975), পৃ. ৬-১২; Alexander Woodside, "Nationalism and Poverty in the Breakdown of Sino Soviet Relations", *Pacific Affairs*, 52:2 (Fall 1979), পৃ. ৩৮৫-৮৭

৪৪. Robert C. Horn, "Soviet Vietnamese Relations and the Future of Southeast Asia", *Pacific Affairs*, 51:4 (Winter 1978), পৃ. ৫৯৯; *Dossier Kampuchea*, পৃ. ১২৮; Porter, The Sino-Vietnamese Conflict," প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫

৪৫ দ্বিতীয় ইন্দোচীন যুদ্ধোত্তর কালে খেমাররুজ সরকারের বদ্ধমূল ধারণাজনিত দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, Francsois Porchaud, *Cambodge: Anee Zero* (Paris: Juillard, 1977)। ভিয়েতনীম ষড়যন্ত্রের বিষয়ের জন্য দেখুন, Anthony Paul, "Plot Details Filter Through", *Far Eastern Economic Review* (19 May 1978)

৪৬. Nayan Chandra, "Peking Escaltes the War of Nerves", *Far Eastern Economic Review* (17 March 1978) পৃ. ১০; Porter, "The Sino-Vietnamese conflict", প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫-২২৬

৪৭. Gareth Porter, "Vietnam's Ethnic Chinese and the Sinovietnamese Conflict", *Bulletin of Concerned Asian Scholars*, 12:4 (October-December 1980), আরো দেখুন তাঁর The Great Power Triangle", প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২; Nayan Chandra, "Southeast Asia Comes into Focus", *Far Eastern Economic Review* (7 July 1978) পৃ. ৮

৪৮. The Editorial Board of "Journal of International Studies", Facts about Sino-Vietnamese Relations", প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬ ; Nayan Chandra, "Exit the Wolf," *Far Eastern Economic Review* (19 May 1978)

৪৯. Porter, "Vietnam's Ethnic Chinese", প্রাগুক্ত, একই লেখকের "The Sino-Vietnamese Conflict", প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬

৫০. The Editorial Board of "Journal of International Studies", Facts about Sino-Vietnamese Conflict", প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

৫১. ঐ, পৃ. ১০১-১০২

৫২. ঐ, পৃ. ১১৪-১১৫, ১২৬-১২৭

www.pathagar.com

৫৩. Porter, "The Great Power Triangle",প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১

৫৪. ঐ, পৃ. ১৬২

৫৫. দ্রঃ Robert Sutter, "Chinese Strategy Toward Vietnam", in David W.P. Elliott (ed.) *The Third Indochina War* (Boulder, Colo,: Westview Press, 1980): Mirsky, "China's 1979 Invasion of Vietnam", প্রাগুক্ত পৃ. ৪৯

৫৬. Porter, "The Great Power Traingle", প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২

৫৭. Mirsky, "China's 1979 Invasion of Vietnam", প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯; চীনা বক্তব্যের জন্য দেখুন The Editorial Board of "Journal of International Studies", Facts about Sino-Vietnamese Conflict", প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

৫৮. Porter, "The Great Power Triangle", প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২ Mirsky, "Chinas 1979 Invasion of Vietnam", পৃ. ৪৯

৫৯. সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে কোনো কোনো লেখক ও বিশ্লেষক ভিয়েতনামে চীনা ঝটিকা অভিযানের সাফল্য সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। দ্রঃ Daniel Tretiak, "China's Vietnam War and Its Consequences", *China Quarterly* (December 1979), পৃ. ৭৫২-৭৬৯; Harold C. Hinton, "Sino-Soviet Relations: Background and Overview", in Douglas T. Stuart and William T. Tow (eds.) *China, The Soviet Union and the West: Strategic and Political Dimensions in the 1980s* (Boulder, Col: Westview Press, 1982), পৃ. ১৮

৬০. The Editorial Board of "Journal of International Studies", Facts about Sino-Vietnamese Conflict", প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

৬১. প্রায় সমরূপ বক্তব্যের জন্য দেখুন, Vladimir Petrov, "New Dimensions of Soviet Foreign Policy", in Franklin E. Margiotta (eds.) *Evolving Strategic Relations: Implications for U.S. Policy makers* (Washington, D. C.: National Defense University Press 1980), পৃ. ১২-২২

৬২. Horn, "Soviet-Vietnamese Relations", প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৯

৬৩. Porter, "The Great Power Triangle", প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩-১৬৪ ; Banning Garrett, "The China Card: To Play or not To Play", *Contemptorary China*, 3:1 (Spring 1979), পৃ. ৭-৮

৬৪. Gareth Porter, "Vietnamese Policy and the Indochina Crisis", in Dovid N. P. Dlliott (ed.) The *Third Indochina War* (Boulder, Col. Wesview Press 1980)

www.pathagar.com

৬৫. চীন-জাপানী চুক্তির শর্তাবলী ও এর তাৎপর্যের বিশদ ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, Avigdor Hasel Karn, "Impact of Sion-Japanese Treaty on the Soviet Security Strategy", *Asian Survey* (June 1979).

৬৬. Porter, "The Great Power Triangle", প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪; Steven L. Levine, "US-China Relations as viewed by the Major InternationalActors int he East Asian Region: A symposium", in John Bryan Staar (d.) *The Future of US-China Relations* (New York and London: New University Press, 1981) পৃ. ৭৯

৬৭. Levine, "US-China Relations", প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

৬৮. Donald S Zagoria, "The Moscow Beijing Detente", *Foreign Affairs* (Spring 1913), পৃ. ৮৫৫-৫৬; Porter, "The Great Power Triangl", প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২-৬৩

৬৯. Glebov, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬-৮৭, ৯৩।

৭০. Zagoria, "The Moscow-Beijing Detente", প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬২-৮৬৪।

৭১. ঐ, পৃ. ৮৬৫-৬৬; The Editorial Board of "Journal of International Studies", "Facts About sino-Vietnamese Relations", প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩৮১০৬-১১১

৭২. Porter, "The Great Power Triangle", প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪।

৭৩. Levine, "US-China Relations", প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।

৭৪. ঐ, পৃ. ৮৬

৭৫. Porter, "The Great Power Triangle", প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪।

৭৬. "Relations between the USSR and the Countries of South and Southeast Asia", in *Soviet Foreign Policy*, 11, পৃ. ৬২৫।

৭৭. লাওসে ভিয়েতনামের অন্ততঃপক্ষে ৫০,০০০ সৈন্য মোতায়েন রয়েছে, আর সেই দেশে ভিয়েতনাম 'উপদেষ্টামূলক' ভূমিকায় অবতীর্ণ যাতে লাওস হ্যানয়ের সহযোগী হিসেবে সর্বদা অনুগত থাকে।

৭৮. হ্যানয়ের ঐতিহ্যগত ইন্দোচীন নীতির বিশদ ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, আবুল কালাম, "ইন্দোচীনে আগ্রাসন ও হ্যানয়ের রাজনীতি", লেখকের গ্রন্থ "দর্শন ও তত্ত্বঃ রাজনীতি", (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫).

৭৯. একইরূপ বক্তব্যের জন্য দ্রঃ Zagoria,The Moscow-Beijing "Detente", প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬৬-৬৭।

৮০. বর্তমনে ভিয়েতনামকে দেয়া সোভিয়েত সাহায্য দৈনিক প্রায় ষাট লক্ষ মার্কিন ডলারের মত অনুমান করা হয়, কিন্তু এই বিপুল সাহায্যের বেশিরভাগ ভিয়েতনামের সামরিক খাতের ব্যয়

www.pathagar.com

নির্বাহে চলে যায়। দ্রঃ Tor That Thier, "Vietnam's New Economic Policy", প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৫, কিছুকাল পূর্বের অনুমান তুলে ধরেন Richard H. Solomon, "East Asia and the Great Power Coalition" in *America and the World: Foreign Affairs*, Vol. 60 (July 1982), ৭১৪।

৮১. James A. Kelley, *Soviet Role in Asia*, Statement by U.S. Deputy secretary of Defense James A. Kelley before the U. S. House of Representative's Foreign Affairs Subcommittee on Asia and Pacific Affairs and the Subcommittee on Europe and the Middle East (October 19, 1983), পৃ. ৯-১৩।

৮২. এ অঞ্চলে সোভিয়েত কৌশলগত বাহিনীর আধুনিকায়ন ও উন্নততর যাত্রায়নের বিশদ বিশ্লেষণের জন্য দেখুন, ঐ, পৃ.৩-৪, ১৫-১৬

৮৩. ঐ, পৃ. ৩,১১. ১৬

৮৪. হ্যানয় স্বীকার করে যে ১৯৭৯ সনের চীন-ভিয়েতনামী সামরিক লড়াইয়ের সময় ভিয়েতনামকে অন্ততপক্ষে এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিমাণ সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। দ্রঃ La Republique Socialiste de Vietnam (Hanoi: Editions an Langues Etrangeres, 1981), পৃ. ৯১-৯২

৮৫. Le Monde (7 January 1983), cit. in Tor that thier, "Vietnam's New Economic Policy", প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৬

৮৬. Viet Report, পৃ. ১৫০, cit, in ঐ, ৭০৭

৮৭. ঐ, পৃ. ৬৯৬

৮৮. এটা সত্যি যে ১৯৮৪ সন শেষ হবার পূর্বে মস্কো ও বেইজিং তাদের পারস্পরিক বাণিজ্যিক সম্পর্কের উন্নতি বিধানকল্পে অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিক এবং বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে তিনটি সহযোগিতামূলক চুক্তি সম্পাদন করে। এ সব চুক্তিতে স্বাক্ষরদানের ফলে চীন ও সোভিয়েত তুষারাবৃত সম্পর্ক কিছুটা বিগলিত হয় বটে, কিন্তু তা' সত্ত্বেও চীনের বর্তমান নেতা ডাং শিয়াং পিং স্বয়ং উল্লেখ করেন, চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে মৌলিক বিষয়সমূহে রাজনৈতিক পার্থক্য বিদ্যমান। প্রকৃতপক্ষে, যে সব বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে সন্দেহ, অবিশ্বাস ও বিরোধের সূত্রপাত হয় সে বিষয়গুলো এখনো সবই অমীমাংসিত। দু'দেশের মধ্যে সাম্প্রতিক স্বাক্ষরিত চুক্তির বিষয় দেখুন," Chinese and Russians break nore ice with three new Pacts", *The Times* (29 December, 1984), পৃ. ৫

৮৯.বিশদ ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য, আবুল কালাম, 'কম্যুনিস্ট পররাষ্ট্র নীতি : মস্কো/বেইজিং/হ্যানয়' (ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়, ১৩৯৪)

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

প্রলম্বিত যুদ্ধ ও পার্শ্বভাগ তত্ত্ব ঃ ভিয়েতনাম যুদ্ধে হ্যানয়ের প্রতিরক্ষা রণকৌশল ও সমকালীন ধারাবাহিকতা *

ভূমিকা

১৯৫৫–১৯৭৫ সালব্যাপী সংঘটিত ভিয়েতনাম যুদ্ধ ছিল মার্কিন হস্তক্ষেপবিরোধী একটি প্রলম্বিত যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে কম্যুনিস্ট বিপ্লবীদের সাফল্য এক অভূতপূর্ব বিষয় বটে। কেননা, এ যুদ্ধে ভিয়েতনামের বিপ্লবী সরকার, হ্যানয় সরকার, এরূপ এক সক্রিয় ও দুর্বার সংগ্রাম গড়ে তোলে যে সংগ্রামের প্রচণ্ডতায় বিশ্ব চমকিত হয়, হতবাক হয়ে দেখে কি করে সাম্প্রতিককালের স্বাধীনতা অভিলাষী একটি ক্ষুদ্র দেশের বিপ্লবী জনগণ বিশ্বের সেরা পরাশক্তি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ও কৌশলগত পরিকল্পনার বেড়াজাল ছিন্ন করে তাদের বিভক্ত দেশকে পুনরেকত্রিত করে, মুক্ত করে ভিয়েতনামকে সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া ঔপনিবেশবাদের গ্রাস থেকে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দক্ষিণ ভিয়েতনামে বিপ্লবীদের এই সাফল্য সম্ভব হয় হ্যানয় সরকার কর্তৃক পরিচালিত অবিচল সংগ্রামের ফলে— যে সংগ্রাম ছিলো সুচিন্তিত বিপ্লবী দর্শন বা রূপরেখা ভিত্তিক ; হ্যানয়ের প্রণীত এই রূপরেখাই বিপ্লবীদের চূড়ান্ত বিজয়ের লক্ষ্যে সতত অনুপ্রাণিত ও উদ্দীপ্ত করে। যে তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে হ্যানয় এই মার্কিন হস্তক্ষেপ বিরোধী অপ্রতিসম যুদ্ধে বিজড়িত হয়।[১] আর শিকার হয় প্রতিপক্ষের আগ্রাসন প্রক্রিয়ার নিঃসন্দেহে তা' ছিলো চিত্তাকর্ষক এবং সেই উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে উত্তর ভিয়েতনামে বিপ্লবী নেতৃবর্গ যে সকল প্রতিরক্ষা রণকৌশল উদ্ভাবন ও ব্যবহার করেন যথার্থই ওসব ছিলো প্রেরণা-উদ্দীপক। এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হচ্ছে মার্কিন আগ্রাসন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে হ্যানয়ের গৃহীত প্রতিরক্ষা রণকৌশলাদি তুলে ধরা ; প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে ভিয়েতনামী নেতৃবর্গের উপস্থাপিত প্রলম্বিত যুদ্ধ এবং পার্শ্বভাগ তত্ত্বও প্রবন্ধে আলোচিত হবে। কেননা এ দু'টো

---

* প্রবন্ধটি 'সমাজ নিরীক্ষণ' পত্রিকার আগস্ট, ১৯৮৪-এর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

তত্ত্ব ছিলো একই রূপরেখার বেষ্টনীতে সংযুক্ত, ঐক্যবদ্ধ ও সমাজতান্ত্রিক ভিয়েতনাম প্রতিষ্ঠাকল্পে হ্যানয় সরকার প্রণয়ন করে এ সংগ্রামী রূপপেখা। এর প্রথমটি ছিলো দক্ষিণ ভিয়েতনাম নয়া সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া-ঔপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রাম অব্যাহত রাখা ও তীব্রতর করার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, আর দ্বিতীয়টি ছিলো এ সংগ্রাম পরিচালনার পেছনে উত্তর ভিয়েতনামসহ সহানুভূতি সম্পন্ন বিশ্বের সক্রিয় সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও বিপ্লবী কৌশলগত ফ্রেম

ভিয়েতনামী বিপ্লবীদের সংগ্রামের কৌশলগত ফ্রেম বা রূপরেখা ছিলো কম্যুনিস্ট আদর্শভিত্তিক। এ সংগ্রামী রূপরেখার বিশদ দিক ভিয়েতনামী বিপ্লবীদের সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা ও মূল্যায়নের ফসল। যুদ্ধকে তারা চিহ্নিত করে 'রাজনৈতিক ধারাবাহিকতার' অঙ্গ হিসেবে।[২] তাদের সামরিক কর্মপন্থা গৃহীত হয় ভিয়েতনাম কম্যুনিস্ট পার্টি বা ভিয়েতনাম শ্রমিক দলের নির্দেশে। উল্লেখ্য, এ পার্টির নেতৃত্বে ভিয়েতনামের জনগণ ফরাসি সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রামে সাফল্য লাভ করে, যদিও তখন তারা তাদের দেশকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও ঐক্যবদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়। কেননা, ১৯৫৪ সনের জেনিভা শান্তিচুক্তি সম্পাদনের পরপরই আমেরিকা একটি দুর্দান্ত প্রতাপশালী পরাশক্তি হয়েও দুর্বল ঔপনিবেশিক শক্তি ফ্রান্সের সদ্য খালি করা জুতোয় পা রেখে নয়া ঔপনিবেশিক ও নয়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় ভিয়েতনামে। অথচ শান্তিচুক্তির বিধান মতে কথা ছিলো, সতেরো সমান্তরাল রেখার সোজাসুজি 'সামরিকভাবে' ভিয়েতনামকে ভাগ করে উত্তরাঞ্চলে হ্যানয়স্থ বিপ্লবী সরকার প্রশাসন চালিয়ে যাবে, আর দক্ষিণাঞ্চলে প্রশাসন চালাবে সাইগনস্থ ফরাসিদের সৃষ্ট ডানপন্থী সরকার। কথা ছিলো যে, বছর দু'য়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, পুনরেকত্রিত হবে ভিয়েতনাম।

কিন্তু ফরাসিদের প্রত্যাহারের পূর্বেই সাইগনস্থ ফরাসিদের লেজুড় সরকার লিপ্ত হয় আমেরিকার লেজুড়বৃত্তিতে আর এই সরকার মার্কিন ইন্ধন ও প্ররোচনার শিকার হয়ে 'স্বাধীনতার' মুখোশ পরে, বানচাল করে নির্বাচনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভিয়েতনামকে পুনরেকত্রীকরণের জেনিভায় গৃহীত পরিকিল্পনা। অথচ সাইগন সরকার শুধু মার্কিন সমর্থনপুষ্ট ছিলো না, এর আর্থিক সচ্ছলতা ও খোরপোষ, বিশ্ব-রাজনীতিতে এ সরকারের স্বীকৃতি ও এর প্রশাসনিক ধারাবাহিকতা, এর সামরিক সাজ-সরঞ্জাম, এমন কি এর রণনৈতিক চিন্তাধারা ও কৌশলগত পরিকল্পনার উৎস ছিলো মার্কিন সরকার। এতে হ্যানয় হয় অনেকখানি বিপর্যস্ত, ব্যর্থ হয় বিপ্লবীদের সমাজতান্ত্রিক

www.pathagar.com

ভিয়েতনাম গড়ার পরিকল্পনা, বানচাল হয় ভিয়েতনামীদের ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠার অভিলাষ।[৩]

স্বাভাবিকভাবেই হ্যানয়সহ বিপ্লবী সরকারের কাছে এ ছিলো এক মৌলিক পরিবর্তিত রণনৈতিক প্রেক্ষাপট, কেননা আমেরিকার মতো একটি প্রতিপত্তিশালী পরাশক্তির সামরিক ও কৌশলগত আয়োজন এবং সরবরাহের সম্মুখে যথার্থ সমুত্তর দেয়ার মতো বিপ্লবীদের তেমন কিছু আর্থিক বা সামরিক পুঁজি ছিলো না, তাদের পুঁজি ছিলো ভিয়েতনামী জনগণের দেশপ্রেমজনিত আনুগত্য ও বিপ্লবী স্পৃহা। এসব মূলধন করেই বিপ্লবীরা মার্কিন হস্তক্ষেপ ও আগ্রাসনের মুখোমুখি হয়, সচেষ্ট হয় হানাদার নয়া ঔপনিবেশিক শত্রুকে বিতাড়িত করে ভিয়েতনামকে পুনরেকত্রিত করতে, সক্রিয় হয় সাম্যবাদভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা স্থাপনে।

ভিয়েতনাম সমস্যার উদ্ভূত এই সংগ্রামী পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে হ্যানয়ের বিপ্লবী নেতৃত্ব সংগ্রামের একটি তাত্ত্বিক ফ্রেম বা রূপরেখা প্রণয়নে নিজেদের নিয়োজিত করেন। হ্যানয়ের গৃহীত সামরিক কর্মপন্থার তাত্ত্বিক রূপরেখা ছিলো 'মার্কসবাদী বৈপ্লবিক আক্রমণমূলক সম্প্রদায়ের সৃজনশীল প্রয়োগ।' এর মর্মকথা হচ্ছে জনযুদ্ধ (People's War)ঃ এ যুদ্ধের মাধ্যমে "সমগ্র জাতি মেহনতি শ্রেণীর নেতৃত্বে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।" এতে আপামর জনসাধারণের সার্বিক শক্তি একাত্ম হয় সশস্ত্র গণবাহিনীর শক্তির সঙ্গে, সশস্ত্র সংগ্রাম অভিন্ন হয় রাজনৈতিক কর্মসূচি থেকে এবং এর মাধ্যমে "শক্তিধর সাম্রাজ্যবাদী বাহিনীর বিরুদ্ধে" তারা গড়ে তোলে এক অপ্রতিরোধ্য বিপ্লবী শক্তি।[৪]

জনযুদ্ধের রণনীতিকে বলা হয় প্রলম্বিত যুদ্ধ (Protracted War)। প্রতিথযশা ভিয়েতনামী রণবিশারদ উত্তর ভিয়েতনামের তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল ভো নগুয়েন জিয়াপ এ রণনীতিকে চিহ্নিত করেছেন একটি "অব্যাহত আক্রমণমুখী প্রক্রিয়া হিসেবে, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে শত্রুকে সর্বতোভাবে ঘায়েল করা; এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শত্রুকে ভাগ ভাগ করে নির্মূল করতে হয়, পিছু হঠাতে হয় এক এক পদক্ষেপে, নিশ্চিহ্ন করতে হয় টুকরো টুকরো করে, আর ধূলিসাৎ করতে হয় পর পর শত্রুর সব কৌশলগত ফন্দি ফিকির....।"[৫] বস্তুত, প্রলম্বিত যুদ্ধ পরিচালিত হয় সতত লড়াইয়ের ধারায়–এতে রণকৌশল পরিবর্তিত হয় বটে, কিন্তু অপরিবর্তিত থাকে রণনীতি। এ যুদ্ধের মাধ্যমে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হয়। শত্রুকে ফাঁদে ফেলে তার দুর্বলতার সুযোগ নিতে হয় এবং বহু নিপুণ ও কার্যকর সংগ্রামী কৌশল উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিপ্লবীদের কৌশলগত উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে

www.pathagar.com

হয়।[৬] ভিয়েতনাম যুদ্ধে বিপ্লবীরা সর্বতোভাবে সচেতন ছিলো যে তাদের মূল শত্রু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে বিশ্বের সবচাইতে শক্তিধর রাষ্ট্র, আর এই অপ্রতিসম শত্রুর আগ্রাসী পরিকল্পনা ও প্রক্রিয়াকে নস্যাৎ করার একমাত্র সম্ভাব্য অবলম্বন হচ্ছে প্রলম্বিত যুদ্ধ। কেননা, এরই মাধ্যমে আসে উপর্যুপরি সাফল্য, আর চূড়ান্ত যুদ্ধে বিপ্লবীরা হতে পারে জয়যুক্ত।[৭] ভিয়েতনামীদের জনযুদ্ধ তাই প্রলম্বিত যুদ্ধের প্রক্রিয়ায় চিহ্নিত ছিলো। জিয়াপের বিশ্লেষণে এ যুদ্ধের প্রক্রিয়ায় আরো বিশদ পরিচয় মেলে। তিনি লিখেছেন, "বিজয়ের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির পরিবেশ তৈরির জন্য" ভিয়েতনামের জনযুদ্ধ হতে হবে কঠোর এবং দীর্ঘস্থায়ী ....। হাজারো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিজয়ের সমষ্টি নিয়ে উদ্ভাবিত হবে বিরাট সাফল্যের পথ। ক্রমশ শক্তির ভারসাম্যের হেরফের ঘটিয়ে, আমাদের দুর্বলতাকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে চূড়ান্ত বিজয় ছিনিয়ে নিতে হবে।"[৮]

উল্লেখ্য, হ্যানয়ের নেতৃবৃন্দ ছিলেন দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিপ্লবী যুদ্ধের প্রণেতা; তাঁদের আদেশ ও নির্দেশ, সাহায্য ও সমর্থন, একাত্মতা ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের ফলেই দক্ষিণাঞ্চলে প্রলম্বিত যুদ্ধের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়। উত্তরাঞ্চল থেকে দক্ষিণাঞ্চলীয় বিপ্লবীদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পার্টিকর্মী, তাত্ত্বিক নৈপুণ্য ও দক্ষতা শুধু প্রয়োজন হয় নি, প্রলম্বিত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার মতো প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র ও রসদসামগ্রী সংগ্রহের জন্যও দক্ষিণাঞ্চলীয় বিপ্লবীরা হ্যানয়ের ওপর নির্ভরশীল ছিলো। প্রলম্বিত যুদ্ধের এ বাস্তব প্রয়োজন হ্যানয়ের নেতৃত্ব পূর্বেই অনুধাবন করেন এবং প্রলম্বিত যুদ্ধের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে দক্ষিণ ভিয়েতনামে নয়া-ঔপনিবেশবাদ বিরোধী এ যুদ্ধে সাহায্য ও সমর্থন যোগাবার মানসে তাঁরা উপস্থাপিত করেন 'পার্শ্বদেশ' তত্ত্ব নামে আরেকটি কৌশলগত তত্ত্ব। এই কৌশলগত তত্ত্বে উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের সংগ্রামকে দেখা হয় পারস্পরিক সহযোগিতার প্রতিপূরক হিসেবে ; এতে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে পরিচালিত উত্তর ভিয়েতনামকে দেখা হয় বিপ্লবের পার্শ্বভাগ ('near') হিসেবে যেখানে থেকে বিপ্লবের সম্মুখভাগ বা রণপ্রান্তর ('front') দক্ষিণ ভিয়েতনামে বাস্তব সংগ্রামের প্রয়োজনে উৎপাদিত সরঞ্জামাদি ও রসদ সরবরাহ করা হয়। অপ্রতিসম যুদ্ধজনিত বিপ্লবীদের সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে এ জাতীয় সম্প্রত্যয়গত বৈসাদৃশ্য শুধুমাত্র ভাষাগত ছিলো না; বরঞ্চ এ ব্যবধানের মূলে ছিলো ভিয়েতনামী বিপ্লবী যুদ্ধকে সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করার বাস্তব রণনীতি এবং রণকৌশল কি হবে হ্যানয়ের চিন্তাধারায় তা' প্রতিফলিত হয়। উত্তর ভিয়েতনামকে পার্শ্বভাগ হিসেবে চিহ্নিত করা ছিলো ভিয়েতনাম যে একই দেশ সেই মৌলিক দাবির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভিয়েতনামী বিপ্লবীদের কৌশলগত তত্ত্বে শুধুমাত্র

www.pathagar.com

সংগ্রামের পার্শ্বভাগ সম্মুখভাগের সমর্থনে এগিয়ে আসবে তা নয়, দুটোই তাদের পারস্পরিক উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য ও সমর্থন লাভ করে "সুবিশাল পার্শ্বভাগ" ('immense near') থেকে, অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উদ্দীপ্ত সাম্যবাদী শিবির থেকে।[৯]

হ্যানয়ের প্রলম্বিত যুদ্ধ

বস্তুত, বিপ্লবের পার্শ্বভাগ হিসেবে উত্তর ভিয়েতনাম দক্ষিণাঞ্চলের বিপ্লবীদের নয়া-উপনিবেশবাদ ও নয়া-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের ভিত্তিভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং হ্যানয় সরকারই 'সুবিশাল পার্শ্বভাগ' থেকে সাহায্য ও সমর্থন লাভে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।[১০] বলাবাহুল্য ভিয়েতনামের বিপ্লবী যুদ্ধের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বেষ্টিত ছিলো প্রলম্বিত সংগ্রামের অভিন্ন ফ্রেম বা রূপরেখায়। হ্যানয় ছিলো এ রূপরেখার প্রণেতা, নিঃসন্দেহে হ্যানয় সরকারই ছিলো মার্কিন বিরোধী প্রলম্বিত যুদ্ধের প্রকৃত হোতা।

অবশ্যি ভিয়েতনামের পুনরেকত্রীকরণের জন্য প্রলম্বিত যুদ্ধের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে গিয়ে হ্যানয়ের নেতৃবর্গ মূলত উত্তর ভিয়েতনামের দিকে এ যুদ্ধ সম্প্রসারিত হতে পারে এরূপ সম্ভাবনার বিষয় পূর্ব থেকে ভাবেন নি। উল্লেখ্য, দক্ষিণ ভিয়েতনামে প্রলম্বিত যুদ্ধ রচনা ও পরিচালনার ব্যাপারে হ্যানয় তাঁর নিজস্ব ভূমিকা গোপন রাখে। এ ছিলো অনেকটা উদ্দেশ্যমূলক, কেননা হ্যানয় যুক্তরাষ্ট্রকে উত্তরাঞ্চলের দিকে যুদ্ধ সম্প্রসারণের কোনো প্রত্যক্ষ অজুহাত দিতে চায় নি। কিন্তু ষাট দশকের মাঝামাঝি উত্তর ভিয়েতনামের ওপরও যখন মার্কিন জঙ্গি বিমানসমূহ বোমা বর্ষণ শুরু করে হ্যানয় নেতৃত্বের মধ্যে তখন এ স্থির প্রত্যয় জন্মে যে, আমেরিকা তার "আগ্রাসী যুদ্ধ সম্প্রসারণ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে।"[১১] ১৯৬৬ সনের মাঝামাঝি হ্যানয়ের এই আশঙ্কা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে। কেননা ঐ সময় ভিয়েতনামে মার্কিন বিমান অভিযান প্রচণ্ডতর রূপ ধারণ করে এবং মার্কিন সরকার হ্যানয় ও হাইপং এর কাছাকাছি এলাকা পর্যন্ত ক্রমশ সারা উত্তর ভিয়েতনামের ওপর কৌশলগত বোমা বর্ষণ অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দান করে।

উত্তর ভিয়েতনামের ওপর তীব্র মার্কিন বিমান যুদ্ধ পরিচালনার প্রেক্ষিতে হ্যানয়ের প্রতিক্রিয়া ছিলো প্রায় অতি সহজ প্রবৃত্তিজাত। এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ হ্যানয়ের নেতৃবৃন্দ গ্রহণ করেন প্রথম দফা মার্কিন বোমা বর্ষণের পরপরই। এসব সিদ্ধান্তের মধ্যে ছিলো ভিয়েতনামে বিপ্লবী যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে হবে, আরো মারমুখী করতে হবে প্রলম্বিত সংগ্রাম। উত্তরাঞ্চলে বিমান হামলা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আরো জোরদার করতে হবে

www.pathagar.com

এবং সারা দেশের সার্বিক কৌশলগত ব্যবস্থাপনা এভাবে সংগঠিত করতে হবে যাতে মার্কিন বোমা বর্ষণজনিত ক্ষয়ক্ষতি ন্যূনতম পর্যায়ে সীমিত রাখা যায়। দেশের জনগণকে সার্বিক দেশের পুরো সর্বনাশা পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রস্তুত হবার নির্দেশ দেয়া হয়। সারা ১৯৬৫-১৯৬৬ সনব্যাপী বোমা বর্ষণ সীমিত করার জোর মার্কিন প্রচারণা হ্যানয় নেতৃবৃন্দের কাছে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। এর কারণ ছিলো সহজঃ হ্যানয় ভিয়েতনামকে পুনরেকত্রীকরণের তার অভিলাষ সাধনে প্রলম্বিতযুদ্ধ তীব্রতর করার পূর্ণ বাসনা পোষণ করে এবং তাই তারা নিশ্চিতরূপে অনুধাবন করতে পারে যে তাদের এই সামগ্রিক বাসনা ও প্রচেষ্টা প্রতিপক্ষকে উত্তর ভিয়েতনামের সম্ভাব্য প্রতিটি লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস হওয়া অবধি তার বোমা বর্ষণ জোরদার করতে প্ররোচিত করবে।[১২] এসব সংগ্রামী চেতনাপ্রসূত যৌক্তিকতা ও চিন্তাধারার আলেখ্যে হ্যানয় উত্তর ভিয়েতনামে একটি প্রতিরক্ষা পদ্ধতি উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন করে; সুষ্ঠু বিশ্লেষণের প্রয়োজনে এ পদ্ধতিকে 'সক্রিয়' ও 'নিষ্ক্রিয়' প্রতিরক্ষা রণকৌশল বলা যেতে পারে।[১৩] ভিয়েতনামের দক্ষিণাঞ্চলে সংগ্রাম চলাকালে ঐসব রণকৌশল বাস্তবভাবে ব্যবহার করে ভিয়েতনামের বিপ্লবী নেতৃবর্গ চেয়েছে প্রতিপক্ষ শত্রুকে সহিষ্ণুতা সম্বলিত যুদ্ধে হারিয়ে দিতে।

হ্যানয়ের সক্রিয় প্রতিরক্ষা রণকৌশল

মার্কিন বিমান অভিযানের প্রথম মাসকয়েক তাদের জঙ্গি ও বোমারু বিমানগুলো উত্তর ভিয়েতনামের আকাশে প্রায় অবাধে বিচরণ করতো, উত্তর ভিয়েতনামের লক্ষ্যবস্তুর ওপর যথা ইচ্ছা তথা হামলা চালাতো। কিন্তু উত্তর ভিয়েতনামের দিকে ক্রমবর্ধমান মার্কিন বিমান অভিযান প্রতিরোধকল্পে হ্যানয় সরকার উত্তরাঞ্চলে তৎকালীন সময়ে বিশ্বের একটি অন্যতম সেরা বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এই বিমান-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ছিলো বহু উন্নত, সূক্ষ্মতার ও ক্ষুরধার ক্ষেপণাস্ত্রের সমাবেশ (যেমন ভূমি থেকে আকাশগামী ক্ষেপণাস্ত্র বা (Surface-to-air missiles or SAMs.), সন্নিবেশ করা হয় বিমান-বিধ্বংসী ঘাঁটি ও ব্যবস্থা এবং রাডার পরিচালিত বন্দুক (Radar guided guns) যেমন বিমান বিধ্বংসী বন্দুক বা (the anti-aircraft gunners of the AAGs)।[১৪] এসব সংখ্যাধিক ও উচ্চতর গুণগত মানের সরঞ্জাম সংগ্রহের ফলে উত্তর ভিয়েতনামের শক্তি যতই উত্তরোত্তর বেড়ে চলে আনুপাতিক হারে ততই শত্রুর বিমান হামলা প্রতিহত করার হ্যানয়ের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। উত্তর ভিয়েতনামের অস্ত্রাগারে অতি দ্রুত সোভিয়েত মিগ বিমান (MIGS যেমন মিগ ১৫, ১৭, ১৯, ২১) এবং ইলিসিয়াম (Ilesium 28) বা মাঝারি ধরনের বোমারু বিমানের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এসব সংগৃহীত বিমানের কিছুসংখ্যক দক্ষিণ-

www.pathagar.com

পশ্চিম চীনের পেইটুন ইউনানি বিমান ঘাঁটিতে অবস্থান করতো এবং সেখান থেকে প্রয়োজনবোধে অভিযান পরিচালনা করতো। এরি মধ্যে হ্যানয় উত্তর ভিয়েতনামে তার নিজস্ব বিমান ঘাঁটিসমূহকে জোরদার করে। শত্রুর বিমান হামলা প্রতিরোধকল্পে হ্যানয় কর্তৃক এ জাতীয় বহুবিধ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন জঙ্গি ও বোমারু বিমানসমূহের আগ্রাসী কার্যক্রম জটিলতর হয়ে পড়ে।

উত্তর ভিয়েতনামের আকাশ সীমানা রক্ষা করার ব্যবস্থা ছাড়াও হ্যানয় উত্তরাঞ্চলের সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা, উপকূল ভাগ ও সরবরাহের পথসমূহ রক্ষা করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই সময়ে হ্যানয়ের সংগৃহীত সামগ্রীর মধ্যে ছিলো অতি দ্রুতগামী ১০০ মিলিমিটার বন্দুক (100 mm gus), সোভিয়েত সরবরাহকৃত বৃহদকার হেলিকপ্টার যুদ্ধ জাহাজ (Helicopter gunship), বৈতরণী–ধরনের ভূমি থেকে-ভূমিগামী ক্ষেপণাস্ত্র (Styx-type Surface-to-surface missiles)। হ্যানয় এসব যুদ্ধসামগ্রী ব্যবহার করে মার্কিন বন্দুকধারী রণতরী (gunboats), যুদ্ধ-সরবরাহকারী ও যুদ্ধ জাহাজসমুহের (carriers and batleships) ওপর আঘাত হানে।[১৫] উপর্যুক্ত বহুবিধ যুদ্ধ-সরঞ্জাম সংগ্রহের মাধ্যমে উত্তর ভিয়েতনামের সীমানা ও উপকূলীয় অঞ্চলের ওপর শত্রুর বিমান হামলা প্রতিহত করতে গিয়ে হ্যানয়ের নেতৃবৃন্দ এসব সক্রিয় প্রতিরক্ষামূলক রণকৌশল ব্যবহার করেন। একই উদ্দেশ্যে, সম্ভবত জনগণের মনোবল অধিকতর সমুন্নত রাখার মানসে, হ্যানয় কিছু কিছু প্রতীকমূল ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যেমন, বড় শহর-নগরসমূহে ভূমির সঙ্গে তার দিয়ে সংযুক্ত করে অসংখ্য বেলুন খোলা আকাশের দিকে ছেড়ে দেয়া হয়। একইভাবে, মার্কিন বিমানগুলোকে লক্ষ্য করে গুলি করার জন্য সাধারণ নাগরিকদেও উৎসাহ দেয়া হয়; এজন্য জনগণকে এমন কি রাইফেল, হালকা ও ভারী জাতীয় কামান বিশেষ (Submachine guns and heavy machine guns), স্বয়ংক্রিয় রাইফেল (automatic rifles) এবং হালকা গুলি-গালাজে ব্যবহৃত খুচরো যন্ত্রাদি (light artillery pieces) সরবরাহ করা হয়।[১৬]

হ্যানয়ের 'নিষ্ক্রিয়' প্রতিরক্ষা রণকৌশল

শত্রু পক্ষের সহিষ্ণুতা আঘাতকল্পে প্রলম্বিত শত্রুকে হারিয়ে দিতে হ্যানয় সরকার 'নিষ্ক্রিয়' ('passive') রনকৌশল নামে এক ধরনের রণকৌশলেরও আশ্রয় গ্রহণ করে। এ জাতীয় রণকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে হ্যানয় চেয়েছে মার্কিন বিমান হামলার সম্মুখে যতকম খেসরত দিয়ে প্রতিরক্ষা বিধান করতে চেয়েছে উত্তরাঞ্চলে ক্ষয়ক্ষতি সাধন করার মার্কিন ক্ষমতা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক-রণনৈতিক দরকষাকষি বা চাপ সৃষ্টি করার ক্ষমতা

www.pathagar.com

যথাসম্ভব খর্ব করতে। এসব উদ্দেশ্য চরিতার্থতায় হ্যানয় পর পর বহুবিধ কৌশলমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেঃ

১. ১৯৬৫ সনের ফেব্রুয়ারিতে হ্যানয় প্রথমবারের মতো 'নিষ্ক্রিয় বিমান বিধ্বংসী ব্যবস্থা' সমন্বিত এক বিধি ঘোষণা করে। এই ঘোষণা কার্যত ছিলো শহরাঞ্চল ছেড়ে যাবার নির্দেশ। এই নির্দেশে উৎপাদন কিংবা যুদ্ধের কাজে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয় এ ধরনের সব ব্যক্তিবর্গকে দেশের বড় বড় শহরগুলো ছেড়ে যেতে বলা হয়। ১৯৬৬ সনের জুন-জুলাইয়ের মধ্যে একই জাতীয় আরেকটি নির্দেশ বলবৎ করা হয়। এই নির্দেশ 'রাজধানী জীবন যাত্রায় সত্যিকারভাবে' অপরিহার্য লোকজন ছাড়া বাদ-বাকি সবাইকে হ্যানয় যেতে বাধ্য করা হয়। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কতিপয় সরকারি মন্ত্রণালয়, সরকারি বিভাগ, এবং সম্ভব হলে বড় বড় শহরগুলোর শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও কারখানাসমূহ দেশের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে দেয়া হয়, অথবা অধিকতর নিরাপদ এলাকায় সরিয়ে নেয়া হয়।[১৭] হ্যানয়ের নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্যে এ দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করেন যে, তাঁরা হ্যানয় ও হাইফং-এর মতো নগরগুলোকে ধ্বংসলীলার মাধ্যমে জিম্মি হিসেবে ব্যবহার করার শত্রুর প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করেবেন। তাঁদের এই ঘোষণা বস্তুত দেশের অর্থনীতিকে তাঁদের জাতীয় অভিলাষ, উদ্দেশ্য ও জাতীয় অহমিকার সমর্থনে সংগঠিত ও পরিচালিত করার দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় বহন করে। উল্লেখ্য, উত্তর ভিয়েতনামের অহমিকা বোধের একটি বিশেষ অভিব্যক্তি ছিলো এরূপঃ 'হ্যানয় ও হাইফং ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, তবু আমরা মাথা নোয়াবো না।'[১৮] সংগ্রাম চালিয়ে যাবার এ ধরনের প্রত্যয় প্রকৃতপক্ষে তাদের বিঘোষিত প্রলম্বিত যুদ্ধের রণনীতি ও ভিয়েতনামের জাতীয় অহমিকার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

২. হ্যানয় কর্তৃপক্ষ মাটির নিচে গর্ত ও পরিখা খনন করে গুপ্তস্থান সৃষ্টির মাধ্যমেও নিরাপত্তা বিধান করার প্রচেষ্টা চালায়। এ জাতীয় প্রচেষ্টার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলো সারা দেশে সুগভীর আশ্রয় কেন্দ্রসহ সম্প্রসারিত ভূ-গর্ভস্থ নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিধান, ইস্পাতের তৈরি বাংকার ও কংক্রীটের তৈরি ম্যানহোল (bunkers of steel and concrete manholes), ফক্সহোল (Foxholes) এবং বিভিন্ন ধরনের পরিখাশ্রেণী তৈরি। এ সবের কোনো কোনোটি স্কুল, হাট-বাজার ও জনজীবনের উপযোগী অনেক সুযোগ সুবিধা সহকারে তৈরি হয়। বস্তুত এ সময় জাতীয় শ্লোগান ছিলো ভু-গর্ভস্থ "আশ্রয় কেন্দ্র হচ্ছে তোমাদের দ্বিতীয় বাড়ি।" এ শ্লোগানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উত্তর ভিয়েতনামীরা ১৯৬৫-১৯৬৮ সনের মধ্যে প্রায় ৩০,০০০ মাইল পরিখা ও দু'কোটি দশ লক্ষ শত্রুর বোমাবর্ষণ থেকে আত্মরক্ষমূলক আশ্রয় কেন্দ্র (air raid sheftor) স্থাপন।

www.pathagar.com

৩. জনগণকে আসন্ন বিমান হামলা থেকে সর্তক পাহারায় রাখার উদ্দেশ্যে দক্ষতা সহকারে বহুবিধ বিপদ-সংকেত ব্যবস্থা (alarm systems) উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন করা হয়।[১৯]

৪. পেট্রোলিয়াম ও এ জাতীয় জ্বালানি উৎস শক্তিসমূহ যেসব মার্কিন বিমান হামলায় ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্তের সম্মুখীন সেসব ক্ষয়ক্ষতির ভার লাঘবে সমতা বিধান করতে গিয়ে হ্যানয় কর্তৃপক্ষ বহু ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যুদ্ধের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে হ্যানয় সরকারকে পেট্রোলিয়াম আমদানি বৃদ্ধি করতে হয় অবশ্যি, কিন্তু এসব আমদানিকৃত তৈল স্থানীয়ভাবে গ্রহণ ও বাজারজাত বা ব্যবহারের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। তৈলবাহী জাহাজ (Oil tanks) থেকে পেট্রোলিয়াম নেয়া হতো সমুদ্র থেকে ভাসা-ভাসা ক্ষুদ্রকারের বজরা (Shallow-draft barges) বা ছোট স্বয়ংক্রিয় তরীতে (Lighters) তারপর এসবকে প্রধান প্রধান সড়ক পরে পাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ট্যাংক মাটির নিচে পুঁতে রাখা হতো। যেখানে সম্ভব মার্কিন বিমান হামলায় ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্তজনিত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ঘাটতি পূরণের জন্য ক্ষুদ্রকার ডিজেল জেনারেটর (diesel generators) প্রবর্তন করা হয়। এছাড়াও, উত্তর ভিয়েতনাম সরকার অনেক সুনিপুণ পদ্ধতি উদ্ভাবন করে, যেমন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের স্থলে হস্ত-চালিত যন্ত্র,বিদ্যুৎ চালিত মিল-কারখানার স্থলে পায়ে চালিত মিল-কারখানা, বিদ্যুৎ চালিত পাখার স্থলে হস্ত চালিত পাখা, বিদ্যুৎ চালিত স্বয়ংক্রিয় চাঁচের (electric-powered automatic molds) পরিবর্তে ঢালাইকারী টর্চ (welding torch)। যেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি সরবরাহ ছিলো এসব স্থানে জলশক্তি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র (Hydro-dynamic stations) স্থাপন করে বিদ্যুতায়িত শক্তি উৎপন্ন করা হয় ; কয়লা, বায়ু, শস্য, বাষ্প প্রভৃতি সিক্ত করে উৎপাদিত মিথ্যান গ্যাস (methane gas) এসব থেকেও জ্বালানি শক্তি সঞ্চয়ের প্রচেষ্টা চালানো হয়।[২০]

৫. উত্তর ভিয়েতনামের দিকে ভয়াবহ মার্কিন বিমান হামলা প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজনীয় জনশক্তি ও শ্রমিক সরবরাহের প্রতি যে হুমকি দেখা দেয় তার' মোকাবিলা করার বাস্তব প্রয়োজনে উত্তর ভিয়েতনাম সরকার মহিলাদের শ্রমজীবী মানুষের কাতারে শামিল করে। এ জন্যে একটি বিশেষ নারী মুক্তি অভিযান চালানো হয়, মুক্তি দেওয়া হয় নারীদের সব ধরনের "সামন্ত" দায়-দায়িত্ব থেকে। দেশের আর্থনীতিক ব্যবস্থায়, পার্টির সংগঠনে ও সরকারে বিভিন্ন দপ্তরে নারীদের অধিকতর ভূমিকা ও দায়িত্ব দেয়া হয়। এছাড়াও, পুরুষদের পরিবর্তে মহিলাদের মাঠে-প্রান্তরে ও কল-কারখানার দায়িত্ব প্রদান করা হয়, বলা হয় পরিবারের দেখাশুনা করতে এবং প্রয়োজনবোধে মিলিশিয়া বা রক্ষী বাহিনীতে যোগদানেরও নির্দেশ দেয়া হয়।

www.pathagar.com

৬. যোগাযোগ, পরিবহণ এবং প্রশাসন ব্যবস্থায় মার্কিন বোমা বর্ষণের ফলে উত্তর ভিয়েতনামে যে অসাড়, অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় তার প্রতিবিধানকল্পে হ্যানয়ের কর্তৃপক্ষ প্রাদেশিক, জেলা ও স্থানীয় প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিজ নিজ এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় কার্যকর সাংগঠনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার অনুমতি প্রদান করে।

৭. মার্কিন হামলা থেকে উদ্ভূত সমস্যাবলী, যেমন, স্থানচ্যুত বা বাস্তুহারা জনগণের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাবার ভয় বা সম্ভাবনা, বা বিকেন্দ্রীভূত শাসন-ব্যবস্থাজনিত সমস্যাদির প্রতিবিধানকল্পে এবং একই সঙ্গে জনগণের জঙ্গি মনোবল অটুট রাখার মানসে সরকার সরাদেশে রীতিবদ্ধভাবে বেশ কিছু "যুদ্ধরত গ্রাম" ('combat villages') সংগঠিত করে। এসব গ্রাম ছিলো সম্পূর্ণ ভিয়েতনাম কম্যুনিস্ট পার্টি বা ভিয়েতনাম শ্রমিক দলের নিয়ন্ত্রণে। গ্রামে প্রতিটি অধিবাসী থেকে যথাসম্ভব সর্বাধিক পরিমাণ কাজ আদায় করতো পার্টি; পার্টি ব্যক্তি বিশেষের দৈনন্দিন কার্যাবলিরও খোঁজ-খবর রাখতো। প্রতিটি যুদ্ধরতগ্রাম তাদের নিজস্ব কৌশলমূলক বিকল্প পরিকল্পনা গ্রহণ করে, গড়ে তোলে নিজ নিজ এলকায় প্রতিরক্ষাব্যুহ তৈরি করে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা। এসবের উদ্দেশ্যে ছিলো নিজ নিজ এলাকায় শত্রুবাহিনীর সম্ভাব্য আগ্রাসী হামলার জন্য প্রস্তুত হওয়া। প্রতিপক্ষের নাশকতামূলক ও মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধবিগ্রহর কৌশলাদি প্রতিহত করার জন্য হ্যানয় কর্তৃপক্ষ প্রতি-বিপ্লবী কার্যকলাপ তৎপরতাজনিত অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বলে অনুজ্ঞা জারি করে। শত্রুর বেতার প্রচারণাজনিত অভিযান মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে রেডিও ক্রয় সীমিত করে দেয়া হয়। শত্রুপক্ষ প্যারাশুট (parachute) করে কোনো রেডিও কিংবা ট্রানজিস্টার বিতরণ করে থাকলে এ সবের মাধ্যমে বিপক্ষের প্রচারণা ব্যাপকতা লাভ করার সুযোগ ছিলো অত্যন্ত সীমিত। কেননা, লাইসেন্সবিহীন মালিকদের কাছে ব্যাটারী বিক্রি করা নিষিদ্ধ ছিলো। শত্রুপক্ষ প্যারাশুট করে কোনো অনুদান বস্ত্র বা উপহার সামগ্রী ফেলে গিয়ে থাকলে তা জনসমক্ষে বহ্নুৎসব (public bonfire) সহকারে পোড়ানো হতো; জনগণকে বুঝানো হতো যে পৈশাচিক শত্রু উপহারের নামে ক্ষতিকর বা স্বাস্থ্য হানিকর দ্রব্য পাঠাতে পারে। এতে প্রতিপক্ষের প্রতি জনগণের ক্রোধ ও ঘৃণাবোধ হতো তীব্রতর। বস্তুত, জনগণকে সমাবেশ ও ক্ষিপ্ত করার এসব বহুবিধ কৌশল-পদ্ধতি অনবরত ব্যবহারের মাধ্যমে, শ্লোগান-অভিযান চালিয়ে এবং "আমেরিকান চক্রের" বিরুদ্ধে ঘৃণাসূচক মনস্তাত্ত্বিক অভিযান পরিচালনা করে উত্তর ভিয়েতনামের সমগ্র জনগণকে উত্তরাঞ্চলের সম্ভাব্য মার্কিন আক্রমণের বাস্তবতার জন্য প্রস্তুত করে তোলে ভিয়েতনাম শ্রমিক দল। [২১]

www.pathagar.com

৮. উত্তর ভিয়েতনামের বাঁধ, অভ্যন্তরীণ জলপথে এবং সেচ প্রকল্পসমূহের ওপর মার্কিন বোমা বর্ষণের ক্ষতি লাঘব করার জন্য হ্যানয় কর্তৃপক্ষ "সমস্ত্র সাঁতারু" ('armed swimming') দল গঠন করে। এছাড়া আরো অনেক কর্মরত বাহিনী গঠন করে বহু অতিরিক্ত বাঁধ, খাল ও জল-রক্ষণাগার তৈরি করা হয়। এসবের ফলে উত্তর ভিয়েতনামে শত্রুর বিধ্বংসী বোমা অভিযানের ক্ষেত্রে পানি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় নি, সেচ প্রকল্পসমূহের উন্নতি সাধন সম্ভব হয়।[২২]

৯. দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রলম্বিত সংগ্রাম পরিচালনার জন্য একটি "সুমহান অঞ্চল" হিসেবে এর কর্তব্য পালন করা এবং নিজস্ব এলাকাসমূহে শত্রুর বিমান হামলাপ্রসূত ভয়াবহ চাপের সম্মুখে প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী উৎপাদন সুনিশ্চিত করার জন্য হ্যানয় কর্তৃপক্ষ উত্তর ভিয়েতনামের শিল্প পরিকল্পনায় "মোড় ফেরায়" ('switch in direction') কৌশল প্রবর্তন করে। কার্যত এর ফলে ভারী শিল্পায়নের পরিকল্পনা পরিবর্তন করে এ জাতীয় ক্ষুদ্রকার শিল্পযন্ত্রের উৎপাদন করা হয় যাতে কৃষি বা কৃষিভিত্তিক শিল্প বা স্থানীয় ক্ষুদ্রশিল্পের প্রসার লাভে সাহায্য হবে। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও নীতিকৌশল ছিলো কেন্দ্রীভূত শিল্পায়নের পরিবর্তে ক্ষুদ্র শিল্পের ওপর জোর দেয়া। তৎকালীন শিল্প ইউনিটসমূহকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিট হিসেবে ঢালাও করে দেশের অভ্যন্তরে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দেয়া হয়। হস্তশিল্প সমবায়ভুক্ত কারিগরদের নিজেদের এককভাবে কাজ করার স্বাধীনতা দেয়া হয়।[২৩]

এভাবে, হ্যানয়ের সামগ্রিক কৌশলগত পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা মার্কিন বিরোধী প্রলম্বিত যুদ্ধের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিচালিত হয়। এ প্রসঙ্গ সম্পর্কিত বিপ্লবী আদর্শবাণী হো চি মিন স্বয়ং নির্ধারিত করেন। তাঁর কথায়,"প্রতিটি [ভিয়েতনামী] মানুষ [নিয়োজিত হবে] শত্রুর বিরুদ্ধে, প্রতিটি নাগরিক এক একজন যোদ্ধা, প্রতিটি গ্রাম, রাস্তা, বৃক্ষ এক একটি নির্দেশক ঘাঁটি। বিপ্লবের পার্শ্বভাগকে একটি আত্মপ্রত্যয়ী আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস হিসেবে, রণাঙ্গনের সম্মুখ ভাগের বাস্তব প্রয়োজনের উৎস হিসেবে গড়ে তোলে।"[২৪]

স্পষ্টতই হ্যানয় শত্রু কর্তৃক শেষ অবধি উত্তর ভিয়েতনামের মূল ভূ-খণ্ড আক্রমণের আশংকা করে এবং এই সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য বিস্তারিত যুদ্ধ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। উল্লেখ্য, উত্তর ভিয়েতনামের সেনাবাহিনী ইতিমধ্যেই এশিয়ার সবচাইতে রণঅভিজ্ঞ বাহিনী হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। তা' সত্ত্বেও ১৯৬৬ সনের ১৭ জুলাই হ্যানয় সরকার উত্তর ভিয়েতনামে আংশিক রন-সমাবেশ (Partial mobilization) নির্দেশ বা পরওয়ানা জারি করে। অস্ত্র কিংবা প্রযুক্তি নয়, বরং মানুষই যুদ্ধের ফলাফল

www.pathagar.com

নির্ধারণ করে–মাও'র মতবাদভিত্তিক এ জাতীয় কৌশলগত নীতিবাক্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে হ্যানয় কর্তৃপক্ষ গড়ে তোলে জনগণের মনোবল, আর শেষ আত্মরক্ষার ব্যূহ হিসেবে প্রস্তুত করে উত্তরাঞ্চলীয় সুবিস্তৃত পর্বতমালা। সেই পর্বতমালা সেচপ্রকল্প সমভূমি বেষ্টিত হয়ে মিশে যায় লাওস ও দক্ষিণ চীনের পার্বত্যাঞ্চলে। উত্তর ভিয়েনামের এই ব্যাপক এলাকা ঐ অঞ্চলের প্রায় অধিকাংশেরও বেশি ভূখণ্ড জুড়ে রয়েছে। এই দুর্গম এলাকায় বিদেশী আগ্রাসী শত্রুবাহিনীর অনুপ্রবেশ সহজ হতো না। বস্তুত, বলা যায় এই সুবিস্তৃত এলাকা প্রলম্বিত যুদ্ধের প্রধান ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করা যেতো। ভিয়েতনামের উত্তরাঞ্চলে মার্কিন বাহিনীর যে কোনো হামলা প্রতিহত করার জন্য শুধুমাত্র উত্তর ভিয়েতনামের দুর্ধর্ষ নিয়মিত সেনাবাহিনী প্রস্তুত ছিলো না, অতন্দ্রপ্রহরীর মতো সজাগ ছিলো গেরিলা প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সারা উত্তর ভিয়েতনামের জনগণ। হ্যানয়ের সরকারি নেতৃবৃন্দ তাই দ্বিধাহীন চিত্তে ও অবজ্ঞাভরে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, জঙ্গলাকীর্ণ পার্বত্য ঘাঁটিসমূহ থেকে তাঁদের বাহিনী প্রতিপক্ষকে এমন এক মরণপণ দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে প্রবৃত্ত করবে যাতে শেষাবধি হানাদার মার্কিন বাহিনী ভিয়েতনাম ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়।'[২৫]

বস্তুত, বিপ্লবের পার্শ্বভাগ হিসেবে বিপ্লবীদের চূড়ান্ত বিজয় অবধি হ্যানয় দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন বিরোধী প্রলম্বিত যুদ্ধ অব্যাহত রাখে, শত্রুর আগ্রাসনমূলক তৎপরা নস্যাৎ করার মানসে সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকে, সুসংহত করে উত্তর ভিয়েতনামের প্রতিরক্ষামূলক সামরিক প্রস্তুতি। এ প্রসঙ্গে বিপ্লবের 'সুবিশাল পার্শ্বভাগের' ভূমিকাও প্রণিধানযোগ্য। হ্যানয়ের বিপ্লবী তত্ত্বে বিশেষ করে ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ গণচীন ও সোভিয়েত ইউয়িনের বিপ্লবী একাত্মতা ও সাহায্য অপরিহার্যরূপে ধরা হয়। এ দু'টো দেশও তাদের নিজ নিজ আদর্শিক ও কৌশলগত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভিয়েতনামী বিপ্লবীদের আর্থিক, কূটনৈতিক ও সামরিক সাহায্য প্রদান করে। ১৯৫০-এর দশক থেকে এই দু'মিত্র শক্তির উত্তরোত্তর সাহায্য সহযোগিতা লাভের ফলে ভিয়েতনামী বিপ্লবীদের পক্ষে আমেরিকার মতো একটি পরাশক্তির সামরিক ও কৌশলগত দৌরাত্মজনিত ভয়াবহ হিংসাত্মক প্রক্রিয়ার মোকাবিলা করা সম্ভব হয়। আরো উল্লেখ, অধিকতর হারে চীন-সোভিয়েত সাহায্য লাভের ফলেই ১৯৭০ দশকের প্রথম দিকে উত্তর ভিয়েতনামের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা একটি অন্যতম শক্তিশালী ও ব্যাপকতম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে বিশ্বের কৌশলগত মানচিত্রের সারির বিমান বাহিনীসমূহের মধ্যে খ্যাতির আসন লাভ করে। যদিও হ্যানয় ইতিমধ্যে, ১৯৬৯ সন থেকে, প্রতিপক্ষের সঙ্গে পারীতে শান্তি আলোচনায় যোগদান করে এবং উত্তর ভিয়েতনামের ওপর মার্কিন বিমান হামলাও সাময়িকভাবে স্থগিত থাকে। উত্তর ভিয়েতনাম সরকার তা' সত্ত্বেও

www.pathagar.com

চীন-সোভিয়েত সাহায্য আদায় করে চলে, জোরদার করে ভিয়েতনামের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। কেননা, হ্যানয় নেতৃবৃন্দ তাদের জনগণকে উদ্ভূত যে-কোনো কৌশলগত পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত রাখতে প্রয়াসী হন এবং এরূপ অবস্থা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট হন যে বিপ্লবী যুদ্ধের "সুমহান সম্মুখভাগ [দক্ষিণ ভিয়েতনাম] যেন সব রকম পরিস্থিতির মোকাবিলায় [পার্শ্বভাগ সমূহের] পুরো সাহায্য ও সমর্থন লাভ করে।"[২৬]

বলাবাহুল্য, হ্যানয় নেতৃবৃন্দের এ জাতীয় রণনৈতিক কার্যক্রম তাঁদের তাত্ত্বিক চিন্তাধারার সঙ্গো সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ চিন্তাধারার বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হলে উত্তর ভিয়েতনামকে "সুদূর বহুমুখী কৌশলগত ভিত্তির ওপর গড়ে তোলা এবং উত্তরাঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তি মজবুত করে তোলা যাতে এর [সমাজতন্ত্রের] সুষ্ঠু প্রসার লাভ হতে পারে।" এসব চিন্তাধারার সঙ্গো সংগতি রেখে হ্যানয় সরকার ভিয়েতনামের জাতীয় উন্নয়ন পকিল্পনা এরূপ নীতি-কৌশল মোতাবেক রচনা যাতে "সব রণক্ষেত্রে জনশক্তি ও সাজ-সরঞ্জামাদি জরুরি ভিত্তিতে ও সময়মত সরবরাহ করা যেতে পারে।"[২৭] এজন্য হ্যানয় চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গো এমন কূটচাল ব্যবহার করে ভ্রাতৃপ্রতিম সৌহার্দ্য বজায় রেখে চলে যাতে উভয় শক্তি থেকে বর্ধিত হারে সাহায্য-সরঞ্জামাদি লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে পারীতে শান্তি আলোচনা অব্যাহত থাকাকালেই ভিয়েতনামী কম্যুনিস্ট কৃর্তৃপক্ষ "একই সঙ্গো দু'টো রননৈতিক কাজ হাতে নেয়"। হ্যানয়ের সামরিক পত্রিকাতে এরূপ তথ্য পরিবেশন করা হয়, "উত্তরাঞ্চলে সমাজতন্ত্র কায়েম কর, মুক্ত কর দক্ষিণাঞ্চলকে। আমাদের সমস্ত জনগণ ও সামরিক বাহিনীর কাছে মার্কিন বিরোধী জাতীয় মুক্তির কাজটা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ।"[২৮] ১৯৭৩ সনের জানুয়ারিতে পারী শান্তিচুক্তি সম্পাদন সত্ত্বেও হ্যানয় তার তত্ত্বীয় রূপরেখা ভিত্তিক প্রলম্বিত যুদ্ধ ও কৌশলগত সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকে, কূটচাল প্রয়োগ করে আদায় করে চলে। পরিশেষে ১৯৭৪ সনের এপ্রিলে, অধিকতর চীন-সোভিয়েত সরঞ্জাম ও সরবরাহাদি লাভের পর, হ্যানয় তার পরিচালিত প্রলম্বিত যুদ্ধের চূড়ান্ত অভিযান, "মহান হো চি মিন অভিযানের" মাধ্যমে সাইগনে অবস্থিত মার্কিন তাবেদার সরকারের পতন ঘটায়, বাধ্য করে আমেরিকাকে ভিয়েতনামের দক্ষিণাঞ্চল ছেড়ে যেতে, আর পুনরেকত্রিত করে ভিয়েতনামকে।[২৯]

উপসংহার

উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আলেখ্যে একথা বলার আর অপেক্ষা রাখে না যে, সাইগনের মুক্তি ও মার্কিন নয়া-সাম্রাজ্যবাদী ও নয়া ঔপনিবেশবাদীদের ভিয়েতনামের মাটি থেকে চূড়ান্তভাবে বিতাড়ন অবধি হ্যানয় সরকার

www.pathagar.com

ভিয়েতনামে পার্শ্বভাগ তত্ত্বসহ প্রলম্বিত বিপ্লবী যুদ্ধের রূপরেখা একাত্মতার সঙ্গে বাস্তবায়েনে সক্রিয় থাকে। হ্যানয়ের নেতৃবর্গ নিজেরা ছিলেন এ বিপ্লবী ফ্রেম বা রূপরেখার সত্যিকার প্রণেতা এবং উত্তর ভিয়েতনামী জনগণ ভিয়েতনামের দক্ষিণাঞ্চলে মুক্তি ও দেশের পুনরেকত্রীকরণের জন্য যে নজিরবিহীন সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেন এবং ভিয়েতনামের বিপ্লবী জনগণ সমষ্টিগতভাবে যে ত্যাগ-তিতিক্ষা ও বিসর্জন স্বীকার করেন তা প্রেরণা-উদ্দীপক বিষয় হিসেবে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। প্রচণ্ডতম মার্কিন জঙ্গি বিমানের হামলার সম্মুখীন হয়েও ভিয়েতনামের বিপ্লবী নেতৃবর্গ কিভাবে একটি পরাশক্তির হিংসাত্মক সামরিক ও কৌশলগত চাপ অগ্রাহ্য করে, কিভাবে ক্ষুদ্রদেশ ভিয়েতনামের জনগণ অপ্রতিসম আগ্রাসনের মোকাবিলা করে তা যথার্থই বিশ্বের মুক্তকামী জনগণের বিপ্লবী স্পৃহায় সতত অনুপ্রেরণা যোগাবে। বলাবাহুল্য, বর্তমানকালে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে পরাশক্তির অপ্রতিসম যুদ্ধজনিত আগ্রাসন নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে ভিয়েতনামে হ্যানয়ের গৃহীত বিপ্লবী রূপরেখা ও প্রতিরক্ষা রণকৌশল অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক মনে হবে। ভিয়েতনামী বিপ্লবীদের অভিজ্ঞতা থেকে এটাই সুস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয় যে, একটি সফল বিপ্লবের পূর্বশর্ত হিসেবে বিপ্লবী আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা বিপ্লরেব সাফল্যের জন্য যথেষ্ট নয় ; বলিষ্ঠ ও গতিশীল নেতৃত্বাধীন দেশপ্রেমজনিত জাতীয় সংগ্রামী একাত্মতা, আদর্শগত আনুগত্য ও সুদৃঢ় ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধনভিত্তিক আন্তর্জাতিক সাহায্য-সমর্থনও অপরিহার্য। এখানেই প্রলম্বিত যুদ্ধও পার্শ্বভাগ তত্ত্বের যোগসূত্র ও যথার্থতার পরিচয় মেলে।

পার্শ্বভাগ তত্ত্বের সমকালীন ধারাবাহিকতা

হ্যানয়ে অবস্থিত উত্তর ভিয়েতনামের কম্যুনিস্ট সরকার ভিয়েতনামে মার্কিন আগ্রাসন ও হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে দীর্ঘ একুশ বছরব্যাপী প্রলম্বিত যুদ্ধ চালায়। এ যুদ্ধের অঙ্গ হিসেবে উত্তর ভিয়েতনামের কম্যুনিস্ট নেতৃবৃন্দ পার্শ্বভাগ তত্ত্ব উদ্ভাবন করে এবং এ তত্ত্ব অনুযায়ী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন অবস্থানের ওপর 'পার্শ্বভাগ' তত্ত্বসহ উত্তর ভিয়েতনাম থেকে বিভিন্ন ধরনের কলাকৌশল ব্যবহার করে। "সুবিশাল পার্শ্বভাগ" হিসেবে চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নকেও ব্যবহার করে বলে ভিয়েতনামী কম্যুনিস্ট বিপ্লবীরা মার্কিন আগ্রাসী তৎপরতা শুধু প্রতিহত করে নি, ভিয়েতনামে ব্যাপকতর পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ওয়শিংটন সেই দেশ থেকে হাত গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

www.pathagar.com

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রামে পার্শ্ববর্তী সহানুভূতি সম্পন্ন রাষ্ট্র বা দেশকে ব্যবহার করা কিছু এমন নতুন নয়। এক্ষেত্রে নতুন হলো ভিয়েতনামের বিপ্লবী নেতৃবর্গ কর্তৃক নতুনভাবে তত্ত্বীয় রূপ-রেখায় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদান। খোদ আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ফরাসি সাহায্যের বিপ্লব অজানা নয়। চীনের মুক্তি সংগ্রামে সোভিয়েত সাহায্যের বিষয় অবিদিত নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ভারতে ব্রিটিশ অবস্থানের বিরুদ্ধে বিপ্লবী রাস বিহারী বোস ও সুভাস চন্দ্র বোস দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় গঠন করে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি' (Indian National Army বা INA) এবং সিঙ্গাপুর ও বার্মা থেকে ব্রিটিশ বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে। তাই ভিয়েতনামী বিপ্লবীদের তত্ত্ব উপস্থাপনের বহুপূর্ব থেকেই বাস্তব রাজনীতিতে এ তত্ত্বে প্রাসঙ্গিকতার প্রমাণ মেলে।

ভিয়েতনামী বিপ্লবী নেতৃবর্গ সেই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাকে তাত্ত্বিক নীলনকশা প্রণয়নের মাধ্যমে নিজেদের বিপ্লবী কর্মকাণ্ড সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন একটি পরাশক্তির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামেও মুক্তিবাহিনী প্রতিবেশী দেশ ভারতকে পাকিস্তানী হানাদারদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। এ প্রসঙ্গে কিন্তু এও মনে রাখা সমীচীন যে, ভিয়েতনাম যুদ্ধ সমাপ্ত হবার মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেই ভিয়েতনাম স্বয়ং আরেকটি প্রলম্বিত যুদ্ধ ও পার্শ্বভাগ তত্ত্বের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়। এটি ছিল কম্বোডীয় যুদ্ধ, যে-যুদ্ধ প্রধানত ছিল ভিয়েতনামের স্বয়ং সৃষ্ট। এ যুদ্ধে হ্যানয় আগ্রাসনের দায়ে অভিযুক্ত হয়। কেননা অনেকটা মার্কিনী অনুকরণে ভিয়েতনাম এক পর্যায়ে প্রায় দু'লক্ষের মতো তার নিজস্ব সেনাবাহিনী কম্বোডিয়ায় হ্যানয় সমর্থিত তাবেদার সরকারের পক্ষে নিয়োজিত করে। ফলে কম্বোডিয়ার বিভিন্ন প্রতিরোধ বাহিনী ভিয়েতনামী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রলম্বিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, এবং খোদ হ্যানয়ের নেতুবর্গের উপস্থাপিত পার্শ্বভাগ তত্ত্বের ফ্রেমের রূপরেখা অনুযায়ী পার্শ্ববর্তী দেশগলো, বিশেষ করে থাইল্যান্ডকে ব্যবহার করে আসে। উদ্দেশ্য ছিল সমরূপ ঃ কম্বোডিয়া থেকে ভিয়েতনামের আগ্রাসী বা দখলদার বাহিনীকে উৎখাত করা। এভাবে ভিয়েতনামের কম্যুনিস্ট নেতৃবৃন্দ এক দশকেরও অধিককাল কম্বোডিয়ায় তাদের নিজেদের তত্ত্বীয় কাঠামো অনুযায়ী প্রণীত আরেকটি প্রতিরোধ যুদ্ধের শিকার হয়, বাধ্য হয় কম্বোডিয়া থেকে ভিয়েতনামী দখলদার বাহিনী প্রত্যাহার করতে। এতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কে প্রলম্বিত যুদ্ধ ও পার্শ্বভাগ তত্ত্বের মতো রণনৈতিক ও কৌশলগত তত্ত্বীয় কাঠামো বাস্তব রাজনীতির ব্যবহারিক পরিমণ্ডলে দেশ ও সমাজ নির্বিশেষে আপন ধারাবাহিকতা বজায় রাখে।

www.pathagar.com

বলা প্রয়োজন যে, স্নায়ুযুদ্ধ উত্তরকালেও সেই অতীত অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতা পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। কম্বোডিয়ায় ভিয়েতনামের দখলদার বাহিনীর প্রত্যাহার, তথাকথিত শান্তিচুক্তি সম্পাদন এবং আন্তর্জাতিক তদারকির মাধ্যমে নির্বাচন সত্ত্বেও প্রলম্বিত যুদ্ধের ধারা ও পার্শ্বভাগ তত্ত্বের অব্যাহত প্রভাব দৃশ্যমান। কেননা জঙ্গি ভিয়েতনামের বিরোধী খেমার রুশ বাহিনী এখনো পূর্বের মতো তাদের বিপ্লবী কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখছে। সাম্প্রতিককালেও যেহেতু এমন কি শান্তি প্রক্রিয়ার অধীন নির্বাচিত সরকারও অকার্যকর বলে প্রমাণিত হয়, ভিয়েতনামের অনুগামী বলে পরিচিত হুনসেন কার্যত একনায়ক হিসারে আবির্ভূত হয়েছে সেহেতু খোমাররুজদের বিপ্লবী প্রলম্বিত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার অনমনীয় ধারাও অব্যাহত রয়েছে, কম্বোডিয়ার ভেতর থেকে ও থাইল্যান্ডের সীমান্ত এলাকা থেকে তারা তাদের বিপ্লবী যুদ্ধ অব্যাহত রাখছে।

এটা অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে, বিপ্লবী প্রলম্বিত যুদ্ধ ও পার্শ্বভাগ তত্ত্ব-সদৃশ যুদ্ধের প্রক্রিয়া বা বিদ্রোহের তৎপরতা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ছাড়া সমকালীন আরো অনেক দ্বন্দ্বেই পরিলক্ষিত হয়। ইউরোপের উত্তর আয়ারল্যান্ড, সাইপ্রাস, কসোভো, এশিয়ার আফগানিস্তান, কাশ্মির, এমন কি পার্তব্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় বিদ্রোহের মতো প্রভৃতি দ্বান্দ্বিক অঞ্চল বা এলাকায় প্রলম্বিত যুদ্ধ ও পার্শ্বভাগ তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আফ্রিকার ইথিওপিয়া, সুদান, এঙ্গোলা, রুয়ান্ডা, প্রভৃতি দেশেও বিপ্লবী ও জাতিগত সহিংসতায় সমরূপ ধারা পরিলক্ষিত হয়। আয়ারল্যান্ডের তিন দশকের সহিংস অভিযানে সিনফেইন ও আইরিশ বিপ্লবী বাহিনী আইরিশ প্রজাতন্ত্রকে পার্শ্বভাগ হিসেবে ব্যবহার করে, সাইপ্রাসে ব্যবহৃত হয় তুরস্ক, আর কসোভোতে বর্তমানে স্বাভাবিকভাবেই ব্যবহৃত হয় প্রতিবেশী দেশ আলবেনিয়া। আফগানিস্তানে সোভিয়েত বিরোধী অভিযানকাল থেকেই পাকিস্তান ও ইরান ব্যবহৃত হয় পার্শ্বভাগ হিসেবে, কাশ্মিরে ব্যবহৃত হচ্ছে পাকিস্তান এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয় বিদ্রোহীরা ভারতকে তাদের পার্শ্বভাগ হিসেবে ব্যবহার করে। প্রায়শ বিপ্লবীরা তাদের পার্শ্বভাগ দেশ সম্পর্কে প্রকাশ্যে স্বীকার করে না। প্রতিবেশী ভারতের মতো তথাকথিত পার্শ্বভাগ দেশও তাদের ভূমিকা অস্বীকার করে চলে, কিন্তু পক্ষ-বিপক্ষ কারোর অজানা থাকে না কার কি প্রকৃত ভূমিকা। বিপ্লবী প্রক্রিয়া, রাজনীতি ও কূটনীতি এক্ষেত্রে মিথস্ক্রিয়া চক্রের আবর্তে সংমিশ্রিত হয়, অনেক ক্ষেত্রেই চলে শূন্যমানের কৌশলগত খেলা - যে খেলার পরিণতি প্রায়শ হয়ে হার-জিতের মাধ্যমে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কে এ কৌশলগত খেলা চলে আসছে অনন্তকাল থেকে, সেই ধারাবাহিকতা এখনো বজায় রয়েছে এবং সম্ভবত

www.pathagar.com

ভবিষ্যতেও থাকবে। সব সময়েই এ দ্বন্দ্বের প্রক্রিয়া যে কৌশলগত তত্ত্বের ভাষা-পরিভাষায় উপস্থাপিত হবে তা' নয় ; কিন্তু প্রবহমান কৌশলগত দ্বন্দ্বের প্রক্রিয়ায় দ্বন্দ্বরত পক্ষ-বিপক্ষ তাদের নিজ নিজ অবস্থান সুদৃঢ়করণ, সুযোগের অন্বেষায় এবং প্রতিপক্ষকে কাবু বা ঘায়েল করার মানসে প্রলম্বিত যুদ্ধ সদৃশ ও পার্শ্বভাগ তত্ত্বের অনুরূপ রণনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রবৃত্ত হবে এটা স্বাভাবিক। সাফল্য ও ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিত ভিন্নতর হতে পারে, থাকতে পারে বিভিন্নধর্মী ব্যাখ্যা। কিন্তু যুদ্ধদ্বন্দ্ব যতদিন থাকবে পার্শ্বভাগ তত্ত্বও তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলবে– এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

তথ্যনির্দেশ

১. অপ্রতিসম দ্বন্দ্ব বা যুদ্ধের তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট উপস্থাপিত করেন প্রথিতযশা নরওয়েজীয় সমাজবিজ্ঞানী হোয়ান গালটুং। লেখকের গ্রন্থ 'ভিয়েতনামের রণাঙ্গন' ঃ বিপ্লবী যুদ্ধের কলা-কৌশল' (ঢাকা, বাংলা একাডেমী) বিশেষ করে ভূমিকা দ্রষ্টব্য। এ গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ও দ্রষ্টব্য।

২. General Vol Nguyen Giap, *National, liberation War in Vietam: General Line, Strategy and Tactics.* (Hanoi, Foreign Language Publishing House, 1971,) পৃ. ২৪

৩. Abul Kalam, *Peacemaking in Indochina 1954 - 1975*, Dhaka, University of Dhaka. 1983, পৃ. ২৮

৪. Giap, *National Liberation War*, পৃ. ৩১ - ৩৩

৫. 'ঐ' পৃ. ৯২

৬. 'ঐ' পৃ. ৯২ - ৯৩

৭. 'ঐ' পৃ. ৯২

৮. উদ্ধৃত, T.N. Green, :"Inside Vietnam", *The Guerrilla and How to Fight Him* (New York, Frederick A. Praeger, 1962), পৃ. ১৪৭

৯. দ্রঃ Bernard B. Fall (ed.) *Ho Chi Minh on Revolution (London, Pall Mal Press,* 1971) পৃ. ৩০৩ ; Jon M. Van Dyke, *North Vietnam's Strategy for Survival* (Palo Alto, Calif., পৃ. ৩০

১০. দ্রঃ Abul Kalam, "the Indochinese Triangle: Diplomacy Between Hanoi, beijing and Moscow". *The Journal of Asiatic Society of Bangladesh* (Humanities), XXVIII: (June 4983), পৃ. ৩০

১১. "Statement of General Vo Nguyen Giap of July 1965", উল্লেখিত, George McT Kahin and Richard F. Lewis, *The United States in Vietnam* (New York: Dial Press, 1969), পৃ. ২৩১

www.pathagar.com

১২. "Life in North Vietnam," *China News Analysis*, No. 586 (22 October 1965); আরো দেখুন, the Resolution of the Central Committee to the Dang Lao Dong, উল্লেখিত, Van Dyke, 'প্রাগুক্ত' পৃ. ৩০

১৩. প্রতিরক্ষামূলক রণকৌশল ব্যবহৃত হয় শত্রু বাহিনীকে ধ্বংস বা নিশ্চিহ্ন করার জন্য, আর আত্মরক্ষামূলক নিষ্ক্রিয় রণকৌশল ব্যবহার করা হয় শত্রুর আক্রমণাত্মক অভিযান থেকে নিজস্ব সামরিক ও কৌশলগত সম্ভাবনাময় অবস্থানসমূহ রক্ষা করা। Johan Galtung, *Peace and Defence: Essays in Peace Research*, Vol II. (Copenhagen, Christian Ejlers Forlag, 1976) পৃ. ৩৮৩

১৪. Cecil Brownlow, : North Viet Air Threat Increases, "*Aviation Weekly and Space Technology*, LXXXIX: 23(2 December 1968), পৃ. ১৭; Adm. US.G. Sharp, *Report on the War in Vietnam* (Washington. D.C., U.S. General Printing Office, 1969), পৃ. ৪; Van Dyke, 'প্রাগুক্ত' পৃ. ৫৯ - ৬৭

১৫. Van Dyke, পৃ. ৬৬ - ৬৭

১৬. 'ঐ' পৃ. ৭৩- ৭৪

১৭. Wilfred G. Burchett, *Vietnam North: A First-hand Report* (London, Lawrence and Wishart, 1966), পৃ. ৬৬ ; Dave Dellinger, "Report from the Tribunal-II", *Liberation*, XII:3 (May-June 1967), পৃ. ৮

১৮. জিয়াপ উদ্ধৃত, Le Monde (8 December 1966)

১৯. আরো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্য দেখুন Van Dyke, 'প্রাগুক্ত' পৃ. ৭৩ - ৭৭

২০. Burchett, Vietnam North পৃ. ২৮; Adm Sharp, পৃ. ২৫ - ২৬; P.J. Honey, China News Analysis, No. 268 (9 September 1966): Van Dyke 'প্রাগুক্ত' পৃ. ৭৮

২১. আরো বিশদ আলোচনার জন্য দেখুন, Van Dyke, 'প্রাগুক্ত' পৃ. ৭৮ - ৮৭"

২২.'ঐ' পৃ. ১৮৬

২৩. Ference Fabian, "Hanoi Under Fire", *The Far Eastern Economic Review*, LIV:3 (20 Octorber 1966). পৃ. ২৪

২৪. উল্লেখিত, Van Dyke, পৃ. ৮০

২৫. 'ঐ' আরো দেখুন, Giap's Statement of July 1965, উল্লেখিত, Kahin and Lewis 'প্রাগুক্ত,' পৃ. ২৩১ - ২৩২

২৬. Robert F. Turner, *Vietnamese Communism: Its Origins and Development* (Stanford, Calif., Hoover Institution; 1975), পৃ. ২৭৬। ভিয়েতনাম যুদ্ধে ভিয়েতনামী বিপ্লবীদের প্রতি চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য-সমর্থন সম্পর্কে আরো বিশদ ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, Abul Kalam, : The Indochinese Triangle: Diplomcy Between Hanoi, Beijing and Moscow, "*Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*,

www.pathagar.com

Vol. XXVIII, No., 1 (June 1983), পৃ. ৩০ - ৫৩

২৭. "Voice of Vietnam~ (1 January 1971), 'ঐ' পৃ. ২৪৬ উত্তর ভিয়েতনাম হ্যানয় সরকারেরর গৃহীত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাদির আরো বিশদ বিররণের জন্য দেখুন, General Vo Nguyean Giap, Peoples, War Against U.S. Aero-Naval War (Hanoi, Foreign Languages Publishing House, 1975)

২৮. "Voice of Vietnam" (2 February 1972) উল্লেখিত, Turner, 'প্রাগুক্ত,' পৃ. ২৪৬

২৯. দ্রঃ Julian Manyor, The Fal of Saigon (London, Rex Collings, 1976); Tizino Tezani, Giai Phongl, *The Fall and Liberation of Saigon, Translated by John Shapley* (New York : St. Martins Press, Inc, 1976); আবুল কালাম, 'ভিয়েতনামের রণাঙ্গনে ঃ বিপ্লবী যুদ্ধের কলাকৌশল' (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫)

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

আঞ্চলিকতা, সিস্টেম তত্ত্ব ও দক্ষিণ এশিয়া

ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিশ্ব রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কে নতুন নতুন রাজনৈতিক ধারণা প্রবর্তিত হয়ে আসছে। এসব ধরণার মধ্যে রয়েছে 'সিস্টেম', 'উপ-সিস্টেম', 'আঞ্চলিক সংহতি' ইত্যাদি। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জাতীয় রাষ্ট্রের আচরণ বা তাদের ব্যবহারিক ধারার বিশ্লেষণে এ ধরনের প্রযোজ্য ধারণাগুলো ব্যবহৃত হয়।

ঐতিহ্যগতভাবে পণ্ডিত ও বিশ্লেষকবৃন্দ বিশ্বকে একটি যৌথ সত্তা হিসেবে প্রকাশের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রত্যয় ব্যবহার করেন। এসব প্রত্যয়ের মধ্যে 'বিশ্ব সমাজ', 'বিশ্ব পরিবার'-এর মতো ধারণা অন্তর্ভুক্ত। বিশ্বসত্তা সম্পর্কিত এ ধরনের প্রত্যয়ের কোনো তত্ত্বীয় ভিত্তি ছিল না । এ সবের ব্যবহার হয় অনেকটা শিথিলভাবে, রাষ্ট্রসমূহের লেনদেন বা বিনিময়ভিত্তিক সম্পর্কের কারণে। সম্ভবত এ প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় কখনো সাদৃশ্যমূলক, কখনো উপমার্থে। এসব প্রত্যয়ের ব্যবহারে বিশ্ব সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণার একটি মৌলিক ঐক্যের পরিচয় মেলে, সন্ধান মেলে তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত সামঞ্জস্যের।

পূর্বেই বলা হয়েছে, বিশ্ব-ভূমণ্ডল সম্পর্কিত উপর্যুক্ত চিরায়িত প্রত্যয়ের ব্যবহারে কোনোরূপ তত্ত্বীয় বা ধারণাগত ভাব ব্যক্ত হতো না, বুঝানো হতো না যে বিশ্ব একটি তত্ত্বীয় কাঠামো সন্নিবিষ্ট 'সিস্টেম' বিশেষ। কিন্তু সমাজবিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে এ ধরনের তত্ত্বীয় ভাব ও ধারণাগত ব্যবহার অপরিহার্য বলে বিবেচিত। সমকালীন আন্তর্জাতিক আচরণ ও ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জাতীয় রাষ্ট্রের আচরণ শুধু ব্যাখ্যা করা নয়, এর আরো উদ্দেশ্য হচ্ছে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাষ্টসমূহের সমরূপ বৈশিষ্ট্য ও আন্তক্রিয়ার ধারা চিহ্নিত করা।

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সিস্টেম কাঠামো বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যবহৃত হতে পারে। বিশ্বের সব জাতীয় রাষ্ট্রের সমন্বয়ে একটি বৃহত্তর সিস্টেম কাঠামো গঠিত হতে পারে। জাতিসংঘকে কেন্দ্র করে সমকালীন

www.pathagar.com

বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের 'আন্তক্রিয়াভিত্তিক বন্ধনকে অনেকে একটি সিস্টেম হিসেবে অভিহিত করেন। আবার কেউ ভাবতে পারেন বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন পর্যায়ের আন্তক্রিয়া বা কর্মকাণ্ড ভিত্তিক একটি বিবর্তনমুখী পরিকল্পিত সিস্টেম সম্পর্ক কিংবা কেউ ভাবতে পারেন বিশ্বের ক্ষুদ্রতর অংশবিশেষের সমন্বয়ে উপ-সিস্টেম সম্পর্কে। এমন কি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সংগঠিত আঞ্চলিক সংস্থা সংগঠনকে কেন্দ্র করে সদস্য দেশগুলির বিশেষ বিশেষ পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ক উদ্দেশ্য বা সুনির্দিষ্ট কর্মকাণ্ডের বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় উপ-সিস্টেম গঠিত হতে পারে।

এই উপ-সিস্টেমের ধারণা আঞ্চলিক পর্যায়ে 'সংহতি' (intetration) অর্জনের প্রয়াসের সামঞ্জস্যপূর্ণ। আঞ্চলিক সংহতি যখন যথার্থভাবে পূর্ণরূপ লাভ করে তখনি উপ-সিস্টেমের তাত্ত্বিক অভিব্যক্তি বাস্তব বা কার্যকর রূপ ধারণ করে। আঞ্চলিক পর্যায়ে একদিকে রাষ্টসমূহের সমরূপ ভয়ভীতি ও হুমকি জনিত চেতনা, পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যুদ্ধ-দ্বন্দ্ব, কলহ ও রেষারেষির প্রতি অনীহা, অন্যদিকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিলাভে পারস্পরিক সমঝোতা ও সাহায্য, সহানুভূতি ও সহযোগিতার ভাব থেকে আঞ্চলিক সংহতির ধারণা সুসংহত এবং উপ-সিস্টেম তত্ত্বীয় ধারণা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে।

প্রকৃতপক্ষে বিগত কয়েক দশকে বিশ্বব্যাপী আঞ্চলিক পর্যায়ে সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে, চলে আসছে আঞ্চলিক সংহতি স্থাপনের প্রয়াস, গড়ে উঠেছে বহু ধরনের আঞ্চলিক সংস্থা ও সংগঠন। এসবের উদ্দেশ্য হচ্ছে আঞ্চলিক পর্যায়ে রাষ্ট্রসমূহে স্থিতিশীল শান্তি অর্জন ও গঠনমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়া সুনিশ্চিত করা। ১৯৫০-এর দশকের গোড়া থেকেই আঞ্চলিকতার ইতিবাচক প্রক্রিয়া শুরু হয়। পরবর্তীকালে ইউরোপীয় অভিন্ন বাজারের প্রতিষ্ঠা, পর্যায়ক্রমে এর বিকাশ ও বিস্তৃতির ফলে পশ্চিম ইউরোপে আঞ্চলিক সংহতি সুদৃঢ় হয়। প্রায় একই সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে কেন্দ্র করে পূর্ব ইউরোপে, কিছুটা এককেন্দ্রিক বা উলম্ব প্রকৃতির হলেও, সংহতি প্রক্রিয়া চলে কমেকন (Council for Mutual Economic Assistance বা COMECON) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এমন কি দক্ষিণ এশিয়ার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতেও ১৯৬৭ সনে আসিয়ান (Association of Southeast Asian Nations বা ASEAN) প্রতিষ্ঠার পর থেকে আঞ্চলিক সংহতি স্থাপনের প্রক্রিয়া চলে আসছে। এভাবে বিশ্বব্যাপী আঞ্চলিকতার ধারণা জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, যুদ্ধদ্বন্দ্ব নিরসন ও উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার কাজে এই ধারণা ক্রমশ সমাদর লাভ করে আসছে। এ প্রক্রিয়ায় আঞ্চলিক সংহতি পূর্ণতা লাভ করে

www.pathagar.com

চলছে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং সংহতি প্রক্রিয়া আঞ্চলিক পর্যায়ে উপ-সিস্টেম তত্ত্বীয় ধারণার বাস্তব রূপদান করে চলছে।

অথচ দক্ষিণ এশিয়া বহুকাল থেকে 'আঞ্চলিক অভিব্যক্তিবিহীন একটি অঞ্চল' হিসেবে পরিচিত। ১৯৭৭ সন থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রয়াস চলে আসছে। এ সহযোগিতার উদ্যোগ গ্রহণ করে বাংলাদেশ। ১৯৮৫ এর ডিসেম্বরে ঢাকায় এক শীর্ষ বৈঠকে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সংস্থা সার্ক (South Asian Association for Regional Cooperation বা SARC এর উদ্বোধনের পর এই অঞ্চলে আঞ্চলিক সমঝোতা, সহযোগিতা ও সৌহার্দ্য স্থাপনের প্রয়াস সাংগঠনিকরূপ পরিগ্রহ করে।

১৯৮৫-১৯৮৬ সনে সার্ক-এর সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট সার্কভুক্ত বিভিন্ন দেশ সফর করেন। সার্ক-এর মাধ্যমে আঞ্চলিকতার ভিত মজবুত করা ছিল তাঁর সফরের মৌলিক উদ্দেশ্য। ১৯৮৮ সনে বাংলাদেশে প্রলয়ংকারী বন্যার পর বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট পুনর্বার প্রতিবেশী দেশগুলো সফর করেন। বাংলাদেশসহ এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশে উপর্যুপরি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় আঞ্চলিক সচেতনতা সৃষ্টি এবং আঞ্চলিক প্রয়াসকে সমন্বিত রূপ দেয়া ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। ফলে দ্বি-পাক্ষিক পর্যায়ে হলেও কয়েকটি 'টাস্ক ফোর্স' (Task Force) বা কমিশন গঠিত হয়। সার্ক গঠিত হওয়া সত্ত্বেও দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কে অবিশ্বাস ও সন্দেহের ঐতিহ্যিক ধারা বিদ্যমান। ফলে আঞ্চলিকতার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি 'সংহতি' অর্জনের পরিবেশ এখনো সৃষ্টি হয় নি। ১৯৭০-এর দশকের শেষপাদে একটি আঞ্চলিক সংস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে আঞ্চলিকতার ভিত গড়ে তোলার প্রস্তাব যখন উত্থাপিত হয় দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম দেশ ভারত তখন এ ধরনের ধারণার প্রতি সংহতি প্রকাশে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। কেননা ভারত বরাবরই দ্বি-পাক্ষিক ভিত্তিতে আঞ্চলিক সমস্যা নিরসন বা সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে আগ্রহী। পরে অবশ্য বহুপক্ষীয় ধারণা ভিত্তিক আঞ্চলিকতার প্রতি ভারতের মনোভাবের কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। উল্লেখ্য, দক্ষিণ এশিয়ার আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কে দ্বিপাক্ষিক বিষয়গুলি এখনো সার্কের কর্মসূচি বহির্ভূত।[১] রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক দ্বন্দ্বমুখর সম্পর্ক আঞ্চলিকতার পথে প্রধান প্রতিবন্ধক - যে ভাবাদর্শের ভিত্তিতে দক্ষিণ এশিয়ায় গড়ে উঠতে পারে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বীয় ভাব সন্নিবিষ্ট একটি উপ-সিস্টেম। এ জাতীয় ধারণা রূপায়ণে কার্যকর প্রক্রিয়া এখন সূচিত হয় নি।

অবশ্য দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য শুধু দ্বান্দ্বিক উপাদান সম্বলিত নয়, এ অঞ্চলের ইতিহাস এবং ঐতিহ্য ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিতও বটে। প্রবন্ধে এ অঞ্চলের দ্বান্দ্বিক আবর্ত ও সমরূপ বৈশিষ্ট্য উভয় দিকের ওপর

www.pathagar.com

আলোকপাত করে এ ধরনের যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে যে, দক্ষিণ এশিয়ায় উন্নততর বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মতো উপ-সিস্টেমের তত্ত্বীয় ভাবাদর্শভিত্তিক বিবর্তন ঘটাতে হলে এ অঞ্চলে সাংগঠনিকভাবে আঞ্চলিকতার ভাবাদর্শ গ্রহণ ও ধারণ করতে হবে, বাড়াতে হবে সহযোগিতার পরিধি, প্রতিসম ভিত্তিতে বহুজাতিক পর্যায়ে গড়ে তুলতে হবে আনুভূমিক আন্তক্রিয়া যাতে আঞ্চলিকতার ভিত বিস্তার লাভ করতে পারে। দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে এবং এ প্রক্রিয়ায় বহুরূপা ও বিচিত্রধর্মী সিস্টেমের পরিবর্তে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হবে একটি সমরূপধর্মী ও সুসংহত সিস্টেম।

সিস্টেম কাঠামো

দক্ষিণ এশিয়ায় সিস্টেম কাঠামোর ভিত্তিতে আঞ্চলিক বিবর্তন পর্যালোচনা করতে হলে এই ধরনের তত্ত্বীয় কাঠামোর আরো ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কতিপয় বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষণে সহায়ক উপকরণ হিসেবে সিস্টেম পদ্ধতি ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এসব বিশেষজ্ঞদের মধ্যে প্রথিতযশা মার্কিন পণ্ডিত চার্লস ম্যাকল্যালেন্ড অন্যতম। তাঁর ব্যবহৃত সিস্টেম পদ্ধতির উদ্দেশ্য হচ্ছে আন্তর্জাতিক আচরণের ধারাকে "এমন এক প্রবহমান সিস্টেম যৌগিক উপদান হিসেবে উপস্থাপিত করা যা' বিশেষ দিকে পরিচালিত হবে, নিয়োজিত হবে বিশেষ অভীষ্ট লক্ষ্য সাধনে"।[২]

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে সিস্টেম পদ্ধতির ব্যবহার হয়ে থাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জাতীয় রাষ্ট্রের মধ্যে গড়ে ওঠা সম্পর্কের ভাবপ্রবাহের ধারা ও সমঝোতার প্রক্রিয়া বুঝার উদ্দেশ্যে। একই সঙ্গে এই পদ্ধতির আরো উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ আন্তক্রিয়ার ধারা চিহ্নিত করা। লক্ষ্য হচ্ছে এ ধরনের আন্তক্রিয়া পরিমাপ করা ও মূল্যায়ন করা।

সিস্টেম কাঠামো সময় ও পরিবেশ উভয় পরিপ্রেক্ষিত ও আঙ্গিক থেকে আন্তরাষ্ট্র সম্পর্কের ধারা প্রবাহ নির্ণয় হতে পারে। বলা প্রাসঙ্গিক, যে কোনো সম্পর্কের সমন্বয়ে সিস্টেম গঠিত হতে পারে। সিস্টেম কাঠামো যেমন আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ডের সমরূপতা বা সাদৃশ্য বিচার করার কাজে সহায়ক হতে পারে, তেমনি আন্তর্জাতিক আচরণের নিয়মমাফিক বা ব্যবহারিক ধারা উপস্থাপনে সহায়ক হয়, এবং এক একটি সিস্টেমে অন্তর্গত বিভিন্ন উপাদান বা এসবের অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যাবলী নিরূপণেও সাহায্য করে।

বস্তুত, সিস্টেম দৃষ্টিকোণের উপকারিতা বহুমুখী। এই দৃষ্টিকোণ গৃহীত হলে আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের যোগসূত্র পর্যালোচনা করা চলে। আন্তর্জাতিক আচরণের এ ধরনের উপর্যুপরি ধারা, ক্রমানুক্রম বা প্রতিক্রিয়া যদি পৃথক পৃথক বা স্বতন্ত্রভাবে যথাযথ মূল্যায়ন করা হয় তাহলে আন্তর্জাতিক সিস্টেম ও

www.pathagar.com

উপ-সিস্টেমের মধ্যে সংযোগ বা আন্তঃনির্ভরশীলতার প্রকৃতি সম্পর্কে আন্তঃদৃষ্টি লাভ করা যেতে পারে।[৩]

সিস্টেমে বড়, ছোট বা মাঝারি যে কোনো প্রকার হতে পারে। প্রত্যেকটি ছোট সিস্টেম তার নিজের চেয়ে বৃহত্তর সিস্টেমের কার্যক্রম যেমন প্রভাবিত করতে পারে তেমনি সেই বৃহত্তম সিস্টেমের কর্মকাণ্ড দ্বারা ক্ষুদ্রতর সিস্টেমও প্রভাবিত হতে পারে। তাই প্রতিটি সিস্টেম, স্বয়ং একটি সিস্টেম হওয়া সত্ত্বেও, আরেকটি বৃহত্তর সিস্টেমের সঙ্গে সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে একটি উপ-সিস্টেম হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।[৪]

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক সিস্টেম

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর যে নতুন বিশ্ব জন্মলাভ করে সেই বিশ্বকে একটি আন্তর্জাতিক সিস্টেম হিসেবে উপস্থাপিত করা যেতে পারে। এ সিস্টেমের ভিত্তি হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তরকালে উদ্ভূত জাতীয় রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ক্রমবর্ধমান আন্তক্রিয়া এবং তাদের পারস্পরিক সংযোগ বা পরস্পরের নিয়মমাফিক আচরণ। ফলে এসব রাষ্ট্র তাদের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও আন্তক্রিয়ার মাধ্যমে একক বন্ধনে আবদ্ধ হয়, একটি ব্যাপকতর সিস্টেমের রূপ পরিগ্রহ করে।

এই আন্তর্জাতিক সিস্টেম অনেক গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তবে এ সিস্টেমের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ব্যাপকতা বা প্রসার লাভ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত নব স্বাধীনতালব্ধ জাতীয় রাষ্ট্রগুলো আঞ্চলিক পর্যায়ে এক নতুন জীবন এবং জোর কর্মচাঞ্চল্য প্রদর্শন করে। ফলে তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বৃহত্তর আন্তর্জাতিক সিস্টেমের সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে এসব আঞ্চলিক উপ-সিস্টেম হিসেবে বিবেচিত হয়। এ ধরনের আঞ্চলিক উপ-সিস্টেমকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষক মাইকেল হা'স একই অঞ্চলে অবস্থিত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে "অপেক্ষাকৃত স্বয়ংসম্পূর্ণ রাজনৈতিক আন্তক্রিয়ার সমন্বিত বেড়াজাল" হিসেবে অভিহিত করেন।[৫]

উল্লেখ্য, এই আঞ্চলিক উপ-সিস্টেমের আন্তক্রিয়ার তীব্রতা ও পর্যায় বিভিন্নভাবে পরিমাপ করা যায়। এসব আন্তক্রিয়ার মধ্যে সহযোগিতামূলক কার্যক্রম, কূটনৈতিক বিনিময় বা মৈত্রী সুলভ আচরণ যেমন অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তেমনি থাকতে পারে যুদ্ধদ্বন্দ্বের মতো অসহযোগিতামূলক কার্যক্রমও। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ ধরনের সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ও আত্মপ্রত্যয় প্রভৃতি। এই সিস্টেমের বৈশিষ্ট্যের মাপকাঠি স্বরূপ।

www.pathagar.com

সিস্টেম বা উপ-সিস্টেম তত্ত্বের এরূপ ধারণাগত ভিত্তি কঠোর বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা প্রসূত বিশ্লেষণের অনুকূলে সহায়ক না হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে প্রধানত ভৌগোলিক উপাদানের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বীয় ধারণা প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। কেননা আন্তর্জাতিক আন্তক্রিয়া মোটামুটিভাবে ভৌগোলিক বিভক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[৬]

ব্র্যাচার ও দক্ষিণ এশীয় সিস্টেম

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক যে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ আন্তর্জাতিক সিস্টেমকে আঞ্চলিক উপ-সিস্টেম পর্যায়ে চিহ্নিত করেন মাইকেল ব্র্যাচার তাঁদের অন্যতম।[৭] সমকালীন আন্তর্জাতিক সিস্টেমকে তিনি পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন। দক্ষিণ এশিয়া এর মধ্যে একটি। ব্র্যাচারের ধারণায় দক্ষিণ এশিয়া ছাড়া আর বাদবাকি চারটি উপ-সিস্টেম হচ্ছে আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও পশ্চিম আফ্রিকা। দক্ষিণ এশিয়া বলতে ব্র্যাচার শুধু সাম্প্রতিককালে পরিচিত দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সংস্থা সার্কভুক্ত দেশগুলোকে বুঝান নি, তাঁর চিহ্নিত দক্ষিণ এশিয়ায় বর্তমান দক্ষিণ পূর্ব এশীয় রাষ্ট্রগুলোও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ব্র্যাচারের সার্বিক আঞ্চলিক বিভাজন বিতর্কিত এবং আরো বিতর্কিত দক্ষিণ এশীয় উপ-সিস্টেম সম্পর্কিত তাঁর ব্যাপকতর ধারণা। প্রকৃতপক্ষে ১৯৬০-এর দশকে ব্র্যাচারের উপস্থাপিত ইতিমধ্যেই বেশ কিছু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

ব্র্যাচারের চিহ্নিত দক্ষিণ এশীয় উপ-সিস্টেমের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তিকের দেশগুলো ১৯৫০-এর দশক থেকে ভিন্নতর আঞ্চলিক কাঠামো সৃষ্টির প্রক্রিয়া চালিয়ে আসছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক কাঠামো সম্পর্কিত প্রাথমিক উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়। ১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি, দক্ষিণ পূর্ব এশীয় চুক্তি সংগঠন (Southeast Asia Treaty Organization)-এর জন্মলগ্ন থেকে কম্যুনিস্ট ভীতি থেকে উদ্ভূত সেই সামরিক ও নিরাপত্তা কাঠামো তেমন একটা আঞ্চলিক সচেতনতা বা বিবর্তন ঘটাতে সমর্থ হয় নি। ১৯৬০-এর দশকে সেই আঞ্চলিকতার ভাব ও অনুভূতি পুনরায় সঞ্চারিত হয় মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন এবং ইন্দোনেশিয়ার সমন্বয়ে গঠিত 'মাফিলিন্ডো' (Malaysia, the Philippinees and Indonesia or Maphlilindo)-এর সৃষ্টি প্রক্রিয়ায়। কিন্তু সেই সংহতি প্রয়াস অংকুরেই বিনষ্ট হয় বিভিন্ন ধরনের আন্তরাষ্ট্রিক কলহের কারণে। ১৯৬০-এর দশকেই ইন্দোচীনের দেশগুলোতে কম্যুনিস্টদের ক্ষমতা দখলের ভীতি ও সম্ভাবনার কারণে এ অঞ্চলের কট্টর কম্যুনিস্ট বিরোধী রাষ্ট্রগুলো দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় জাতি সংস্থা (Association of Southeast Asian

www.pathagar.com

Nations or ASEAN) বা আসিয়ান গঠনে ইন্ধন যোগায়। এরপর থেকে ক্রমশ আসিয়ান দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় একটি সুনির্দিষ্ট আঞ্চলিক অভিব্যক্তি বা ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে সমর্থ হয়। অচিরেই এ অঞ্চলে আঞ্চলিক পর্যায়ে পারস্পরিক আন্তক্রিয়াভিত্তিক সম্পর্কে নতুন কর্মচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয়। অতএব দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া বর্তমানে স্পষ্টতই নতুন সংজ্ঞা দাবি রাখে এবং সে অনুযায়ী এই অঞ্চল নতুনভাবে সংগঠিত হয়ে চলছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নতুন দক্ষিণ এশীয় উপ-সিস্টেমের সংজ্ঞা আসিয়ানের সনদপত্রেই সন্নিবিষ্ট হয়, কেননা এতে দক্ষিণ পূর্ব এশীয় উপ-সিস্টেমকে ভারতীয় উপমহাদেশ ও প্রান্তস্থ এলাকা থেকে পৃথক রূপে চিহ্নিত করা হয়।

সার্ক ও বাংলাদেশের উদ্যোগ

স্মর্তব্য, দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মধ্যে ভৌগোলিক সেতুবন্ধনের দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ। অনেকের নিকট এটা প্রবাদের মতো ভূ-রাজনৈতিক সত্য। এরূপ বন্ধনের সুবাদে ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি বাংলাদেশ আসিয়ানের যোগদানে প্রয়াসী হয়। কিন্তু এতে বাংলাদেশকে ব্যর্থ মনোরথ হতে হয়। এরপর ১৯৭৭ সন থেকে ১৯৮০ সন অবধি বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান দক্ষিণ এশিয়ার একটি যৌথ সত্তা গঠনের ধারণা জনপ্রিয় করার প্রয়াসে তৎপর থাকেন। বাংলাদেশের ঐকান্তিক আগ্রহ ও সক্রিয় উদ্যোগের ফলে পরবর্তীকালে সহযোগিতার প্রয়াস প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। প্রাথমিক পর্যায়ে কিছুটা দ্বিধা বা সংশয় থাকলেও বাংলাদেশের আঞ্চলিক সহযোগিতা সম্পর্কিত প্রস্তাব পরবর্তীকালে এ অঞ্চলের বাদবাকি ছয়টি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অনুকূলে সাড়া লাভ করে। ফলে দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক উপ-সিস্টেমের সম্ভাবনা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।[৮] এরপর কিছুকাল থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় একটি আঞ্চলিক সাংগঠনিক কাঠামো ক্রমশ সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে আসছে, আঞ্চলিক পর্যায়ে দক্ষিণ এশিয়ায় উপ-সিস্টেম ধারণা বিবর্তিত ও বিকশিত হয়ে চলছে।[৯]

কাঠামোগতভাবে আঞ্চলিক সংস্থা সার্কের বিভিন্ন পর্যায়ে সাংগঠনিক অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়ে আসছে। প্রথমত সার্কভুক্ত দেশসমূহের সহযোগিতার প্রতিটি বিষয়ে সবদেশের বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে প্রতিনিধি রয়েছে। দ্বিতীয়ত, পররাষ্ট্র সেক্রেটারী পর্যায়ে রয়েছে সার্ক-এর স্ট্যান্ডিং কমিটি। সার্ক-এর তৃতীয় কাঠামো হচ্ছে দক্ষিণ এশীয় মন্ত্রী পরিষদ। চতুর্থত, প্রায় প্রতি বছর একবার দক্ষিণ এশীয় রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানদের শীর্ষ বৈঠকে রাজনৈতিকভাবে উচ্চতম পর্যায়ে আঞ্চলিক সহযোগিতার বিষয়াদি পর্যালোচনা করা হয়। পরিশেষে,

www.pathagar.com

নেপালের রাজধানী কাঠমুন্ডুতে সার্ক-এর সদর দফতর স্থাপিত হয়েছে। সার্ক সেক্রেটারীয়েটের স্থায়ী কর্মকর্তাদের মধ্যে রয়েছে একজন সেক্রেটারী জেনারেল বা মহাসচিব। কাঠামোগতভাবে বিশেষজ্ঞ পর্যায় থেকে শুরু করে উচ্চতম শীর্ষ পর্যায়ে নিয়মিত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিকতার ভাব প্রবাহে কিছুটা গতিশীল প্রক্রিয়ার উন্নয়ন ঘটবে এরূপ প্রত্যাশা করা যায়।

প্রকৃতপক্ষে, আন্তরাষ্ট্রিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে হিংসাবিদ্বেষ, কলুষতা, এমন কি সময় সময় তিক্ততা সত্ত্বেও দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলো তাদের প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক যোগাযোগ ও লেনদেন অব্যাহত রেখেছে, শীর্ষ পর্যায়ের বৈঠক কখনো কখনো কিছুটা দেরীতে হলেও সমান্তরাল ধারায় অব্যাহত রয়েছে। এ পর্যায়ের বৈঠকগুলোই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে, সম্ভব করে একেবারে নেতিবাচক তিক্ততা এড়িয়ে যেতে। আবার ক্ষেত্রবিশেষে ইতিবাচক কর্মসূচি গ্রহণেও উদ্বুদ্ধ করে। নেতিবাচক প্রক্রিয়ার মধ্যে উল্লেখ করা চলে ভারত ও পাকিস্তান পারমাণবিক সমঝোতা স্বাক্ষর, যাতে একে অপরের পারমাণবিক অবস্থানে আঘাত না হানার বিষয়ে সম্মত হয়। অর্থনৈতিক সহযোগিতার ইতিবাচক ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ১৯৯২ সনের 'সাপটা' বা 'দক্ষিণ এশীয় প্রেপারেনশীয়েল ট্রেডিং এরেঞ্জমেন্টস' ('South Asian Preferential Trading Arrangements')। পরবর্তী বছর (১৯৯৩ সন) থেকে এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়। গত বছর (১৯৯৮ সনে) মালে অনুষ্ঠিত শীর্ষ বৈঠকে ২০০১ সালের মধ্যে সাফটা'য় ('South Asian Free Trading Arrangement or SAFTA) রূপান্তরিত করার প্রতিশ্রুতিও অভিব্যক্তি ব্যক্ত করা হয়। সেই প্রতিশ্রুতি বা অভিব্যক্তি কতখানি কার্যকর হবে তা নির্ভর করবে সাফটা'র সুষ্ঠু বাস্তবায়ন বা সাফল্যের ওপর। এ অঞ্চলের বৃহত্তম দেশ ভারতের নতুন ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন ডানপন্থী সরকারের 'স্বদেশী' অর্থনৈতিক শ্লোগান আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সংহতির প্রত্যাশার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে কিনা তা' এপর্যায়ে বলা কঠিন। তবে ২০০১ সালের মধ্যে 'সাফটা' বাস্তবায়নের পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই পরিত্যক্ত হয়েছে। 'সাফটা' বাস্তবায়নের যে আন্তরিকতা ও পারস্পরিকতা ভারতের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা হয়, তাতে বাংলাদেশের মতো দেশকে হতাশ হতে হয়।

দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক শক্তি কাঠামো

অবশ্য শুধু সাংগঠনিক কাঠামো দিয়ে আঞ্চলিকতার ভিত সুদৃঢ় হয় না। এতে প্রয়োজন স্থিতিশীল শক্তিকাঠামো। অভ্যন্তরীণভাবে দক্ষিণ এশিয়ার শক্তি সম্পর্ক আপেক্ষিকভাবে স্থিতিশীল। এতে মোটামুটি একটি স্বনির্ভর নিরাপত্তা

www.pathagar.com

কাঠামো গড়ার প্রক্রিয়া চলে আসছে। তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বলা চলে, ১৯৪৭-এর পর থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় একটি দ্বি-মেরুকেন্দ্রিক সিস্টেম (bipolar system) প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব অব্যাহত রয়েছে। শক্তিকাঠামোর দিক থেকে ভারত সর্বদাই এ অঞ্চলের ক্ষমতার শিরোমণি হিসেবে বিবেচিত। তাই আঞ্চলিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারত দক্ষিণ এশিয়ায় একক মেরুকেন্দ্রিক সিস্টেম (unipolar system) প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী।[১০] অন্যদিকে পাকিস্তান দু'ভাগে বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও দক্ষিণ এশিয়ায় এ ধরনের বিবদমান পরিস্থিতির কোনোরূপ পরিবর্তন সাধিত হয় নি। ভারত এখনো লাভ করে নি তার কাঙ্ক্ষিত নিশ্চিত আঞ্চলিক কর্তৃত্ব।[১১] তাই দক্ষিণ এশিয়ার শক্তি কাঠামোকে তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণ থেকে একটি স্থিতিহীন দ্বি-মেরুকেন্দ্রিক সিস্টেম বলা চলে। এ অঞ্চলে একটি স্থিতিশীল সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করতে হলে সম্ভবত বাংলাদেশের মতো একটি তৃতীয় দেশের ভারসাম্যমূলক ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে যাতে দক্ষিণ এশিয়ার একটি শক্তিসাম্য সিস্টেম (Balance of Power System) গড়ে উঠতে পারে। বর্তমানে আঞ্চলিক স্থিতিশীল সিস্টেমের অভাবের কারণে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চিরাচরিত ও পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র উভয়বিধ খাতে চলমান তীব্র প্রতিযোগিতা দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যাহত করে চলছে।

এ ক্ষেত্রে অবশ্য বহিঃশক্তির সামরিক সাহায্য ও কৌশলগত যোগসূত্র দক্ষিণ এশিয়ার শক্তিকাঠামো এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আপেক্ষিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে আসছে। প্রকৃত অর্থে কিন্তু বাইরের শক্তির সাহায্য ও যোগসূত্র আঞ্চলিক শক্তিগুলোর নিরাপত্তাহীনতার পরিচয় বহন করে।[১২] ফলে বাইরের বিশ্বের শক্তিকোন্দলে দক্ষিণ এশিয়া ক্ষত-বিক্ষত হয়। বিশেষ করে পরাশক্তির দ্বন্দ্ব এবং চীন-সোভিয়েত বিরোধের প্রভাব বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মতো এ অঞ্চলেও পরিলক্ষিত হয়। প্রধান শক্তিদ্বয় নিজ নিজ বৃহৎ শক্তিসুলভ স্বার্থ চরিতার্থতায় আঞ্চলিক শক্তিগুলোর সঙ্গে বন্ধুভাবাপন্ন ও মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপনে প্রয়াসী হয়।

স্নায়ুযুদ্ধ উত্তরকালে বিগত কয়েক দশকের বৃহৎ শক্তির তীব্রতা না থাকলেও দক্ষিণ এশিয়ার বহিঃশক্তির লোলুপ দৃষ্টি এখনো লক্ষণীয়। অর্থনৈতিক-বাণিজ্যিক কারণে চীন বর্তমানে সকল দেশের সঙ্গে বন্ধুপ্রতিম সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী; কিন্তু মস্কো ভারতের সঙ্গে তার পুরনো ঘনিষ্ঠতার রেশ ধরে নয়াদিল্লীর সঙ্গে সামরিক-কৌশলগত সম্পর্কের অতীত ধারা অব্যাহত রাখতে আগ্রহী। ফলে এ অঞ্চলে-এর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম মিত্রশক্তিগুলোও এ অঞ্চলে তাদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক জোরদার করতে আগ্রহী। ভারতে গৃহীত বিগত বছরগুলোর অর্থনৈতিক

www.pathagar.com

উদারকরণ নীতি সেই আগ্রহের ইন্ধন স্বরূপ বলে প্রতিভাত হয়, কিন্তু সাম্প্রতিক 'স্বদেশী' প্রবণতা সেই আগ্রহের কি ধরনের প্রভাব ফেলবে বলা মুশকিল। বাংলাদেশের গ্যাস ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনার কারণে বৃহৎ শক্তিগুলো এদেশেও আগ্রহী হচ্ছে।

দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সংহতি প্রতিষ্ঠিত না হলে অদূর ভবিষ্যতে এ অঞ্চল শক্তি দ্বন্দ্বে পূর্বের চেয়েও অধিকতর ক্ষত-বিক্ষত হতে পারে। কেননা এ অঞ্চলের দু'টো বৃহৎ শক্তি, ভারত ও পাকিস্তান কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে মারাত্মক কৌশলগত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। কিন্তু রাজনৈতিক-কৌশলগত দ্বন্দ্বের পাশাপাশি দু'দেশের পারমাণবিক ও ক্ষেপণাস্ত্র উন্নয়নের প্রতিযোগিতা দক্ষিণ এশিয়াকে ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঠেলে দিতে পারে। খোদ ভারতের অভ্যন্তরেও নয়াদিল্লির কর্তৃত্বে চলছে বিভিন্ন ধরনের বিদ্রোহী তৎপরতা যার প্রভাব বাংলাদেশের মতো প্রতিবেশী দেশে পড়তে পারে। কাশ্মীর সীমান্তের ভারত-পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণ এলাকায় দু'দেশের 'সীমিত যুদ্ধ' কিংবা বাংলাদেশের সীমানা লগ্নে ভারতের পরিখা খনন প্রভৃতি কাঙ্ক্ষিত আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতির অনুকূল নয়। এসব হচ্ছে নিরাপত্তা হুমকি।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয়ও প্রণিধানযোগ্য। একুশ শতকে উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে দাম্ভিক প্রবণতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ব্যবসায়িকভাবে গুরুত্বপূর্ণ পূর্ব-দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের মাঝামাঝি ভারত মহাসাগরের পাদদেশে অবস্থিত এ অঞ্চলের কৌশলগত গুরুত্ব অনেকখানি বৃদ্ধি পাবে। দক্ষিণ এশিয়া হচ্ছে ওঠতি পরাশক্তি চীনের প্রতিবেশী এবং সম্ভাব্য চীন-জাপান কৌশলগত শক্তিদ্বন্দ্বে এ অঞ্চলের দেশগুলো কৌশলগত টানা- হেঁচড়ায় পড়তে পারে।

আদর্শিক দ্বন্দ্ব ও অভ্যন্তরীণ কাঠামোগত হুমকি

সিস্টেম দৃষ্টিকোণ থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় স্থিতিশীলতার অভাব ও আঞ্চলিক নিরাপত্তাহীনতার সঙ্গে এ অঞ্চলে পরিলক্ষিত নেতিবাচক প্রক্রিয়ার বিষয় উল্লেখ করা চলে। ১৯৪৭ সনে দক্ষিণ এশিয়ার মূল ভূ-খণ্ডভাগ বা ভারতীয় উপমহাদেশের ভাগাভাগি থেকে এখানে এক দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং কূটনৈতিক সংকট বিরাজ করে আসছে। অথচ বহির্বিশ্বের নিকট দীর্ঘকাল এই উপমহাদেশ ছিল একটি মাত্র দেশ। দক্ষিণে উত্তাল ভারত মহাসাগরের প্রান্ত থেকে উত্তরে স্নিগ্ধ-শুভ্র তুষারাবৃত হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে পশ্চিমে সপ্তমুখী সিন্দুর ওপর অবধি এই ঐতিহ্যমণ্ডিত উপমহাদেশের অভিন্ন আত্মার সন্ধান করেন। এখানকার মুণি-

www.pathagar.com

ঋষি ও পির-ফকির, ধর্ম প্রচারক ও রাজনৈতিক-দার্শনিক, কবি ও শিল্পী, ইতিহাসবেত্তা ও সমাজবিজ্ঞানী এবং বিভিন্ন স্তরের গুণী ও সুধীজন। এখানেই এক সার্বজনীন সুবিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হন প্রাচীন ভারতের গুপ্ত ও মৌর্য সম্রাটবর্গ, মধ্যযুগের শাহ-ইন-শাহ সুলতানেরা ও পরবর্তীকালে মুঘল রাজবংশ। মাত্র বিশ শতকে এসে সেই দেশ তার একক পরিচয় হারিয়ে ফেলে, হারায় তার অভিন্ন রাজনৈতিক সত্তা গড়ে তোলার বহু শতকের অভিলাষ। এই নেতিবাচক প্রক্রিয়া প্রকৃত অর্থে শুরু হয় দু'শত বছরেরও কম ঔপনিবেশিক শাসনামলে।

বলা প্রয়োজন, বিদেশী শাসক-গোষ্ঠী সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের প্রক্রিয়ায় ভারতীয় উপমহাদেশ অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক উলম্ব সিস্টেম-এর অংশ হিসেবে। সেই শাসন ও শোষণের প্রক্রিয়ায় এই উপমহাদেশের জনমানুষের ঐতিহ্যিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্কের বিনাশ ঘটে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বপন করে হিংসা-বিদ্বেষ ও ভাঙ্গনের বীজ। প্রকৃতপক্ষে, ঔপনিবেশিক শাসন আমল এবং তারপর থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে সেই বিদ্বেষের বীজ যে কোনো আঞ্চলিক সত্তা ও অভিব্যক্তির মূলে কাঠামোগতভাবে আঘাত হেনে চলেছে। ঔপনিবেশিক শক্তি একদিকে যেমন ইন্ধন যুগিয়ে ছিলো একশ্রেণীর উগ্রপন্থী হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতৃত্বের আধিপত্যবাদী ধ্যান-ধারণায়, অন্যদিকে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদীরাও ব্রিটিশ ভাগ-বাটোয়ারা এবং বিদ্বেষমূলক নীতির কারণে ভারতীয় মুসলমানরে জন্য পৃথক রাষ্ট্রসত্তা সৃষ্টির ব্যাপারে তৎপর হয়।

বস্তুত, পাকিস্তান সৃষ্টির ভিত্তিমূলে রয়েছে দ্বি-জাতি তত্ত্ব ও মুসলিম জাতীয়তাবাদ। ধর্মনিরপেক্ষতার আবরণে গঠিত ভারতে এই নীতি (দ্বি-জাতি) গৃহীত হলে স্বাভাবিক কারণে সেই দেশের ভাঙ্গন ধরাতে পারে। অন্যদিকে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা সার্বজনীন নীতি হিসাবে গৃহীত হলে পাকিস্তানের সৃষ্টি উদ্ভট বলে বিবেচিত হতে পারে। এভাবে এই উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলিম হিংসা-বিদ্বেষের বীজ এক দুষ্টচক্রের মতো আঞ্চলিক পর্যায়ে সহযোগিতা ও সংহতি প্রক্রিয়া ভীষণভাবে ব্যাহত করে চলছে। এই আদর্শিক সংকট থেকে নিষ্কৃতি না পেলে আঞ্চলিক পর্যায়ে, সিস্টেম ভিত্তিক তাত্ত্বিক বিবর্তন সম্ভব হবে না। কেননা পাকিস্তানের দ্বি-জাতি তত্ত্ব সার্বজনীন নীতি হিসেবে গৃহীত হলে দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম শক্তি ভারতে ভাঙ্গনের সম্ভাবনা বাড়বে, আর ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা দ্বি-খণ্ডিত পাকিস্তানের জাতীয় অস্তিত্ব এর বর্তমান অখণ্ডতার প্রতি হুমকি প্রদান করতে পারে। ধর্মের পাশাপাশি ভাষা ও জাতিগত বিদ্বেষ দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের সম্প্রীতি বিনষ্ট করে চলছে। যেমন, পাকিস্তানে গুরুত্ব দেয়া হয় ইসলাম ও উর্দু ভাষার ওপর। শ্রীলংকায়

www.pathagar.com

বৌদ্ধধর্ম ও সিংহলী ভাষার ওপর, নেপালে হিন্দুধর্মের ওপর, বাংলাদেশে ইসলাম ও বাংলা ভাষার ওপর, ভুটানে বৌদ্ধধর্মের ওপর। পরিশেষে, ধর্মনিরপেক্ষবাদী ভারতের রাজনীতি প্রধানত সাম্প্রদায়িক, আঞ্চলিক ও ভাষাভিত্তিক বিবেচনায় পরিচালিত হয়ে আসছে।[১৩] এভাবে আদর্শিক দ্বন্দ্ব ও অভ্যন্তরীণ কাঠামোগত হুমকি দক্ষিণ এশিয়ায় স্থিতিশীল সিস্টেম ভিত্তিক বিবর্তনে অন্তরায় সৃষ্টি করে চলছে।

আধিপত্যবাদ ও কর্তৃত্বের রেষারেষি

আঞ্চলিক পর্যায়ে এ ধরনের আদর্শগত দ্বন্দ্ব এবং অন্তর্নিহিত কাঠামোগত হুমকি ছাড়াও দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর অসম আকার, তাদের জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক অবস্থানের ক্ষেত্রে বিপুল পার্থক্য, সামরিক ক্ষমতা ও প্রযুক্তিগত যোগ্যতার দিক থেকে ব্যাপক ব্যবধান ও বৈপরিত্য প্রভৃতি স্থিতিশীল আঞ্চলিক বিবর্তনের পথে বাধা সৃষ্টি করে চলেছে। শিল্প ও অর্থনীতির অনেক ক্ষেত্রে ভারত ও পাকিস্তান দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের চেয়ে অনেক অগ্রগামী। কেননা স্বাধীনতা পূর্বকাল থেকে উভয় দেশে বেসরকারিভাবে স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা শিল্প এলাকা প্রসার লাভ করে। ফলে স্বাধীনতা উত্তরকালেও উভয় দেশে দ্রুত শিল্পোন্নতি ঘটে, উভয় দেশ সেই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ও আনুকূল্যের কারণে শিল্পোজাত পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনে বৈচিত্র্য ও দক্ষতা অর্জন করে বাজারজাতকরণের কলাকৌশলও শিখে অতি দ্রুত। বাংলাদেশসহ এই অঞ্চলের অন্যান্য অনগ্রসর দেশগুলোর পক্ষে ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমপর্যায়ে সুদক্ষ ব্যবসায়িক লেনদেন বা আর্থনীতিক আদান-প্রদানের ভিত্তিতে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলা কঠিন।

এসবের ফলে দক্ষিণ এশিয়ার সম্ভাব্য আধিপত্য ও কর্তৃত্ব নিয়ে রেষারেষি দেখা দেয়, বিঘ্ন সৃষ্টি হয়ে আসছে সম-অধিকারভিত্তিক আঞ্চলিক সত্তা গড়ে তোলার পথে। এ ধরনের ভয়ভীতিজনিত চেতনার প্রধান উৎসস্থল হিসেবে দেখা হয় ভারতকে। মূলত দক্ষিণ এশীয় সিস্টেমের আঞ্চলিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভারতকেন্দ্রিক।[১৪] এ চরিত্রের পরিচয় মেলে ভারতের ভৌগোলিক অবস্থা এবং এর অর্থনৈতিক অবকাঠামোতে, এর অপ্রতিসম শক্তিকাঠামো এবং এর সম্ভাব্য আধিপত্যবাদী অভিব্যক্তিতে।

দক্ষিণ এশিয়ার সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ভারত শুধু বৃহৎ নয় ; এ অঞ্চলের বাদবাকি, রাষ্ট্রগুলোর সমষ্টির চেয়েও সেই দেশ কয়েকগুণ বড়। ফলে দক্ষিণ এশিয়ার যে কোনো ধরনের বাহ্যিক কর্তৃত্বমুক্ত আঞ্চলিক সিস্টেম

www.pathagar.com

ভিত্তিক বিবর্তন ঘটলে প্রায় সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ধারায় ভারত এতে এককভাবে যে কোনো সিদ্ধান্ত নাকচ করার ক্ষমতা দাবি করতে পারে। এতে প্রতিবেশী দেশগুলোতে বিরূপ আশঙ্কা সৃষ্টি হতে পারে ভারতের সম্ভাব্য বৃহৎ শক্তি বা জ্যেষ্ঠভ্রাতৃসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে। ফলে এ অঞ্চলের ক্ষুদ্র দেশগুলো ভারতের সম্ভাব্য আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে বহিঃশক্তির নিকট ধর্ণা দেয়ার প্রবণতা বাড়তে পারে।[১৫] অবশ্য এও মনে রাখা প্রয়োজন, বহিঃশক্তির মৈত্রী যোগসূত্র দক্ষিণ এশীয়ার জটিল নিরাপত্তা কাঠামোর স্থিতিশীলতা বজায় রেখে আসছে। অথচ এই যোগসূত্রই ব্যাপকভাবে এ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর নিরাপত্তাহীনতার অবস্থা সৃষ্টি করছে। অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়ায় এ ধরনের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক অব্যাহত থাকার কারণে আঞ্চলিক দেশগুলোকে বহির্শক্তির নিকট ধর্ণা দিতে হয়।

বিষয়টি আরো কিছুটা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া নিরাপত্তা কাঠামোর প্রান্তে অবস্থিত দক্ষিণ এশিয়া। দু'টি অঞ্চলের মধ্যে বার্মা (মায়ানমার) বাফার হিসেবে অবস্থান করছে। ফলে দু' অঞ্চলের মধ্যে সামরিক ও নিরাপত্তাজনিত আন্তক্রিয়া নেই বললে চলে। দক্ষিণ এশিয়ার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত উপসাগরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা। এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা উপসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থাকে (Gulf Cooperation Council) কেন্দ্র করে সংগঠিত হয়ে আসছে। অবশ্য এই নিরাপত্তা অবকাঠামো মধ্যপ্রাচ্যের বৃহত্তর ও জটিল নিরাপত্তা অতিকাঠামোর অংশবিশেষ। দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে একমাত্র পাকিস্তান মধ্যপ্রাচ্যের এই কাঠামোর সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামরিক সংযোগ রক্ষা করে চলছে। এছাড়া আরো বাইরে রয়েছে বৃহৎ শক্তিসমূহের নিরাপত্তা কাঠামো। এর মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার জন্য অনিবার্য তাৎপর্যের কাঠামো হচ্ছে চীন-সোভিয়েত (বর্তমান চীন-রুশ) সম্পর্কের বিষয়। কেননা এই দু'শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দক্ষিণ এশিয়া অবিলম্বে প্রভাবিত হয়। বিশেষ করে এর ফলে মস্কো ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপনে প্রয়াসী হয়। মস্কো-বেইজিং সম্পর্কের বিষয় ছাড়া বিশ্বব্যাপী পরাশক্তির লড়াইতেও দক্ষিণ এশিয়া প্রভাবিত হয়, কেননা এ লড়াইয়ের ফলে স্বার্থের সংযোগ ঘটলে পরাশক্তি ও দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হয়।[১৬] এভাবে ভারতের আঞ্চলিক আধিপত্য স্থাপনের দাবি সোভিয়েত বা রুশ সাহায্য ও সমর্থনপুষ্ট বলে প্রতিভাত হয় এবং প্রায়শ ভারতীয় আঞ্চলিক কর্তৃত্বকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করে মস্কো দক্ষিণ এশিয়ায় মুখ্য বহির্শক্তির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।[১৭] ফলে সম্ভাব্য ভারতীয় প্রাধান্য ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান চীন-মার্কিন সহানুভূতি, মৈত্রী একাত্মতা ও অস্ত্র সরবরাহ কামনা করে আসছে। এভাবে এ অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে আধিপত্যবাদ ও কর্তৃত্ব নিয়ে

www.pathagar.com

রেষারেষির ফলে দক্ষিণ এশিয়া বহির্শক্তির আধিপত্যবাদ ও অপ্রতিসম ধ্যান-ধারণার শিকার হতে বাধ্য।

এ ধরনের সম্ভাব্য আধিপত্যবাদ ও অপ্রতিসম ধ্যান-ধারণা মাত্রই দক্ষিণ এশিয়ার সিস্টেমভিত্তিক আঞ্চলিক বিবর্তনের পরিপন্থী। তাই বলা চলে, সুস্থ, স্থিতিশীল ও গঠনমূলক আঞ্চলিক সত্তা গড়ার কাজে দক্ষিণ এশিয়ায় যে কোনো কূটনৈতিক প্রয়াস বা রাজনৈতিক প্রক্রিয়া অবশ্যি হতে হবে প্রতিসম সিস্টেম মডেলভিত্তিক–আর্থনীতিক, সামরিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে।

ভারত বনাম প্রতিবেশী দেশ : দ্বান্দ্বিক ঐতিহ্য ও বিচিত্রমুখী প্রবণতা

বিগত কয়েক দশক থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় অমীমাংসিত বিষয়াদি নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও অন্তঃকলহ প্রায় লেগেই রয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে, এসবের উৎপত্তি হয় ঔপনিবেশিক যুগে। ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিন্নমুখী গতিধারা, স্বাধীনতা উত্তরকালে নতুন গড়ে ওঠা রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের অভাব, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের রেখে যাওয়া আন্তঃরাষ্ট্রীয় ভৌগোলিক সীমারেখার সুনির্দিষ্ট চিহ্নিতকরণের অনুপস্থিতি প্রভৃতি এ অঞ্চলের দ্বন্দ্বকলহে ইন্ধন যুগিয়ে আসছে। দক্ষিণ এশিয়ায় স্বাধীনতা উত্তরকালে আরো বহুরূপা ও বিচিত্রধর্মী ভাবপ্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন রাষ্ট্রে ভাষা ও বর্ণ, ধর্মীয় ও জাতিগত বিষয় নিয়ে একরোখা মতবাদ, কুসংস্কার ও গোঁড়ামি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরস্পরবিরোধী নীতি কৌশলগত গ্রহণ প্রভৃতি কারণে এ অঞ্চলে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক বিষিয়ে ওঠছে।

ভারত ও পাকিস্তান ইতিমধ্যে পর পর তিনটি যুদ্ধ শক্তি-পরীক্ষায় লিপ্ত হয়। তিনটি যুদ্ধেই কাশ্মীর ছিল একটি মুখ্য রণাঙ্গন। দু'দেশের সম্পর্ক এখনো অহিনকুল, পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস ভিত্তিক, উভয়ের দ্বন্দ্ব অব্যাহত রয়েছে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও দ্বি-পাক্ষিক বিষয় নিয়ে। উভয় দেশ নিরন্তর অস্ত্র প্রতিযোগিতায় নিমগ্ন। এমন কি এই অস্ত্র প্রতিযোগিতা বিস্তার লাভ করে পারমাণবিক অস্ত্রখাতে। কাশ্মীরের ওপর কর্তৃত্ব নিয়ে দু'দেশ প্রায়শই লিপ্ত হয় সীমান্ত সংঘর্ষে। চলে সীমান্ত যুদ্ধও। এ অঞ্চলব্যাপী ভারতের একক আধিপত্য বিস্তারের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও পররাষ্ট্র নীতি সর্বদা সক্রিয় ও তৎপর।

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যেও দ্বন্দ্ব রয়েছে। অবিভক্ত পাকিস্তানের সম্পদ ও দায়দেনার ভাগ-বন্টন এবং বাংলাদেশে আটকে পড়া পাকিস্তানীদের

www.pathagar.com

ফেরত নেয়ার বিষয় নিয়ে উভয় দেশের মধ্যে বিবাদ বর্তমান।[১৮] অবশ্য ভারতের আধিপত্যবাদী প্রসারের বিরুদ্ধে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ উভয়েই মনস্তাত্ত্বিকভাবে একই ধরনের হুমকি বা ভয়ভীতিজাত চেতনার অংশভাগী। তাই অখণ্ড পাকিস্তানের ভাঙ্গনের প্রাক্কালে পাকিস্তানী বাহিনীর নৃশংসতা ও বাংলাদেশী জনগণের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও পাকিস্তান ও বাংলাদেশ উভয়েই সম্ভাব্য ভারতীয় হুমকি ও সম্প্রসারণবাদী প্রয়াস সম্পর্কে উৎকণ্ঠিত এবং উভয় দেশ নিজ নিজ নিরাপত্তা প্রয়োজনের কারণে পারস্পরিকভাবে সহানুভূতিশীল।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিরোধের ফিরিস্তি বিস্তর, যদিও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত সমাপ্তি ভারতের সাহায্য ও হস্তক্ষেপের পরে ত্বরান্বিত হয় এবং ১৯৭২ সন থেকে উভয় দেশ সরকারিভাবে বন্ধুপ্রতিম ও সহযোগিতা চুক্তির বন্ধনে আবদ্ধ হয়। উভয় দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত অভিন্ন নদ-নদীর পানির হিস্যা, তিন বিঘা ও দক্ষিণ তালপট্টি সম্পর্কিত বিরোধ, নৌ-সীমানা চিহ্নিতকরণ, উভয় দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাপক বৈষম্য, পার্বত্য বাংলাদেশের অভিযোগ— এ ধরনের বিভিন্ন বিষয়ে দু'টি প্রতিবেশী দেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব অব্যাহত রয়েছে।

ভারত ও শ্রীলংকার মধ্যে শ্রীলংকার তামিলদের প্রসঙ্গ নিয়ে যথেষ্ট তিক্ততা সৃষ্টি হয়। শ্রীলংকার তামিল সমস্যা দৃশ্যত শ্রীলংকার অভ্যন্তরীণ সমস্যা। কিন্তু তামিল বিদ্রোহীদের প্রতি ভারতের পরোক্ষ ইন্ধন, প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক আশ্রয় ও তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ, এমন কি অস্ত্র সরবরাহ প্রভৃতি নিয়ে অভিযোগ তামিল সমস্যার জটিলতা সৃষ্টি করে। শ্রীলংকা সম্ভবত ভারতের সামরিক ও রাজনৈতিক ফন্দি এবং কৌশলগত চাপের মুখে অনেকটা অনিচ্ছাভরে ১৯ জুলাই ১৯৮৭-এর রাজীব-জয়বর্ধনে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে। সেই চুক্তির ধারা অনুযায়ী ভারত শ্রীলংকায় তার নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করে তামিল সমস্যার 'শান্তিপূর্ণ' সমাধান করার উদ্দেশ্যে অপ্রতিসম ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। কিন্তু সেই চুক্তি নিয়ে প্রশ্ন উঠে যে এর মাধ্যমে, বিশেষ করে শ্রীলংকায় ভারতীয় সামরিক উপস্থিতির মাধ্যমে, তামিল সমস্যার আদৌ সমাধান হবে কিনা যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সিংহলীরা পরিতৃপ্ত থাকবে, পূরণ হবে সংখ্যালঘু তামিলদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক অখণ্ডতা বজায় থাকবে শ্রীলংকার। শ্রীলংকায় সুদীর্ঘকালব্যাপী ভারতীয় সশস্ত্র উপস্থিত সত্ত্বেও সেই দেশে ক্রমবর্ধমান নৃশংসতা ও হত্যাযজ্ঞের পরিপ্রেক্ষিতে কলম্বো সোচ্চার হয় শ্রীলংকা থেকে ভারতের সশস্ত্র বাহিনী প্রত্যাহারের দাবিতে। এমন কি শ্রীলংকা ইসলামাবাদে সার্ক মন্ত্রী পরিষদের নিয়মিত বৈঠকে যোগদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। শ্রীলংকায় ভারতীয় উপস্থিতি অব্যাহত

www.pathagar.com

থাকলে স্বাগতিক দেশ হিসেবে শ্রীলংকা এক পর্যায়ে সার্কের শীর্ষ বৈঠক আয়োজন বা সার্কের নির্ধারিত সভাপতির দায়িত্ব পালনের বিষয়ে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। এ সবের পটভূমিতে পরবর্তীকালে ভারত শ্রীলংকা তার 'শান্তি বাহিনী' প্রত্যাহার করে নেয় বটে, কিন্তু শ্রীলংকার তামিল সংকটের নিরসন ঘটে নি।

ভুটান এবং নেপালের সঙ্গেও ভারতের সম্পর্ক খুব একটা মধুর নয়, পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ধারা এ ক্ষেত্রেও বর্তমান। ঐতিহ্যিকভাবে ভারত-নির্ভরশীল ভুটানের সরকার অনেকটা নীরবে দেশের অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা (ভারত নির্ভরশীলতা) কমাতে ও নিজস্ব বুনিয়াদ গড়ে তুলতে সক্রিয়। একই সঙ্গে ভারত ঘেঁসা পররাষ্ট্র নীতির পরিধি অতিক্রম করে ভুটান ক্রমশ বহির্বিশ্বের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করতেও প্রয়াসী।

স্থলবেষ্টিত নেপাল ১৯৫০ সনের এক দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনার ব্যাপারে ভুটানের মতো ভারতের কর্তৃত্ব ও খবরদারি মেনে নেয়। কিন্তু কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ নেপাল ক্রমশ ভারতের অহেতুক কর্তৃত্ব ও খবরদারির বিরুদ্ধে সচেতন হয়, আত্মপ্রত্যয় ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করে জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধারকল্পে/ এতে প্রতিবেশী ভারত বাদ সাধে। বিগত ২৫ মার্চ ১৯৮৯ তারিখে ভারত একতরফাভাবে স্থলবেষ্টিত নেপালের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ট্রানজিট অধিকার খর্ব করে, বন্ধ করে দেয় ভারতের অভ্যন্তর দিয়ে নেপালে অনুপ্রবেশযোগ্য প্রায় সব ট্রানজিট-পথ। ভারত নেপালের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কও প্রায় ছিন্ন করে, বন্ধ করে পেট্রোলিয়ামসহ নেপালের অন্যান্য প্রয়োজনীয় জরুরি সরবরাহ। এ নিয়ে দু'দেশের রেষারেষি ও তিক্ততার সম্পর্ক চরমে পৌঁছে। দু'দেশের মধ্যে রেষারেষি ও তিক্ততার রেশ পরবর্তীকালে নেপালের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্রভাব ফেলে।

মালদ্বীপে সরকার-বিরোধী বিদ্রোহী দমন ও স্থিতিশীলতার নামে সেই দেশে ভারতের ঝটিকা সামরিক অভিযান এবং অব্যাহত উপস্থিতি ও হস্তক্ষেপ সুকৌশলে সাজানো হয়েছিলো কি না সেই বিষয় নিয়ে বিতর্ক ও সংশয়ের অন্ত নেই। কেননা মালদ্বীপে বিদ্রোহী তৎপরতায় অংশগ্রহণকারী তামিল নাশকতাকারীরা এক সময় খোদ ভারতেই সামরিক প্রশিক্ষণ লাভ করে। পূর্বে নাশকতামূলক কাজে এরা ভারতেরই আশ্রয়, প্রশ্রয় ও ইন্ধন লাভ করে। এভাবে ভারতের আধিপত্যবাদী মনোভাব ও আঞ্চলিক পর্যায়ে একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। ভারতের এ ধরনের অপ্রতিসম অভিসন্ধির ফলে দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোতে নিরবচ্ছিন্ন ভারত-বিরোধী ক্ষোভ, পারস্পরিক সন্দেহ ও রেষারেষির প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

www.pathagar.com

মৌলিক স্বার্থগত ও কূটনৈতিক বন্ধন

দক্ষিণ এশিয়ায় অন্তঃআঞ্চলিক অস্থিরতা ও কলহ, আধিপত্য ও কর্তৃত্বের রেষারেষি, দ্বান্দ্বিক ঐতিহ্য ও বিচিত্রমুখী প্রবণতা সত্ত্বেও মৌলিক প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে এ অঞ্চল সর্বদাই ছিল অনেকটা একক ও অভিন্ন ধারায় সম্পৃক্ত। পূর্বেই বলা হয়েছে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো অবস্থিত হচ্ছে সুউচ্চ ও সুবিশাল হিমালয় পর্বতমালার পাদদেশে, একই উৎসস্থলের নদনদী দ্বারা এসব দেশ বিধৌত এবং এদের অবস্থান হচ্ছে ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী এলাকায়। প্রায় একইরূপ মৌসুমী আবহাওয়া ও জলবায়ু দ্বারা প্রবাহিত এসব দেশ। এ অঞ্চলের জনগণের রয়েছে একই নৃতাত্ত্বিক পরিচয়; এদের ব্যক্তিগত অভ্যাস, সামাজিক আচার-আচরণ ও ভাব বিনিময় প্রায় একই ধরনের, ভাষাও একই পরিবারভুক্ত।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশ একইরূপ অনগ্রসর, জনসংখ্যার তুলনায় সম্পদের অভাবও প্রায় একইরূপ, উন্নয়ন-অনুন্নয়নের সমস্যাও অনেকটা একই ধরনের।

বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর মতো দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানা সম্বলিত এলাকার ওপর কর্তৃত্বের দাবিদার; পারস্পরিক নৈকট্য এবং ইতিহাস ও ঐতিহ্যিক বন্ধনের কারণে এদের অর্থনৈতিক জীবন ও আর্থনীতিক ব্যবস্থা, আধ্যাত্মিক মতবাদ ও দার্শনিক ভাবধারায় সমগ্র অঞ্চলব্যাপী সাদৃশ্য রয়েছে। এদের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ও যোগসূত্র রয়েছে, এমন কি সম্পর্ক রয়েছে পারিবারিক পর্যায়ে। এ অঞ্চলের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ও রাজনৈতিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্যে সমরূপতা বিদ্যমান।

পররাষ্ট্রনীতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া কিংবা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বহির্বিশ্বের সঙ্গে কূটনৈতিক যোগাযোগ বা লেনদেনের বিষয়ে এ অঞ্চলের সব দেশেই জনমত বা বৃহত্তর নাগরিক সমষ্টির ভূমিকা নেই বললেই চলে। এ ধরনের বিষয়ে অবশ্য সংগঠিত জনমত বা রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে এমন আলোকিত জনগোষ্ঠী বা দলের অভাব রয়েছে। শিক্ষার নিম্নহার এবং সার্বিকভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের নির্লিপ্ততার ফলে এ অঞ্চলের সকল দেশে সরকার ও প্রশাসনে মুৎসুদ্ধি ভাবধারা পরিলক্ষিত হয়।

দক্ষিণ এশিয়ার শক্তিকাঠামোতে স্থিতিশীলতার অভাব, এ অঞ্চলে অব্যাহত আদর্শগত দ্বন্দ্ব ও অভ্যন্তরীণ কাঠামোগত হুমকি, এর দ্বান্দ্বিক ঐতিহ্য ও আন্তঃকলহ, আধিপত্যবাদ ও কর্তৃত্বের রেষারেষি, এতে বাহ্যিক বৃহৎ শক্তিবর্গের স্বার্থের অন্বেষা এবং তাদের অসামান্য কূটনৈতিক প্রভাব সত্ত্বেও

www.pathagar.com

এই অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বেশ কিছু মৌলিক কূটনৈতিক ও স্বার্থগত বিষয়ে অভিন্ন বন্ধন বিদ্যমান রয়েছে।

একই পাহাড়-পর্বতমালা থেকে অধঃক্ষিপ্ত মাটির বন্ধনে আবদ্ধ ও একই স্রোতধারা বিধৌত এ অঞ্চলের সকল দেশ একই ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং পরিবেশ-প্রতিবেশগত হুমকির সম্মুখীন। এই ধরনের ভয়াবহ হুমকি মোকাবিলা করতে হলে প্রয়োজন এ অঞ্চলের সবদেশের সমন্বিত পরিকল্পনা এবং প্রয়োজন সামগ্রিক বা যৌথ কর্মপ্রয়াস। বর্তমানে এ অঞ্চলের সব দেশ জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন এবং উন্নয়নকামী তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর সমন্বয়ে গঠিত ৭৭ জাতি গ্রুপের মতো সংস্থার সদস্য। এসব দেশ উন্নত বিশ্বের অন্যায় ব্যবসায়িক শর্তাবলীর শিকারে পরিণত, একই ধরনের অসম ঋণদায়ের বোঝা ও অসম বাণিজ্যিক লেনদেনের সমস্যায় জর্জরিত। তাই অনুন্নত বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো এরাও নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনীতির দাবিতে সোচ্চার। এ ধরনের দাবি আদায়ে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো সর্বতোভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনীতির মূল ইতিবাচক আবেদন হচ্ছে দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা। তৃতীয় বিশ্বের সর্বত্র এ ধরনের প্রায় সর্বজন সমাদৃত নীতির ভিত্তিতে আঞ্চলিকতা গড়ে উঠলে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো বাইরের শক্তিগুলোকে না জড়িয়ে, এমন কি তাদের সমর্থন ছাড়াই, আঞ্চলিক চাহিদা মেটাতে পারে। বাইরের বিশ্ব থেকে আমদানি করা পণ্যদ্রব্যের বিকল্পের অন্বেষার পাশাপাশি রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও তারা বৈচিত্র্য আনতে পারে। এ ক্ষেত্রে অবশ্য আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা হিসেবে সার্ককে মৌলিকভাবে জোরদার করা প্রয়োজন, কেননা আঞ্চলিক আর্থ-সামাজিক ও বাণিজ্যিক সংস্থা হিসেবে সার্ক-এর ভূমিকা এখনো তুচ্ছ বলা চলে। সার্ক-এর জন্মলগ্ন থেকে বিগত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা থেকে এটা বলা সমীচীন যে, ইউরোপীয় অর্থনৈতিক বাজারের মতো দক্ষিণ এশিয়ায় বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে শুল্ক ঐক্য বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ঐক্যের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে, আঞ্চলিক সংস্থা হিসেবে সার্ক-এর সম্ভাবনা ও গুরুত্ব তাৎপর্যবিহীন। বরং অনেকটা জোর দিয়েই বলা চলে, আপেক্ষিকভাবে ঘনবসতিপূর্ণ জনসংখ্যাবহুল অথচ অনুন্নত দক্ষিণ এশিয়ার একটি আঞ্চলিক সংগঠন হিসেবে সার্ক বিশ্ব পর্যায়ে তৃতীয় বিশ্বের পক্ষ থেকে একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। সার্কভুক্ত দেশগুলো তাদের নিজ নিজ নিছক স্বার্থগত লক্ষ্য অর্জনে স্বতন্ত্র কূটনৈতিক প্রয়াসে নিযুক্ত না হয়ে যদি আঞ্চলিক সংস্থা সার্ক-এর মাধ্যমে পরাশক্তি বা অন্য যে কোনো বৃহৎ শক্তির সম্ভাব্য

www.pathagar.com

আধিপত্যবাদী প্রয়াসের বিরুদ্ধে সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে সে ক্ষেত্রে তারা অধিকতর বাস্তব সাফল্যের স্বাক্ষর রাখতে পারে।

বৃহত্তর আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সার্ক আরো ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। ভারতের অনুকূল সাড়া পেলে সার্ক সম্ভবত অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে ভারত মহাসাগরকে "শান্তি এলাকা" ঘোষণায় কিংবা এই অঞ্চলকে মুক্ত রাখতে পারে বহির্শক্তির উল্লম্ব আগ্রাসন, হুমকি ও হস্তক্ষেপের প্রক্রিয়া থেকে।

দক্ষিণ এশিয়ার আন্তঃরাষ্ট্র বিষয়ক সমস্যাদি আলোচনাকল্পে সার্ককে রাজনৈতিকভাবে আরো জোরদার করা প্রয়োজন যাতে আঞ্চলিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সহযোগিতার স্বার্থে এই সংস্থা এ অঞ্চলের দেশগুলোর রাজনৈতিক মতপার্থক্য দূরীকরণের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে, নিষ্পত্তি করতে পারে পারস্পরিক সম্পর্ক বিষিয়ে তোলা বিবদমান সমস্যাদির। সার্ক ইতিমধ্যেই তার সাংগঠনিক কাঠামো বিস্তৃত করেছে। সার্ক প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ, কর্মকর্তা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্ণধারবর্গ প্রতিবছর বহুবার মুখোমুখি আলাপ-আলোচনায় বসার সুযোগ লাভ করে এবং পারস্পরিক অভাব-অভিযোগ ও সমস্যাদি নিয়ে সরকারিভাবে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে চলেছে। উল্লেখ্য, সার্কের মাধ্যমে চিহ্নিত সহযোগিতা বিষয়ের রয়েছে কৃষি, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা, আবহাওয়ার পূর্বাভাস, ডাক-যোগাযোগ, পল্লি উন্নয়ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, তার যোগাযোগ, পরিবহণ, খেলাধুলা, শিল্পকলা ও সংস্কৃতি, নারী উন্নয়ন, মাদকতার অপব্যবহার ও ব্যবসা রোধ, সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ, বেতার-দূরদর্শনের মাধ্যমে ভাব-বিনিময়, সফর, দলিল-প্রমাণ কেন্দ্র, সার্ক চেয়ার, ফেলোশিপ ও স্কলারশিপ, যুব স্বেচ্ছাসেবী বিনিময় এবং আন্তর্জাতিক আর্থনীতিক বিষয়াদি। "আঞ্চলিকতাবিহীন অঞ্চল" হিসেবে পরিচিত দক্ষিণ এশিয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ে এ ধরনের সহযোগিতা, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা কম গুরুত্বের বিষয় নয়।

তবুও সার্কভুক্ত দেশগুলো এখনো তাদের কর্মকাণ্ড, পছন্দ-অপছন্দ ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হয় নি। এ অঞ্চলে বহিঃশক্তির নিরাপত্তা হুমকি, এতে অন্তঃকলহ বা অভ্যন্তরীণ হুমকি সম্পর্কিত উপলব্ধির ক্ষেত্রে আঞ্চলিক রাষ্ট্রগুলি এখনো প্রায় ভিন্ন রাজ্যে বিচরণ করে। ফলে আঞ্চলিক বিবর্তন মনস্তাত্ত্বিক পর্যায়ে কঠিন বাধার সম্মুখীন।

ভারতের কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি

এক্ষেত্রে সবচেয়ে জটিলতা সৃষ্টি করে চলছে ভারতের কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং এর ফলে সৃষ্ট ভারত-ভীতি। বস্তুত, দক্ষিণ এশিয়ার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য

www.pathagar.com

হচ্ছে এ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর ভারত-ভীতি। ভারত-ভীতির অনুভূতি এ অঞ্চলে সহজাত। বিশ্ব পর্যায়ে ভারত হচ্ছে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের জোর প্রবক্তা, তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর বহুপক্ষীয় বা বহুজাতিক সম্পর্ক গড়ে প্রক্রিয়ার মুখ্য উদ্যোগী। অথচ আঞ্চলিক পর্যায়ে ভারতীয় কূটনীতি ও রণনীতির সুর ভিন্ন। এ ক্ষেত্রে ভারতের ধারণা হচ্ছে "আন্ত-নির্ভরশীলতা" ('Inter-dependence') ভিত্তিক।[১১] ভারত স্বয়ং হবে এই "আন্ত-নির্ভরশীলতার" বা "দ্বি-পাক্ষিকতার মূল কেন্দ্রবিন্দু, আঞ্চলিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে "দ্বিপাক্ষিকতার" ভিত্তিতে। ভারত চাচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ায় যথাসম্ভব বহুপক্ষীয় বা বহুজাতিক আর্ন্তক্রিয়া পরিরহার করতে। ভারত শুধু তার আঞ্চলিক প্রতিপ্রত্তি সংরক্ষণ করতে চাচ্ছে না, চাচ্ছে এ অঞ্চলে তার আধিপত্য ও কর্তৃত্ব আরো জোরদার করতে। ভারতের ভয় হচ্ছে, বহুপক্ষীয় আঞ্চলিক আন্তক্রিয়ায় ব্যাপকভাবে জড়িয়ে পড়লে তার আঞ্চলিক কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ন হতে পারে। কেননা এ অঞ্চলের বাদবাকি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো সংঘবদ্ধভাবে যে কোনো আঞ্চলিক সংস্থা বা বহুজাতিক প্রক্রিয়ায় নয়াদিল্লীর কর্তৃত্ব খর্ব করতে পারে। পক্ষান্তরে, দ্বি-পাক্ষিকতার ভিত্তিতে শক্তিশালী ভারতের পক্ষে প্রতিবেশী দুর্বল দেশগুলোর ওপর তার আধিপত্যবাদী ইচ্ছা চাপিয়ে দেয়া কঠিন হবে না।

সিস্টেম তত্ত্বীয় কাঠামোভিত্তিক সমকালীন যে কোনো আঞ্চলিক বিবর্তন প্রধানত গড়ে ওঠে বহুপক্ষীয় আন্তক্রিয়া বা বহুজাতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে, একদেশদর্শী বা একক কর্তত্ব প্রতিষ্ঠাকল্পে দ্বিপাক্ষিক রণনীতি বা কূটচালের মাধ্যমে নয়। তাই আঞ্চলিকতার ভিত যথার্থ গড়ে তুলতে হলে ভারতকে তার এই দ্বিপাক্ষিকতা ভিত্তিক "আন্ত-নির্ভশীলতার" রণনীতি পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। কেননা এ ধরনের কূটচাল ও রণনীতিতে উলম্ব বা একদেশদর্শী আধিপত্যবাদী প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। ভারতকে তাই ভাবতে হবে আঞ্চলিক সহযোগিতা ও সংহতির সমন্বয়ে সাধনে কি করে "পারস্পরিক আন্ত-নির্ভরশীলতা"র ('Mutual inter-dependence') ভিত্তিতে সুপ্রতিবেশীসুলভ আনুভূমিক সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়। অন্য কথায়, সৌহার্দ্যমূলক আঞ্চলিকতার স্বার্থে ভারতের বৈদেশিক নীতি ও কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন আনতে হবে। সন্দেহ ও সংশয়ের পরিবর্তে ভারতকে তার দক্ষিণ এশীয় প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে আস্থার ভাব সৃষ্টি করতে হবে। কৌশলগত বিষয়ে ভারতকে সামঞ্জস্য ও বিশ্বাসযোগ্যতা স্থাপন করেত হবে তার বিশ্ব পর্যায়ের আদর্শিক বক্তব্য ও আঞ্চলিক কর্মকাণ্ডে। এককথায়, ভারতকে আঞ্চলিকতার ভাবাদর্শ ধারণ ও লালন করতে হবে। এ অঞ্চলের বৃহত্তম দেশ হিসেবে আঞ্চলিক নেতৃত্ব লাভে প্রত্যাশী ভারতকে ত্যাগী আচরণের মাধ্যমে

www.pathagar.com

প্রতিসম আন্তক্রিয়ার ভাব সৃষ্ট করতে হবে, স্বতঃস্ফূর্ততার আমেজ ও আনুগত্য সঞ্চার করতে হবে ভারতের প্রত্যাশিত আঞ্চলিক কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের প্রতি।

সার্ক ও সচেতন আঞ্চলিক অনুভূতি

দক্ষিণ এশিয়া অবশ্য বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন একটি অঞ্চল নয়। ছোট বড় রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত এ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে অনুন্নয়ন ও অনগ্রসরতা এখানে রয়েছে ক্ষমতার দাপট, রয়েছে শক্তি-অভিলাষ। বিশ্বশক্তিবর্গের আধিপত্যবাদ ও ক্ষমতা-লিপ্সার ছাপ এখানেও পরিলক্ষিত হয়, একেও স্পর্শ করে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের বিচিত্রতা ও বহুরূপতা। আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্ক এ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর সার্বিক রাজনৈতিক আচরণে সমরূপতার ভাব সৃষ্টি করতে পারে, সম্পূরক ভূমিকা পালন করতে পারে এ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর উন্নয়নমূলক প্রয়াস ও কূটনৈতিক কর্মকাণ্ডে, পারস্পরিক সম্পর্কে সঞ্চার করতে পারে গতিশীলতা।

কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার লক্ষণীয় ভিন্নমুখী দৃষ্টিভঙ্গি ও পরস্পরের বিরুদ্ধে হুমকিপ্রসূত চেতনা পরিবর্তনকল্পে সচেতন প্রচেষ্টা না করা হলে এ অঞ্চলের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে আঞ্চলিকতার অনুকূল ভাবধারা সঞ্চার হবে না, পরিহার করা যাবে না নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি।[২০] তাই আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থায় আরো প্রাণ সঞ্চার করতে হবে, সার্ককে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করতে হবে যাতে এ সংগঠনের সনদে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধিত হয়, এতে আঞ্চলিক সংহতির স্বার্থে হস্তান্তরিত হয় প্রয়োজনীয় আইনগত ক্ষমতা এবং এই সংগঠন যথার্থ সাংবিধানিক কর্তৃত্ব লাভ করে সর্বপ্রকার আঞ্চলিক দ্বন্দ্বের নিরসনকল্পে, অঞ্চলব্যাপী সহিংসতা নিরসনে।[২১]

বলা প্রয়োজন, দক্ষিণ এশিয়ার নব স্বাধীনতালব্ধ রাষ্ট্রগুলোর আর্থ-সামাজিক কাঠামো ও রাজনৈতিক দিক থেকে এখনো বেশ দুর্বল। অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব এ অঞ্চলে বেশ প্রকট। প্রতিটি রাষ্ট্র এ অঞ্চলে তাদের নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য ও সার্বভৌম মর্যাদার বিষয়ে অত্যন্ত স্পর্শকাতর, যৌথ আঞ্চলিক স্বার্থের উর্ধ্বে জোর দেয় জাতীয় স্বার্থের ওপর। এ ধরনের রাজনৈতিক প্রবণতা আঞ্চলিকতার বিবর্তন পরিপন্থী। সার্কের সনদে সর্ব বিষয়ে ঐকমত্যের ওপর জোর প্রদান, দ্বি-পাক্ষিক দ্বন্দ্ব-কলহের বিষয় আলোচনা না করার সিদ্ধান্ত, বহির্বিশ্ব বা আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোকে আঞ্চলিক আর্থনীতিক বিষয়াদিতে জড়ানোর প্রতি অনীহা প্রভৃতি রাজনৈতিক স্পর্শকাতরতার পরিচয় বহন করে।

www.pathagar.com

তবুও বাংলাদেশের উদ্যোগে গঠিত সার্ক-এর মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ায় ভাবী সংহতির সম্ভাবনা ও সমঝোতার বীজ বপন করা হয়েছে। সার্কের মাধ্যমে আঞ্চলিকতা বিবর্তিত হচ্ছে, আঞ্চলিক ধারণা ক্রমশ দানা বেঁধে উঠছে। এটা সম্ভবত জোর দিয়ে বলা চলে, প্রকৃত জাতীয় স্বার্থের অন্বেষা দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না; বরং জাতীয় স্বার্থের প্রকৃত অন্বেষা তাদের আঞ্চলিক সহযোগিতার পথে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

দক্ষিণ এশিয়ার প্রকৃত রাজনৈতিক অবস্থা কিন্তু বিবদমান, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকলহ এতে বিদ্যমান। এই দ্বন্দ্বকলহের সুযোগের বাইরের শক্তিগুলো এ অঞ্চলে হাত বাড়াচ্ছে। বিশেষ করে পরাশক্তিসহ অন্যান্য বৃহৎ শক্তি দক্ষিণ এশিয়ায় তাদের স্বার্থলোলুপ শ্যেনদৃষ্টি নিক্ষেপ করে চলছে। এ অঞ্চলে ঐতিহ্যগতভাবে মস্কো তার কৌশলগত স্বার্থের সন্ধান করে ভারতকে ঘিরে, মস্কো চায় ভারতের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে, আর তাই ক্রেমলিন ভারতের আধিপত্যবাদী ধ্যান-ধারণায় ইন্ধন যুগিয়ে চলে। অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের ঐতিহ্যিক লেজুড় বৃত্তির সুযোগ গ্রহণ করতে পিছিয়ে ছিল না। দক্ষিণ এশিয়ায় অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশের বিষয়ে আমেরিকার আগ্রহের অভাব নেই। প্রকৃতপক্ষে উভয় বৃহৎশক্তি ভারত মহাসাগরে কৌশলগত প্রতিযোগিতা ও নৌ-মহড়ায় তৎপর।

এভাবে সার্ক গঠনের পর থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিকতার প্রক্রিয়া শুরু হওয়া সত্ত্বেও এতে স্থিতিহীন উপাদানের অভাব নেই। এ অঞ্চলে স্থিতিহীনতার কারণ নিহিত শুধু আঞ্চলিক রাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা বা তাদের দ্বান্দ্বিক আন্তক্রিয়ায় নয়, নিহিত বাইরের বিশ্বের সম্ভাব্য হস্তক্ষেপ প্রক্রিয়াতেও। ফলে দক্ষিণ এশিয়ায় এটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সিস্টেম ভিত্তিক আঞ্চলিক কাঠামো গড়ে উঠছে না।

উপসংহার

স্বাভাবিক কারণে প্রশ্ন দাঁড়ায়, দক্ষিণ এশিয়ায় সিস্টেম ভিত্তিক আঞ্চলিক বিবর্তনের পথে যেসব বাধা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে কি করে সে সব থেকে অব্যাহতি লাভ করা যেতে পারে, কি উপায়ে এখানে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি আঞ্চলিক কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব? তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর কঠিন নয় ঃ প্রয়োজন হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার সব রাষ্ট্রে বিচিত্রমুখী রাজনৈতিক প্রবণতা ও নিছক আত্মস্বার্থ সিদ্ধির পথ পরিহার করে অভিন্ন বা যৌথস্বার্থ অর্জনে প্রয়াসী হওয়া ও সমরূপতার অন্বেষা করা। অন্য কথায়,

www.pathagar.com

পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শুধু ইতিবাচক সচেতনতা, সমঝোতা ও সহযোগিতার ভাব গড়ে তোলার মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিকতার ভিত বিস্তার লাভ করতে পারে। সিস্টেম ধারণায় দক্ষিণ এশিয়ার বর্তমান আঞ্চলিক সত্তা ও অবস্থাকে বর্ণনা করতে হলে এক সম্ভবত বহুরূপা সিস্টেম (Heterogeneous system) বলা চলে। একমাত্র সুষম ও ইতিবাচক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে একে সমরূপ সিস্টেম-এর (Homogeneous system) রূপ দেয়া যেতে পারে। বহুরূপা সিস্টেম হয় বহুমুখী হুমকিজাত চেতনা সন্নিবিষ্ট ও দ্বন্দ্বমুখর, বিচিত্রধর্মী ও আন্তবিদ্বেষভাবাপন্ন। সমরূপ সিস্টেম মোটামুটিভাবে হতে হবে আন্তঃকলহ ও দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষমুক্ত, পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল এবং অভিন্ন চেতনা ও স্বার্থের অন্বেষার বন্ধনে আবদ্ধ। বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ায় আধিপত্য ও কর্তৃত্বের রেষারেষির পাশাপাশি চলছে সহিংসতা ও ভাঙ্গনের পালা, চলছে অভিন্ন স্বার্থগত চেতনা সৃষ্টির পরিবর্তে পারস্পরিক ভয়ভীতি ও হুমকি প্রসূত চেতনা। তাই একে বলা চলে বহুরূপা সিস্টেমের দুষ্ট প্রভাবপন্ন ও বিভিন্নতর বৈশিষ্ট্য সম্বলিত।

দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিকতার বন্ধন যথার্থ গড়ে উঠতে পারে একমাত্র সমরূপধর্মী সিস্টেমের মাধ্যমে, একে মুক্ত করতে হবে বহুরূপা সিস্টেমের কলুষ থেকে। এ ধরনের বিবর্তন না ঘটলে এ অঞ্চলে আদর্শিক কলহ প্রবণতা বাড়বে, বেড়ে চলবে এ অঞ্চলের ভিন্নতর রাজনৈতিক জোটভিত্তিক শত্রুতার ভাব। এতে এ অঞ্চলের বিবদমান রাষ্ট্রগুলোর ওপর বহির্বিশ্বের বৃহৎ শক্তিবর্গ তাদের কর্তৃত্ব চাপিয়ে দিতে পারে । ফলে সমরূপধর্মী সিস্টেম ভিত্তিক আঞ্চলিক বিবর্তন বিপন্ন হবে। একই সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোকে তাদের নিজ নিজ অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা বা স্থিতিহীনতার কারণও অনুসন্ধান করতে হবে, যথাযথ প্রতিবিধানও করতে হবে এ সব দেশের জনমানুষের মৌলিক ও সার্বভৌম অধিকারের ভিত্তিতে। আঞ্চলিকতার বাঁধ না হয় ভেতর থেকেই ভেঙ্গে পড়বে, আন্তসারশূন্য রূপ পরিগ্রহ করবে আঞ্চলিক সহযোগিতার শ্লোগান। এক কথায়, সমরূপতার বন্ধন ভেতর থেকে গড়ে তুলতে হবে।

দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক বিবর্তনে সার্ক আঞ্চলিক সংগঠন হিসেবে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রয়োজন হচ্ছে সার্ককে কার্যকর সংগঠনের রূপ দেয়া, একে আরো গতিশীল করে তোলা। তাহলেই পারস্পরিক সম্পর্কে দ্বন্দ্বের উৎস চিহ্নিত করা সম্ভব হবে, মোকাবিলা করা যাবে নেতিবাচক দিকগুলো, প্রতিকার করা সম্ভব হবে অভ্যন্তরীণ অস্থিরতার কারণ। সার্ককে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গতিশীল করা হলে এ সংস্থা দক্ষিণ এশিয়ায় আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কে পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি নিরসন করতে পারে, প্রতিহত করতে

www.pathagar.com

পারে এ অঞ্চলে দ্বন্দ্ব ও ভাঙ্গনের পালা, গড়তে পারে সৌহার্দ্যমূলক ভাবের বন্ধন। আঞ্চলিক সংস্থার মাধ্যমে পারস্পরিক যোগাযোগ ও আন্তক্রিয়া যতই বৃদ্ধি পাবে ততই ভাব-বিনিময়, বোঝাপড়া ও লেনদেনের পরিধি বিস্তৃত হবে, দ্বন্দ্বকলহ ও দুষ্টচক্রের আবর্তে থেকে নিষ্কৃতি পাবে অঞ্চল। এভাবে সিস্টেমভিত্তিক আঞ্চলিক গতিপথ ত্বরান্বিত হবে, সমরূপতা লাভ করবে দক্ষিণ এশিয়া।

কিন্তু সার্কের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ায় এ ধরনের কাজ তখনি সম্পূর্ণ করা হবে যখন এই আঞ্চলিক সংগঠন বিভিন্ন স্তরে যথার্থ গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভিত্তিতে অঞ্চলব্যাপী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করবে। দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক ধারণা প্রকৃতই বিস্তার লাভ করবে তখনি যখন সার্ক আঞ্চলিকতার সুফল ছড়িয়ে দিতে সমর্থ হবে এ অঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে এবং তাহলেই সেই জনমানুষ অঞ্চলব্যাপী স্বতঃস্ফূর্ততার আমেজে অনুপ্রাণিত হবে প্রতিসম ভিত্তিতে আনুভূমিক আন্তক্রিয়ায়।

এ ধরনের ব্যাপক ও সর্বব্যাপী সাফল্য অর্জনে সার্কের কর্মকাণ্ড শুধু সরকারি বৈঠক ও আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্রে বা তথাকথিত বিশেষজ্ঞবর্গের কর্মশালার পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখা সমীচীন হবে না। লেখক ও গবেষক, সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ, শিল্পী ও দার্শনিক, চিন্তাবিদ ও পণ্ডিত, বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবী, রাজনীতিক ও সংসদীয় নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন পর্যায়ের আলোকিত শ্রেণীসমূহের মধ্যে সমরূপ আঞ্চলিকতার চেতনা গড়ে তুলতে হবে। সার্কভুক্ত দেশগুলোর সর্বসাধারণ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে আঞ্চলিকতা সংক্রান্ত গণচেতনা। সার্কের প্রস্তাবিত বৃত্তি, ফেলোশিপ ও স্বেচ্ছাসেবক বিনিময় কর্মসূচি এ ক্ষেত্রে শুভ সূচনার ইঙ্গিত বহন করে নিঃসন্দেহে, কিন্তু এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের তেমন কোনো উদ্যোগ নেয়া হয় নি। অন্যদিকে অঞ্চলব্যাপী পরিবেশ-প্রতিবেশগত হুমকি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলার যৌথ কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সার্কের ভূমিকা দক্ষিণ এশিয়ায় সিস্টেমভিত্তিক আঞ্চলিকতার বিবর্তনে সুদূরপ্রসারী প্রবাহ রাখতে পারে। অথচ এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তেমন কোনো উদ্যোগ নেই।

সার্কের মাধ্যমে সেই ইতিবাচক বিবর্তন ঘটাতে হলে দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের নেতিবাচক দিকগুলো চিহ্নিত করে সমঝোতা ও সৌহার্দ্যের ভিত্তিতে যতশীঘ্র এসবের সমাধান ত্বরান্বিত করা অত্যাবশ্যক। এই ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের বৃহত্তম শক্তি ভারতকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে, ভারতকে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের। ভারতকে তার প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে বিষিয়ে তোলা দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক আধিপত্যবাদের দুষ্টচক্রের আবর্ত থেকে মুক্ত করে তাদেরকে সার্ক-এর

www.pathagar.com

বহুজাতিক সহযোগিতামূলক বন্ধনে আবদ্ধ করতে হবে। তাহলেই সার্ককে কেন্দ্র করে দক্ষিণ এশিয়ায় সংহতির ধারণা ক্রমশ বিকশিত হবে, মজবুত হবে আঞ্চলিকতার ভিত এবং এ অঞ্চলেও উপ-সিস্টেমের তত্ত্বীয় মতবাদ যথার্থ বাস্তবায়িত হবে। এ সকল ক্ষেত্রে অগ্রগতির পূর্বশর্ত হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিটি দেশে স্থিতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া এবং রাজনীতিতে কলুষিত হীনমন্য ধারার পরিবর্তে উন্নয়ন ও উৎপাদনের ধারা প্রবর্তন।

তথ্যনির্দেশ

১. দ্রষ্টব্য Morton A. Kaplan, *System and Process in International Politics* (New York: John Wiley and Sons, 1957), আরো দ্রষ্টব্য তাঁর "Variants on Six Models of International System" in James N. Rosenau (ed.) *International Politics and Foreign Policy* (New York: The Free Press, 1969); Charles A McClelland, *Theory and The International System* (New York: the Macmillan Compan, 1960); Richard N. Resentrance, *Action and Reaction in World Politics* (Baston : Little, Brown and Company, 1963)

২. McClelland, *op.cit.*, পৃ. ৯৫

৩. Charles A. McClelland, "Systems Theory and Human Conflict,"in Elton B. CcNail (ed.), *The Nature of Human Conflict* (Englwood Cl As,: NJ. : Prentice Hall, 1965), পৃ. ২৫৮; আরো দ্রঃ এ প্রবন্ধের ৮ নম্বর টীকা।

৪. আরো বিশদ ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য, Michaed Breacher, "The Subordinate System of Southern Asia, " *World Politics* 15 (January 1963); আরো দ্রষ্টব্য, Leonard Binder, *The Ideological Revolution in the Middle East* (New York: John Wiley and sons, 1964), পৃ. ২৬২ - ৭২। আরো দেখুন তাঁর, "transformation in the Middle East Subordiante system after 1967, " in Michael confino and Shamir (eds.), *The USSR and the Middle East* (Jerusalem: Israel University Press, 1973)

৫. Michael Haas, "Internationl Subsystems: Stability and Polarity, "*American Political Science Review*, No. 64 (March 1970), পৃ. ২৩৫

৬. দ্রষ্টব্য, Bruce M. Russett, *International Regios and Interantional System* (Chicago: Rand Mcnally 1967); আরো দ্রষ্টব্য, Louis J. Cantori and Steven L. Spiegel, *The International Politics of Regions: A Comparative Approach* (Englewood Cliffs. NJ. : Preatices hal, 1970)

৭. Brecher, : The Subordinate System of Southern Asia", *op.cit.*

৮. এই নিবন্ধে দক্ষিণ এশীয় "উপ-সিস্টেম'/'অঞ্চল' একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ; কোনো কোনো

www.pathagar.com

পর্যায়ে একে একটি সিস্টেম হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে একে আন্তর্জাতিক সিস্টেমের 'উপ-সিস্টেম' হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে

৯. M. Shamsul Huq. "South Asian Association for Regional Cooperation: Past, Present and Future , " *BIISS Journal*, vol. 7, No. 3 (1986), পৃ. ৮২৮

১০. Barry Buzan and Gowher Rizvi, *South Asian Security and the Great Powers* (London: The Macmillan Pres Ltd. 1986), পৃ. ১৪

১১. P.L. Sharma, India, the Fourth World : *A Panorama of World Peace* (new Delhi: Pankaj Publication, 1985), পৃ. ২০৭

১২. S.D. Muni,: India and Regionalism in South Asia, A Political Perspective, "In Bimal Prasad (ed.) *India's Foreign Policy: Studies in Continuity and Change* (New Delhi: Vikas Publication, House, Pvt. Ltd., 1979), পৃ. ১০৭, ১১১

১৩. Buzan and Rizvi, *op cit.*, পৃ. ১৪-১৫; Muni, "India and Regionation in South Asia,"*op.cit.*, পৃ. ১০৯ -১১১

১৪. S.D. Muni, "India and Regionalism in South Asia, A Political Perspective,"*op.cit.*, পৃ. ১০৮ - ১০৯; আরো দেখুন Emajuddin Ahamed, *SARC: Seeds of Harmony* (Dhaka: The University Press Ltd., 1985), পৃ. ৫ - ৬

১৫. Buzan and Rizvi, *op.cit.*, পৃ. ২৫১

১৬. ঐ, পৃ. ১৬ - ১৭, ২২৭

১৭. Bhabani Sen Gupta, *Soviet Asian Relations in the 1970s and Beyond* (New York: Prager 1976) পৃ. ১৫৪

১৮. বিশদ ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য, Syed Sirajul Islam, : Bangladesh Pakistan Relation: From Conflict to Cooperation, "in Emajuddin Ahamed (ed.), *Foreign Policy of Bangladesh: A Small State's Imperative* (Dhaka: The University Press Ltd. 1984), পৃ. ৫৮ - ৫৯

১৯.বিশদ ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য, Abul Kalam "Cooperation in South Asia, : *Regional Studies* (Summer 1988); আরো দ্রষ্টব্য, Abul Kalam, "South Asia: Regional Perspective in a Systemic Framework, "*Asian Studies*, No. 10, (May 1988), পৃ. ৬৫ - ৬৬

২০. Shelton Kodikara, "Asymmetry and Commonalities, "in Pran Chopra and M. Shamsul Hup et al, *Future of South Asia* (Dhaka: The Uviversity Press Ltd. 1986), পৃ. ১২৭

২১. Surjit Mansingh. *India's Search for Power: Indira Gandhi's Foreign Policy*, 1966 - 1982 (New Delhi: Sage Publications, 1984), পৃ. ২৭৩

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

ভারত ও দক্ষিণ এশীয় সহযোগিতা

দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রয়াস প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে ১৯৮৫ সনের ডিসেম্বরে। এ সময়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্ক (South Asian Regional Cooperation বা SARC) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ অঞ্চলব্যাপী সহযোগিতার ধারণা প্রচার ও জনপ্রিয় করে তোলার ব্যাপারে বাংলাদেশ উদ্যোগ গ্রহণ করে ১৯৭৭ - ১৯৮০ এর দিকে। এতে বেশ উৎসাহ ব্যঞ্জক সাড়া মেলে এ অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত ছোট দেশগুলো থেকে; কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার প্রধান শক্তি, ভারত এ পর্যায়ে সতর্কতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, এমন কি ভারতের অনেকটা শীতল মনোভাবও ব্যক্ত হয়। পরবর্তীকালে অ.শ্য ভারতও এ অঞ্চলের অন্যান্য রাষ্ট্রের মতই সহযোগিতার ব্যাপারে উষ্ণ আগ্রহ প্রদর্শন করে। ১৯৮৭ সনে প্রায় এক বছর কাল এবং পালাক্রমে পরবর্তী কালে আরেকবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী সার্কের সভাপতি পদেও আসীন ছিলেন। এ অঞ্চলে ভারতের সার্বিক সম্পর্কের আলোকে তার আঞ্চলিক ভূমিকা মূল্যায়ন করা প্রয়োজন, প্রয়োজন আরো প্রতিবেশী সার্কভুক্ত দেশগুলো এ ভূমিকা কিভাবে দেখে আসছে সেই কারণে।

এ প্রবন্ধে ভারত ও দক্ষিণ এশিয়ায় তার প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে বিরাজমান সম্পর্ক পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে একটি কৌশলগত রণনৈতিক ফ্রেম বা কাঠামো ব্যবহার করে এরূপ যুক্তি উপস্থাপিত হয়েছে যে, ভারতের কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গিতে দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিক অপ্রতিসম প্রবণতা আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রতিসাম্য ভিত্তিক বহুজাতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে। প্রবন্ধে এরূপ অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ভারতের রণনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিলক্ষিত সহযোগিতা পরিপন্থী এসব উপাদান পরিত্যক্ত না হলে আঞ্চলিক সহযোগিতার পক্ষে যথার্থ অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবে না।

www.pathagar.com

দুই

সমকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষণে কৌশলগত ফ্রেম বা কাঠামোর ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের দ্বান্দ্বিক আচরণ বা সহযোগিতামূলক কর্মসূচি পর্যায়ক্রমে চিহ্নিত করা সম্ভব। কৌশলগত চিন্তাধারা অবশ্য নতুন নয়।[১] কৌটিল্য, ম্যাকিয়াভেলি ও ক্লজভিৎসের লেখায় কৌশলগত বিষয় সম্পর্কে ব্যাপক পরিচয় মেলে, যদিও তাদের বক্তব্যে অপ্রতিসম ভাবধারা ও ধ্রুপদী বা সনাতনপন্থী চিন্তা-চেতনা পরিস্ফুট হয়। কিন্তু সমকালীন রণনৈতিক ফ্রেমে গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় প্রতিসম বিবর্তনের প্রতিফলন ঘটতে হবে।

'রণনীতি' 'strategy' বা প্রত্যয়টি উৎপত্তি হয় সমর অধিনায়ক বা জেনারেলদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত গ্রিক প্রতিশব্দ 'strategus' থেকে। এর অর্থ অধিনায়কদের ব্যবহৃত কলাকৌশল। সাধারণভাবে সেনাবাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্রে সংগঠিত করে নেতৃত্ব প্রদানের উদ্দেশ্যে গৃহীত কর্মসূচি থেকে যুদ্ধ অবধি প্রভৃত কার্যকলাপের মাধ্যমে শত্রুপক্ষকে বিপাকে ফেলার সার্বিক পরিকল্পনা রণনীতির ধারণার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২] বর্তমানকালে রণনীতি সম্পর্কিত বিশ্লেষকবৃন্দ রণনৈতিক ও সামরিক আশা-আকাঙ্ক্ষার বিভিন্ন পর্যায় বা বৈশিষ্ট্য চিহ্নিতকরণে 'কৌশলগত' বা রণনৈতিক' (strategic) শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। রণনৈতিক কাঠামোতে চার পর্যায়ের বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হতে পারেঃ উচ্চতম পর্যায় হচ্ছে 'নীতি' (policy) তারপর পর্যায়ক্রমে 'মহারণনীতি' (grand strategy) 'রণনীতি' (strategy) এবং সবশেষে 'রণকৌশল' (tractics)।

রণনীতি অনেক সময় যুদ্ধ দ্বারা আবেষ্টিত, রণকৌশলও একই বেষ্টনীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মহারণনীতি যুদ্ধ চলাকালের সামরিক কৌশলগত পরিধি অতিক্রম করে যুদ্ধোত্তর শান্তির প্রতিও দৃষ্টি রাখবে-এই হচ্ছে নিয়ম। মহারণনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি জাতির রাজনৈতিক উদ্দেশ্যাবলি অর্জনে জাতির সার্বিক ধন-সম্পদ সমন্বয় ও পরিচালিত করা। এতে জাতীয় নীতির লক্ষ্য সংজ্ঞাগত রূপ ধারণ করে, রাষ্ট্রের যে নীতি কার্যকর বা বাস্তবায়িত হতে চলেছে সেই অর্থই ব্যক্ত হয়ে থাকে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, রণনীতি হচ্ছে এমন এক 'কলা' ও 'বিজ্ঞান' বিশেষ যার ব্যবহার এবং প্রয়োগের মাধ্যমে একটি জাতির রাজনৈতিক, অর্থনীতিক, মনস্তাত্ত্বিক শক্তি ও সামর্থ্য জোরদার করা যায়। এর পাশাপাশি একই সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালে বা শান্তিকালীন সময়ে রণনীতি দ্বারা জাতীয় উদ্দেশ্যাদি অর্জন করা যায়। 'রণকৌশল' হচ্ছে রণনীতির প্রয়োগের নিম্নতর স্তর বা পর্যায় বিশেষ, যদিও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বেশ অস্পষ্ট। কেননা যুদ্ধদ্বন্দ্বের এ দুটি পর্যায়ের একটি অপরটিকে

www.pathagar.com

শুধুমাত্র প্রভাবিত করে না, উভয়ে বাস্তব কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে সংমিশ্রিতও হয় বটে।[৩]

এ বিষয় সম্পর্কে আরেকটি প্রসঙ্গও প্রণিধানযোগ্য। যুদ্ধদ্বন্দ্বরত রাষ্ট্রসমূহ যখন মহারণনীতি অর্জনে অঙ্গীকারবদ্ধ হয় এবং এ স্থির লক্ষ্য অর্জনে ব্যবহার করে সামগ্রিক কৌশলগত ক্ষমতা তখন শান্তি সহযোগিতামুখর প্রক্রিয়ার প্রতি বিবদমান পক্ষের শূন্যমান রণনীতি (zero-sum strategy) প্রকাশ পায়। এরূপ ক্ষেত্রে অর্থবহ সহযোগিতা সম্ভব হয় না; বরং পারস্পরিক সম্পর্কে সৃষ্টি হয় অচলাবস্থা, এমন কি সামরিক সংঘর্ষও বিচিত্র নয়। সংক্ষেপে, কৌশলগত চিন্তাধারার উদ্দেশ্য হচ্ছে রাষ্ট্রের নীতি বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাদি পর্যালোচনা করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে গৃহীত মহারণনীতি, রণনীতি ও রণকৌশল চিহ্নিত করা এবং বিকল্প উপায় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা।

তিন

এখন দেখা যাক ভারত ও প্রতিবেশী সার্কভুক্ত দেশগুলো একে অপরের সঙ্গে কি ধরনের কৌশলগত সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে এবং পরস্পরের প্রতি তাদের রণনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি কিরূপ? বিগত প্রায় দেড় দশক অবধি দক্ষিণ এশিয়ায় সাতটি দেশ আঞ্চলিক ভিত্তিতে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সচেষ্ট, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাদের প্রকৃত সাফল্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অবতারণা করা যেতে পারে।[৪] দক্ষিণ এশিয়া এমন একটি অঞ্চল যাতে অভিন্ন হুমকি প্রসূত কৌশলগত সমঝোতা নেই বললেই চলে; বরং বলা যায়, এ অঞ্চলে অভিন্ন হুমকিজাত সচেতনা রয়েছে শুধুমাত্র তাদের নানারূপতা বা বিচিত্রতায়। প্রসঙ্গটি সম্ভবত আরো কিছুটা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। প্রথমত, দক্ষিণ এশিয়ায় অভ্যন্তরীণ হুমকি হচ্ছে বহু ধরনের এবং এসব প্রায় প্রতিটি হুমকির ক্ষেত্রে কোনো-না কোনো ধরনের আঞ্চলিক ইন্ধন রয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়। দ্বিতীয়ত, দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর প্রতি বাহ্যিক হুমকির মূলে প্রায়শ প্ররোচণা আসে সার্কভুক্ত অন্য কোনো দেশ থেকে এবং প্রধানত আঞ্চলিক দ্বন্দ্বের কারণে এ অঞ্চলে বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা দেখা দেয়। দক্ষিণ এশিয়ায় কৌশলগত সমঝোতার অভাব এবং সার্কের অনগ্রসরতা উভয়ই সম্ভবত উপর্যুক্ত দুটি কৌশলগত আঞ্চলিক বাস্তবতার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় খুব স্বাভাবিকভাবে এসে পড়ে– তাহলো আয়তন ও জনসংখ্যা অর্থনীতি ও আর্থিক অবস্থা, প্রযুক্তি ও সামরিক যোগ্যতার দিক থেকে দক্ষিণ এশিয়ার ব্যাপক অসম বিরাজ করছে। এখানেই নিহিত রয়েছে এ অঞ্চলের কৌশলগত উদ্যোগর প্রধান কারণ।[৫] কেননা এর ফলে স্পষ্টতই

www.pathagar.com

বৃহত্তর আঞ্চলিক আধিপত্য বিস্তার সম্পর্কে আশঙ্কা জন্মে কিংবা কিছুটা অস্পষ্ট হলেও আঞ্চলিক নেতৃত্ব লাভে অভিলাষী দুটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ শক্তির প্রভাব-বলয় সম্প্রসারণে দ্বি-কেন্দ্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

ভূ-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে, সম্ভবত অন্য যে কোনো অঞ্চলের চেয়ে দক্ষিণ এশিয়াকে ভিন্নতর বলে মনে হয়। কেননা এর 'কেন্দ্র' (core) একটি মাত্র রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত। এ রাষ্ট্র হচ্ছে ভারত। 'প্রান্তে' (periphery) অবস্থিত রাষ্ট্রের মধ্যে রয়েছে আঞ্চলিক নেতৃত্ব লাভে প্রয়াসী রাষ্ট্র পাকিস্তান, রয়েছে মাঝারি শক্তিসম্পন্ন আঞ্চলিক রাষ্ট্র বাংলাদেশ, ক্ষুদ্রতর দুটি শক্তি, নেপাল ও শ্রীলঙ্কা, এবং পরিশেষে দুটি অতি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ভুটান ও মালদ্বীপ।[৬] দক্ষিণ এশিয়ার কেন্দ্রস্থ শক্তিরূপে ভারতকে চিহ্নিত করার অর্থ এ নয় যে ভারতই হচ্ছে এ অঞ্চলের কেন্দ্রবিন্দু। কেননা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ অঞ্চলের অন্যান্য রাষ্ট্রের জন্য এরূপ প্রস্তাবনার অর্থ দাঁড়াতে পারে ভারতের কৌশলগত লেজুড়বৃত্তি। বস্তুত, প্রতিটি দেশের বিশ্ব-কৌশলগত ভাবনা এরূপ যে স্বদেশকে সবাই দেখে কেন্দ্রবিন্দু বলে, আর বাদবাকি বিশ্বকে দেখে তার চারপাশে। দক্ষিণ এশিয়ায় এই প্রকৃতির জাতীয় আচরণ আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক ব্যবস্থার পরিপন্থী নয়। বরং এসবের ফলে একে অপরকে পারস্পরিক শক্তিতে বলীয়ান করতে পারে, আর তাই স্বদেশ ভিত্তিক মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতির প্রতি বিরাগভাব প্রদর্শন করা সমীচীন হবে না।[৭]

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো সবই রাজনৈতিকভাবে সার্বভৌম। এরূপ দাবি তাদের স্বাধীন রাষ্ট্রীয় সত্তার ভিত্তি। তবু বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিক বাস্তবতার দিকে দৃষ্টিপাত করলে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এসব রাষ্ট্রের মধ্যে দুটো-পাকিস্তান ও বাংলাদেশ– হচ্ছে মূল ভারতের উপাঙ্গ এবং ভারত ছাড়া এ অঞ্চলের বাকি রাষ্ট্র সর্বমোট ভূ-সীমানা ও জনসংখ্যার দিক থেকে ভারতের এক তৃতীয়াংশের চেয়েও কম। উল্লেখ্য, এ অঞ্চলের শতকরা ৭২ ভাগ ভূমি এবং জনসংখ্যার শতকরা ৭৭ ভাগ ভারতের অংশে। স্থায়ী কৃষিকাজের উপযোগী জমির শতকরা ৮৫ ভাগ এবং সেচধৌত জমির শতকরা প্রায় ৭০ ভাগই ভারতের। এভাবে ভারত অন্যান্য সার্কভুক্ত দেশগুলোর চেয়ে শুধু বড়ই নয়, বাদবাকি রাষ্ট্রের সর্বমোট আয়তন - পরিমাণের চেয়েও অনেক বড়।

উপরন্তু, দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত সীমান্ত ছাড়া অন্য কোনো দুটি রাষ্ট্রের অভিন্ন সীমানা নেই। অথচ ভারতের সঙ্গে চারটি দেশের অভিন্ন ভূসীমা রয়েছে, দুটির রয়েছে জলসীমা। দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিটি দেশ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ, ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার দিক থেকে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। উপর্যুক্ত বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত দক্ষিণ এশিয়ার আরেকটি বিশেষত্ব -এর দৃশ্যত অপ্রতিসম শক্তি-কাঠামো। এসবের ফলে এ

www.pathagar.com

অঞ্চলে ভারতের প্রাধান্য প্রকাশ পায়। এ প্রাধান্য জনসংখ্যা, আয়তন ও সম্পদের কারণে নয়; অর্থনৈতিক প্রসার, সামরিক শক্তির বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কারণেও।[৮]

উপরিউক্ত সকল ঐতিহাসিক বাস্তবতা, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উপাদান এ ইঙ্গিত বহন করে যে, ভারতের কৌশলগত মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রশ্নে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের অন্তর্নিহিত জাতীয় শক্তি, তার চিরায়িত সামরিক শক্তি ও সম্ভাব্য কৌশলগত শক্তির দিক বিবেচনা করে ভারতীয় নেতৃবর্গের প্রায় সবার পক্ষে ভারত-ভিত্তিক একটি দক্ষিণ এশীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং এ অঞ্চলে ভারতের 'বৈধ' রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে যুক্তির অবতারণা করা অমূলক হবে না। অবশ্য ভারতের কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা বৈপরীত্য বা দ্বৈতভাবও বিদ্যমান।

ভারতীয় নেতৃবৃন্দ প্রায়শ বিশ্ববাসীকে এ বলে আশ্বস্ত করেন যে, "বৃহৎ ক্ষুদ্র বা কোনো ধরনের শক্তি হবার কোনো ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি ভারতের নেই-প্রতিবেশী দেশগুলোর ব্যাপারে কোনোভাবেই হস্তক্ষেপ করতে [ভারত] ইচ্ছুক নয়।"[৯] তবু বহির্বিশ্বে এবং এ অঞ্চলে ভারতের পররাষ্ট্র নীতি কৌশলগত পর্যায়ক্রমের সুনির্দিষ্ট অভিলাষপূর্ণ বেষ্টনী দ্বারা পরিচালিত। বিশ্ব কৌশলগত মানচিত্র ভারত তার রণনৈতিক গুরুত্ব দেখে ইউরোপ ও এশিয়ার পার্শ্বস্থ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান থেকে, আর তাই একজন ভারতীয় বিশ্লেষক এ ধরনের বক্তব্য উপস্থাপিত করেন যে, "কিছু কিছু রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে ভারত বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারের রণনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিতে পারে।"[১০] তাই আঞ্চলিকভাবে ভারত দক্ষিণ এশিয়ায় এমন একটি মহারণনীতি বাস্তবায়নে সচেষ্ট যাতে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের কর্তৃত্ব সুসংহত হয়। এররূপ লক্ষ্য অর্জনে ভারত 'আন্তঃনির্ভরশীলতা' (inter-depenence) রণনীতি বাস্তবায়নে সক্রিয়।[১১] বিশ্ব পর্যায়ে ভারত তার অভিলাষ উন্মুক্ত রাখতে প্রয়াসী, যাতে শক্তিধর "ভারত মানব জাতির সেবায় বিশ্বরাজনীতির পুরোভাগে স্বীয় আসন লাভ করতে পারে।"[১২]

এভাবে 'আন্তঃনির্ভরশীলতা' রণনীতি গ্রহণ সত্ত্বেও এ অঞ্চলে ভারতের বাস্তব অবস্থান ও আচরণ সন্দেহের উদ্রেক করে। এসবের পাশাপাশি ভারতের বিশ্ব অভিলাষ ও আঞ্চলিক কর্তৃত্ব-সবকিছু মিলিয়ে নয়াদিল্লী এমন একটি ভাবমূর্তি সৃষ্টি করে যে ভারতকে আধিপত্যবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষার দায়ে অভিযুক্ত করা যেতে পারে। ভারত সার্কের পটভূমিতে যথার্থ যদি এরূপ কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে তবে আঞ্চলিক ভিত্তিতে গৃহীত যে কোনো সহযোগিতামূলক প্রয়াসে ভারতকে এককভাবে 'ভিটো' প্রদান বা নাকচ করার

www.pathagar.com

ক্ষমতার অধিকারী করতে পারে। এ ধরনের কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক সংস্থার অন্যান্য রাষ্ট্রকে সম্ভাব্য ভারতীয় আধিপত্য প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে বহিঃশক্তির সমর্থন লাভের প্রচেষ্টায় প্ররোচিত করতে পারে। তাই দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতার যে কোনো মডেল হতে হবে আর্থনীতিক, সামরিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে পরিব্যাপ্ত প্রতিসম মডেল।

এ হচ্ছে প্রতিসম আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুসৃত লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। এ ধরনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ না হলে আঞ্চলিকভাবে আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কে অপ্রতিসম প্রাধান্য ও হুকুমাধীন, আদেশ বা নির্দেশমূলক উপাদান তিক্ততা সঞ্চার করতে পারে। ঐতিহ্যগতভাবে এ অঞ্চল বহু অমীমাংসিত বিষয় নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে বিভক্ত। ফলে এ অঞ্চলের কৌশলগত দৃশ্য অনেকখানি পারস্পরিক অবিশ্বাসের ছোঁয়াছে আড়ষ্ট। ভারতের কেন্দ্রস্থ অবস্থান, এর বিশাল আয়তন ও ব্যাপকতর শক্তির কারণে সার্কভুক্ত পার্শ্ববর্তী দেশগুলো প্রায় অনবরত ভারত ভীতিতে সন্ত্রস্ত। দৃশ্যমান ভারতীয় ধারণা যে এ অঞ্চলের প্রতিবেশী ক্ষুদ্রদেশগুলো তার নিরাপত্তা বলয়াধীন এবং তাই এসব দেশকে অবশ্যি ভারতীয় 'নিরাপত্তা স্বার্থ সংরক্ষণে ভারতীয় কর্তৃত্ব মেনে নিতে হবে, থাকতে হবে ভারতীয় কোটরাধীন।'[১৩] এ সবের ফলেই প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে ভারতভীতি সঞ্চার হয়।

চার

বস্তুত, দ্বিপাক্ষিক বিষয় দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর সম্পর্ক বেশ কিছু বিষিয়ে তুলছে। এর মধ্যে কিছু বিষয় অতীতকালের দ্বন্দ্বজনিত এবং কিছু বিষয় ভবিষ্যৎ সুসম্পর্কে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে। ভারত-পাকিস্তান, ভারত-বাংলাদেশ, ভারত-শ্রীলঙ্কা ও ভারত-নেপাল সম্পর্ক প্রভৃতি। পারস্পরিক দ্বি-পাক্ষিক, বহুমুখী গভীরতর দ্বন্দ্বের পঙ্কিলতায় আচ্ছন্ন। এ অঞ্চলের সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর বিভিন্নতর কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি জাতিগঠন নীতি-কৌশলের অংশবিশেষ হিসেবে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের আলোকে বুঝা যেতে পারে। কিছু প্রধান প্রধান সমস্যা এবং কিছু অপেক্ষাকৃত অপ্রধান কিন্তু সতত পরিলক্ষিত সমস্যা, অভিন্ন ধন-সম্পদ ও নদনদীর পানির হিস্যা ও বন্টন, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও অর্থনৈতিক আধিপত্য নিয়ে পারস্পরিক ভয়ভীতি ও আশঙ্কা–এ জাতীয় বিষয়াদি ভারত ও তার ক্ষুদ্রতর প্রতিবেশী সার্কভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি করে চলছে।

দক্ষিণ এশিয়ায় সার্কভিত্তিক সহযোগিতামূলক বিবর্তনের প্রতি সবচেয়ে মারাত্মক হুমকি আসছে ভারত-পাকিস্তান অহিনকুল সম্পর্কের কারণে। ১৯৪৭

www.pathagar.com

সনে ভারত-বর্ষের ভাগাভাগি এবং দু'দেশের জন্মলগ্ন থেকে প্রতিযোগী হিসেবে, যাতে সুযোগমত একে অপরের ওপর আঘাত হানতে পারে। তথাকথিত 'দ্বিজাতি তত্ত্বের' ভিত্তিতে এ সময়ে ভারতবর্ষের ভাগাভাগি নয়াদিল্লী অপরিহার্য চাল হিসেবে মেনে নেয়, কিন্তু বহু ভারতীয় বিশ্বাস করতো যে মাতৃভূমি তার অপসৃত সন্তানদের আবার কোলে ফিরে পাবে।[১৪] এরপর থেকে ভারত শুধু তার নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকল্পে সচেতন প্রচেষ্টাই চালিয়ে আসে নি, তার জনসংখ্যা, আয়তন এবং অর্থনৈতিক সম্ভাবনার সাথে সঙ্গতি রেখে আন্তর্জাতিক সিস্টেমে ভারত যথাযথ শক্তি অবস্থান লাভেও প্রয়াসী হয়।[১৫] স্বাধীনতা লাভের পর পরই বিশ্ব রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ভারত লিপ্ত হয় একটি প্রধান শক্তিকেন্দ্রে পরিণত হবার প্রয়াসে, দখল করে প্রায় সব রাজন্য প্রশাসিত রাজ্য, জোরদার করে এ উপমহাদেশে তার অবস্থান। ফলে ভারতভীতি পাকিস্তানের মজ্জাগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তাই ১৯৫০-এর দশকের দিকে পাকিস্তান সুযোগমত মার্কিন উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রতিরক্ষা মৈত্রী জোটগুলোতে যোগদান করে। পরাশক্তির ওপর ভর করে হলেও পাকিস্তানের উদ্দেশ্য ছিল এ উপমহাদেশে 'শক্তি' ভারসাম্য অর্জন করা।[১৬] অবশ্য বলার অপেক্ষা থাকে না যে, পাকিস্তান কম্যুনিস্ট মতবাদের ভয়ে তেমন ভীত ছিল না, কিন্তু কম্যুনিস্ট ভীতির হিড়িকে সম্ভাব্য ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান মার্কিন নিরাপত্তামূলক ছত্রছায়া লাভের প্রত্যাশা করে।[১৭]

এভাবে আইয়ুব খানের ভাষায়, "পাকিস্তান এশিয়ায় মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয় আমেরিকার একান্ত অনুগত মিত্র হিসেবে।"[১৮] ফলে পাকিস্তানকে ভারত দেখে বেনামি ভূমিকায় অবতীর্ণ এক শত্রুদেশ হিসেবে। কৌশলগত পাল্টা চাল হিসেবে ভারতও ঝুঁকে পড়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে।[১৯] ফলে ভারত-সোভিয়েত সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের পরিধি ক্রমশ বিস্তৃত হয় এবং এসবের চূড়ান্ত ফসল হিসেবে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে স্বাক্ষরিত হয় (৯ আগস্ট ১৯৭১) ভারত সোভিয়েত শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর ভারত দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে শক্তিধর রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ভারতের সম্ভাব্য আধিপত্য ও কর্তৃত্বের ভয়ে ভীত পাকিস্তান তার নিজস্ব শক্তির ভারসাম্য রক্ষাকল্পে চীন-মার্কিন অব্যাহত সহানুভূতি ও সাহায্য লাভের প্রয়াস চালিয়ে আসে। প্রকৃতপক্ষে চীন ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়ে পাকিস্তানের প্রতি বন্ধুপ্রতিম সাহায্য ও সমর্থন যুগিয়ে চলে।[২০]

ভারত ও পাকিস্তান উভয়ে বর্তমানে অবশ্য বাহ্যত জোটনিরপেক্ষ ভাবমূর্তি ধারণ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও উভয় রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক শক্তি দাবার চালের ঘুঁটিতে রূপান্তরিত। উভয় দেশের এরূপ কৌশলগত পরিণতি তেমন বড় ধরনের মৌলিক রাজনৈতিক বা আদর্শগত পার্থক্যের কারণে নয়। বরং এ

www.pathagar.com

ধরনের অবস্থার পেছনে সতত ইন্ধন যোগাচ্ছে কাশ্মীরকে ঘিরে উভয়ের বিরোধ; একে অপরকে নিজ নিজ অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার দায়ে অভিযুক্তও করে চলছে। শুধু তাই নয়, উভয় দেশ তাদের সশস্ত্র বাহিনীর বিরাট অংশ কাশ্মীরের সীমানা প্রান্তে নিয়োজিত রাখে। উল্লেখ্য, ১৯৪৭, ১৯৬৫ এবং ১৯৭১-এর এই তিনটি প্রধান ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে কাশ্মির সর্বদা ছিল একটি রণাঙ্গন। অবশ্য ১৯৭২ সনে স্বাক্ষরিত সিমলা চুক্তি অনুযায়ী ভারত ও পাকিস্তান উভয়ে ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১-এর যুদ্ধ বিরতির নিয়ন্ত্রণ সীমারেখা মেনে চলতে সম্মত হয়-এতে পক্ষ দুটির নিজ নিজ নিয়ন্ত্রিত অবস্থানের ওপর কোনোরূপ প্রভাব পড়বে না এবং কোনোপক্ষ তাদের মধ্যে পারস্পরিক মতপার্থক্য এবং আইনগত বিরোধ থাকা সত্ত্বেও আপন অবস্থান পরিবর্তন করবে না বলে রাজি হয়।[২১]

অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারত তার পূর্ব পাঞ্জাব রাজ্যে শিখদের একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে সশস্ত্র অভিযানের প্রতি পাকিস্তানের সক্রিয় সাহায্য সম্পর্কে অভিযোগ করে আসছে। অন্যদিকে ইসলামাবাদ সন্দেহ পোষণ করছে যে, ভারত তার অভ্যন্তরীণ গোলযোগ সম্পর্কে অনাহূত পাকিস্তানকে ফাঁসাতে সচেষ্ট। এছাড়া পাকিস্তানের গভীর বিশ্বাস যে, সিন্ধু ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অসন্তোষের পেছনে ইন্ধন যোগাচ্ছে ভারতের সাহায্য ও সহানুভূতি।

ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্বের অধিকতর বিপজ্জনক দিক হচ্ছে তাদের অব্যাহত অস্ত্র প্রতিযোগিতা। ভারত যে কেন ব্যাপক আকারে অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে তুলছে পাকিস্তান তার কোনো যৌক্তিকতা মেনে নিতে অনিচ্ছুক। কেননা ভারত ইতিমধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়ন/রাশিয়া, চীন এবং যুক্তরাষ্ট্রের পরেই চতুর্থতম শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনীর অধিকারী দেশ। ভারত যেহেতু তার রণদক্ষতা উন্নয়নকল্পে বেশ মোটা পরিমাণ অঙ্কের অর্থ ব্যয় করে চলছে সেহেতু বেশিরভাগ পাকিস্তানী দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের আধিপাত্যবাদী প্রবৃত্তি সম্পর্কে সন্দিহান।[২২] প্রকৃত প্রস্তাবে পাকিস্তান ভারতকে তার নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হিসেবে দেখে আসছে, আর তাই ইসলামাবাদ পশ্চিমা সূত্র, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র থেকে সাহায্য সরবরাহ লাভের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। ভারত যদিও বিভিন্ন সূত্র থেকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে থাকে তবু সোভিয়েত ইউনিয়ন/রাশিয়াই হচ্ছে তার সামরিক সরবরাহের প্রধান উৎস। পরিমাণ ও গুণগত দিক থেকে সাম্প্রতিককালীন ভারত-পাকিস্তান অস্ত্র প্রতিযোগিতার ব্যাপকতা অতীতের সব পরিসংখ্যান ছাড়িয়ে গেছে।

ভারত-পাকিস্তান অস্ত্র প্রতিযোগিতার সবচেয়ে মর্মান্তিক দিক হচ্ছে উভয়ের পারমাণবিক কর্মসূচি ও সম্ভাবনা। ভারত তার প্রথম আণবিক বোমার

www.pathagar.com

বিস্ফোরণ ঘটায় ১৯৭৪ সনের অক্টোবরে, এভাবে বাস্তবায়িত করে পারমাণবিক শক্তিতে পরিণত হওয়া সম্পর্কিত তার বাসনা।[২৩] জানা যায় যে, ভারত বর্তমানে পারমাণবিক অস্ত্র উৎপন্নে ব্যবহৃত পদার্থ প্লুটোনিয়াম যে পরিমাণে উৎপাদনে সমর্থ তাতে ইচ্ছে করলে প্রতি বছর ২০টি পারমাণবিক বোমা উৎপাদন করতে সক্ষম।[২৪] ভারতের পক্ষে তার পারমাণবিক নীতির এ ধরনের বিবর্তন তার বিশ্ব-পরিব্যাপ্ত ভাবমূর্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা, এতে সম্ভব হতে পারে, 'যাতে ভারত [বিশ্বের] পারমাণবিক অস্ত্রের সম্প্রসারণরোধ ও সার্বজনীন নিরাপদমূলক শর্তাদি মেনে নিতে সম্মত করাতে পারে, বলে এক ভারতীয় রণনীতিবিদ।[২৫] পারমাণবিক প্রযুক্তির কতকগুলো দিকে ভারত পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে গেছে বটে, এতে পাকিস্তান ভারতের সম্ভাব্য কর্তৃত্বের ভয়ে আরো সন্ত্রস্ত এবং এ কারণে পাকিস্তান পারমাণবিক ক্ষেত্রে তার অনগ্রসতার বাধা অতিক্রম করতে সচেষ্ট, বিশেষ করে ইউরোনিয়াম উন্নতকরণের পদ্ধতি সম্পর্কিত জ্ঞানলাভেও তৎপর। এই পারমাণবিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও পাকিস্তান কর্তৃক এ ধরনের 'পাল্টা ভারসাম্য রণনীতি' (Counterbalance strategy) গ্রহণের ফলে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কে আরো তিক্ততা সঞ্চার হয়।

সম্ভবত ভারত পাকিস্তানের পারমাণবিক অভিলাষকে তার আঞ্চলিক বিশ্বাস-যোগ্যতার প্রতি হুমকি হিসেবে দেখে। পারমাণবিক ক্ষেত্রে ভারতের বিশ্বজনীন ভাবমূর্তি গ্রহণ সত্ত্বেও ভারত-পাকিস্তান পারমাণবিক প্রতিযোগিতার একটি মৌলিক উপাদান হচ্ছে যে, তাদের পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন শুধু পরস্পরের বিরুদ্ধে। তবে উভয়ে যখন পারমাণবিক অস্ত্রলাভেরগণ্ডী অতিক্রম করবে তখন আর কিছুই তাদের সম্মুখে বড় বাধা হয়ে দেখা দেবে না এবং পারমাণবিক অস্ত্র উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বাধ্যবাধকতার কারণে উভয়ে সম্ভবত পুরোপুরি পারমাণবিক শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার অপ্রতিরোধ্য বাসনার স্রোতে ভেসে যাবে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পারমাণবিক নিবারকের যৌক্তিকতা এবং এর ফলশ্রুতিতে দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক স্পৃহাকে নিস্তেজ করে দিতে পারে।

পরিহাস হচ্ছে এই যে, ভারত ও পাকিস্তান তাদের অব্যাহত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও তিক্ত সম্পর্কের কারণে দেখছে না যে, কিরূপ অভিন্ন হুমকি তাদের প্রতি এবং একই সঙ্গে এ অঞ্চলের প্রতি ত্রাস সৃষ্টি করতে চলছে। আফগানিস্তানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপ এবং ভারত মহাসাগর অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান সামরিকীকরণ থেকে এই ত্রাসের সম্ভাবনা। ভারতের বিশ্বাস যে, পাকিস্তান আফগান সংকটকে মূলধন করে ১৯৫০ ও ১৯৬০ -এর দশকের স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন মৈত্রী ব্যবস্থার মতো এখনো ভারতের বিরুদ্ধে তার আপেক্ষিক শক্তি অবস্থান

www.pathagar.com

জোরদার করার প্রয়াসে লিপ্ত।[২৬] কিন্তু ভারতের যেহেতু বিশ্ব পরিব্যাপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষায় অভিলাষ রয়েছে এ অঞ্চলের প্রধান শক্তি হিসেবে সেহেতু স্বাভাবিক কারণে এ অঞ্চলে যে কোনো বহিঃশক্তির রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বা সামরিক শক্তি প্রবর্তিত হলে ভারতের আঞ্চলিক প্রতিযোগীর চেয়ে তার নিজেরই অবস্থানের প্রতি অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য হুমকি দেখা দেবে। কিন্তু কার্যত ভারতের কাছে যেন বাইরের শত্রুর হুমকি মোকাবিলার চেয়ে পাকিস্তানকে বাগমানানোই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

এবার ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান ও মালদ্বীপের সম্পর্কের বিষয়ে আসা যাক। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর এসব আঞ্চলিক শক্তিগুলো পরাশক্তি বা অন্য কোনো শক্তির সঙ্গে বিশেষ কোনোরূপ সম্পর্ক রক্ষা করে চলে না। এসব দেশের পররাষ্ট্রনীতির গভীরতর উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে তাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা, সংরক্ষণ করা তাদের গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় স্বার্থ। কিন্তু তাদের কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি, তাদের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান বা প্রাকৃতিক দুর্বলতার কারণে তারা মারাত্মক বাধা-প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন। এসব বাধা-প্রতিবন্ধকতা বাংলাদেশসহ ক্ষুদ্রতর শক্তিগুলো পরিবর্তনশালী রণনীতি ও বহুমুখী বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে মোকাবিলায় সচেষ্ট।[২৭] তবু ভারতের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সম্ভবত তাদের বৈদেশিক সম্পর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। কেননা এ অঞ্চলের সুবিশাল কেন্দ্রদেশ ভারত তাদের বন্ধু, পথ-প্রদর্শক, এমন কি নিরাপত্তা বিশদায়ক হিসেবে বিশেষ ভূমিকার দাবিদার, যদিও অনেকের নিকট এরূপ দাবি বৃহৎ শক্তিসুলভ অপ্রতিসম আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রসূত।

প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে সম্ভবত বাংলাদেশ অন্যান্য রাষ্ট্রের চেয়ে ভারতের প্রতি অধিকতর কৃতজ্ঞতার নাগপাশে আবদ্ধ। কেননা অনেকের দৃষ্টিতে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত একটি যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে। ১৯ মার্চ ১৯৭২-এ স্বাক্ষরিত ২৫ বছর মেয়াদি একটি চুক্তি সম্পাদন করে উভয় দেশ এরূপ বন্ধুপ্রতিম ভাবমূর্তি অধিকতর প্রসারে সচেষ্ট হয় বস্তুত, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের 'সোনালি' দিনগুলোতে, স্বাধীনতার অব্যবহিত দু'বছর অবধি, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির মুখ্য ভিত্তি ছিল ভারতের সঙ্গে বন্ধুপ্রতিম সম্পর্ক সুসংহত করা।[২৮] সম্ভবত ভারতের নিকটও ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত ছিল একটি পরম গৌরব এবং আনন্দের বিষয়। কেননা এ চুক্তিতে উভয় দেশের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র নীতি সমন্বয়ের বিধান রাখা হয়। এর চেয়েও বড় কথা, এ চুক্তি ছিল ভারতের আন্তঃনির্ভরশীলতা রণনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

www.pathagar.com

কিন্তু বাংলাদেশে অনেকে এই চুক্তিকে দক্ষিণ এশিয়ার পরিবর্তিত শক্তিকাঠামো এবং আঞ্চলিক রাষ্ট্রসমূহের পররাষ্ট্র-অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে 'ভারতের আপন স্বার্থোদ্ধারের পূর্ব পরিকল্পিত ভারতীয় প্রয়াসের' অংশবিশেষ বলে মনে করে।[২৯] ফলে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে অচিরেই ফাটল ধরে, সঞ্চার হয় তিক্ততা। বিশেষ করে বাংলাদেশে আগস্ট ১৯৭৫-এর ক্ষমতার পটপরিবর্তন হওয়ার পর ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের গভীর কালো ছায়া পরিলক্ষিত হয়। তবু বলা অমূলক হবে না যে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতিতে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াজাত উপাদান হিসেবে ভারতের উপস্থিতি ও প্রভাব অন্য যে কোনো উপাদানের চেয়ে প্রকট। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে এ জাতীয় ধারা যথার্থ তুলে ধরেন একজন প্রজ্ঞাবান বিশ্লেষকঃ বাংলাদেশে ক্ষমতায় টিকে থাকতে হলে অতি ভারতপন্থী যে কোনো সরকারকেও তার ভারত-প্রীতি প্রদর্শন থেকে যথেষ্ট সতর্কতা বজায় রেখে চলতে হবে ; পক্ষান্তরে কট্টর ভারত-বিরোধী যে কোনো সরকারের পক্ষে ভারতবিরোধী কিছুটা নির্দিষ্ট গন্ডীর [৩০] মধ্যে সীমিত রেখে চলা ছাড়া কোনো গত্যন্তর থাকবে না।

বাংলাদেশ ও ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে বেশ কিছু অমীমাংসিত, বিবদমান বিষয় সংশয় ও সন্দেহ সৃষ্টি করে চলছে। এসবের মধ্যে রয়েছে অভিন্ন নদনদীগুলোর পানির হিস্যা নিয়ে বিবাদ। উভয় দেশের মধ্যে এ হচ্ছে সবচেয়ে নিশ্চল সমস্যা। ভাটির দেশ হিসেবে বাংলাদেশ মনে করে যে, উজান দেশ ভারত প্রায় সব বড় বড় নদ-নদীগুলোতে একতরফাভাবে বাঁধ নির্মাণ করে বাংলাদেশের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করে চলছে। বাংলাদেশের দৃষ্টিতে, এসব বাঁধ দ্বারা ভারত শীত ও শুকনোর মওসুমে বাংলাদেশকে তার প্রাপ্য পানি ভাগ থেকে বঞ্চিত করছে, অথচ বর্ষার মওসুমে ভারত বাঁধের দ্বার উন্মুক্ত করে অতিরিক্ত পানি ছেড়ে দিয়ে বাংলাদেশকে বন্যায় প্লাবিত করছে। ১৯৭৫ সনে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ সম্পূর্ণ করার পর থেকে ভারত যে ইচ্ছাকৃতভাবে পানি সমস্যা সমাধানকল্পে বাংলাদেশের সঙ্গে কোনোরূপ দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিতে পৌঁছতে নারাজ তা বাংলাদেশের অনেকের কাছে স্পষ্ট। অনেকে একে ভারতীয় আধিপত্যবাদী মনোভাবের পরিচায়ক বলে মনে করে। ভারত কর্তৃক একতরফা গঙ্গার পানি প্রত্যাহারের ফলে বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি এলাকা অর্থনৈতিক ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে।

পানি বন্টন সমস্যা এখন পানির প্রবাহ বৃদ্ধি ও পানি নিয়ন্ত্রণ সমস্যাকে গুরুত্বের দিক থেকে ছাড়িয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে ভারত কর্তৃক ২০০ মাইল দীর্ঘ 'সংযোগ খাল' নির্মাণের প্রস্তাব। ভারতের প্রস্তাবিত এই খাল ব্রহ্মপুত্র নদীকে ফারাক্কার কাছে গঙ্গার সঙ্গে সংযুক্ত করবে। কিন্তু বাংলাদেশ

www.pathagar.com

ভারতের সংযোগ খালের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এর পরিবর্তে বাংলাদেশে শুকনো মওসুমে গঙ্গার প্রবাহ বৃদ্ধিকল্পে নেপালে গঙ্গার শাখায় জলধারা নির্মাণের প্রস্তাব রাখে। ভারতের সংযোগ খাল নির্মাণ সম্পর্কিত প্রস্তাব বাংলাদেশ প্রত্যাখ্যান করে এ কারণে যে, এ ধরনের খাল বাংলাদেশের কৃষিকার্য ও পরিবেশের ওপর দারুণ ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে, ঘটাতে পারে উপর্যুপরি বন্যার উপদ্রব, পলিমাটি ও তলানি সঞ্চিত করবে, ক্ষয় করবে মাটি।

সাম্প্রতিককালে ভারত ত্রিপক্ষীয় আলাপ-আলোচনায় নেপালের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে বাংলাদেশের প্রস্তাবে রাজি হয়েছে বলে মনে হয়; তবু বাংলাদেশ-ভারত পানি হিস্যা সম্পর্কিত আলোচনায় সৃষ্ট অচলাবস্থা দূর হয় নি। বরং দু'দেশের মধ্যে এ নিয়ে আরো জটিলতার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা তিস্তা, খোয়াই গোমতী, মুহুরী, মনু, ধরলা, ধুধকুমার, কুশিয়ারা ও মহানন্দার মতো নদীগুলোতে উজান দেশ ভারত যখন বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু করবে তখন ভাটির দেশ বাংলাদেশে এসবের অশুভ প্রভাব হবে প্রায় তাৎক্ষণিক। এ ধরনের উদ্ভূত সমস্যা সমাধানকল্পে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সনে বাংলাদেশ-ভারত যুক্ত নদী কমিশন গঠিত হয়, কিন্তু হিস্যার সমাধানে এ কমিশনের সাফল্য অতি তুচ্ছ বলা চলে।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক বিষিয়ে তুলছে আরো কিছু অমীমাংসিত সমস্যা। এসবের মধ্যে রয়েছে তিন বিঘা ও দক্ষিণ তালপট্টি, উভয় দেশের অভিন্ন সীমান্তে ভারতের প্রস্তাবিত কাঁটাতারের বেড়া, সামুদ্রিক জলসীমা চিহ্নিতকরণ, ব্যবসা-বাণিজ্যে অসমতায় সাম্য বিধান, ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর যোগসাজশ ও সমর্থনপুষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা উপজাতীয় বিদ্রোহীদের সন্ত্রাসী হামলা। এসব বিবদমান বিষয়ের কারণে বাংলাদেশে ভারতের আধিপত্যবাদ ও কর্তৃত্বসুলভ মনোভাবের বিরুদ্ধে ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। অনেকে একে পরিহাস মনে করছে যে, যে-পাকিস্তানের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের অধিকতর সুসম্পর্ক লক্ষণীয়[৩১] যদিও পুরনো পাকিস্তানের সম্পদের হিস্যা এবং পাকিস্তানপন্থী বিহারীদের পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের বিবাদ এখনো সম্পূর্ণ অমীমাংসিত।[৩২]

ভারত কেন বাংলাদেশকে তিন বিঘা করিডোর ফেরত দেয়া এবং চাকমা উপজাতীয় শরণার্থীদের বাংলাদেশে ফিরে আসার ব্যাপারে সরকারি চুক্তি সম্পাদন, উচ্চ পর্যায়ে নিশ্চয়তা ও সমঝোতা সত্ত্বেও কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে না–এতে অনেকে হয়তো আশ্চর্য হতে পারে, কিন্তু এসব বিষয়গুলো ভারতের 'আন্তঃনির্ভরশীলতা' রণনীতি এবং কখনো সখনো বাংলাদেশের গৃহীত পাল্টা-ভারসাম্যমূলক 'স্বাধীনচেতা' দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষাপটে বিচার-বিশ্লেষণ করা হলে

www.pathagar.com

বুঝা কঠিন হবে না যে কি কারণে ভারত তার চুক্তি, নিশ্চয়তা বা সমঝোতা বাস্তবায়ন থেকে বিরত থাকছে।

ছয়

এখন ভারত-শ্রীলংকা সম্পর্ক পর্যালোচনা করা যাক। ভারত শ্রীলংকার একমাত্র নিকট প্রতিবেশী। বলা হয় যে, বৃটেনের নিকট আয়ারল্যান্ড কিংবা চীনের নিকট ফরমোজা যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভারতের নিকট শ্রীলংকাও তেমনি।[৩৩] ভারতের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানগত প্রভাব ও বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন কলম্বো মনে করে যে, ঐতিহাসিক রামায়ণ যুগ থেকে শ্রীলংকা প্রায় সর্বদা দক্ষিণ ভারত হতে আক্রান্ত হয়। ভারতভীতি তাই শ্রীলংকায় প্রায় সর্বদা বর্তমান।[৩৪]

শ্রীলংকার সাম্প্রতিক জাতিগত সমস্যার ফলে ভারত-শ্রীলংকা সম্পর্ক কঠোর পরীক্ষার সম্মুখী। জুলাই ১৯৮৩ -এ শ্রীলঙ্কার সংখ্যাগরিষ্ঠ সিংহলী ও সংখ্যালঘিষ্ঠ তামিলদের মধ্যে সহিংস দাঙ্গা শুরু হয়। তামিলদের সমান অধিকারের দাবি নিয়ে বিবাদ শুরু হলেও পরে তামিলরা উত্তর শ্রীলংকার জাফনা উপদ্বীপে স্বাধীন তামিল রাষ্ট্র গঠনের দাবি করে। এরূপ সহিংসতা ও রাজনৈতিক দাবির প্রতিক্রিয়া খোদ ভারতেও দেখা দেয়। শ্রীলংকার বহু তামিল ভারতে পালিয়ে গিয়ে তামিলনাড়ু রাজ্যে আশ্রয় লাভ করে। সেখানে তারা যুদ্ধে প্রশিক্ষণ লাভ ছাড়া অস্ত্রশস্ত্রও লাভ করে এবং শ্রীলংকায় ফিরে এসে তারা কলম্বো সরকারের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ভারত বার বার প্রকাশ্যে জানায় যে, তামিলদের নিয়ে বিবাদ শ্রীলংকার অভ্যন্তরীণ বিষয়, যদিও ভারত সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্তু ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তামিল গেরিলারা তবু তামিলনাড়ু থেকে শ্রীলংকায় অনুপ্রবেশ অব্যাহত রাখে। ফলে পারস্পরিক ভয়ভীতি ও আশংকার কারণে শ্রীলংকা-ভারত সম্পর্ক অচিরেই ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের পর্যায় এসে দাঁড়ায়। কলম্বো সহিংস ও অশান্ত তামিলদের তুষ্টি বিধানে আঞ্চলিক, এমন কি অঞ্চলের বাইরের শক্তিগুলোর সক্রিয় সাহায্যও কামনা করে।

এ পর্যায়ে কলম্বো ভারতের কৌশলগত তত্ত্বের মর্মে আঘাত হানে, অতিক্রম করে ভারতের 'আন্তঃনির্ভরশীলতা' রণনীতির গণ্ডী। শীঘ্রই ভারত সক্রিয় 'মানবিক' আগ্রহের মুখোশ ধরে শ্রীলংকায় অবতীর্ণ হয় ঐতিহাসিক জ্ঞাতিত্বের ভূমিকায়, যে মুখোশ উন্মোচিত হয় তার 'ত্রাণবোট কূটনীতিতে'। পরবর্তীকালে একই মুখোশ আরো উদ্‌ঘাটিত হয় ভারতীয় জঙ্গি বিমানের সশস্ত্র প্রহরায় জাফনায় তামিলদের জন্য ভারতের পরিবহণ বিমান থেকে ত্রাণ

www.pathagar.com

সামগ্রী ফেলার প্রক্রিয়া থেকে। বহির্বিশ্বের নিকট শ্রীলংকার তামিলদের ব্যাপারে ভারত যে-কতখানি বিজড়িত ছিল তা আর গোপন থাকে নি। এসবের চূড়ান্ত পরিণামে ভারত তার কৌশলগত ক্ষমতার দাপটে শ্রীলংকার সঙ্গে ২৯ জুলাই ১৯৮৭ তে স্বাক্ষর করে রাজীব-জয়বর্ধনে চুক্তি, যে কারণে এক পর্যবেক্ষক একে অভিহিত করেন 'করেন সম্মতিবিহীন বিজয়ের আয়োজন রূপে'।[৩৫] এ চুক্তি কতখানি তামিল সমস্যার সমাধান করতে পারবে, সামঞ্জস্য বিধান করতে পারবে তাদের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং একই সঙ্গে তুষ্ট করতে পারবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সিংহলীদের একমাত্র সময়ের মাপকাঠিতে তা প্রমাণিত হবে।

বর্তমানে কিন্তু দৃঢ়প্রত্যয়ী ভারত এবং অনিচ্ছাভরে ভারতের হস্তক্ষেপ সম্মত বিপদগ্রস্ত শ্রীলঙ্কা তাদের পারস্পরিক প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র নীতির সমন্বয় করতে পেরে আপাতদৃষ্টিতে সন্তুষ্ট বলে মনে হচ্ছে। অন্ততপক্ষে ভারতের জন্য এটা বড় গৌরবের বিষয়। এর মাধ্যমে ভারত তার আন্তঃনির্ভরশীলতা' রণনীতিতে এ ধরনের প্রস্তাবিত প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি সমন্বয়ের বিধান বাস্তবায়িত করে। শ্রীলংকায় ভারতের হস্তক্ষেপে অন্যান্য সার্কদেশের প্রতিক্রিয়া কি ধরনের? দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তর শক্তি একটি প্রতিবেশী স্বাধীন, সার্বভৌম দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ প্রক্রিয়ায় দৃষ্টান্তে তারা সচকিত, কেননা এ ধরনের প্রক্রিয়া সেকেলে সম্প্রসারণবাদী অভিসন্ধির-ই পরিচায়ক।

সাত

প্রকৃতপক্ষে ভারতের প্রায় সব প্রতিবেশী দেশ অনুভব করে যে, ভারত তাদের সমান অধিকারভিত্তিক সার্বভৌম দেশ বিবেচনা করে না। সিকিম ও ভুটান উভয়ে ছিল ব্রিটিশ ভারতবর্ষের আশ্রিত দেশ, উভয় দেশ যথাক্রমে ১৯৫০ ও ১৯৪৯ সনে স্বাধীন ভারত কর্তৃক স্বাক্ষরিত চুক্তির মাধ্যমে একই ধরনের ভাগ্যের শিকার হয়। বরং ভারত এ সময়ে তার আশ্রিত রাজ্যদ্বয়ের ওপর ঔপনিবেশিক আমলের সম্ভবত কঠোরতর শর্তাবলি চাপিয়ে দেয়। এভাবে স্বাধীন ভারত আশ্রিত রাজ্যের অধিকারী এশিয়ার একমাত্র শক্তিরূপে পরিগণিত হয়। ১৯৭১ সনে অবশ্য ভারত ভুটানের জাতিসংঘ সদস্যপদ লাভে সম্মতি প্রদান করে। সেই সময় থেকে ভুটান তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের দৃষ্টান্ত অনুকরণে তার জাতীয় সার্বভৌম ক্ষমতা অর্জনে তৎপর, যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে ভুটান এখনো, বিশেষ করে প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়ন ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে, ভারতের তদারকি ও সতর্ক প্রহরাধীন। ১৯৭৪ সনে ভারত আশ্রিত দেশ সিকিমকে তার অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগে গ্রাস করে।

www.pathagar.com

এতে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান ও নেপালে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের চূড়ান্ত উদ্দেশ্যাবলি নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়।

কৌশলগত অবস্থানের দিক থেকে ভুটান ও নেপাল উভয় হিমালয়ে রাজ্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ, কেননা দুটি দেশই ভারত ও চীনের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ভারত তাই এ দু'দেশকে তার নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য বলে মনে করে। নেপাল কখনো কোনো বিদেশী শক্তির কর্তৃত্বাধীন ছিল না। স্বাভাবিক কারণে নেপাল তার ভূকৌশলগত অবস্থানের সুযোগ গ্রহণ করতে আগ্রহী। কিন্তু নেপালকে অচিরেই ভারতের 'আন্তঃনির্ভরশীলতা' রণনীতির আওতায় আসতে হয়। বস্তুত এই রণনীতি মোতাবেক যে কয়টি দক্ষিণ এশীয় দেশকে প্রথমেই ভারতের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র নীতি সমন্বয়ের ধারণা গ্রহণ করতে হয় নেপাল তার মধ্যে অন্যতম। ভারতীয় রণনীতি সন্নিবিষ্ট হয় ১৯৫০-এর তথাকথিত ভারত-নেপাল শান্তি ও বন্ধুপ্রতিম চুক্তিতে। এ ধরনের চুক্তির সুযোগ নিয়ে ভারত ১৯৫১ সনে নেপালে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র গঠনে তৎপর হয়। ফলে নেপাল সরকার ভারতীয় স্বার্থোদ্ধারে নেপালের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার দায়ে ভারতকে অভিযুক্ত করে। ১৯৬০-এর দশকে ভারত কিছুকালের জন্য তার নিজস্ব সীমানার অভ্যন্তর থেকে নেপালি রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে নেপালি বিদ্রোহীদের বিদ্রোহমূলক তৎপরতায় ইন্ধন যোগায়। ফলে বেশ কয়েক বছর ভারত-নেপাল সম্পর্কে চাপ সৃষ্টি হয়।

দু'দেশের সম্পর্কের এই পটভূমিতে স্বাভাবিক কারণে নেপাল চায় একটি আঞ্চলিক শক্তিসাম্য অবস্থা সৃষ্টি করতে, মোকাবিলা করতে প্রয়াসী হয় ভারতের সৃষ্ট চাপের। বিশেষ করে নেপাল চীনের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতে সচেষ্ট হয়। নেপালের পররাষ্ট্র নীতিতে এ ধরনের কৌশলগত প্রবণতা ভারত সুনজরে দেখে নি বরং উদ্বিগ্ন হয়।[৩৬] বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সার্কভুক্ত দক্ষিণ এশীয় অন্যান্য দেশ কিন্তু চীন-নেপাল সুসম্পর্ক ইতিবাচক বলে মনে করে। কেননা এর ফলে শুধু ভারতের চাপ প্রতিহত হবে না, দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ভারসাম্যমূলক একটি সুস্থ ভাবধারাও সৃষ্টি হতে পারে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জের সমন্বয়ে গঠিত মালদ্বীপও সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশের মতো সমান ও সার্বভৌম মর্যাদা সংরক্ষণে ঈর্ষাকাতর। এ কারণে মালদ্বীপ শুধু দক্ষিণ এশিয়ার সব রাষ্ট্রের সঙ্গে অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ সুসম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী নয়, এমন কি সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সব বহির্শক্তির সঙ্গেও ভারসাম্যমূলক সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট। সম্ভবত ভারত প্রতিবেশী সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশগুলোর সঙ্গে তার আঞ্চলিক বিবাদে মালদ্বীপকে নিরপেক্ষ দেখতে চায়,

www.pathagar.com

কিন্তু ভারতের হস্তক্ষেপমূলক রণনীতি প্রসঙ্গে মালদ্বীপকে সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশগুলোর অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম বলে মনে হয়।

আট

এ পর্যায়ে ভারত ও তার প্রতিবেশীগুলোর সম্পর্কের সাধারণ কৌশলগত ভাবধারা এবং কার্যকর কলাকৌশল সংক্ষেপে পুনরুল্লেখ করা যেতে পারে। নীতিগত পর্যায়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের প্রধান শক্তি হিসেবে একটি বিশ্বভূমিকা অর্জনে ভারতীয় অন্বেষা অন্তত আংশিকভাবে হলেও বাস্তবরূপ লাভ করে। কেননা জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতৃত্বলাভ ও পঞ্চশীলার ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতির প্রবক্তা হিসেবে ভারত তার আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তির প্রসার ঘটায়।[৩৭] ভারত এই সমকালীন বিশ্বকে দেখে আদর্শগত ভাবাবেগ ও দ্বিধাদ্বন্দ্বে বিভক্ত একটি সত্তা হিসেবে, আর তাই নয়াদিল্লী তার নিজস্ব নমনীয় ও যুক্তিযুক্ত ভাবমূর্তি তুলে ধরতে প্রয়াসী। এ ধরনের ভাবমূর্তি সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় ভারত যথেষ্ট চাতুর্য ও সূক্ষ্মতার পরিচয় রাখে। আজকাল বিশ্বের অনেক দেশ অন্তত বাহ্যিক বা মুখ রক্ষামূলকভাবে হলেও ভারতের উত্থাপিত নির্জোট ও পঞ্চশীলার মতো নীতি-আদর্শের প্রতি সমর্থন প্রদান করে থাকে। তার আঞ্চলিক কৌশলগত উদ্দেশ্যাবলির অনুকূলে বা তার মহারণনীতি, রণনীতি ও রনকৌশলের প্রয়োগ ভারত একই ধরনের চাল-চাতুর্য প্রদর্শন করে আসছে। কেননা ভারত দক্ষিণ এশিয়ায় গড়ে তুলে দ্বি-পাক্ষিক মডেল ভিত্তিক শান্তিপূর্ণ, বন্ধুপ্রতিম ও সহযোগিতার সম্পর্ক এবং এ ধরনের সম্পর্ক ভারত গড়ে তুলে 'আন্তঃনির্ভরশীলতা' রণনীতি ভিত্তিক চুক্তির মাধ্যমে।

কিন্তু আদর্শিক শ্লোগানে সমন্বিত বাহ্যিক আবরণ সত্ত্বেও এ ধরনের ভারতীয় রণনীতি হচ্ছে একক ভারতীয় স্বার্থ বিস্তারের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ; দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক স্বার্থ সংরক্ষণ বা উন্নয়নের বিধান এতে নেই। তবু এ জাতীয় রণনীতি প্রসূত চুক্তি ভারত শুধু স্থলভাগবেষ্টিত হিমালয় রাজ্য ভুটান ও নেপালের সঙ্গে স্বাক্ষর করে নি, বাংলাদেশ এবং শ্রীলংকার মতো পরস্পর দূরদূরান্তে অবস্থিত ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গেও নয়াদিল্লী একই ধরনের চুক্তি সম্পাদন করে। একজন ভারতীয় বিশ্লেষকের দৃষ্টিকোণ থেকে, এসব চুক্তির ফলে ভারত সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর ওপর কর্তৃত্ব লাভ করে বটে, কিন্তু চুক্তির আওতাধীন দেশগুলোর নিরাপত্তার বিধান শুধু হবে না, ভারতের ছত্রছায়ায় আঞ্চলিক নিরাপত্তাও সুনিশ্চিত হবে। পাকিস্তানও তার আপন স্বার্থের কারণে শেষ পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে একই

www.pathagar.com

ধরনের সম্পর্ক স্থাপনের বিষয় বিবেচনা করতে পারে।[৩৮] কিন্তু সিমলা চুক্তি সত্ত্বেও ভারতীয় সামরিক বা রাজনৈতিক ছত্রছায়ার প্রতি পাকিস্তানের কোনোরূপ অনুরাগ রয়েছে বলে মনে হয় না।

এটা সত্য যে, ভারত নির্জোট বা জোটনিরপেক্ষতা, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান ও ধর্মনিরপেক্ষতা, অহিংসা ও অন্যদেশে হস্তক্ষেপ না করা, শান্তি ও বন্ধুপ্রতিম বা মৈত্রীভাবসহ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বেশ নীতিসূত্র দ্বারা তার পররাষ্ট্র নীতি ও বৈদেশিক আচরণকে আবেষ্টিত রাখে। কিন্তু এ ধরনের নীতিসূত্রের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন সত্ত্বেও প্রতিবেশী সার্কভুক্ত দেশগুলোর প্রতি ভারতের সার্বিক আচরণ এবং আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে এমন একটা ধারণা বিরাজ করে যে, ভারত তার আদর্শিক ও ইতিবাচক নীতিসূত্রের আড়ালে আসল উদ্দেশ্যাবলী গোপন রাখে। ভারতের প্রকৃত রণকৌশল হচ্ছে বিশ্ব পর্যায়ে সুযোগের সন্ধান- সুযোগ মতো মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন। আঞ্চলিক পর্যায়ে ভারত শুধু আন্তঃনির্ভশীল রণনীতি ভিত্তিক দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করে ক্ষান্ত হচ্ছে না, এর বাস্তব প্রয়োগে সক্রিয় রণ-কৌশলও অবলম্বন করে চলছে। এসবের মধ্যে রয়েছে স্বার্থোদ্ধারের উদ্দেশ্যে হস্তক্ষেপ করা; প্রতিবেশী দেশগুলোর রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বীদের আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেয়া; ভারতের ছত্রছায়ায় বিদ্রোহমূলক তৎপরতা চালাতে দেয়া, সময়-সুযোগ মতো প্রয়োজন হলে বিদ্রোহীদের অনুকূলে হস্তক্ষেপ করা; দ্বি-পাক্ষিক বিবাদ বা সমস্যার সমাধানে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে চুক্তি বা সমঝোতায় পৌঁছানো, কিন্তু ভারতের কৌশলগত উদ্দেশ্য হাসিলের অনুকূল না হলে এসব বাস্তবায়িত করা থেকে বিরত থাকা; আঞ্চলিকভাবে সহিংসতায় ইন্ধন যোগানো; বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চলতি ভারসাম্যহীনতা রক্ষা করে চলা; আদর্শিকভাবে শান্তিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষতার মতো মুখরোচক প্রচারণা সত্ত্বেও খোদ ভারতে সংখ্যালঘুদের এসব অধিকার আদায় বা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ভ্রুক্ষেপ না করা।

এভাবে ভারতের কৌশলগত আদর্শ ও বাস্তব আচরণে দ্বৈত ভাবধারা পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, ভারতের কৌশলগত আচরণ ক্রমশই সেকেলে ধ্রুপদী বা অপ্রতিসম ভাবধারাপুষ্ট বলে মনে হয়। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের কৌশলগত তত্ত্বের প্রেক্ষাপটে এবং এ অঞ্চলে তার সার্বিক রণনৈতিক আচরণের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বাঙ্গালোর সার্ক সম্মেলন চলাকালে (১৯৮৭) ভারত ও সার্কভুক্ত প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতার প্রয়োজনে কৌটিল্যের কলাকৌশল ব্যবহারের প্রতি ভারতীয় অনুরাগ নিছক নীতিভ্রংশ বলে মনে হয় না।[৩৯]

www.pathagar.com

নয়

উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে এটা যথার্থই প্রতীয়মান হয় যে, ভারতীয় কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করে দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সম্পর্ক কি ধরনের হবে ; তার আচরণের ধারা এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ করবে দক্ষিণ এশিয়ায় কি সহযোগিতামূলক বিবর্তন ঘটবে, নাকি পারস্পরিক ভয়ভীতিজাত বিবদমান কাঠামো এ অঞ্চলের কৌশলগত পরিবেশ দূষিত করতে থাকবে। দক্ষিণ এশিয়ার রণনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা এটাই ইঙ্গিত দেয় যে, কেন্দ্রস্থ আঞ্চলিক শক্তি ভারতের আগ্রহ এখনো নিবন্ধ দ্বি-পাক্ষিকভিত্তিক অপ্রতিসম সম্পর্কে, বহুজাতিক সহযোগিতামূলক প্রতিসম আনুভূমিক সম্পর্কে নয়।

ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের প্রকৃতি, বিশেষ করে পারস্পরিক ভয়ভীতিজাত হুমকি বা সচেতনতার কারণে আঞ্চলিক সংস্থা সার্কের ভবিষ্যৎ বানচাল হতে পারে। বর্তমানে ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলোরতে বিরাজমান ধারণা হচ্ছে যে, ভারত তার আঞ্চলিক ও বিশ্ব পরিব্যাপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে কৌশলগত ও কৌশলমূলক অভিসন্ধি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। এ ধরনের অবিশ্বাস ও সন্দেহমূলক ধারণা নির্মূল করতে ভারতকে সচেষ্ট হতে হবে। যদি ভারতের সঙ্গে প্রতিবেশী দেশগুলোর দ্বিপাক্ষিক রাজনৈতিক সমস্যাদির অমীমাংসিত থাকে তবে বহুজাতিক আঞ্চলিক সংগঠন সার্কের জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে। ভারত এককভাবে ভয়ভীতির উৎসরূপে চিহ্নিত বলে তার প্রতিবেশী দেশগুলো পাল্টাভারসাম্যে চাল হিসেবে নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার জন্য বহির্শক্তির মুখাপেক্ষী।

উপর্যুক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের উচিত হবে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে তার মনস্তাত্ত্বিক বাধা দূরীভূত করা, অপ্রতিসম প্রভু নয়- প্রতিসম শরিক হিসেবে তার বিশ্বাসযোগ্যতা স্থাপন করা। বর্তমান দ্বন্দ্ব-বিরোধ থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে ভারত ও সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশসূহকে ভাবতে হবে সম্ভাব্য উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে, খুঁজতে হবে নতুন উপায়, প্রণয়ন করতে হবে নতূন রণনীতি ও রণকৌশল সমন্বিত নতুন সম্পর্কের কাঠামো। ভারতকে তার একান্ত স্বীয় স্বার্থপ্রণোদিত আন্তঃনির্ভরশীলতা রণনীতির মতো বিকল্প পন্থা গ্রহণ সম্পর্কে ভাবতে হবে।

অল্পকথায়, ভারতকে তার কর্তৃত্বসুলভ ও আধিপ্রত্যবাদী কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করতে হবে। সুবিশাল ভারতকে তার সংকীর্ণ স্বার্থেরগণ্ডী পরিত্যাগ করতে হবে, একক আপন স্বার্থ হাসিলের অন্বেষা বাদ দিয়ে

www.pathagar.com

ভারতকে ভাবতে হবে ঐতিহ্যদীপ্ত আঞ্চলিক সংহতির কথা, নীতিসূত্রভিত্তিক শ্লোগানের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠা করতে হবে আদর্শিক বিশ্বাসযোগ্যতা। শুধুমাত্র তখনি এ অঞ্চলে জনগণের একের সম্পর্কে অপরের ভুলবুঝাবুঝির নিরসনে সূচিত হবে শান্তিপূর্ণ ও গঠনমূলক কৌশলগত প্রক্রিয়া, গড়ে উঠবে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধভিত্তিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক, ভারত স্বতঃস্ফূর্তভাবে লাভ করবে তার প্রাপ্য আঞ্চলিক মর্যাদা, অর্জন করবে গৌরবমণ্ডিত বিশ্ব ভাবমূর্তি। এভাবে ভারত ও প্রতিবেশী সার্কভুক্ত দেশগুলোর সম্পর্ক সুসংহত হবে, সুগম হবে আঞ্চলিক ও বিশ্ব শান্তির পথ।

স্নায়ুযুদ্ধ উত্তরকালীন ভারতীয় রণনীতি ও দক্ষিণ এশীয় সহযোগিতা

১৯৮০-এর দশক থেকে ১৯৯০-এর দশকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উত্তরণের বৈশিষ্ট্যাবলী দক্ষিণ এশিয়াকে প্রভাবিত না করে পারে না। কেননা বিশ শতকের এই শেষাংশে বিশ্ব রাজনীতি পূর্বের যে কোনো কালের চেয়ে অধিকতর পারস্পরিকভাবে আন্তনির্ভরশীল ও সম্পর্কযুক্ত। রাজনৈতিক-আদর্শিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিক রূপান্তর এরূপ বৈপ্লবিক ও ব্যাপকতর যে কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে সমকালীন বিশ্বে নিছক একঘরে বা অন্তর্মুখী নীতি গ্রহণ সম্ভব নয়। ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশেও এসবের প্রতিফলন না ঘটে পারে না।

স্নায়ুযুদ্ধ উত্তরকালীন বিশ্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অর্থনৈতিক দিক থেকে অধিকতর উন্মুক্ত ও উদার নীতি যা 'বাজার অর্থনীতি' নামে পরিগণিত। দীর্ঘকাল থেকে ভারত এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক অন্তর্মুখী নীতিতে আস্থাবান ছিল। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ, সমাজতান্তিক ধারার অনুকরণে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে বিধি-বন্ধন ও জটিলতা, এমন কি আঞ্চলিকতার মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রেও ভারতের অনীহা স্পষ্টত পরিলক্ষিত হয়। স্নায়ুদ্ধকাল থেকে স্নায়ুযুদ্ধউত্তর কালে উত্তরণ প্রক্রিয়ায় ভারত প্রায় একঘরে হয়ে পড়ে । দারুণ আর্থিক-বাণিজ্যিক সংকটে পতিত হয়, বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের ক্ষেত্রে একেবারে দেউলিয়া হবার উপক্রম হয়।

রাজনৈতিক ও কৌশলগত দিক থেকে এ সময়ে ভারতের অবস্থা আরো নাজুক হয়ে ওঠে। কেননা তাত্ত্বিক/ধারণাগত পর্যায়ে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় পর্যায়ের সমর্থক হলেও ভারত প্রকৃত প্রস্তাবে আন্তর্জাতিক শক্তিদ্বন্দ্বে ছিল মস্কোর সমর্থক। ১৯৭১ সনে স্বাক্ষরিত সোভিয়েত -ভারত দ্বিপাক্ষিক মৈত্রী চুক্তির মাধ্যমে দু'দেশের সম্পর্ক অনেকটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করে। এ চুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দু'দেশ নিজ নিজ কৌশলগত উদ্দেশ্য সামনে রেখে একে অপরকে সাহায্য-সমর্থন দিয়ে চলে।

www.pathagar.com

আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে চীন-মার্কিন আঁতাত ও কৌশলগত সংযোগের বিরুদ্ধে মস্কো ভারতের মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের নির্জোট দেশগুলোর সমর্থন লাভে প্রয়াসী হয়। অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত তার কৌশলগত উদ্দেশ্য চরিতার্থতায় মস্কোর সমর্থন লাভ করে। সোভিয়েত আণবিক পারমাণবিক প্রযুক্তিসহ সোভিয়েত অস্ত্র ভাণ্ডারে উদ্ভাবিত প্রায় সব অস্ত্রশস্ত্র যে কোনো কিছু ভারত চেয়েছে তা পায় নি এ রকম দৃষ্টান্ত বিরল বললে অত্যুক্তি হবে না। বিনিময়ে মস্কো কম্বোডিয়া ও আফগানিস্তানের মতো আন্তর্জাতিকভাবে সমালোচিত ও ধিকৃত হস্তক্ষেপের মতো বিষয়ে ভারতের নিরবচ্ছিন্ন সমর্থন লাভ করে। বস্তুত, স্নায়ুযুদ্ধের শেষলগ্ন অবধি মস্কোর প্রতি ভারতের অকুণ্ঠ সমর্থনের পেছনে মূল কারণ ছিল সোভিয়েত সামরিক-কৌশলগত শক্তিতে নয়াদিল্লীর প্রচণ্ড আস্থা এবং বিশ্বের আধিপত্য ও কর্তৃত্বের লড়াইয়ে মস্কোর সাফল্য ভারতের নিকট সুনিশ্চিত বলে প্রতীয়মান হয়।

তাই স্নায়ুযুদ্ধের চূড়ান্তে যখন প্রায় রাতারাতি এক নাটকীয় প্রক্রিয়ায়, অনেকটা একই সঙ্গে ওয়ারশ জোট ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরে সম্ভবত ভারতীয় নেতৃবর্গ সবচেয়ে বেশি হতবাক হয়। নয়াদিল্লীর সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের নিকট এটি ছিল একটি কল্পনাতীত বিষয় যে সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো ৭০ বছরের একটি পরাক্রমশালী শক্তি, সমাজতন্ত্রের পিতৃভূমি, একেবারে বিলীন হয়ে যাবে। ভারত যেন হঠাৎ দেখতে পেলো যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে হঠাৎ নয়াদিল্লী মিত্রহীন হবার উপক্রম। তাই স্নায়ুযুদ্ধ থেকে স্নায়ুযুদ্ধ উত্তরকালে উত্তরণের পর্যায়ে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক-কৌশলগতভাবে ভারত বিপর্যয় ও সংকটের সম্মুখীন হয়। অভ্যন্তরীণ ও বহিঃরাষ্ট্র সম্পর্কে একমাস যুগপৎ নীতি পরিবর্তনের মাধ্যমে ভারত সেই সংকট ও বিপর্যয় থেকে বেরিয়ে আসতে পারে—এ ধরনের চেতনা শীঘ্র নয়াদিল্লীর নীতি নির্ধারকদের মধ্যে সৃষ্টি হয়। ফলে ১৯৯০-এর দশকের প্রথম থেকে ভারত অর্থনৈতিক উদারীকরণের দিকে ক্রমান্বয়ে আকৃষ্ট হয়, অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে বাজার অর্থনীতি ও বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতি বাস্তবায়নে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণে তৎপর হয়।

বহিঃসম্পর্কে অবশ্যি এর প্রভাব পড়ে। অন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য বিষয়ে সার্কের মাধ্যমে কোনো ধরনের চুক্তি বা সমঝোতায় আসার ব্যাপারে ভারত ইতিপূর্বে আগ্রহী ছিল না। বস্তত, যে-কয়টি বিষয় সার্ক সনদে সহযোগিতার কর্মসূচি থেকে বাদ দেয়া হয় প্রথম দিকে এর মধ্যে অন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য, বৈদেশিক সাহায্য ও বিরাপত্তা বিষয়ক সমস্যাবলী অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর মুখ্য কারণ ছিল ভারতের আপত্তি। ভারতের কৌশলগত নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নয়াদিলী মূলত এসব বিষয়ে দ্বিপাক্ষিকভাবে আলোচনা ও সমাধানের

www.pathagar.com

.হ্বাবান ছিল। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক-শিল্পজাত খাতে উন্নততর ও .কৌশলগত ক্ষেত্রে অধিকতর শক্তিশালী ভারতের পক্ষে ক্ষুদ্রতর ও .তিবেশী দেশগুলোর ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতে স্বীয়স্বার্থের অনুকূল চাপ সৃষ্টি সম্ভব হয়। কিন্তু বিশ্বব্যাপী স্নায়ুযুদ্ধ উত্তরকালীন অধিকতর উদারনৈতিক ও আপেক্ষিকভাবে মুক্ত অর্থনীতি-বাণিজ্যের পরিবেশে ভারতের নীতি-নির্ধারকদের চিন্তাধারায় কিছুটা পরিবর্তন আসে। ফলে দক্ষিণ এশিয়ায় বাণিজ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিধি বিস্তৃতি লাভ করে। ১৯৯২ সনে সার্কের আওতায় 'দক্ষিণ এশীয় প্রেপারেনসিয়্যাল ট্রেডিং এরেঞ্জমেন্টেস' (South Asian Preferential Trading Arrangements) স্বাক্ষরিত হয় এবং পরের বছর ১৯৯৩ সন থেকে তা' কার্যকর হয়ে চলছে। মূলত এ চুক্তির ধারা মতে, পারস্পরিকভাবে সম্মত কিছু কিছু পণ্যে সার্কভুক্ত দেশগুলো একে অপরকে বাণিজ্যিক সুযোগ এমনিভাবে প্রদান করবে (প্রাথমিকভাবে শতকরা দশভাগ কম হবে বাণিজ্যিক কর) যাতে বিশ্ব বাজারের চেয়ে একে অপর থেকে অধিকতর সুবিধা লাভ করবে। পর্যায়ক্রমে এই পণ্যের সংখ্যা ও সুবিধার হার বৃদ্ধি করা হবে, বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হবে বাংলাদেশসহ অন্যান্য আপেক্ষিকভাবে কম উন্নত দেশ গুলোকে। কথা ছিল ২০০৫ সালের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়া অবাধ বাণিজ্যিক এলাকায় (SAFTA -South Asian Free Trade Area) রূপান্তরিত হবে, এমন কি ১৯৯৭ সনে অনুষ্ঠিত সার্কের মালে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় যে, ২০০১ সনের মধ্যেই এ অবাধ বাণিজ্য নিশ্চিত করা হবে।

সার্কের কার্যক্রমে বৈদেশিক সাহায্যের ক্ষেত্রেও ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। মালে অনুষ্ঠিত একই শীর্ষ সম্মেলনে ভারত একটি দক্ষিণ এশীয় উন্নয়ন ফাণ্ড (South Asian Development Fund) সৃষ্টিতে সম্মত হয়। সে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ ফাণ্ডের দফতর ঢাকায় স্থাপিত হবে।

ভারতীয় অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে পরিবর্তনের পর, বিশেষ করে নয়াদিল্লীতে ১৯৯৬ সনে কংগ্রেসের পরিবর্তে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের পর দক্ষিণ এশীয় প্রতিবেশী দেশগুলোর প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গিতে আপেক্ষিক পরিবর্তন দেখা যায়। পাকিস্তানের সঙ্গে কাশ্মীরসহ দ্বিপাক্ষিক বিষয় আলোচনা ছাড়াও নয়াদিল্লী অন্যান্য প্রতিবেশী দেশগুলোর প্রতি কিছুটা নমনীয়তা প্রদর্শন করে। ফলে পাকিস্তানের সঙ্গে পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে কয়েক দফা আলোচনা চলে এবং বাংলাদেশ, ভুটান ও নেপালের সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক পর্যায়ে পানি চুক্তি সম্পাদিত হয়।

এ পর্যায়ে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর প্রতি ভারতের কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গির ধারণাগত পরিবর্তন সম্পর্কেও কিছুটা আলোকপাত করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে প্রতিবেশী দেশগুলোর প্রতি নয়াদিল্লীর কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি 'ভারত মতবাদ' (India Doctrine) নামে সমধিক পরিচিতি লাভ করে। এর মোদ্দা অর্থ ছিল, দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা হচ্ছে ভারতকেন্দ্রিক এবং এ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর নিরাপত্তার দেখাশুনা প্রধানত ভারতের দায়িত্ব। স্বাভাবিকভাবেই ভারতের প্রভাব বলয় বলে বিবেচিত দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর পক্ষে ভারতের সম্মতি ব্যতিরেকে এ অঞ্চল বহির্ভূত কোনো শক্তির সামরিক সাহায্য বা হস্তক্ষেপ চাওয়া সমীচীন হবে না। শ্রীলংকা ও মালদ্বীপে ভারতের হস্তক্ষেপ ছিল 'ভারত মতবাদ' নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ। অন্যদিকে কাঠমুণ্ডু কর্তৃক চীন থেকে অস্ত্র আমদানির প্রস্তাবনার পরিপ্রেক্ষিতে স্থলবেষ্টিত ও বিশ্বের একমাত্র হিন্দুদেশ নেপালের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক সীমানা বন্ধ করার মতো ব্যবস্থা থেকে নয়াদিল্লীর 'ভারত মতবাদ' প্রসূত নীতির অভিব্যক্তি ঘটে। ভারতের এ ধরনের আচরণে অঞ্চলব্যাপী ভারতবিরোধী ক্ষুব্ধ অনুভূতি সঞ্চার হতে থাকে। কৌশলগত নীতির বিষয় নিয়ে প্রতিবেশী সকল দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কে প্রায়শ তিক্ততা দেখা দেয়।

স্নায়ুযুদ্ধ উত্তরকালে নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস প্রশাসন পরিসমাপ্তির পর ক্রমান্বয়ে ভারতের 'দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছুটা নমনীয়তা পরিলক্ষিত হয়। যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর নতুন সরকার প্রতিবেশী দেশসমূহের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থের প্রতি অধিকতর সমঝোতাসুলভ মনোবার ব্যক্ত করে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পরে প্রধানমন্ত্রী ইন্দরকুমার গুজরাল ১৯৯৭ সনের জানুয়ারিতে প্রকাশ্যে নতুন ভারতীয় কৌশলগত নীতি উপস্থাপন করেন।

'গুজরাল মতবাদ' ('Gujral Doctrine') নামে পরিচিত এই কৌশলগত মতবাদে পাঁচটি রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য অভিব্যক্তি লাভ করে। প্রথমত, বাংলাদেশ, ভুটান, মালদ্বীপ, নেপাল ও শ্রীলংকার সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারত কোনোরূপ পারস্পরিকতা বা প্রতিদান চাইবে না, কিন্তু স্বীয় বিশ্বাস ও আস্থার ভিত্তিতে ভারত এসব সামঞ্জস্য বিধান করবে। দ্বিতীয়ত, ভারত বিশ্বাস করে যে, কোনো দক্ষিণ এশীয় দেশের পক্ষে এ অঞ্চলের অন্য কোনো দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে নিজ দেশের সীমানা ব্যবহার করতে দেয়া সমীচীন হবে না। তৃতীয়ত, কোনো দেশ অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। চতুর্থত, দক্ষিণ এশিয়ার সকল দেশ পরস্পর পরস্পরের সীমানাগত অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে। পরিশেষে এ অঞ্চলে সকল রাষ্ট্রের উচিত দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার ভিত্তিতে পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদসমূহ মীমাংসা করা। বলা হয় যে, এ ধরনের সহজ নীতিমালা অনুসরণ করা হলে

www.pathagar.com

দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা পরিস্থিতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে, অঞ্চলব্যাপী, এমন কি সমগ্র বিশ্বে দক্ষিণ এশিয়ার ভূমিকা সম্পর্কে একটি মৌলিক ইতিবাচক চিন্তাধারা সংযোজিত হবে।[৪০]

গুজরাল মতবাদে উপস্থাপিত ভারতীয় কৌশলগত দর্শনে নতুন ধরনের ও আপেক্ষিক নমনীয়তা সত্ত্বেও এতে নয়াদিল্লীর অতীত আধিপত্য ও কর্তৃত্বসুলভ মনোভাবের ধারা পরিলক্ষিত হয়। ভারতের পক্ষ থেকে 'গুজরাল মতবাদ'কে 'সৎ-প্রতিবেশীসুলভ' মতবাদ বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু পাকিস্তানকেই শেষোক্ত ধারণার বা গুজরাল মতবাদের ইতিবাচক ধারার আওতাবহির্ভূত রেখে নয়াদিল্লী বস্তুত প্রতিবেশী দেশগুলোকে 'সৎ' ও 'অসৎ' পর্যায়ে বিভক্ত করতে প্রয়াসী হয়। এটা মনে হয় উদ্দেশ্যমূলক যাতে প্রতিবেশীদেশগুলো পাকিস্তান থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলে, ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসে ভারতের। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ, গুজরাল মতবাদের দ্বিতীয় ধারায় প্রতিবেশী দেশগুলোর সীমানার ওপর নিয়ন্ত্রণ কার্যত ভারতের একক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা নির্ধারণ করার প্রয়াস মেলে। এটা ছিল ভারতের স্বার্থ ও নিরাপত্তার মাপকাঠি দ্বারা প্রতিবেশী দেশসমূহের পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়নের সার্বভৌম অধিকারের ওপর আঘাত হানার শামিল।[৪১] তবু 'ভারত মতবাদের' হস্তক্ষেপমূলক ও সম্প্রসারণবাদী ভাব ও অভিব্যক্তির তুলনায় গুজরাল মতবাদকে আপেক্ষিকভাবে উদার ও সমঝোতাধর্মী বলে প্রতিভাত হয়। কেননা প্রতিবেশী দেশসমূহের প্রতি সুবিধা প্রদান বা তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সম্পূরণে নয়াদিল্লী প্রথমবারের মতো প্রতিদান ছাড়া একতরফা পদক্ষেপ গ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশসহ প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে পানি চুক্তির বিষয়ে আপেক্ষিকভাবে ভারতের সমঝোতামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে তা' প্রতিফলিত হয়। দ্বি-পাক্ষিক ও আঞ্চলিক বাণিজ্যের ভারসাম্যহীনতা দূরীকরণেও ভারত একই ধরনের সমঝোতামূলক মনোভাব ব্যক্ত করে। সাপটা বাস্তবায়নসহ বাণিজ্য উদারনীতিকরণের মাধ্যমে ২০০১ সনের মধ্যে সাফটা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। ভারতের আশ্রিত চাকমা শরণার্থীদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠিয়ে তাদের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত শান্তিচুক্তি সম্পাদনে উৎসাহ প্রদান করা হয়। পাক-ভারত শান্তি আলোচনার কার্যসূচিতে কাশ্মির অন্তর্ভুক্ত করা হয় যাতে দ্বিপাক্ষিক পরিসরে সেই উপত্যকায় উত্তেজনা নিরসন করে পারস্পরিকভাবে গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছা যায়। এ সকল কারণে কিছুকালের জন্য দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অনেক মহলে ক্ষীণ হলেও আশার সঞ্চার হয়।

www.pathagar.com

সূক্ষ্ম ও গভীর দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করলে সম্ভবত দেখা যাবে যে 'গুজরাল মতবাদ'সহ সেই মতবাদ অনুসৃত সকল পদক্ষেপই ছিল কূটনৈতিক চাতুর্য ও কারুকার্যমণ্ডিত। দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কিত ভারতের রণনীতিতে কোনোরূপ পরিবর্তন হয় নি, পরিবর্তিত হয় শুধুমাত্র ভারতের রণকৌশল। সামরিক-কৌশলগত বেড়াজালের পরিবর্তে ভারতে রাজনৈতিক-অর্থনেতিক বেড়াজালের আশ্রয় গ্রহণ করে। তার মানে, ভারতের আঞ্চলিক পররাষ্ট্র ও কূটনীতিতে তেমন কোনো লক্ষণীয় গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয় নি। কথামালা ও শব্দগুচ্ছের মারপ্যাঁচে ভারত তার আঞ্চলিক আধিপত্য ও কর্তৃত্বের উদ্দেশ্য ঢাকা দিতে চায়।

বিষয়গুলো কিছুটা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। বাংলাদেশ-ভারত দ্বি-পাক্ষিক গঙ্গা পানি চুক্তি প্রসঙ্গের অবতারণা করা বলা চলে যে, এ চুক্তি ইতিবাচক মনে হলেও তা' সম্ভবত বাহ্যিক, কেননা এ চুক্তিতে কোনোরূপ 'গ্যারান্টি ক্লজ' (Guarantee Clauses) বা বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা সম্বলিত ধারা নেই। ফলে পানি প্রবাহের পরিমাণ পূর্ব চুক্তির (১৯৭৭ সনের) কাছাকাছি ধরে বাংলাদেশকে প্রায় সমপরিমাণ পানি দেয়া হবে বলা হয়। কিন্তু একে চোখ ঝাঁঝালো বলেই প্রতীয়মান হয়, কেননা ১৯৭৭ সন থেকে, বিশেষ করে পাঁচ বছর মেয়াদি চুক্তি নবায়ন না করার পর থেকে, গঙ্গায় ভারতের উজান থেকে উত্তর প্রদেশ ও বিহারে প্রচুর পরিমাণ পানি কৃষিকাজ ও অন্যান্য প্রয়োজনে প্রত্যাহার করা হয়ে আসছে। ইতিমধ্যে পশ্চিম বাংলা ও বাংলাদেশে আবহাওয়া পরিবর্তনে কার্তিক মওসুমে পানির চাহিদা বেড়েছে প্রচণ্ডভাবে। তাই ফাকাক্কা বাঁধের দু'ধারেই পানির চাহিদা বেড়ে চলছে ক্রমাগত। অথচ চুক্তিতে ২০ বছর আগের প্রবাহের ভিত্তিতে পানি ভাগাভাগি করা হয়। পানি-ই যেখানে নেই সেখানে ভাগাভাগি হতে পারে নিছক কাগুজে পর্যায়ে। বাস্তবে তাই হয়েছে। চুক্তি বাস্তবায়নের প্রথম বছরেই দেখা যায় যে, সংকটকালীন শুষ্ক মওসুমে ভারত বাংলাদেশে চুক্তিবিহীন পূর্বের বছরের চেয়েও কম পানি সরবরাহ করে। 'গ্যারান্টি ক্লজ' যেহেতু নেই সেহেতু এসব বিষয়ে প্রশ্ন তোলাও অমূলক বলে মনে হয়।

ভারতের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা দেয়া হয় যে, ঐ বছর হিমালয়ের বরফ গলে নি। ফলে পানির প্রবাহ কমে যায়। কখনো এমনও বলা হয় যে শুষ্ক বালি পানি টেনে নিয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে ভারতের প্রতি বন্ধুপ্রতিম সরকার এসব বিষয়ে বিতর্ক ও প্রশ্ন এড়াবার উদ্দেশ্যে হার্ডিঞ্জ প্রান্তে পানির মাপ/পরিমাণ জনসমক্ষে প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকছে।[৪২] পার্বত্য শান্তি চুক্তির বিষয়েও ভারত যথোপযুক্ত সদিচ্ছার প্রমাণ রেখেছে বলে মনে হয় না। একদিকে ভারতের পৃষ্ঠপোষকতায় স্বাক্ষরিত এই চুক্তির ফলে উপজাতি-

www.pathagar.com

অউপজাতি বলে যে ভেদাভেদ সৃষ্টি হয়েছে এবং তার পরিণতি কি হতে পারে সেই বিষয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গণে সৃষ্টি হয়েছে দারুণ উত্তাপ. অন্যদিকে ভারত পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বাধীন 'জুম্ম্যাল্যাণ্ড' সৃষ্টিতে অভিলাষী একটি বিশেষ বিদ্রোহী চক্রকে ইন্ধন, এমন কি আশ্রয় দিয়ে চলছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। দু'দেশের দীর্ঘকালীন অন্যান্যরা দ্বি-পাক্ষিক বিষয় সমাধানে ভারতের আগ্রহ নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়।

এসব সত্ত্বেও ভারতের যুক্তফ্রন্ট কোয়ালিশন সরকার পূর্বেকার অন্যান্য ভারতীয় সরকারের চেয়ে অধিকতর সমঝোতা ও সামঞ্জস্য মনোভাবসম্পন্ন ছিল। ইতিমধ্যে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির তোলপাড়ের কারণে বামপন্থী যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়, ১৯৯৮-এর নতুন নির্বাচনে নয়াদিল্লীতে ক্ষমতায় আসীন হয় কট্টর ডানপন্থী ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন সরকার। অভ্যন্তরীণভাবে এ সরকারের শ্লোগান হচ্ছে 'স্বদেশী' এবং সামরিক-কৌশলগত বিষয়ে জঙ্গিসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি। 'স্বদেশী' শ্লোগানের অর্থ-ই হচ্ছে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক খাতে অন্তর্মুখী নীতি অবলম্বন। এতে আঞ্চলিকতা, বিশেষ করে সাপটা ও সাফটার প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে মারাত্মকভাবে। বস্তুত, ২০০১ সনের মধ্যে সাফটার বাস্তবায়ন সম্পর্কিত মালে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন (১৯৯৭)-এর প্রস্তাব দশ বছরের জন্য স্থগিত রাখার কথা ইতিমধ্যেই উত্থাপিত হয়েছে।

অন্যদিকে নয়াদিল্লীর নতুন ডানপন্থী সরকারের জঙ্গিসুলভ ঘোষিত নীতি অনুযায়ী তারা ভারতের পারমাণবিক বিস্ফোরণের ক্ষমতাকে আণবিক ও উদ্‌যান বোমার রূপদান করেছে, বাধ্য করে প্রতিযোগী শক্তি পাকিস্তানকে আণবিক পারমাণবিক আগ্রাসনে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণে। ভারতের বর্তমান সরকার জঙ্গিসুলভ মতবাদের পাশাপাশি কখনো নরম সুর-ও ব্যবহার করছে বটে, কিন্তু বর্তমানে নয়াদিল্লীর সার্বিক কৌশলগত আচরণ দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক রাজনীতিকে অনেকখানি বিষিয়ে তুলছে তাদের উস্কানীমূলক ও সম্প্রদায়িক রাজনীতির দুষ্টধারা প্রবণতার মাধ্যমে। আণবিক পারমাণবিক অস্ত্রায়ণের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভব হয়েছে মারণাস্ত্র প্রতিযোগিতার ভয়াবহ খেলা। সেই পটভূমিতে কাশ্মীরের সীমান্ত রেখায় দু'দেশের মধ্যে চলছে 'সীমিত যুদ্ধ' এবং এর আনুষঙ্গিক হিসেবে চলছে ও পক্ষের রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি ও কূটনীতির দরকষাকষি। ফলে দক্ষিণ এশিয়ায় রূপান্তরিত হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক এলাকায়।

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য সকল বিষয়ের মতো এ অঞ্চলে সহযোগিতাও ভারত-নির্ভর। কেননা ভারত হচ্ছে এ অঞ্চলের বৃহত্তম দেশ এবং শক্তি-সামর্থ্যের ও ধনসম্পদ-অস্ত্রশস্ত্রের দিক থেকে সকল দেশই বলা চলে

www.pathagar.com

ভারতবন্দি। বাংলাদেশ, ভুটানে ও নেপাল ভৌগোলিক-কৌশলগতভাবেও ভারতবন্দি। ভারত-বিরোধিতা এসব দেশে সহজাত নয়; বরং ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, এমন কি জাতিগতভাবে ভারতের সঙ্গে এসব দেশের বন্ধন অনেকটা গভীর ও সুনিবিড়। নেপালের ক্ষেত্রে ধর্মের বন্ধন বিশেষভাবে গভীরতর, কেননা, পূর্বেই বলা হয়েছে হিন্দুপ্রধান ভারতের বাইরে নেপাল-ই হচ্ছে রাষ্ট্রীয়ভাবে বিশ্বের, একমাত্র হিন্দু দেশ। অথচ এই নেপালের সঙ্গেও নয়াদিল্লীর তিক্ত সম্পর্কের অবধি নেই, যে তিক্ততা নেপালের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রেও দুষ্টবীজ ছড়াচ্ছে । ভারতের প্রভাব বলয় সৃষ্টির প্রয়াস বাংলাদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রেও তিক্ততা সৃষ্টি করে চলছে।

সমকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতির ধারা হচ্ছে দল ও দলীয় পর্যায়ে লেজুড় ভিত্তিক সম্পর্ক সৃষ্টি না করে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে, সুসম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়াস। এমন কি চীনের মতো সমাজতান্ত্রিক আদর্শে প্রত্যয়ী রাষ্ট্র ও তার কূটনীতিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার অব্যাহত প্রয়াস চালিয়ে আসছে। সৌদি আরবের মতো রক্ষণশীল ইসলামী দেশও এসব বিষয়ে সতর্ক। অথচ দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়াদিল্লী বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ সম্পর্ক রেখে আসছে যার প্রভাব পড়ছে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে, সৃষ্টি করে খোদ ভারতের প্রতি বৈরীসুলভ মনোভাব। এসব আঞ্চলিক রাজনীতি হয় আরো বিষাক্ত এবং এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে দক্ষিণ এশীয় সহযোগিতার ওপর। এ যেন এক দুষ্টচক্রের মতো। আঞ্চলিক সহযোগিতার পরিধি বিস্তার করতে হলে ভারতকে এ ধরনের নেতিবাচক রাজনীতির ধারা পরিহার করতে হবে।

ধারণাগত পর্যায়ে দ্বন্দ্ব, শান্তি ও সহযোগিতা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। এতে রাজনৈতিক বাস্তবতার পাশাপাশি মনস্তাত্ত্বিক উপাদানসমূহের দিকেও দৃষ্টি নিবন্ধ করতে হয়। এই অঞ্চলে যেমন ভারতের বৃহৎশক্তিসুলভ অবস্থান অস্বীকার করার উপায় নেই তেমনি নয়াদিল্লীকেও পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের ভৌগোলিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা মেনে নিয়ে সার্বভৌম আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিসাম্য অধিকার ভিত্তিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে প্রয়াসী হতে হবে। দক্ষিণ এশিয়া বাদবাকি বিশ্বের মতো আগামী সহস্রাব্দীতে অনুপ্রবেশ করতে চলছে। সময় কিংবা সভ্যতা কিছুই দক্ষিণ এশিয়ার জন্য অপেক্ষা করবে না। তাই ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার সকল দেশের নেতৃত্বকে এগিয়ে আসতে হবে আগামী সহস্রাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায়।

www.pathagar.com

তথ্যনির্দেশ

১. রণনৈতিক বা কৌশলগত চিন্তাধারা সম্পর্কিত বিশদ ব্যাখ্যা এবং এর ভিত্তিতে বিশ্লেষণের জন্য দ্রঃ আবুল কালাম *ভিয়েতনামের রণাঙ্গন : বিপ্লবযুদ্ধের কলাকৌশল* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫)

২. Lt. Col. Donald R. Baucons, "Historical Framework for the Concept of Strategy," *Military Review* (March 1987), পৃ. ৩

৩. B.H. Liddell Hart, *Strategy, The Indirect Approach* (London/ Faber and Faber, 1967), পৃ. ৩৩৫-৬

৪. সার্ক-এর সাফল্য এখনো কর্মশিবির, সেমিনার, সম্মেলন প্রভৃত কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, পুঁজি বিনিয়োগ ও অর্থনীতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার যথার্থ স্থান পেয়েছে বলে মনে হয় না। সার্ক-এর সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড পর্যালোচনার জন্য দেখুন, Iftekhruzzaman, "The Saarc on the move : time for further flexibility?" *Holiday* (30 November 1987)

৫. Mohammed Ayoob, "The Primary of the Political South Asian Regional Co-operation (SARC) in Comparative Perspective" in M. Abdul Hafiz and Iftekharuzzaman (eds), *South Asian Regional Co-operation : A Socio-Economic Approach to Peace & Stability* (Dhaka : Bangladesh Institute of International and Strategic Studies, 1985).

৬. Ali T. Sheikh, "South Asian Regional Co-operation for Peace and Stability", in Hafiz and Iftekhruzzaman (eds), Ibid, পৃ. ২২৫; Hamid H. Kizilbus : Geopolitica Compulsion in the Strategy for Peace and Security, "*Strategic Studies*, Vol VI, Nos 2 & 3 9 Winter-Spring 1982 - 1983) পৃ. ৯৩

৭. Sheikh, "South Asian Regional Co-operation..., প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬

৮. Emajuddin Ahamed, A Comparative View: *SARC Seeds of Harmony* (Dhaka : University Press Ltd., 1985) পৃ. ৫ - ৬

৯. *Aspects of our foreign policy from Speeches and writings of Indira Gandhi* (New Delhi : An AICC publication, 1973), পৃ. ৮৬

১০. Pradyumna P. Karan, "India's Role in Geopolitics in K.P. Misra (ed.), *Foreign policy of India : A Book of Readings* (New Delhi: Thomson Press (India) Ltd., 1977) পৃ. ২

১১. K.R. Narayanan, "New Perspectives in Indian Foreign Policy", in K.P. Misra (ed.), *Ibid.*, পৃ. ১১৭

www.pathagar.com

১২. *Prime Minister Rajiv Gandhi: Statements on Foreign policy. November 1984- Apriil 1985.* (New Delhi : External Publicity Division, Ministry of External Affairs, 1985), পৃ. ২০; also Prime Minister Rajiv Gandhi: Statements on Foreign Policy, May August 1985, (New Delhi: External Publicity Division, Ministry of External Affairs, 1985), পৃ. ৮৪

১৩. Shelton Kodikara, *Strategic Factors in Interstate Relations in South Asia.* Canberra Papers on Strategy and Defence, No. 19 (Canberra;: The Strategic and Defence Studies Centre, The Research School of Pacific Studies, The Australian National Uviversity, 1979), পৃ. ৬৫--৬৬

১৪. Seing S. Harrison, "Fanning the Flames in South Asia", Foreign Policy, No. 45 (Winter 1981 - 1982), পৃ. ৬৬

১৫. K. Subramanyam, *Bangladesh and India's Security.* Compiled and published by Maj-Gen D.K. Palit (Dehra Dun: Palit and Dutt Publishers, 1972) পৃ. ১৪৮

১৬. Lt. Gen. (Rtd.), A.I. Akram, "Security of Small States in South Asian Context", *Regional Studies,* Vol. V, No - 1 (Winter 1986 - 1987), পৃ. ১২

১৭. Mizanur Rahman Shelley, *Emergence of a New Nation in a Multipolar World: Bangladesh* (Dhaka : Universiy Press Ltd., 1979), পৃ. ১১২

১৮. Mohammad Ayub Khan, *Friends Not Masters* (London: Oxford University Press, 1969) পৃ. ১৩০

১৯. Subramainyam. *Bangladesh and Indias Security* পৃ. ১৫৬, ১৭০, ২৩৯

২০. Emajuddin Ahamed (ed.), Foreign Policy of Bangladesh: A Small State's Imperative (Dhaka : University Press Ltd., 1984), পৃ. ২৬-২৯

২১. দ্রষ্টব্য, Kodikara, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০

২২. দ্রঃ Mubashir Hasan, "Alternative to Dependence" in Pran Chopra (ed.), *Future of South Asia* (Dhaka : University Press Ltd., 1986), পৃ. ১০০-১০২

২৩. Subramanyam, Bangladesh and India's Security পৃ. ১৭০

২৪. New York Times এর প্রতিবেদন (21 February 1983) উল্লেখিত, Shelton Kodikara, "Strategic Dimensions on South Asian Politics : Emerging Trends," A Paper Presented at the Second International Conference on Indian Ocean Studies, Perth, Western Australia (Dec. 5 - 12, 1984), পৃ. ৮

২৫. K. Subramayam, " Our Nuclear Predicament, "*Strategic Analysis*, Vol. IX, No. 7 (October 1985), পৃ. ৬৫৫

www.pathagar.com

২৬. Harrison, "Fanning the Flames in South Asia", প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২; *Prime Minister Rajiv Gandhi Statements of Foreign Policy, November 1984 April 1985* (New Delhi: External Publicity Division, Ministry of External Affairs, 1985), পৃ. ২১

২৭. Narayanan, "New perspectives in Indian Foreign Policy", প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭ ; Ahamed, "Bangladesh and Policy of Peace and Non-alignment," প্রাগুক্ত, পৃ. ২২, ২৭

২৮. Dr. S.S. Bindra, *Indo-Bangladesh Relations* (New Delhi: Deep and Deep Publishers, 1982), পৃ. ৩৭-১৩১

২৯. বাংলাদেশ সম্পর্কিত ভারতের পূর্ব পরিকল্পনার কিছুটা আভাস মেলে ভারতীয় রণনীতিক সুব্রামানিয়াম এর লেখায় (দ্রঃ Subramanyam, *Bangladesh and India's Security*, পৃ. ২১৮

৩০. Kodikara, "Strategic Dimensions of South Asian Politics" প্রাগুক্ত, ১৯

৩১. দ্রঃ Norman D. Palmer, "India in the International System," in M.S. Rajan and Shivaji Ganguli (eds.) *Great Power Relations, World Order and the Third World* (New Delhi: Vikas Publishing House Pvt. Ltd. 1981), পৃ. ২৪৮

৩২. বিষদ ব্যাখ্যার জন্য দ্রঃ Syed Sirajul Islam, "Bangladesh-Pakistan Relations : From Conflict to Co-operation," in Emajuddin Ahamed, *Foreign Policy of Bangladesh: A Small State's Imperative* (Dhaka : University Press Ltd., 1984) পৃ. ৫৮-৫৯

৩৩. Ravi Kaul, "The Indian Ocean: A Strategic Posure for India", in T.T. Ponlouse, *Indian Ocean Rivalry* (New Delhi : 1974), পৃ. ৬৬

৩৪. Maj-Gen. Anton Muttukumam, "View from the Strategic Islam of SriLanka in Afro-Asian Ocean of the strategy for peace and Security in South Asia, " *Strategic Studies*, Vol. VI: Abdul Hye SriLanka: Is this the Way to Peace", *Holiday* (2 October 1987)

৩৫. Sadek Khan in Holiday (14 August 1987)

৩৬. Prof. Khadya Bhatka Singh, "A Strategic Land Locked State's View of Peace and Security in South Asia," *Strategic Studies*, Vol. VI, Nos. 2 and 3 (Winter-Spring 1982 - 1983), পৃ.২২৫-১১৭; Leo E. Rose and Satish Kumar, "South Asia," in W.J. Feld and G. Boyd (eds.) *Comparative Regional Systems* (New York: Perhanon Press, 1980), পৃ. ২৪৯

৩৭. Shankar Dayal Sharma, "Foreword,"in *Aspects of Our Foreign Policy*,

www.pathagar.com

প্রাগুক্ত iii-iv

৩৮. Narayanan, "New Perspectives in Indian Foreign Policy ", প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭

৩৯. দ্রঃ *Second SARC Summit, Bangalore, India* (New Delhi: External Publicity Division, Ministry of External Affairs, 1987), পৃ. ১

৪০. U.S.I. Journal (New Dhelhi), vol. CXXVII, No.527 (Jan-March 1997), পৃ. ৩

৪১. Mohammad Humayun Kahir, Growth Triangles in ASEAN : Relevance for Sbu Regional Co-operation in South Asia (Prepared Researh Paper, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, October - December 1997), পৃ. ১১১

৪২. ভিন্নতর মতামতের জন্য দ্রঃ, Ahmed Tariq Karim, "The Bangladesh-India Treaty on Sharing of the Ganges Waters: Genesis and Significance," *BIISS Journal*, Vol. 19, No. 2 (April 1998), পৃ. ২১৬-২৩৫

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

উপ-আঞ্চলিকতা ও বাংলাদেশের উন্নয়ন কূটনীতি[১]

আঞ্চলিকতা, উপ-আঞ্চলিকতা ও আন্তঃআঞ্চলিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা খুব বেশি দিন আগের বিষয় নয়। ধারণা হিসেবে এসব আপেক্ষিকভাবে নতুন, অভিনব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তরকালে আন্তর্জাতিক সিস্টেমের বিবর্তনের ফলে ক্রমান্বয়ে এসব ধারণা প্রবর্তিত হয়। এসব ধারণা সর্ববিধ সংকট ও দ্বন্দ্ব থেকে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে ও আন্তঃরাষ্ট্রিক সম্পর্ক উন্নয়নকল্পে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আরো উদ্দেশ্য হচ্ছে উন্নয়ন বা উন্নয়নের প্রক্রিয়া জোরদার করা। তাই এ ধরনের প্রয়াস সাধারণত ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়।[২]

উপর্যুক্ত ধারণাসমূহের বিবর্তন ও বাস্তবায়নে ভৌগোলিক নৈকট্যের উপাদান-ই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তিনটি ধারণার মধ্যে 'উপ-আঞ্চলিকতা' হচ্ছে অতি সাম্প্রতিক। এর ভিত্তি মূলে রয়েছে উন্নয়নের প্রত্যাশা। অবশ্য উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে হলে প্রয়োজন শান্তিপূর্ণ কৌশলগত পরিবেশ যাতে বৃহত্তর জনমানুষের উন্নয়নের আশা-আকাঙ্ক্ষার সম্পূরণ ঘটে, গড়ে ওঠে সাংস্কৃতিক বন্ধন, প্রসার লাভ করে অর্থনৈতিক সহযোগিতা। পরিশেষে, তত্ত্বীয়ভাবে এ ধরনের সহযোগিতায় আগ্রহের পেছনে আন্তর্জাতিক সিস্টেমের স্থিতিশীলতা বিধানের বিষয়ও কাজ করে, কেননা এর মাধ্যমে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদিতে সমষ্টিগত চাপ সৃষ্টি করা চলে। এসব বহুবিধ কারণে রাজনৈতিক নীতি-নির্ধারকবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদবর্গ এবং ব্যবসায়িক গোষ্ঠী নির্বিশেষে প্রায় সবাই আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতাসহ সকল পর্যায়ে অধিকতর সহযোগিতায় প্রত্যাশী।

ধারণাগত দৃষ্টিকোণ

আঞ্চলিক সহযোগিতা বা উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে উন্নয়ন সম্পর্ক ধারণাগতভাবে ব্যাপকতর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক প্রত্যয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এসব প্রত্যয়ের মধ্যে রয়েছে "শান্তি", "শান্তি প্রক্রিয়া", "শান্তি সংস্থাপন", এবং "দ্বন্দ্ব নিরসন" বা "দ্বন্দ্বের সমাধান" প্রভৃতি। প্রত্যয়গত দৃষ্টিকোণ থেকে শান্তি, উন্নয়ন প্রবৃদ্ধি ও দ্বন্দ্বের ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং অর্থের

www.pathagar.com

দিক থেকে অন্তর্নিহিতভাবে সম্পৃক্ত। অনেক সময় এসব প্রত্যয় সমার্থে ব্যবহৃত হয়-একটির সূচনা বা সূত্রপাত আরেকটির মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। প্রক্রিয়াগতভাবে এসব প্রত্যয় ব্যবহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে আন্তঃরাষ্ট্রিক সম্পর্ককে পারস্পরিক স্বার্থ অর্জনে বা সন্তুষ্ট বিধানে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, মতপার্থক্য গঠনমূলকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাতে দ্বন্দ্ব সম্প্রসারিত হয়ে সহিংসতার রূপ পরিগ্রহ না করে, সম্পর্ক ইতিবাচক গতিতে অব্যাহত ধারায় গড়ে ওঠে।

উপরন্তু, বিশ্বমানবতার সার্বজনীন কল্যাণ সাধন এবং জাতি রাষ্ট্রসমূহের সম্পর্কের শান্তিপূর্ণ সামঞ্জস্যবিধানে যে সব অবস্থা প্রয়োজন সে সব অর্জন করাও এসব ধারণাগত প্রত্যয়ের লক্ষ্য। মূল লক্ষ্য হচ্ছে শান্তি, আর শান্তি প্রক্রিয়ার কাজ হচ্ছে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে এভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাতে সম্পর্কের সাধারণ বা স্বাভাবিক উত্তরণ হয়, স্থিতিশীলতা আসে। উন্নয়ন ঘটে, সম্ভব হয় সংহতিপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা। এভাবে শান্তির প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দ্বান্দ্বিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করা চলে। রাষ্ট্রগুলোকে গড়তে হয় এমন ধরনের সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে পারস্পরিক উন্নয়ন, প্রবৃদ্ধি ও সংহতির স্বাভাবিক অভিলাষ পূর্ণ হয়, ত্বরান্বিত হয় অধিকতর শান্তি অর্জনের গতি।[৩]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরিসমাপ্তির পর থেকে আন্তর্জাতিক সিস্টেম ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে চলছে। প্রায় একই সঙ্গে পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে ধারণাগত দৃষ্টিকোণও রূপান্তরিত হয়ে চলছে। আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে পুরনো তত্ত্বীয় ধারণাসমূহের মধ্যে রয়েছে "প্রয়োগবাদ" এবং "নব্য-প্রায়োগিক" চিন্তাধারা। দুটো ধারণার লক্ষ্য হচ্ছে আঞ্চলিক পর্যায়ে এমন ধরনের সহযোগিতা কাঠামো গড়ে তোলা যাতে "জাতি-রাষ্ট্রের একচেটিয়া সুবিধা অর্জনের প্রত্যাশা রূপান্তরিত হয়ে বৃহত্তর সংস্থার মাধ্যমে সমষ্টিগত স্বার্থ প্রতিষ্ঠার পরিগ্রহ করে।"[৪]

স্নায়ুযুদ্ধ উত্তরকালে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অনেক ক্ষেত্রে অনিশ্চিত ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারক ও বিশ্লেষকদের অনেকে নতুন নতুন দৃষ্টিকোণ উপস্থাপন করেন। নব উদ্ভাবিত এসব দৃষ্টিকোণের মধ্যে রয়েছে "সহযোগিতামূলক নিরাপত্তা", "সহযোগিতাধর্মী অঙ্গীকার" অথবা "পারস্পরিক নির্ভরশীল উন্নয়ন" প্রভৃতি। এসবের উদ্দেশ্য হচ্ছে রাষ্ট্রের/জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একক বা ভিন্ন ভিন্ন প্রয়াসের পরিবর্তে সচেতনভাবে উপ-আঞ্চলিক, আঞ্চলিক ও আন্তঃআঞ্চলিক পর্যায়ে, সমন্বিত প্রয়াসে উদ্যোগী হওয়া যাতে দ্বন্দ্ব এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়, সম্ভব হয় উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের মানুষের মৌলিক চাহিদা সম্পূরণ। একমাত্র সহযোগিতার মাধ্যমে যৌথ শক্তির সমন্বয় সম্ভব। এতে রাষ্ট্র তার

www.pathagar.com

একক প্রয়াসের মাধ্যমে নিজস্ব স্বার্থ অর্জনসহ যৌথ প্রয়াস থেকেও লাভবান হতে পারে।[৫]

উল্লেখ্য, ১৯৫০-এর দশকে পশ্চিম ইউরোপ-ই প্রথম আঞ্চলিকতার প্রয়াসে উদ্যোগী হয়। পরবর্তী দশকগুলোতে পশ্চিম ইউরোপের এ উদ্যোগ ঐক্যবদ্ধ ইউরোপ গড়ে তোলার আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে পশ্চিম ইউরোপের উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির এ দৃষ্টান্ত পরবর্তীকালে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলেও অনুকরণ করা হয়।

এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, শান্তির মতো উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধিও প্রায়শ তুলনামূলক বলে প্রতিভাত হয়, কেননা প্রায়শ এসব ধারণা রাজনীতির হীন স্বার্থ চরিতার্থতায় অপব্যবহৃত বা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এটা হতাশাব্যঞ্জক প্রতারণামূলক মনে হতে পারে বটে, কিন্তু দক্ষিণ এশিয়া, বিশেষ করে বাংলাদেশ জাতীয় পর্যায়ে সেই উন্নয়নমূলক সহযোগিতার নামে রাজনৈতিকভাবে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে, দ্বন্দ্বের যে-ধারা প্রকৃত অর্থে উন্নয়নের মাধ্যমে পরিহার করার ওপর জোর দেয়া হয়ে থাকে।

উপর্যুক্ত ধারণাগত দৃষ্টিকোণ ও ঐতিহাসিক বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিত মনে রেখে বর্তমান অধ্যায়ে দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিকতার প্রয়াস এবং সাম্প্রতিককালীন উপ-আঞ্চলিক উদ্যোগ পর্যালোচনা করা হয়েছে। ধারণাগত দিক থেকে এ অধ্যায়ে উপ-আঞ্চলিক উদ্যোগকে ইতিবাচকভাবে দেখা হয়েছে, কিন্তু আঞ্চলিক ও রাজনীতির বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করে একে সমালোচনার দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করা হয়, কেননা এ উদ্যোগ সম্পর্কিত বাংলাদেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বর্তমান প্রেক্ষিতে এটাই অধিকতর প্রতীয়মান হয় যে, উপ-আঞ্চলিক জোটের প্রস্তাব এখনো বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের চেয়ে অধিকতর সমস্যা সৃষ্টি করে চলছে। বিশ্লেষণে রাজনৈতিক ভাবাবেগ পরিহারের ওপর জোর দেয়া হয়, সুপারিশ করা হয় সমঝোতা সৃষ্টির ; একই সঙ্গে বহুল প্রচারিত বহুমাত্রিক খাতভিত্তিক উপ-আঞ্চলিক 'উন্নয়নের' পরিবর্তে প্রায়োগিক ক্রমউন্নয়ন ধারায় বা একক খাতভিত্তিক উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার ওপর জোর দেয়া হয়।

এশীয় সহযোগিতার পটভূমি

এশিয়া মহাদেশে প্রকৃত সহযোগিতার ইতিহাস বেশি দিনের নয়, কিন্তু অভিলাষ-প্রত্যাশা অনেক দিনের। বিশেষ করে, স্বাধীনতা লাভের পর থেকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো তাদের নবলব্ধ স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও উন্নয়নের জন্য নিরন্তর সহযোগিতার প্রক্রিয়ায় তৎপর ছিল। এ ধরনের কাজ কখনো সহজসাধ্য ছিল না। উদ্যোগ, সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অনেক

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিও ছিল। কারণও ছিল অসংখ্য। উপনিবেশবাদের ঐতিহ্যিক সূত্র, জাতি-রাষ্ট্র গঠনের অগণিত সমস্যা, নেতৃত্বের সংকট, দিক-নির্দেশনার অভাব, ঐতিহ্যিক মতবাদ, সম্পদের অভাব—এসব বহুদিক থেকে প্রায় প্রতিটি দেশ ছিল সংকটাপন্ন। তদুপরি আসে বহিঃশক্তিসমূহের চাপ। ফলে স্বাধীনতা লব্ধ দেশগুলো নিজেরা নিজেদের নীতি-কৌশল প্রণয়নে সমর্থ হয় নি, প্রায়শ বৈদেশিক কৌশলগত নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়। নিজেদের উন্নয়নমূলক আশা-আকাঙ্ক্ষার সম্পূরণে এবং জনগণের নিরাপত্তা বিধানে প্রায় ক্ষেত্রে এসব দেশ যে ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে সে সব ছিল বিক্ষিপ্ত ও বিভিন্নমুখী। সমন্বিত প্রয়াস ছিল দুষ্কর বা ক্ষণস্থায়ী। তাই এ দু'অঞ্চলে আঞ্চলিকতার ইতিহাস আপেক্ষিকভাবে নতুন।

বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়া উভয় অঞ্চলেই আঞ্চলিক সংস্থা রয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক সংগঠন, 'আসিয়ান' গঠিত হয়। ১৯৬৭ সনে অনেকটা অঞ্চলব্যাপী কম্যুনিস্ট আন্দোলন ও বিদ্রোহমূলক তোড়জোড়ের পটভূমিতে, যদিও এ সংগঠন ১৯৭৫ সনে সাইগনের পতনের পূর্বাবধি তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয় নি। পক্ষান্তরে, দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সংস্থা সার্ক আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় ১৯৮৫ সনে। আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের মধ্যে সার্ক হচ্ছে কনিষ্ঠতম, যদিও সার্কের প্রকৃত স্বপ্নদ্রষ্টা বাংলাদেশের তদানিন্তন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৭৭ সন থেকে আঞ্চলিকতার ধারণা নিয়ে অঞ্চলব্যাপী যোগাযোগ স্থাপন করেন। শেষ পর্যন্ত অনেক প্রচেষ্টার পর এই সংগঠনের জন্ম লাভ হয় এ অঞ্চলের জটিল ইতিহাস, ভৌগোলিক অবস্থা ও অপ্রতিসম ভূ-রাজনীতির প্রেক্ষাপটে।

সার্কের "ধীরে চলো" নীতি

সার্কের সঙ্গে আসিয়ানের তুলনা করা হলে সার্কের মাধ্যমে আঞ্চলিকতা অগ্রগতি সম্পর্কে হতাশার উদ্রেক ঘটে। অথচ সার্ক দেশের নেতৃবর্গ উচ্চতম পর্যায়ে প্রায় প্রতি বছর শীর্ষ বৈঠকে বসেন। এ ধরনের উচ্চমাত্রার কূটনৈতিক আলেখ্য সত্ত্বেও দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিকতার অন্বেষায় সার্ক "ধীরে চলো" পথ অবলম্বন করে। পক্ষান্তরে, তুলনামূলকভাবে নিম্নমাত্রার কূটনীতি অবলম্বন করেও প্রতিবেশী আসিয়ান দ্রুততর প্রক্রিয়ায় একই সঙ্গে সংহতি ও উন্নয়নের যাত্রায় অগ্রগামী হয়ে আছে।"[৬] "পারস্পরিক আন্তঃনির্ভরশীল উন্নয়নের" ধারণা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে আসিয়ান দেশগুলো তাদের সমষ্টিগত শক্তির সমন্বয় ঘটায় এবং সম্প্রতি পরিলক্ষিত সাময়িক অর্থনৈতিক বিপর্যয় সত্ত্বেও আসিয়ান জোট একটি শক্তিশালী ব্যবসায়িক জোট হিসাবে তার খ্যাতি অক্ষুণ্ন রেখেছে।[৭] অথচ সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে এখনো বাণিজ্যিক

www.pathagar.com

লেনদেন তুচ্ছই বলা চলে এবং এসব দেশ দারিদ্র্যের ফাঁদে আটক বলে প্রতীয়মান হয়। এভাবে সার্ক আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠার একযুগের অধিককাল পরেও দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিকতার ভাবমূর্তির আলেখ্য হচ্ছে "শাহী কায়দায় বৈঠক-সম্মেলন, কৃতিত্বে নিম্নমান।"[৮] আঞ্চলিকতার প্রয়াসে আসিয়ানের সাফল্য প্রকৃত অর্থে অনুপ্রেরণা ও ঈর্ষার উদ্রেক করে।

আসিয়ানের উন্নয়ন ত্রিভুজ

আসিয়ানের আঞ্চলিকতার প্রয়াস বহুমাত্রিক ধরন ও রূপ পরিগ্রহ করে। প্রথমত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অভ্যন্তর ও বাইরে সহযোগিতার সম্পর্ক প্রসারকল্পে এবং আসিয়ানের সদস্যবর্গের অব্যাহত উন্নয়নের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে আসিয়ান তার সদস্য নয় এমন দেশগুলির সঙ্গে চার ধরনের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে "সংলাপ সঙ্গী" (প্রতিপক্ষ দেশ ও জোটের সঙ্গে), "পরামর্শ সঙ্গ" (কিছু কিছু দেশের সঙ্গে), কিছু দেশকে "পর্যবেক্ষকের" মর্যাদা প্রদান, এবং পরিশেষে খাত অনুযায়ী কিছু দেশের সঙ্গে সংলাপ সঙ্গী সম্পর্ক।[৯] এ ধরনের ক্রমান্বয়ে গড়ে ওঠা সম্পর্ক সর্বদা পর্যালোচনার অপেক্ষায় থাকে এবং পর্যালোচনার প্রতি বছর সম্পর্কের ক্ষেত্রে পদমর্যাদার উন্নয়ন ঘটে। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা চলে যে, ১৯৯৩ সন থেকে ১৯৯৬ সন অবধি একটি খাতভিত্তিক সংলাপ সঙ্গী হিসেবে আসিয়ানের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার পর ভারত বর্তমানে পূর্ণাঙ্গ 'পরামর্শ সঙ্গীর' মর্যাদা লাভ করে।[১০]

একই সঙ্গে, আসিয়ান তার আঞ্চলিক কর্মকাণ্ডের পরিধি সম্প্রসারিত করে। এটা প্রতিফলিত হয় বৃহত্তর অঞ্চলব্যাপী অধিকতর সম্প্রসারিত অর্থনৈতিক সংগঠন 'এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগর অর্থনৈতিক সহযোগিতা' (Asian Pacific Economic Co-operation -APEC) সৃষ্টিতে। একই ধরনের আরো প্রয়াস প্রতিফলিত হয় আসিয়ানের উদ্যোগ নিরাপত্তা সংলাপের জন্য গঠিত তথাকথিত আসিয়ান আঞ্চলিক ফোরাম (ASEAN Regional Forum-ARF)-এর কর্মকাণ্ডে। এ সংগঠনে এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ছাড়াও বাহিরে থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ মোট ১৮টি দেশ বা সংস্থাকে সদস্যপদ প্রদান করে। এ দু'সংস্থার কর্মকাণ্ডের প্রক্রিয়ায় আসিয়ান তার স্বার্থের পরিধি বৃদ্ধি করে। প্রথম সংগঠনটির মাধ্যমে আসিয়ান বৃহত্তর এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে একযোগে ১৯৯৪ সনে ইন্দোনেশিয়ার বগোরে গৃহীত ঘোষণার আদর্শ ও উদ্দেশ্যাবলি অর্জনে ব্যাপৃত হয়। এ ঘোষণার মূল লক্ষ্য ছিল এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অধিকতর উদারনীতিকরণ। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় সংগঠনটি মুখ্যত নিরাপত্তা বিষয়ক সংলাপ বা আলাপ-আলোচনায় নিয়োজিত থাকে এবং এক্ষেত্রে লক্ষ্য হচ্ছে স্বচ্ছতা ও সমঝোতার

www.pathagar.com

মাধ্যমে শান্তি বা স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করা।[১১] এসব ক্ষেত্রে আসিয়ানের উদ্যোগ অনুকরণীয়।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় আন্তঃআঞ্চলিক বা আসিয়ানের অভ্যন্তরে উপ-আঞ্চলিক ব্যবস্থা হচ্ছে আসিয়ান দেশসমূহের আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ উদ্যোগ। এ উদ্যোগ আপেক্ষিকভাবে সাম্প্রতিককালীন। এর অধিকতর আন্তর্জাতিক পরিচিতি হচ্ছে "উন্নয়ন ত্রিভুজ" নামে। এ ধারণা রাতারাতি গড়ে ওঠে নি এবং বিভিন্ন সময়ে বিশ্লেষকেরা এর বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। কেউ একে "প্রাকৃতিক অর্থনৈতিক সীমানা" বলে অভিহিত করেন, কেউ একে মনে করেন "আন্তঃজাতীয় অর্থনৈতিক এলাকা" বা লন্ডনভিত্তিক 'দ্য ইকনমিস্ট'-এর ভাষায় একে "প্রাকৃতিক অর্থনৈতিক জোন"ও বলা চলে।[১২]

প্রকৃত অর্থে "উন্নয়ন ত্রিভুজ" হচ্ছে আঞ্চলিকতার স্থানীয় প্রতিরূপ ব্যবস্থা বিশেষ। প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন, উদ্দেশ্যাবলি ও পদ্ধতির দিক থেকে এর পরিধি আপেক্ষিকভাবে সীমিত। আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে একে নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা-ক্ষেত্রও বলা চলে।

এমন কি আঞ্চলিক উন্নয়ন নীতি-কৌশলে ক্ষেত্রে একে নতুন দৃষ্টিকোণ হিসেবেও উপস্থাপন করা হয়ে থকে। [১৩]

"উন্নয়ন ত্রিভুজ" পরিকল্পনা অনুযায়ী তিন বা সম্ভবত ততোধিক সদস্য দেশের ভৌগোলিকভাবে ঘনিষ্ঠ এলাকাগুলো একে অপরের পরিপূরক হয়ে তাদের পারস্পরিক অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে ঐক্যবদ্ধ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এ ধরনের তিনটি "উন্নয়ন ত্রিভুজ"-এর নাম উল্লেখ করা চলে। এ তিনটির মধ্যে সবচেয়ে পুরনো উদ্যোগ হচ্ছে "দক্ষিণাঞ্চলীয় উন্নয়ন ত্রিভুজ"। এটিতে ইন্দোনেশিয়ার রিউ প্রদেশ, মালয়েশিয়ার জহুর রাষ্ট্র ও সিঙ্গাপুর বিজড়িত। উন্নয়ন প্রয়াসে অপেক্ষাকৃতভাবে এ ত্রিভুজ-ই অধিকতর সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে "উত্তরাঞ্চলীয় উন্নয়ন ত্রিভুজ।" এতে সুমাত্রার উত্তরাঞ্চলের এক পাশের সঙ্গে মালয়েশীয় উপদ্বীপের উত্তরাঞ্চল ও থাইল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চল সংযুক্ত করা হয়। কিন্তু এ উপ-আঞ্চলিক প্রকল্প অংশত থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ার বিদ্রোহী তৎপরতার বিঘ্নিত হচ্ছে এবং অংশত এর কম সাফল্যের জন্য দায়ী থাইল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলীয় সমুদ্র উপকূলভাগস্থ প্রকল্পের উন্নয়নের দিকে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার তৃতীয় উন্নয়ন ত্রিভুজ হচ্ছে পূর্ব আসিয়ান উন্নয়ন এলাকা 'ইয়াগা' (East Asean Growth Area -EAGA)। এ প্রকল্পে অংশগ্রহণে প্রত্যাশীদের মধ্যে রয়েছে ফিলিপাইনের দক্ষিণাঞ্চল, ইন্দোনেশিয়ার মূলাবেসী ও মালোকু দ্বীপ, পূর্ব মালয়েশীয় অঙ্গরাজ্য সাবাহ ও সারাওয়াক এবং সুলতানী রাষ্ট্র ব্রুনাই। 'এপেক'

www.pathagar.com

অবকাঠামোগত ফোরাম-এর উদ্যোগে ইতিমধ্যে 'হুয়াগা'র অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য বেসরকারি খাতে টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে।[১৪] লক্ষণীয় যে, উপর্যুক্ত বিভিন্ন উন্নয়ন ত্রিভুজের সাফল্য বা সীমাবদ্ধতা বিভিন্ন ধরনের ; প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে অবস্থানগত মাপকাঠি এবং সেই মাপকাঠিতেই সাফল্য বা ব্যর্থতা বিচার্য।

দক্ষিণ এশীয় উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা

এবার দক্ষিণ এশীয় উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রসঙ্গে আসা যাক। দক্ষিণ এশিয়ার কিছু কিছু দেশে দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে যে, এ অঞ্চলেও আসিয়ানের অনুকরণে উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে সহযোগিতা তাদের উন্নয়নের অনুকূলে হবে। বেসরকারি পর্যায়ে দক্ষিণ এশিয়ার কিছু কিছু বেসরকারি সংস্থা (এন. জি. ও) আন্তর্জাতিক আর্থিক সাহায্য নিয়ে বিগত অর্ধযুগকালীন সময় তিনটি দক্ষিণ এশীয় দেশ–বাংলাদেশ, নেপাল ও ভারতের মধ্যে–পারস্পরিক সমঝোতা বৃদ্ধিকল্পে কাজ করে আসছে। এসব বেসরকারি সংস্থার মধ্যে রয়েছে ঢাকা ভিত্তিক 'বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ' ও 'সেন্টার ফর পরিসি ডায়লগ', নয়াদিল্লীর 'সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চ' এবং নেপালে অবস্থিত 'ইনস্টিটিউট ফর ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ।' এ সংগঠনসমূহ উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে উন্নয়ন সহযোগিতা সম্পর্কিত নিজ নিজ ধারণা সম্প্রসারণকল্পে জ্ঞান-গবেষণাভিত্তিক প্রচার অভিযান চালিয়ে আসছিলো। এ অভিযানের সূত্রপাত ঘটে তাদের আদর্শবাদী চিন্তা-চেতনা থেকে। তারা মনে করে যে, পূর্বাঞ্চলীয় দক্ষিণ এশিয়ায় পানির প্রাচুর্য ও প্রাকৃতিক সম্পদের দিক থেকে সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও নিষ্পিষ্ট দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও অপুষ্টির অভিশাপে ভুগে চলছে। তাদের বক্তব্য উপস্থাপনকল্পে এসব সংস্থা বেশ কিছু সম্মেলন, কর্মশিবির, সেমিনার, অনুসন্ধান ও গবেষণাকর্মের মাধ্যমে অঞ্চলব্যাপী জনমত সমাবেশ করতে প্রয়াসী হয় যাতে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ও পানি সম্পদের উন্নয়নে এ উপ-অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোকে অধিকতর তৎপর করা যায়। প্রকৃতপক্ষে উপ-অঞ্চলে প্রবহমান নদনদী এদের নিকট "আশা" ও "জীবনের" উৎস বলে বিবেচিত হয়। [১৫]

এ প্রসঙ্গে এও বলা সমীচীন যে, ১৯৯৬ সনে বাংলাদেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর উপর্যুক্ত সংস্থাসমূহের আন্দোলনে নতুন গতি সঞ্চার হয়। কেননা এ সময় থেকে এ উপ-অঞ্চলে উন্নয়ন চতুর্ভুজ গঠন অবধি এসব সংস্থাসমূহ ঢাকা, নয়াদিল্লী ও কাঠমুণ্ডুতে কয়েকটি সেমিনার-সম্মেলন আয়োজন করে। এ প্রসঙ্গে যে বিষয়টি স্পষ্ট নয় তাহলো ঃ উপ-অঞ্চলভুক্ত প্রতিটি দেশের অভ্যন্তরে জাতীয় স্বার্থে বিষয় সম্পর্কিত প্রত্যক্ষজ অনুভূতির

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত বিভাজন, বিশেষ করে সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যাবলি নিয়ে বিতর্ক দেখা দিলে বা নীতিগত অগ্রগণ্যতা নিয়ে প্রশ্নের অবতারণা করা হলে উপ-আঞ্চলিক জোট সৃষ্টিতে উৎসাহী এসব বেসরকারি সংস্থাসমূহের প্রকৃত অবস্থান কি হবে ? তারাও কি বিস্ফোরণমূলক রাজনৈতিক মেরুকরণে জড়িয়ে পড়বে না ?

'দক্ষিণ এশীয় উন্নয়ন চতুর্ভুজ' সংস্থা উত্থাপন ও রাজনৈতিক উত্তাপ

প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশে উন্নয়ন চতুর্ভুজ জোট গঠন সম্পর্কে বেশ সংশয় দেখা দেয়, এমন কি বাংলাদেশের অভ্যন্তর রাজনীতিতে দারুণ উত্তাপ সৃষ্টি হয়। ১৯৯৬ সনের শেষ পাদে সরকারি পর্যায়ে দক্ষিণ এশিয়ার কতিপয় দেশের রাজধানীতে, বিশেষ করে ঢাকায় উপ-আঞ্চলিক জোট পরিকল্পনার সপক্ষে জোরসোর প্রচারণা চালানো হয়।[১৬] এ প্রচারণাকালে ঢাকায় এ ধরনের ধারণা দেওয়া হয় যে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ-ই ১৯৯৬ সনের ডিসেম্বরে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত সার্ক পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলনে উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার ধারণা উত্থাপন করেন। প্রকৃত কাহিনী কিছুটা ভিন্নরূপ। উপর্যুক্ত সম্মেলনের কিছুকাল পূর্বে ভারতের তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ইন্দর কুমার গুজরাল, যিনি পরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন– প্রথম বারের মতো বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভুটানের সমন্বয়ে "একটি গতিশীল উন্নয়ন এলাকা" সৃষ্টির বিষয় উল্লেখ করেন।[১৭] পরে ১৯৯৬ সনের সেপ্টেম্বর তিনি লন্ডনে অবস্থিত "রয়্যাল ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্স"–এ বক্তৃতা প্রদানকালে দক্ষিণ এশিয়ায় একটি উপ-আঞ্চলিক জোট গঠনের বিষয়ে ভারতের সংকল্পের বিষয় পুনর্ব্যক্ত করেন।[১৮]

উপ-আঞ্চলিক জোট গঠন সম্পর্কিত পরবর্তী ঘটনাবলী এখন আর অবিদিত নয়। বাংলাদেশ ও নেপালের পররাষ্ট্র সচিবদ্বয় ১৯৯৭ সনের মার্চে দৃশ্যত নিজ নিজ দেশের পক্ষ থেকে কাঠমুন্ডুতে অনুষ্ঠিত সার্ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় "ধারণাপত্র" (বা "কনসেপ্ট পেপার") এবং "প্রস্তাবনাপত্র" বা ("এপ্রোচ পেপার") উপস্থাপন করেন। স্ট্যান্ডিং কমিটির ঐ সভা ছিল মালে'য় অনুষ্ঠিতব্য সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতিপর্বের অংশবিশেষ, কিন্তু শীর্ষ সম্মেলনের প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত সার্ক পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সমঝোতা সারমর্মে উপ-আঞ্চলিক জোটের বিষয় পাকিস্তানের আপত্তির কারণে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে নি।[১৯]

ইতিমধ্যে, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক, উপ-আঞ্চলিক জোট এবং এ জোটের ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা প্রভৃতি বিষয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ

www.pathagar.com

রাজনীতিতে বেশ উত্তাপ সৃষ্টি হয়। ১৯৯৭ সনের জানুয়ারির প্রথমার্ধে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড় বাংলাদেশ সফরে আসেন। এই সফরকালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনসভায় এবং সাংবাদিক সম্মেলনে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহুমুখী সহযোগিতার বিশদ দিক তুলে ধরতে প্রয়াসী হন। দু'দেশের সম্পর্ককে তিনি "ঘনিষ্ঠতম বন্ধুপ্রতীম প্রতিবেশী"র সম্পর্ক বলে অভিহিত করেন। "প্রকৃত বন্ধু" হিসেবে দু'দেশের রাজনৈতিক প্রত্যয় ও সংকল্পের সমন্বয় করে তিনি অর্থনৈতিক উন্নয়নকল্পে সুযোগ সৃষ্টির ওপর জোর দেন, বাংলাদেশ এবং সীমান্ত সংলগ্ন ভারতীয় রাজ্যগুলোর সঙ্গে ব্যবসায়িক সুযোগ সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক যোগাযোগ স্থাপনের ওপরও গুরুত্ব প্রদান করেন। তদুপরি, তিনি এশীয় হাইওয়ে ও এশীয় রেলওয়ে পরিকল্পনাধীন ব্যবস্থায় আঞ্চলিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন সম্পর্কিত প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ভারতের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন যাতে "আমাদের অঞ্চলের দেশগুলো উপ-আঞ্চলিক প্রক্রিয়ায় দ্রুততর উন্নয়নের পথে ধাবিত হতে পারে।" তাঁর প্রসারিত এই উপ-আঞ্চলিক উন্নয়ন দৃষ্টিকোণে তিনি "বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান এবং আমাদের দেশ সংলগ্ন ভারতীয় এলাকাসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করেন।" কেননা তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে, এই উপ-অঞ্চলের জনমানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিদ্যুতের উৎপাদন ও বিতরণ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী অধিকতর বিদ্যুৎ শক্তি আহরণসহ এখানকার সুবিশাল প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকতর সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুফল ও অর্থবহ সহযোগিতাকল্পে অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রীর এ ধরনের বক্তব্য ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যেও প্রতিধ্বনিত হয়। তিনিও উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থা, ট্রানজিট বা সীমান্ত সংযোগ পথ, রাজপথ ও রেলপথ, সড়ক প্রভৃতিসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির কথা বলেন।[২০] পরবর্তীকালেও শেখ হাসিনা উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রতি সুস্পষ্ট সমর্থন প্রদান করেন। কেননা তিনি এ ধরনের সহযোগিতা সার্ক সনদের ৭ নম্বর ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে করেন, যার ফলে সার্ক সুসংহত হবে এবং বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় এ ধরনের সহযোগিতা প্রচলিত রয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।[২১]

জনসভা ও গণমাধ্যম ব্যবহার করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফররত ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একই সুরে সুর মিলিয়ে যে-রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় উপ-আঞ্চলিক জোট গঠনের প্রস্তাব রাখেন তার প্রতিক্রিয়া ছিল প্রায় স্বতঃস্ফূর্ত ও তাৎক্ষণিক। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীবিশেষ প্রতিক্রিয়া

www.pathagar.com

ব্যক্ত করে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। উপ-আঞ্চলিক জোট সম্পর্কিত জনসভা ও গণমাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর উচ্চারিত বক্তব্য ও বিবৃতির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি জাতীয় সংসদে তাঁর শাণিত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তিনি এ দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন যে প্রস্তাবিত চারজাতির সমন্বয়ে উপ-আঞ্চলিক জোট গঠন করার উদ্দেশ্য হবে সার্ককে অকার্যকর করা, "ভারতীয় সম্প্রসারণবাদকে প্রতিষ্ঠিত করা"। তিনি এ প্রয়াসকে দেখেন "সার্কের চেতনাকে নস্যাৎ করার চক্রান্ত হিসেবে" এবং সার্ককে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার একক পরিকল্পনা হিসেবে। তিনি প্রশ্ন রাখেন, বাদবাকি তিনটি সার্কভুক্ত দেশকে কেন বাদ দেয়া হয়েছে? তাঁর মতে, এর কারণ হচ্ছে ভারত শেষ অবধি প্রস্তাবিত উপ-আঞ্চলিক জোটভুক্ত তিনটি দেশকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশে রূপান্তরিত করবে। তাঁর ভাষায়, "ভারতের অংশবিশেষকে উপ-আঞ্চলিক জোটে টানার অর্থ হচ্ছে প্রস্তাবিত জোটের অন্য তিনটি দেশের সার্বভৌমত্বকে কার্যত নাকচ করে দেয়া, ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসেবে তাদের দেখা। আমাদের সরকার ভারতকে তার অশুভ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মদদ যোগাচ্ছে।" খালেদা জিয়া আরো অভিযোগ করেন যে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার 'এশিয়ান হাইওয়ে'র নামে ভারতকে 'করিডোর' দেওয়ার পরিকল্পনা করছে এবং তিনি মনে করেন যে নয়াদিল্লী পরিকল্পিত করিডোরের ব্যবহার করবে সৈন্য পাচার বা চলাচলের কাজে।[২২] এসব বহুবিধ কারণ দেখিয়ে তিনি উপ-আঞ্চলিক জোট গঠনের সকল প্রচেষ্টা প্রতিরোধ করার আহ্বান জানান। তিনি স্বয়ং "বাংলাদেশকে ভারতের একটি প্রদেশে পরিগণিত করার পরিকল্পনা নস্যাৎ করার" দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।[২৩] স্পষ্টতই বাংলাদেশের বিরোধী দলীয় নেত্রী প্রস্তাবিত উপ-আঞ্চলিক জোটকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হিসেবে দেখেন।

এভাবে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে উপ-আঞ্চলিক জোট গঠনের প্রস্তাবনার ধরন ও প্রক্রিয়া এবং সংসদে বিরোধী দলের শাণিত প্রতিক্রিয়ার ফলে এ বিষয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে দারুণ উত্তাপ ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। অথচ এ ধরনের জাতীয় ও আঞ্চলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে প্রয়োজন সহযোগিতা এবং সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যে সমঝোতা ও সম্প্রীতি। ফলে পরিকল্পিত উপ-আঞ্চলিক জোটের সাফল্যের অনুকূলে শুভ সূচনার ভাব পরিলক্ষিত হয় নি। বরং উপ-আঞ্চলিক জোট প্রস্তাবকদের পক্ষ থেকে শান্তি ও উন্নয়নের সপক্ষে সংশ্লিষ্ট মতামতসমূহকে বশে আনার ক্ষেত্রে অপরিপক্কতার পরিচয় পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

উন্নয়ন ত্রিভুজ বনাম উন্নয়ন চতুর্ভুজ

বিতর্ক দেখা দেয় আরেক পর্যায়েও। প্রশ্ন আসে, উপ-আঞ্চলিক জোটে আন্তর্জাতিক সাহায্য-সহযোগিতা, বিশেষ করে দু'টি আন্তর্জাতিক আর্থিক সংগঠন, বিশ্ব ব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক-এর ভূমিকা কি ধরনের হবে? দৃশ্যত, বিশ্বব্যাংক আসিয়ানের উন্নয়ন ত্রিভুজের অভিজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে দক্ষিণ এশিয়ায়ও একই ধরনের সহযোগিতামূলক প্রকল্পে সাহায্য প্রদানে উৎসাহী হয়। প্রকৃতপক্ষে, বিশ্বব্যাংক-এর পক্ষ থেকে "দক্ষিণ এশীয় উন্নয়ন ত্রিভুজ" নামক একটি অববাহিকাভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প উন্মোচন করা হয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র মেঘনা অববাহিকার বেশ কিছু এলাকা জুড়ে একটি আন্তঃসীমানা উন্নয়নমূলক সহযোগিতার ভিত গড়ে তোলা। এ প্রকল্পে থাকবে ভারতের পূর্বাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এলাকাসমূহ, বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটান।

বিশ্বব্যাংকের পরিকল্পিত উন্নয়নমূলক উদ্যোগকে দেখা হয় সার্ক কাঠামোর ভেতরে। তার চেয়েও বড় কথা, বিশ্ব ব্যাংক-এর পরিকল্পিত উন্নয়ন ত্রিভুজকে কৌশলগতভাবে বঙ্গোপসাগরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ উপ-অঞ্চল হিসেবে দেখা হয়, যে-উপঅঞ্চল কালে পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া। মধ্য এশিয়া ও পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোর সঙ্গে সুবিধাজনক যোগসূত্র বা বন্ধন হিসেবে কাজ করতে পারে। এভাবে বিশ্বব্যাংকের পরিকল্পনায় রয়েছে একটি বিশদ রূপরেখা, উন্নয়নের দিক থেকে রয়েছে বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ; উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বব্যাংক-এর বর্তমান সাহায্য কর্মসূচির পরিপূরক হিসেবে উন্নয়ন তৎপরতা জোরদার করা এবং বৃহত্তর অঞ্চলব্যাপী উন্নয়ন সম্পর্কিত সুযোগ বৃদ্ধিকল্পে সচেতনতা সৃষ্টি করা। সঙ্গতিপূর্ণ কৌশলগত বিনিয়োগ পরিকল্পনা, সহায়ক নীতিগত পদক্ষেপ এবং রাষ্ট্রীয় সীমারেখার উর্ধ্বে বিভিন্ন দেশে স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়নের ক্ষেত্রে অধিকতর উদ্যম সৃষ্টিসহ এ সকল কিছুর সমন্বয় বিধান ছিল বিশ্বব্যাংকের সার্বিক লক্ষ্য।[২৪]

বিশ্বব্যাংক ছাড়া এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকও দক্ষিণ এশীয় উপ-আঞ্চলিক উন্নয়নে আগ্রহ প্রদর্শন করে। দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিতর্কে না জড়িয়ে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতাকে ইতিবাচক আলোকে দেখে, ব্যাংক-এর পক্ষ থেকে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ও আর্থিক সাহায্য প্রদানের প্রস্তাব রাখে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এও মনে করে যে, এই উপ-অঞ্চলে কার্যকর সহযোগিতার সুফল হবে কল্পনাতীত। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়, জলবিদ্যুৎ ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে দেখা দেবে সহযোগিতার প্রচুর সম্ভাবনা।[২৫]

www.pathagar.com

বাংলাদেশের 'যুগপৎ উপ-আঞ্চলিক উদ্যোগ'

অবশ্য এও মনে রাখা প্রয়োজন যে, দক্ষিণ এশীয় উন্নয়ন চতুর্ভুজ বাংলাদেশের উদ্যোগে গঠিত একমাত্র উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা সংগঠন নয় যার সঙ্গে বাংলাদেশ সম্পৃক্ত হয়। প্রায় একই সময়ে ঢাকা যুগপৎভাবে কয়েকটি উপ-আঞ্চলিক–আঞ্চলিক জোটে আগ্রহী হয়, এমন কি উদ্যোগী ভূমিকাও পালন করে। বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টিকোণ থেকে, এসব যুগপৎ উদ্যোগের ফলে আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার হবে, ত্বরান্বিত হবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন। এরূপ দাবি করা হয় যে, ১৯৯৭ সনে মালে' অনুষ্ঠিত সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাস্তব জ্ঞান-ভিত্তিক ভূমিকার ফলে সার্কের মাধ্যমে আঞ্চলিক সহাযোগিতার প্রয়াসে নতুন গতি সঞ্চার হয়। সরকারের পক্ষ থেকে আরো দাবি করা হয় যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্র আরো প্রসারিত হয়েছে অন্য দু'টি সংস্থায় বাংলাদেশের যোগদানের ফলে। এর একটি হচ্ছে বিস্টেক (BISTEC-Bangladesh, India, Srilanka and Thailand Economic Co-operation)। মায়ানমার বা বার্মা এতে প্রথমে পর্যবেক্ষক হিসেবে যোগদান করে এবং পরে সে দেশ পূর্ণ সদস্য পদও গ্রহণ করে। ফলে বিস্টেক রূপান্তরিত হয় বিমস্টেক-এ (BIMSTEC)। দ্বিতীয় আরেকটি সংস্থার সদস্যপদও বাংলাদেশ কয়েক মাসের ব্যবধানে লাভ করে। এটি হলো ডি-৮ বা আটটি উন্নয়নকামী দেশের সংস্থা (Developing-Eight)। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ মিশর, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান ও তুরস্কের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদারকল্পে জোটভুক্ত হয়। বাংলাদেশ তার উন্নয়নের কূটনীতি এ পর্যায়েও ক্ষান্ত করে নি। সরকারের পক্ষ থেকে এমন দাবিও করা হয় যে, বাংলাদেশ জোরেসোরে চেষ্টা করে চলছে যাতে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক ও উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে সম্পর্ক জোরদার হয়, বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ, ট্রানজিট ও পর্যটন সম্পর্ক সম্প্রসারিত হয়।

বাংলাদেশ সরকারের প্রত্যাশা যে, উপ-অঞ্চল, দ্বি-পাক্ষিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে সম্পর্ক জোরদারকল্পে গৃহীত এসব বহুবিধ উদ্যোগের ফলে "দেশের অর্থনীতিতে দারুণ ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। বিশ্ব অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিকীকরণের পটভূমিতে আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে দ্রুত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকল্পে সুযোগ-সুবিধা ছিনিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পিছিয়ে থাকতে পারে না।"[২৬] এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, উপর্যুক্ত বহুবিধ পর্যায়ে সম্পর্ক স্থাপন ছাড়াও বাংলাদেশ ভারত মহাসাগর প্রান্তস্থ আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থায় (Indian Ocean Rim Association for Regional Co-

www.pathagar.com

operation- IORARC) যোগদানেও বেশ আগ্রহী। বস্তুত, নয়াদিল্লী ও ঢাকায় এখন পারস্পরিকভাবে বন্ধুপ্রতিম সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে এ সংস্থায় বাংলাদেশের যোগদানের সম্ভাবনাও উজ্জ্বলতর হয়েছে। ভারতে সরকার পরিবর্তনে ঢাকা নয়াদিল্লী সম্পর্কে ভাটা পড়ে নি; বরং বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী দ্রুত ভারত সফর করে দু'দেশের সুসম্পর্ক বহাল রাখতে প্রয়াসী হন। বস্তুত, ১৯৯৯ সনের মার্চে বাংলাদেশকে 'আইওরার্ফ'র সদস্য পদ প্রদানের বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিশ্লেষণী দৃষ্টিকোণ মতানৈক্য

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বেশ কিছুকাল থেকে বাংলাদেশ সরকারের অব্যাহত বক্তব্য ছিল যে, বাংলাদেশের উদ্যোগে গঠিত যে-কোনো উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা হবে সার্কের কাঠামোর অধীন ; কিন্তু সংশ্লিষ্ট চারটি দেশের পররাষ্ট্র সচিবদের ১৯৯৭-এর মার্চে অনুষ্ঠিত সভায় নতুন উপ-আঞ্চলিক জোটের নাম দেয়া হয় "দক্ষিণ এশীয় উন্নয়ন চতুর্ভুজ" (South Asian Growth Quadrangle বা SAGQ)। তদুপরি, নতুন উপ-আঞ্চলিক উদ্যোগ সার্ক-এর বহির্ভূত বলেও বিবেচিত হয়।

ইতিমধ্যে, একদিকে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর পক্ষ থেকে উপ-আঞ্চলিক জোটের সম্ভাব্য সহযোগিতার খাতসমূহ চিহ্নিত হয়, অন্যদিকে বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে দেখা দেয় বড় ধরনের স্পষ্ট মতপার্থক্য। দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে পরিলক্ষিত মতভেদ প্রভাব ফেলে সমাজের সর্বত্র। এমন কি বড় ধরনের মেরুকরণ পরিলক্ষিত হয় বিশ্লেষণী দৃষ্টিকোণে। বিশ্লেষকদের এক শ্রেণী সরকারি অবস্থানের অনুকূলে বক্তব্য রাখেন।[২৭] অনেকে আপত্তি তোলেন, কেননা তাঁদের বড় ভয় হয় যে 'দক্ষিণ এশীয় উন্নয়ন চতুর্ভুজ'-এ অঞ্চলের বৃহৎশক্তি ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত তার নিজ স্বার্থসিদ্ধির একটি চালমাত্র। এ দৃষ্টিকোণ থেকে, ভারতের উদ্দেশ্য হচ্ছে সার্কের প্রতিসাম্য চেতনা নস্যাৎ করা, বাংলাদেশসহ জোটভুক্ত দুর্বলতর দেশগুলোকে ভারতের মার্জিনীকরণ প্রক্রিয়ায় নিয়ে আসা এবং এ প্রক্রিয়ায় ভারতের জাতীয় স্বার্থজনিত কার্যসূচি উদ্ধার করা। উন্নয়ন চতুর্ভুজকে এভাবে দেখা হয় বাংলাদেশের অভ্যন্তরভাগ দিয়ে ট্রানজিট/করিডোর লাভের 'মুখোশ" হিসেবে কেননা ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্যসমূহের বিদ্রোহ দমনে এ ধরনের সুযোগ লাভে ভারত মরিয়া হয়ে রয়েছে। ভারত এ মতে আরো চাচ্ছে চট্টগ্রাম নৌবন্দরে অনুপ্রবেশ লাভের সুযোগ। এই প্রক্রিয়ায় নেপাল ও ভুটান হয়তো 'প্রক্সি' হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে, কিন্তু বাংলাদেশকে এ অঞ্চলের অভিন্ন সেবায় নিজস্ব ভূ-প্রাকৃতিক-কৌশলগত অবস্থানকে সমর্পণ করতে হবে আর

www.pathagar.com

বিনিময়ে বাংলাদেশে পাবে সেই দুর ভবিষ্যতে তুচ্ছ স্বার্থ লাভের অঙ্গীকারমাত্র।[২৮] ১৯৭২'র দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে ব্যক্ত মৈত্রী সম্পর্ক, তিনবিঘা প্রদানের প্রতিশ্রুতি কিংবা ফারাক্কা সংযোগ খাল খুলে দেওয়া কালের অঙ্গীকার– কোনো কিছুই বাংলাদেশের অনুকূলে যায় নি।

দক্ষিণ এশীয় উন্নয়ন চতুর্ভুজ উদ্বোধনের পাশাপাশি এই আন্তঃআঞ্চলিক পরিকল্পনা নিয়ে সার্কদেশসমূহে এ নতুন সংস্থার প্রয়োজনীয়তা, প্রাসঙ্গিকতা, সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে ; এমন কি সার্কের প্রতিলিপিকরণ বা পাল্টাব্যবস্থা হিসেবে একে দাঁড় করানো হয়েছে কিনা এ নিয়ে বাংলাদেশে উত্তরোত্তর সংশয় দেখা দেয়। বিশ্বব্যাংক দক্ষিণ এশীয় উন্নয়ন ত্রিভুজ-এর প্রস্তাব রাখতে গিয়ে সম্ভবত আসিয়ান-এর উন্নয়ন অভিজ্ঞতার অনুকরণের বিষয় ভেবেছিলো, কিন্তু দক্ষিণ এশীয় উন্নয়ন সংস্থার আগ্রহী প্রস্তাবকেরা এর জন্য ভিন্নতর নাম বেছে নেয়।

প্রাসঙ্গিক প্রশ্নমালা

দৃশ্যত দক্ষিণ এশীয় উন্নয়ন চতুর্ভুজের উদ্বোধনে সংশ্লিষ্ট দেশের নিজ নিজ আমলাতান্ত্রিক পরিকাঠামো মুখ্য ভূমিকা পালন করে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে উপ-আঞ্চলিক জোটের উদ্বোধন প্রাক্কালে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ও পরিলক্ষিত আচরণ থেকে এ সম্পর্কিত উত্তর প্রদানের চেয়ে প্রশ্নের উদ্রেক করে অনেক বেশি। এ প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবে যেসব প্রশ্নের উদ্রেক হয় সে সবের মধ্যে রয়েছে অনেক ধরনের জিজ্ঞাসা, যেমন ঃ উন্নয়ন চতুর্ভুজে অংশগ্রহণকারী চারটি দেশ নতুন সংস্থার উদ্বোধন করতে গিয়ে কি কি ধরনের দিক-নির্দেশনা ও উদ্দেশ্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়? এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষজ অনুভূতি ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি কি কি? কি ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার যোগসাজশে নতুন উপ-আঞ্চলিক সংস্থা জন্মলাভ করে? এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ একটি আধিজাতিক সংস্থার উদ্বোধনের পূর্বভাগে প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে, জাতীয় নীতি নির্ধারকবৃন্দ কি ধরনের বিতর্ক বা আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হন? বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক-এর মতো বহুপাক্ষিক আর্থিক সংগঠনগুলো উন্নয়ন চতুর্ভুজের বাস্তবায়নে কি ধরনের অবদান রাখতে আগ্রহী? বহুপাক্ষিক সংগঠনসমূহের সাহায্য-সহায়তার বিষয়ে এবং কি প্রক্রিয়ায় এসব সংস্থা জড়াবে এসব সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সরকারসমূহের অবস্থান কি ধরনের? আসিয়ানের উন্নয়ন ত্রিভুজসহ বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়ন মডেলসমূহের অভিজ্ঞতার যথাযথ পর্যালোচনা বা মূল্যায়নের পর কি দক্ষিণ এশিয়ায় একই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে? অন্যান্য সার্কভুক্ত দেশগুলোকে কেন দক্ষিণ এশিয়ার এই নতুন উন্নয়ন সংস্থায় যোগ দেয়ার জন্য ডাকা হয় নি বা সার্কভুক্ত নয় অথচ এ ধরনের উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা প্রকল্পে, বিশেষ করে

www.pathagar.com

আন্তঃসীমানা জুড়ে সহযোগিতায় গভীরভাবে আগ্রহী দেশসমূহ কিভাবে এ উপ-আঞ্চলিক জোটকে দেখছে? আসিয়ানের দক্ষিণাঞ্চলীয় উন্নয়ন ত্রিভুজে অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ, যেমন ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের সাফল্য থেকে কিভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে প্রকৃত অর্থে এ ধরনের উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে লাভবান হওয়া যেতে পারে?

এ ধরনের প্রশ্নমালা নতুন একটি উন্নয়ন উদ্যোগ সম্পর্কে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, এমন কি উন্নয়ন চতুর্ভুজ যথার্থ-ই পারস্পরিক স্বার্থের উন্নয়নে প্রয়োগ করতে হলে সব প্রশ্নের উত্তর খতিয়ে দেখতে হবে, শিখতে হবে অন্যদের জ্ঞান-অভিজ্ঞতা থেকে। বাংলাদেশের মতো একটি দারিদ্র্যক্লিষ্ট দেশের বিশেষজ্ঞ ও বুদ্ধিজীবীদের এ ধরনের কল্পিত উন্নয়ন কাঠামো সম্পর্কে অতি পুলকিত হবার কোনো কারণ রয়েছে বলে মনে হয় না। আন্তঃদৃষ্টি, দূরদৃষ্টি, সমকালীন অভিজ্ঞতা ও দেশের বৃহত্তর স্বার্থ প্রভৃতি দিক বিবেচনা করেই ভাবতে হবে দেশের জন্য, দেখতে হবে দেশের জনগণের ভবিষ্যৎ নিশ্চয়তা প্রদানকল্পে কি করণীয় এবং কোনটি মঙ্গলকর।

এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, উপর্যুক্ত প্রশ্নমালা বা সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ যথার্থ দিক থেকে জাতীয় সংসদে আলোচিত হয় নি, অথচ সরকারের পক্ষ থেকে জাতীয় সংসদকেই বলা হয়, "সকল জাতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু।" এসব বিষয় সরকারি দল– বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের পর্যায়, এমন কি মন্ত্রী পরিষদ পর্যায়ে আদৌ আলোচিত হয়েছে বলে জানা যায় নি। আলোচনা, মতবিনিময় বা ভাবের লেনদেন ছাড়া জাতীয় স্বার্থের স্থায়ী দিক, এমন কি দলীয় স্বার্থও চিহ্নিত করা সম্ভব নয়।

এর চেয়েও বড় কথা, "সুশীল সমাজ"- দেশের সচেতন বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে একেবারে অন্ধকারে রাখা হয় এরূপ এক বিষয়ে যে দেশের ভৌগোলিক স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের হুমকি দেখা দেবে কিনা। যে বিষয় এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে বেশি মনে রাখার কথা তাহলো, উন্নয়ন বা প্রবৃদ্ধির নামে হলেও একটি বৃহত্তর আন্তর্জাতিক সংস্থা সৃষ্টির অর্থ হবে বড় ধরনের আর্থিক বরাদ্দ, যদি দেশের সম্পদে তা কুলায়, এবং একই সঙ্গে আরো প্রয়োজন হবে নতুন–স্বদেশ বহির্ভূত বা অধিরাষ্ট্রিক নিয়ন্ত্রক সংস্থা সৃষ্টি–যার অর্থ দাঁড়াবে সেই উপ-আঞ্চলিক সংস্থার নিকট আনুগত্য, সার্বভৌমত্ব হস্তান্তর বা সমর্পণ করা। একই ধরনের পরিস্থিতিতে বিশ্বের প্রায়, সবদেশেই এরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জাতীয় পর্যায়ে গণভোট বা অন্যূনপক্ষে, সংসদে দু-তৃতীয়াংশ ভোটের মাধ্যমে অনুমোদন লাভ করা হয়ে থাকে। অথচ বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ প্রক্রিয়া নিছক অপ্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হয়। অন্যদিকে গণতান্ত্রিক সরকার থেকে যে স্বচ্ছতা জাতি

www.pathagar.com

গভীরভাবে কামনা করছে এবং যে গতান্ত্রিক জবাবদিহিতার অঙ্গীকার জাতিকে বার বার দেয়া হয়েছিলো তা এখন অলীক বলে মনে হয়।

বহুপাক্ষিক আর্থিক সমর্থন

এটা অবিদিত নয় যে, দক্ষিণ এশীয় উপ-আঞ্চলিক জোটভুক্ত চারটি দেশের-ই মারাত্মক ধরনের আর্থিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই উপ-আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পিত বড় ধরনের প্রকল্পের বাস্তবায়নে তাদের নির্ভরশীল হতে হবে দাতাদেশ বা বহুপাক্ষিক দাতাসংস্থাসমূহের সাহায্যের ওপর। এক্ষেত্রে বাস্তবতা অনেক কঠোর। এর কয়েকটি দিক রয়েছে। বৈদেশিক সাহায্য আজকাল বেশ টানপোড়েন অবস্থায় অথচ এ উপ-অঞ্চলের দেশগুলো তাদের জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন উন্নয়ন খাতে প্রচণ্ডভাবে বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল, বিশেষ করে বাংলাদেশের সম্পর্কে এটা অনেকটা প্রযোজ্য। এমন কি অপেক্ষাকৃত শিল্পোন্নত ভারতও তার অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য বিদেশী সাহায্য নির্ভরশীল। কিন্তু যে-কোনো বিদেশী সাহায্যের সঙ্গে যুক্ত হয় দায়বদ্ধতা। স্বনির্ভরতায় ভারত সরকার অনেক ক্ষেত্রে এ কারণে বিদেশী সাহায্যের বিষয়ে স্পর্শকাতর হয়ে দাঁড়ায়।

এছাড়া, দক্ষিণ এশীয় উপ-আঞ্চলিক জোট বা প্রস্তাবিত উন্নয়ন চতুর্ভুজ ও বিশ্বব্যাংক-এর উত্থাপিত উন্নয়ন ত্রিভুজের মধ্যে ধারণাগত বা দিকদর্শনের ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকার কারণে বহুপাক্ষিক সংস্থাসমূহ আর্থিক সাহায্য প্রদানে এগিয়ে নাও আসতে পারে, বিশেষ করে উন্নয়ন চতুর্ভুজের প্রকল্প যদি তাদের নিজস্ব পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়। এক্ষেত্রে দু'পক্ষের দৃষ্টিকোণ ভিন্নতর হতে বাধ্য। তদুপরি, আঞ্চলিক আধিপত্যে প্রত্যয়ী বৃহৎশক্তি ভারত দাতা সাহায্যে এমননিতেই আগ্রহী অতি সামান্য। তাছাড়া, ভারতের এটা অজানা নয় যে, বিশেষজ্ঞ সমর্থন/আর্থিক সাহায্য যে-কোনো ভাবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার অর্থ হবে অধিকতর বহুপাক্ষিকতা, সুস্থতা ও দায়বদ্ধতা এবং এসবের আরো অর্থ দাঁড়াবে আঞ্চলিক ক্ষেত্রে ভারতের একক কর্তৃত্ব ও প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস পাওয়া। এসব কারণে বহুপাক্ষিক সাহায্য - সহযোগিতা সম্পর্কে ভারত অত্যন্ত সন্দীহান।

উন্নয়ন কূটনীতি ও ভারত প্রসঙ্গ

আন্তর্জাতিক সাহায্য-সহযোগিতার প্রতি প্রতিবেশী বৃহৎশক্তি ভারতের এ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি মনে রেখে উপ-আঞ্চলিক জোট সম্পর্কে নয়াদিল্লীর উদ্দেশ্যাবলির বিশদ পর্যালোচনার অপেক্ষা রাখে। কেননা পূর্বেই উল্লেখ করা

www.pathagar.com

হয়েছে, বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের ধারা এবং নয়াদিল্লী এদেশের সঙ্গে তাঁর নিজস্ব স্বার্থ চরিতার্থতায় যেভাবে সচেষ্ট থাকে তাতে বাংলাদেশে দারুণ ভারত-ভীতি সঞ্চার হয়, প্রশ্নের অবতারণা করা হয় যে ভারতের আসল উদ্দেশ্য কি উপ-আঞ্চলিক উন্নয়নের নামে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশের সুযোগ লাভ এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরভাগকে ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার করে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিদ্রোহ দমনের প্রচেষ্টা চালানো? দক্ষিণ এশিয়ার বিশেষ বিশেষ এলাকায় এই বিদ্রোহ ও বিদ্রোহ দমনের পাল্টা ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আরো মনে রাখা প্রয়োজন যে, আসিয়ানের অধীন থাইল্যান্ডের দক্ষিণের একাংশ ও ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপের উত্তরাংশ নিয়ে গঠিত "উত্তরাঞ্চলীয় উন্নয়ন ত্রিভুজ"-এর আপেক্ষিক ব্যর্থতার জন্য ঐসব এলাকার চলমান বিদ্রোহী তৎপরতাকে দায়ী করা হয়। যুক্তির খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার এই পূর্বাঞ্চলে ভারত যথার্থ-ই উন্নয়নমূলক উপ-আঞ্চলিকতা সম্পর্কে সদ্ভাব পোষণ করে এবং এজন্য প্রয়োজনীয় সহযেগিতা প্রদানেও অঙ্গীকারবদ্ধ হয় তবু ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহে ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে যাওয়া বিদ্রোহ ও পাল্টা-বিদ্রোহ অভিযানের মুখে কিভাবে এ উপ-অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নের প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে? এ পরিপ্রেক্ষিতেই এটা বলা সমীচীন যে, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে নয়াদিল্লীর বর্তমান পাল্টা-বিদ্রোহী অভিযানের সফল সমাপ্তি না হলে বাংলাদেশ সম্ভবত উপ-আঞ্চলিক উন্নয়নের নামে কেবলমাত্র তার শক্তিমান প্রতিবেশী দেশের অভ্যন্তরীণ দ্বান্দ্বিক ঝঞ্ঝাটে অনাহূত জড়িয়ে পড়বে। সমস্যা-জর্জরিত বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিবেশী দেশের এ ধরনের আন্তঃকলহে না জড়ানো শ্রেয় নয় কি? ইতিমধ্যে আসামের 'ঐক্যবদ্ধ আসাম যুক্তফ্রন্টের' নেতা অনুপ চেটিয়ার বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ, তার গ্রেফতার ও বিচার এবং ভারত কর্তৃক তাকে ফেরত পাঠানোর দাবি, এ দাবি পূরণ করা হলে পক্ষান্তরে মুক্তিফ্রন্টের পক্ষ থেকে বাংলাদেশে নাশকতার হুমকি প্রভৃতি এ অঞ্চলে সম্পর্ক বিষিয়ে তোলার উপক্রম করে।

উপরন্তু, বাংলাদেশের জনমতের একটি বিরাট অংশ ভারতের প্রতিশ্রুতির বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দিহান। ব্যাখ্যা হিসেবে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া সমীচীন। বেরুবারীর বদলে তিনবিঘার স্থায়ী ইজারার বিষয় উল্লেখ করা চলে। এ বিষয়ে নয়াদিল্লী প্রথম আওয়ামী লীগ সরকারের আমল থেকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিগত খালেদা জিয়ার সরকারের আমলে বহু তিক্ততার পর স্বাক্ষরিত হয় ঘণ্টাওয়ারী যোগাযোগের ব্যবস্থা। কিন্তু অঙ্গীকার অনুযায়ী স্থায়ী ইজারার বিষয় এখন আর কোনো বিষয়-ই নয়। অভিন্ন ভূ-সীমানা ও নৌ-সীমানা চিহ্নিত করার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ভারতীয় নিরাপত্তা

www.pathagar.com

বাহিনী বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সীমানা সোজাসুজি জেগে ওঠা নতুন কয়েকটি দ্বীপ দখল করে আছে। এ বিষয়ে সুরাহা করার মানসে ভারত আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতা মেনে নিতে চাচ্ছে না, চাচ্ছে না পারস্পরিকভাবে গ্রহণযোগ্য কোনোরূপ সমাধানও।

ইতিমধ্যে, ভারতের ভূ-সীমানাগত সংহতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বাংলাদেশ তার অভ্যন্তরে ভারতের সংহিত বিরোধী কোনো বিদ্রোহীকে আশ্রয় প্রদান না করার অঙ্গীকার করে ; এমন কি জানামতে এ ধরনের সকল বিদ্রোহীকে গ্রেফতারও করে। কিন্তু বিগত দু'দশকেরও অধিককাল অবধি দু'দেশ সরকারিভাবে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও ভারত পার্বত্য বিদ্রোহীদের আশ্রয়, প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে বিদ্রোহী তৎপরতায় ইন্ধন যোগায়, যদিও সরকারি পর্যায়ে নয়াদিল্লী কখনো স্বীকার করে নি যে ভারতে পার্বত্য বিদ্রোহে কোনোভাবে জড়িত রয়েছে।

অস্বচ্ছতা ও সুসম্পর্ক একযোগে কার্যকর হয় না। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। ১৯৯৭ সনের নভেম্বরে নয়াদিল্লী বাংলাদেশের একটি বন্ধুপ্রতিম সরকারকে পার্বত্য বিদ্রোহীদের সঙ্গে জাতীয় স্বার্থবিরোধী একটি 'শান্তি চুক্তি' স্বাক্ষরে প্ররোচিত করে বলে অভিযোগ রয়েছে, কিন্তু এটা অজানা নয় যে বিদ্রোহীদের একাংশ এখনো ভারতে অবস্থান করছে এবং একাংশ 'স্বায়ত্তশাসনের' লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরে ঢুকে ইতিমধ্যেই পুনর্বার নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত হয়েছে।[২৯] অভ্যন্তরীণভাবে বিপন্ন বাংলাদেশ কিভাবে ভারতের সঙ্গে উন্নয়নের নামে উপ-আঞ্চলিক জোটভুক্ত হয়ে একযোগে কাজ করবে?

নিরাপত্তাহীনতায় বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণভাবে বিপন্ন নয় শুধু, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কও প্রকৃত অর্থে বিপন্ন। নয়াদিল্লীতে পালাক্রমে সরকার পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও দু'দেশের সম্পর্কের মৌখিক অভিব্যক্তিতে বন্ধুসুলভ ভাব বজায় রাখার ভাষার অভাব নেই, কিন্তু একই সঙ্গে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নয়াদিল্লীর অভিযোগেরও অন্ত নেই। অভিযোগ বিশেষ করে অব্যাহত রয়েছে ভারতে বাংলাদেশীদের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে। তাই নয়াদিল্লীর পক্ষ থেকে মাঝে-মধ্যে দু'দেশের ভারতীয় সীমানা প্রান্তে কাঁটা তারের বেড়া ও 'ওয়াচ টাওয়ার' প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য শোরগোল শুনা যায়। কালো বাজারের ব্যবসা ছাড়াও দু'দেশের বাণিজ্যে ক্রমবর্ধমান অসমতা বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে চলেছে, এমন কি স্বাবলম্বী অর্থনীতি গড়ার প্রয়াসে এতে বাংলাদেশ হুমকির সম্মুখীন। অথচ এতে ভারত গুরুত্ব দিয়ে কিছু করছে বলে মনে হয় না।

www.pathagar.com

সবচেয়ে প্রকট হচ্ছে দু'দেশের পানি বন্টন সমস্যা। ভারত ও বাংলাদেশ ৫৪ টি নদীর পানির শরিকদার, কিন্তু কার্যত নদীসমূহের উপরিভাগে অবস্থিত ভারত তার অবস্থানের পুরো সুযোগ নিয়ে প্রায় এক তরফাভাবে প্রতিটি নদী থেকে শুষ্ক মওসুমে পানি প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। নদনদীর স্বাভাবিক প্রবাহ থেকে বঞ্চিত নিম্নভাগে অবস্থিত কৃষি প্রধান বাংলাদেশ এতে অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত দিক থেকে বিপর্যস্ত। গঙ্গার পানির প্রবাহ ও ফারাক্কা বাঁধ হচ্ছে দু'দেশের পানি সমস্যার মূর্ত প্রতীক। ফারাকা বাঁধের পরিকল্পনা হয়েছিলো ভারত-পাকিস্তান শত্রুতামূলক সম্পর্কের পটভূমিতে। অথচ এ বাঁধের বাস্তবায়ন হয় বাংলাদেশ-ভারত বন্ধুপ্রতিম ও মৈত্রী সম্পর্ককালে। ১৯৭৪ সনে ভারতীয় নেতৃত্বের ন্যায্য পানির হিস্যা প্রদানের মৌখিক অঙ্গীকার এবং সম্ভবত রাজনৈতিক চাপের মুখে বাংলাদেশের তৎকালীন সরকার কোনো ধরনের চুক্তি ছাড়াই ফারাক্কা সংযোগ খাল খোলাতে সম্মত হয়, কিন্তু অঙ্গীকার অনুযায়ী সেই পানির হিস্যা না পাওয়ার কারণে বাংলাদেশের এক তৃতীয়াংশ এলাকায় দেখা দেয় মরুকরণ, পঙ্গু হয় কৃষি কাজ, লক্ষ লক্ষ লোক হয় বাস্তুহারা। ১৯৯৬ সনের ডিসেম্বরে অনেক উচ্চমার্গের কূটনীতি সহকারে স্বাক্ষরিত হয় ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গা পানি চুক্তি। কিন্তু এ চুক্তি বাস্তবায়নের প্রথম বছরে শুষ্ক মওসুমেই চুক্তি অনুযায়ী পানির হিস্যা না পাওয়ার কারণ হিসেবে সুবিধামত ব্যাখ্যা দেয়া হয় যে, "হিমালয়ের বরফ গলে নি" কিংবা "শুষ্ক বালু পানি খেয়ে ফেলেছে।"[৩০] এ ধরনের বৈধ অঙ্গীকার না রাখা ও বিশ্বাস ভঙ্গের পটভূমিতে উন্নয়ন সম্পর্কের বন্ধন গড়া সম্ভব কি?

শুধু তাই নয়, বাংলাদেশে একটি বন্ধুপ্রতিম সরকার ক্ষমতালাভের পরেও বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় সীমানা প্রান্তের ও বাংলাদেশের বেসামরিক জনগণের বিরুদ্ধে ভারতীয় সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী (Border security Forces বা BSF) সুচালো রণকৌশল প্রয়োগ করে চলছে প্রায় প্রতিনিয়ত, যদিও ঢাকা ও নয়াদিল্লীতে বন্ধুপ্রতিম ভাববিনিময়ে কখনো ভাটা পড়ে নি। এমন কি ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ সীমান্তে পরিখাও খনন করছে, প্রাণ দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষসহ বাংলাদেশ রক্ষী বাহিনীকে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, উন্নয়নের কূটনীতি এর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এগুতে হলে শান্তি ও দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের ব্যবস্থাপনায় সমন্বয় বিধান করতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের সেই সমন্বয় এখনো পরিলক্ষিত হয় নি।

আঞ্চলিক প্রতিক্রিয়া

এবার আঞ্চলিক প্রতিক্রিয়ার প্রসঙ্গে আসা যাক। বিশেষ করে দেখতে হবে যেসব দেশ দক্ষিণ এশীয় উপ-আঞ্চলিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে নি

www.pathagar.com

তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কিরূপ? আঞ্চলিক শক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রত পাকিস্তান নতুন এ সংস্থা সম্পর্কে তার গভীর আপত্তির ভাব ব্যক্ত করে। পাকিস্তান নীতিগতভাবে সার্কের কাঠোমোর মধ্যে উপ-আঞ্চলিক জোট ব্যবস্থার বিরোধিতা করে, কেননা পাকিস্তানী দৃষ্টিকোণ থেকে এ জোটের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়া ভিত্তিক সহযোগিতা দুর্বল করার একটি হীন উদ্দেশ্য কাজ করছে, উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশসহ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এলাকার রাজ্যসমূহ। নেপাল ও ভুটানকে নিয়ে একটি নতুন সামরিক-কৌশলগত বাঁধন সৃষ্টি করা। এভাবে পাকিস্তানে দক্ষিণ এশীয় উপ-আঞ্চলিক জোট সম্পর্কে একটি দৃঢ় প্রত্যয়ের ভাব সৃষ্টি হয় যে, এটি হচ্ছে "সার্ককে ধ্বংস করার নয়াদিল্লীর একটি চাল মাত্র যাতে-এ অঞ্চলে ভারতের অবস্থান জোরদার হয়।"[৩১]

এবার শ্রীলংকার দৃষ্টিভঙ্গির দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। সাম্প্রতিকালে ভারত-শ্রীলংকা সম্পর্ক "চমৎকার" রূপ পরিগ্রহ করে। বস্তুত, দু'দেশের সম্পর্ককে কলম্বো বর্তমানে সর্বকালের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত বলে মনে করছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও উপ-আঞ্চলিক জোট সম্পর্কে কলম্বোর বক্তব্য অতি সুস্পষ্ট। কলম্বোর অনুভূতি হচ্ছে এরূপ ঃ "সার্কভুক্ত যে-কোনো দু'টি দেশ যথার্থ-ই দ্বি-পাক্ষিক ব্যবস্থায় সম্মত হতে পারে। কিন্তু চারটি সার্কভুক্ত দেশ যখন উপ-আঞ্চলিক ব্যবস্থায় সংযুক্ত হয় এতে আঞ্চলিক সংগঠনের ভিত দুর্বল হবে।" শ্রীলংকার সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ সুস্পষ্টভাবে জানায় যে, উপ-আঞ্চলিক জোট গঠনের ফলে সার্ক দুর্বল হবে না, বরং সার্কের চেতনা আরো উজ্জীবিত হবে–বাংলাদেশের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত এ ধরনের বক্তব্য গ্রহণ করা কলম্বো কঠিন বলে মনে করে। তাই শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গে পাকিস্তান ও মালদ্বীপের নেতৃবর্গের প্রতি সমর্থন দিয়ে একই সুরে জানায় যে, উপ-আঞ্চলিক জোট প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে আঞ্চলিক সংগঠন প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হবে। বিষয়টি শ্রীলংকার একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ব্যাখ্যা করেন এভাবে, "আমাদের বিশ্বাস যে, উপ-আঞ্চলিক জোট সার্কের কর্মকাণ্ডে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে, কেননা এই উপ-আঞ্চলিক সংস্থার সদস্যবর্গ সেই জোটের প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নের সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করবে, ফলে গুরুত্ব হারাবে সার্কের কর্মকাণ্ড।"[৩২]

সংজ্ঞাগতভাবে দক্ষিণ এশিয়ার অংশবিশেষ না হলেও এ বিষয়ে চীনের মতামতও প্রণিধানযোগ্য। কেননা চীন এই ধরনের অভিমত পোষণ করে যে, দক্ষিণ এশীয় উপ-আঞ্চলিক জোটভুক্ত দেশগুলো ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় কোনো সহযোগিতামূলক প্রকল্প হাতে নিলে চীনকে অন্তর্ভুক্ত না করে এর বাস্তবায়ন কঠিন হবে। বাংলাদেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নে চীন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ১৯৮০-র দশক থেকে। দু'দেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কও বেশ

www.pathagar.com

ঘনিষ্ঠ। ভূ-কৌশলগত কারণে নেপালেও চীনের আগ্রহের ঘাটতি নেই। বস্তুত, হিমালয়ের ঐ প্রান্তে অবস্থিত সুবিশাল দেশ ও একটি উঠতি পরাশক্তি হিসেবে হিমালয়ের এ প্রান্তে কি ঘটছে সেই ব্যাপারে চীন আগ্রহী না হয়ে পারে না। অবশ্য চীন মনে করে যে, উপ-আঞ্চলিক জোট এখনো ধারণাগত পর্যায়ে রয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট দেশগুলো এর পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়ার পূর্বে বার বার ভাবা উচিত যে, কতখানি তারা এ সংস্থার মাধ্যমে লাভবান হতে পারে। কিন্তু চীনের বক্তব্য থেকে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না যে, এ বিষয়ে চীনের আগ্রহ বেশ গভীর। ঢাকাস্থ চীনের রাষ্ট্রদূতও তাঁর দেশের বক্তব্য তুলে ধরেন এভাবে, "সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি আমরা ঘনিষ্ঠভাবে প্রত্যক্ষ করছি। ঘটনাপ্রবাহ সত্যিকার অর্থে কোন দিকে মোড় নিচ্ছে আমরা বুঝতে পারছি না।"[৩৩]

পরিবর্তনশীল উপ-আঞ্চলিক কূটনীতি

উপ-আঞ্চলিক কূটনীতির শুরু থেকে বর্তমানকাল অবধি এ সম্পর্কিত বাংলাদেশের সরকারি ভাষ্য বোঝা দায়। এর কারণ সরকারি অবস্থানের পরিবর্তনশীল রূপ। প্রায়শ বিপরীতধর্মী কূটনৈতিক ইঙ্গিত। ফলে মুশকিল বোঝা যে উপ-আঞ্চলিক ধারণা কি সার্কের ভেতর না বাইরে বাস্তবায়িত হতে চলছে। উপ-আঞ্চলিক জোটের প্রকৃত কাঠামোগত যোগসূত্র বা সংযোগ সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকার পরস্পরবিরোধী বক্তব্য রেখে আসছে। বেশ কিছুকাল ঢাকায় সরকারি বক্তব্য ছিল একইরূপঃ সার্ক সনদের সপ্তম ধারায় সার্কের আওতায় উপ-আঞ্চলিক জোট গঠন করা যেতে পারে। কিন্তু পাকিস্তানসহ উপ-আঞ্চলিক জোট বহির্ভূত অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া জানার পর উপ-আঞ্চলিক জোট যে সার্কের আওতাধীন বলা হচ্ছিল সেই ধরনের বক্তব্য থেকে বাংলাদেশে স্পষ্টতই তার অবস্থান পরিবর্তন করে। মালে সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের পূর্বাবধি বক্তব্য রাখা হচ্ছিল যে, দক্ষিণ এশীয় উন্নয়ন চতুর্ভুজ গঠিত হয়, সার্কের বাইরে ; কিন্তু মালে শীর্ষ সম্মেনের পর থেকে আবার বলা হচ্ছে যে সার্ক সনদের আওতায়-ই গঠিত হচ্ছে দক্ষিণ এশীয় উন্নয়ন চতুর্ভুজ।

এ ধরনের বিবর্তনশীল, পরস্পরবিরোধী বক্তব্যে এমন কি নেপালের মতো দেশও খানিকটা বিভ্রান্ত হয়, যদিও বাংলাদেশের সঙ্গে নেপালও দৃশ্যত হচ্ছে উন্নয়ন চতুর্ভুজ-এর সহ-উদ্যোক্তা। বাংলাদেশের মতো নেপালেও উপ-আঞ্চলিক জোটের গঠনের প্রক্রিয়াগত স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্নের অবতারণা করা হয়। কাঠমুণ্ডুতে সার্কে আগ্রহী জনৈক পর্যবেক্ষক বলেন, "আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর স্পর্শকাতরতায় আঘাত না হেনে যদি উপ-আঞ্চলিকতার ভিত গড়ে তুলতে হয় তাহলে পূর্ণ স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা বিধান করা প্রয়োজন। তা' না

www.pathagar.com

হলে সার্কের মাধ্যমে অঞ্চলব্যাপী অতি সযত্নে সহযোগিতার যে চেতনা সঞ্চার হয়েছে সেটাই ধূলিসাৎ হবে।"[৩৪]

দৃশ্যত দক্ষিণ এশীয় উন্নয়ন চতুর্ভুজ সম্পর্কে ভারত তেমন উচ্চবাচ্য করছে না ; ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রধানত দিয়ে আসছে এই উপ-আঞ্চলিক জোটের দুই ক্ষুদ্রতর মিত্র দেশের নেতৃবর্গ। সরকারি পর্যায়ে নয়াদিল্লীতে বাজপেয়ী ক্ষমতা আসা অবধি ভারতের অভিমত ছিল চার জাতি সমন্বয়ে গঠিত উপ-আঞ্চলিক জোট হচ্ছে কেবল কতকগুলো নির্দিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন। এ ধরনের বক্তব্য অবশ্য সার্ক সনদের পরিপন্থী নয়। ভারত ইতিমধ্যে এরূপ মন্তব্যও করে যে, দু'বা ততোধিক সার্ক সদস্য কোনো ধরনের উপ-আঞ্চলিক জোটে সংযুক্ত হলে বা গঠন করলে তাদের উচিত হবে অন্যান্য সদস্যদের এ সম্পর্কে অবহিত রাখা। নয়াদিল্লীর এ জাতীয় মতামত শ্রীলংকার এ সম্পর্কিত অবস্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বিভিন্ন প্রকারের মতামতগুলো বেরিয়ে আসে সার্কের পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলনের পর্যায়ে। পাকিস্তান, মালদ্বীপ এবং শ্রীলংকা উপ-আঞ্চলিক জোট সম্পর্কে আপত্তি জানানোর পর ভারত এ সম্পর্কে তার নিজস্ব অবস্থানের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে এবং পরে শ্রীলংকার প্রস্তাব অনুযায়ী একটি সমঝোতা ফর্মুলা গৃহীত হয়। মালে সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে সেই সমঝোতাই অনুমোদিত হয়। বর্তমানে দক্ষিণ এশীয় উন্নয়ন চতুর্ভুজ সার্ক সনদের অনুমোদনযোগ্য সীমারেখার মধ্যে থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে। যেটা এখনো বুঝা যাচ্ছে না তাহলো এ ফর্মুলা কি ঐ সময়ে পাকিস্তানের স্পর্শকাতরতাকে তুষ্ট রাখার জন্যই গৃহীত হয়েছিলো? এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে যে, নয়াদিল্লীতে তদানিন্তন যুক্তফ্রন্ট কোয়ালিশন সরকারের আমলে ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে উন্নততর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শান্তি সংলাপ চালিয়ে আসছিলো এবং সম্ভবত উপ-আঞ্চলিক জোট সম্পর্কিত সার্ক ভিত্তিক সমঝোতা সেই প্রক্রিয়ার-ই অংশবিশেষ ছিল।[৩৫] অবশ্য উপ-আঞ্চলিক জোটের মূল সমস্যা এখানে নয়, সমস্যা হচ্ছে উন্নয়ন চতুর্ভুজের অভ্যন্তরেই। এখনো এটা স্পষ্ট নয় যে, কোনো সুনির্দিষ্ট প্রকল্পে জোটভুক্ত চারটি দেশ অভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনে সম্প্রীতি সহকারে একযোগে কাজ করতে পারে– যাতে তাদের নিজ নিজ মনস্তাত্ত্বিক প্রত্যক্ষজ অনুভূতি তিক্ততার দিকে না যায়, যাতে একে একে অপরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিরূপ প্রশ্নের অবতারণা করতে না পারে।

প্রকৃত প্রস্তাবে যা' বুঝানো হচ্ছে তা' হলো, দক্ষিণ এশীয় উন্নয়ন চতুর্ভুজের উত্থাপন ও বাস্তবায়ন পক্রিয়ায় প্রতিটি পদক্ষেপ মনে হবে সাময়িক ভিত্তিক ; কোনোরূপ দূর ভিত্তিক পরিকল্পনা বা দিকদর্শনের অভিব্যক্তি এতে রয়েছে বলে মনে হয় না। তদুপরি, বিভিন্ন দেশের জনমতকে এর সঙ্গে

www.pathagar.com

সম্পৃক্ত করার কোনো ধরনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। বিশেষ করে, বাংলাদেশে জনমতের পর্যায়ে জাতীয় স্বার্থ চিহ্নিতকরণ ও অর্জনে দ্বিধাবিভক্ত জনমতকে সম্প্রীতিমূলকভাবে সুসংহত করতে হবে, জনগণকে অবশ্য আশ্বস্ত করতে হবে যে বাংলাদেশসহ প্রতিবেশী দেশগুলোর ঐশ্বর্য ভারতের ভাগ্য-ভবিষ্যৎ থেকে অবিচ্ছিন্ন। অনুরূপভাবে, প্রকৃতি ও পরিবেশের বন্ধন এসব দেশে এতখানি প্রবল যে জনগণের অনুভূতিকে জয় করার উদ্দেশ্যে এরূপ যুক্তিরও অবতারণা করা যেতে পারে যে, "দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষুদ্রতর দেশগুলির কোনোটাই প্রকৃত অর্থে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উন্নতি লাভ করতে পারে না, যদিও তাদের প্রত্যেকটি কোনো না কোনো ভাবে ভারতের নেতিবাচক ভরাডুবিতে অবদান রাখতে পারে।"[৩৬]

মোট কথা, রাজনৈতিক-সীমানাগত বিভাজনের উভয় পার্শ্বে জনমতকে উন্নয়ন চতুর্ভুজের সুফল সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে আশ্বস্ত করতে হবে, জনমতকে এভাবে সমাবেশ করতে হবে যাতে সকলের প্রত্যয় হয় যে এ ধরনের উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে সকলেই লাভবান হবে।

উপ-আঞ্চলিক সংহতি গড়ার বিষয় সম্পর্কে যত সহজে বলা হয়েছে কাজটি তত সহজে তা অর্জন সম্ভব নয়। বরং রাজনীতিক ও নীতি-নির্ধারকদের জন্য এ হচ্ছে এক কঠিন পরীক্ষামূলক কাজ, উভয় সংকটমূলক অবস্থা। বস্তুত, এক্ষেত্রেই দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতির মোকাবিলায় তাঁদের কলাকৌশলের নৈপুণ্যের পরিচয় মেলবে। বুঝা যাবে যে, একটি ধারণা জন্ম দিয়ে বা সংস্থার রূপরেখা প্রণয়ন করে তাঁরা জনমতকে কি করে এর সঙ্গে আবদ্ধ করতে পারেন — যাতে জনমতে এর সম্ভাবনা সম্পর্কে স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগ জন্মে এবং একই সঙ্গে স্বল্পমেয়াদি দৃষ্টিকোণ থেকে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি না হয়। এসব বিষয়ে মনে রাখা প্রয়োজন যে, এ অঞ্চলের জনগণের দাবি হচ্ছে সামাজিক ন্যায়বিচার ও উন্নয়ন। তাদের এ ধরনের আশা-আকাঙ্ক্ষার সম্পূরণে নিঃসন্দেহে প্রয়োজন হচ্ছে বৃহত্তর পরিমণ্ডলে সহযোগিতা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে সুফল অর্জন লাভকল্পে সময়ের ব্যাপ্তিতে অধিককাল ধৈর্যধারণ। স্পেস ও সময়ের দ্বি-বিভাজনে জাতি-রাষ্ট্র তার সার্বভৌমত্ব এবং এর সীমাবদ্ধতা নিয়ে দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হয় ; একদিকে থাকে জনপ্রিয়তার চাপ এবং অন্যদিকে রয়েছে দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের আবশ্যকতা।[৩৭] এক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের নেতৃত্বের প্রসঙ্গই এসে পড়ে ঃ স্বল্পকালীন স্পর্শকাতরতা ও দীর্ঘমেয়াদি হিসেবপত্রের মধ্যে সমন্বয় বিধান করার বিষয়ে নেতৃত্বের ভূমিকা মুখ্য বলে প্রতীয়মান হয়।

www.pathagar.com

উপসংহার

স্নায়ুযুদ্ধ উত্তরকালীন বর্তমান যুগ হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সহযোগিতামূলক নিরাপত্তা অন্বেষণের যুগ। নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নের লক্ষ্যই হবে তাই বাংলাদেশের জন্য নিশ্চিতভাবে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে এ ধরনের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব? আঞ্চলিক শান্তি কিংবা উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা অর্জনের লক্ষ্যে বিস্মৃত হতে হবে যদি যথার্থ রাজনৈতিক দক্ষতা ও কূটনৈতিক নৈপুণ্য সহকারে এ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য প্রয়াসী না হওয়া যায়। উপ-আঞ্চলিক উন্নয়নের লক্ষ্য প্রয়াসী হতে হলে বাংলাদেশসহ প্রতিটি দেশকে এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে সমঝোতা অর্জন করতে হবে। কেননা অভ্যন্তরীণভাবে রাজনৈতিক শূন্যতার ওর আঞ্চলিক সংহতি কিংবা উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার ভিত্‌ গড়ে উঠতে পারে না[৩৮]—জাতীয় পর্যায়ে সমঝোতার অভাব থাকা রাজনৈতিক শূন্যতার-ই শামিল।

বস্তুত, জাতীয় সমঝোতা ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়, এবং জাতীয় সমঝোতা ছাড়া "উন্নয়ন" সংস্থায় তৎপর হওয়ার অর্থ হবে আরো বিভাজন সৃষ্টি। ফলে যে উদ্দেশ্য সাধনে এ ধরনের সংস্থা সৃষ্টি করা হচ্ছে সেই উদ্দেশ্য অধিকতর বানচাল হতে বাধ্য। তাই উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনোরূপ সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ বা উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা জোরদারকল্পে কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হলে সরকারের পক্ষ থেকে একরোখা দৃষ্টিভঙ্গির ধারা পাল্টাতে হবে, জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বশীল রাজনৈতিক দলসমূহকে নিয়ে জাতীয় পর্যায় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে উপ-আঞ্চলিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনমনে আস্থা স্থাপন করতে হবে।

একইভাবে আঞ্চলিক পর্যায়েও সমঝোতা অপরিহার্য। কেননা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে প্রচলিত রাজনৈতিক প্রভাবের ধারায় উপচেপড়া প্রবণতা বর্তমান। ফলে উপ-আঞ্চলিক উন্নয়ন চতুর্ভুজ যতই মহৎ উদ্দেশ্যের দিশারী বলে উপস্থাপিত হোক না কেন আঞ্চলিক রাজনীতির কলুষতা একে স্পর্শ করতে পারে। অবশ্য বর্তমানকালে বিশ্বব্যাপী "সহযোগিতামূলক নিরাপত্তা" গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটি গতিধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে সার্কের ভেতর ও বাইরে সকল ধরনের সম্পর্কের যোগসূত্র ও সহযোগিতার পরিধি অধিকতর বিস্তৃত ও গভীরতর করা বাঞ্ছনীয় বলে প্রতীয়মান হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য যে অন্বেষা চলছে তা বস্তুত সার্বিক নিরাপত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত। আসিয়ানভুক্ত পার্শ্ববর্তী দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর অনুন্নয়নজনিত সমস্যাবলি মোকাবিলায় তাদের অভিজ্ঞতা এবং তাদের ধারণকৃত "পারস্পরিক নির্ভরশীল উন্নয়ন" ঐ অঞ্চলে এরূপ ধারণার প্রয়োগ প্রভৃতি সার্কভুক্ত দেশগুলোর জন্য পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ভিত্তিক

www.pathagar.com

গতিশীল সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় অনুকরণীয় মডেল হিসেবে প্রেরণা যোগাতে পারে। তবে দু'অঞ্চলের ভিন্নতর অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতও মনে রাখতে হবে।

এরপর প্রসঙ্গ হচ্ছে সহযোগিতার কাঠামো। সার্ক সনদে উল্লেখিত (৭ নম্বর ধারা) বিশেষ 'বাস্তবায়ন কমিটি' (Action committee) এবং প্রকল্পভিত্তিক কার্যক্রমই (Project-wise approach) মনে হয় সঠিক পন্থা। তত্ত্বীয় পর্যায়ে এটা ব্যবহারিক/নব্য-ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণের সমন্বয় ঘটাবে এবং সার্ক সনদে সেই দিকনির্দেশনা-ই রয়েছে। একইরূপে এ প্রক্রিয়া সম্ভাব্য ভিন্নমতাবলম্বী বা বিনষ্টকারীদের গঠনমূলকভাবে সক্রিয় হতে সহায়ক হবে। একই লক্ষ্যে, দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা চলে যে, দক্ষিণ এশীয় উন্নয়ন চতুর্ভুজের কোনো কোনো উন্নয়ন প্রকল্পে পাকিস্তানের বেসরকারি খাতকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা যেতে পারে, দেখতে হবে কিভাবে ভারত ও পাকিস্তানের সাম্প্রতিককালীন উত্তেজনা-সীমান্ত সংঘর্ষের পরিধি অতিক্রম করে, প্রশমিত উত্তেজনা এবং সংলাপের প্রক্রিয়াকে ইতিবাচক ফলপ্রসূভাবে কাজে লাগানো যায়– যাতে ইসলামাবাদে এ ধরনের কোনোরূপ অনুভূতি সঞ্চার না হয় যে ইচ্ছামূলকভাবে পাকিস্তানকে বাদ দেওয়া হচ্ছে বা দূরে রাখা হচ্ছে। আঞ্চলিক সমঝোতার পূর্ব হিমালয় উপ-অঞ্চলে যে-কোনো সফল উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে একই লক্ষ্যে তা' একই ধরনের সহযোগিতার চেতনায় জম্মু ও কাশ্মীর উপত্যকায়ও অনুকরণ করা যেতে পারে। অবশ্য তা মোদ্দাভাবে নির্ভর করবে ভারত-পাকিস্তানের সংলাপ কোন পর্যায়ে উত্তরণ ঘটেছে। ধারণাগত দৃষ্টিকোণ থেকে, দক্ষিণ এশীয় জনগণের ভবিষ্যৎ ভাগ্য, শান্তি ও উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় সহযোগিতামূলক নিরাপত্তার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে সঠিক পন্থা এ রূপরেখায় নিহিত।

এরপর উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে কি ধরনের সুনির্দিষ্ট প্রকল্পে উন্নয়নমূলক সহযোগিতা হতে পারে সে প্রসঙ্গে আসা যাক। পূর্ব হিমালয় উপ-আঞ্চলিক জোটের চারটি সরকার সহযোগিতা শুরু করতে পারে পানি সম্পদ উন্নয়ন ও বন্টন থেকে। প্রকৃত প্রস্তাবে, এর ভিত্তিও তৈরি হয়েছে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর পারস্পরিক পানি চুক্তি থেকে। এসব চুক্তি অবশ্যই অভিযোগ বা ত্রুটিমুক্ত নয়, কিন্তু তা' সত্ত্বেও পর্যায়ক্রমে সমঝোতা ও সহযোগিতার পরিধি যতই বৃদ্ধি পাবে ততই অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহ সঞ্চার হবে। আন্তর্জাতিক দাতা-দেশ ও সাহায্য সংস্থাগুলো সে ক্ষেত্রে উপ-আঞ্চলিক উন্নয়ন সমর্থন প্রদানে প্রকৃত অর্থে উৎসাহিত হবে।

কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, পানি সম্পদ উন্নয়ন যদিও গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত এবং বেসরকারি সংস্থাগুলোও এ বিষয়েই সহযোগিতার ওপর জোর দিয়ে আসছে, তবু নতুন উপ-আঞ্চলিক সংস্থার ধারণায় এ বিষয় অগ্রাধিকার

www.pathagar.com

লাভ করে নি। পারস্পরিকভাবে সম্মত ধারণাপত্রে রয়েছে মহিলা ও শিশু পাচার, সীমান্ত বাণিজ্য ও চোরাকারবারি, পরিবেশগত দূষণ ও নদী শাসন, উপ-অঞ্চল পর্যায়ে বিদ্রোহ ও সন্ত্রাস দমনের মতো অভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি।[৩৯] বলা প্রয়োজন যে, এ সবের মধ্যে কিছু কিছু হচ্ছে বিতর্কিত বিষয়, বিশেষ করে শেষোক্ত বিষয়টি রাজনৈতিক ভাবদুষ্ট-উন্নয়নের কর্মসূচি সম্পর্কিত নয়– এবং স্বাভাবিক কারণে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোতে রাজনৈতিক বিতর্কের ঝড় সৃষ্টি করতে পারে – যা' উন্নয়ন পক্রিয়ার পক্ষে অনুকূল নয়।

উপ-অঞ্চল কিংবা অঞ্চল যে কোনো পর্যায়ে দক্ষিণ এশিয়ায় সহযোগিতার অনুকূল পরিবেশ নির্ভর করছে আন্তরিকতাপূর্ণ কূটনৈতিক পরিচর্যার ওপর। এর জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রপ্রজ্ঞাসুলভ নেতৃত্বের। এর সঙ্গে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে আরো প্রয়োজন অব্যাহত সদিচ্ছা ও নিরবচ্ছিন্ন আস্থার পরিবেশ ; একই ধরনের উপাদানের সমন্বয় ঘটাতে হবে যুগপৎভাবে আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে। অথচ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রায়শ এসব উপাদান বিবেচনায় রাখা হয় না। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, রাজনীতির অপরিণামদর্শী ধারা এবং নেতৃত্বের অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত প্রকৃত সহযোগিতার আশা নিরর্থক করে চলছে।

বাংলাদেশের সহযোগিতা দৃষ্টিকোণের প্রসঙ্গে আবার আসা যাক। বাংলাদেশ আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে সহযোগিতার ক্ষেত্রে তার "যুগপৎ উদ্যোগ" নিয়ে গর্ব করে আসছে, কিন্তু এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, লাভ-লোকসান প্রভৃতি সম্পর্কিত রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধি ও কার্যকারিতা সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্নের অবতারণা করা যেতে পারে। বাংলাদেশ সরকার অতি দ্রুত পর পর তিনটি সহযোগিতা সংস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়–এগুলোর হচ্ছে, উন্নয়ন চতুর্ভুজ, বিস্টেক/বিমস্টেক, এবং পরিশেষে ডি-৮। অতি সম্প্রতি 'আইওরার্ক' এর সদস্য পদও লাভ করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যুগপৎ, দু'বার- এমন কি আঞ্চলিক সংগঠনসহ বাংলাদেশ তিনচার বারও একই রাষ্ট্রের সঙ্গে সদস্যপদ লাভ করেছে। তদুপরি আবার ভারত ও পাকিস্তানকে নিয়ে ত্রিপক্ষীয় ব্যবসায়িক শীর্ষ পর্যায়ের বৈঠক ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার প্রয়াস চলছে। অথচ এ ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনের প্রক্রিয়া থেকে সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশকে বাদ দেয়া হয়েছে, যদিও মালে' অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০০১ সালের মধ্যে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়াতেই 'মুক্ত বাণিজ্য এলাকা' (সাফটা) গড়ে তোলার কথা। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের উপ-আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক কূটনীতিতে দূরদর্শিতা ও দিকদর্শনের অভাব রয়েছে বলে মনে হয়। দেশের উন্নয়ন কূটনীতিতে এমন কি বিভ্রান্তিও পরিলক্ষিত হচ্ছে।

www.pathagar.com

বস্তুত, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারকবৃন্দ বর্তমানে একই সঙ্গে চ্যালেঞ্জ এর সম্মুখীন এবং সুযোগ প্রত্যাশী পররাষ্ট্র নীতির চাল ও কূটনৈতিক নৈপুণ্য দিয়ে তাঁদের এখন দেখাতে হবে যে কিভাবে তারা সেই চ্যালেঞ্জ-এর মোকাবিলা করছেন, সম্ভাব্য সুযোগের সদ্ব্যবহার করে কিভাবে জাতীয় প্রত্যাশা পূরণ করছেন। এটা দেখবার মতো যথার্থ-ই একটি দৃশ্যমান বিষয় যে, বাংলাদেশ ভারত মহাসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থার সদস্যপদসহ এতোগুলি আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সংগঠনে সক্রিয় ভূমিকা ও স্পন্দমান কর্মকাণ্ড কিভাবে অব্যাহত রেখে চলবে। অবশ্য সরকার অব্যাহতভাবে তার বহুমাত্রিক উন্নয়ন কূটনীতি সগৌরবে প্রচার করে চলছে। এতে উত্তরোত্তর আশার সঞ্চার হচ্ছে অনাগত ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্পর্কে। এসবে প্রশ্নের উদ্রেক হয় শুধু দেশে নীতি নির্ধারক, রাজনীতিক ও কূটনীতিকবৃন্দ সর্বাগ্রে দেশের স্বার্থ সুনিশ্চিতকরণে কতখানি বদ্ধপরিকর?[৪০]

এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর যাই-ই হোক, বাংলাদেশকে শিখতে হবে অন্যান্য দেশের উন্নয়নমূলক সহযোগিতা, আঞ্চলিকতা ও উপ-আঞ্চলিকতার অভিজ্ঞতা থেকে। সেই অভিজ্ঞতা এরূপ দিক-নির্দেশনা দেবে যে, বাংলাদেশের সঙ্গে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর উন্নয়নের পল্লবিত কূটনীতি একমাত্র তখনই সঞ্চালিত ও সুতীব্র হতে পারে যখন বহুবিধ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সমন্বয় ঘটবে, গড়ে তোলা হবে সম্প্রীতি ও সমঝোতা। জাতি যখন দ্বিধান্বিত, নিয়তির যথার্থ ধারণা থেকে জাতি মনে হয় প্রবঞ্চিত বরং ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসে এরূপ একটি রাষ্ট্রের যার উদ্দেশ্যাবলি সন্দেহের উদ্রেক ঘটায় ; দেশের রাজনৈতিক পরিণতি তখন হতে পারে ভয়াবহ নেতৃত্ব যদি উন্নয়নের নামে এমন কূটনীতিতে প্রবৃত্ত হয় যা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

বাংলাদেশকে আঞ্চলিকতার বিষয়ে নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথাও ভুললে চলবে না। সার্ক মুখ্যত গঠিত হয়েছিলো বাংলাদেশের উদ্যোগেই। সেই সার্কভিত্তিক আঞ্চলিকতার ক্ষেত্রে গতিময়তা প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় বৃহত্তম আঞ্চলিক শক্তির একদেশদর্শী মনোভাব ; উপ-আঞ্চলিকতার ক্ষেত্রেও সেই অপ্রতিসম আশা-আকাঙ্ক্ষাই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে। বাংলাদেশের মতো জনবহুল অথচ ক্ষুদ্রদেশের উন্নয়ন কূটনীতির অবশ্যই হতে হবে জনগণের প্রতিসম আশা-আকাঙ্ক্ষা ভিত্তিক--উন্নয়নের ক্ষেত্রে তা' হবে প্রতিসাম্য-উন্নয়ন প্রমুখ নীতি ভিত্তিক্য ব্যবসায়িক লেনদেন, যোগাযোগ-ট্রানজিট, পরিবেশের ভারসাম্যবিধান, পানির প্রবাহ বৃদ্ধি ও পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রকল্প গ্রহণ বা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উন্নয়ন কূটনীতি উপর্যুক্ত নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত হবে এটাই কাম্য ও স্বাভাবিক।

www.pathagar.com

তথ্যনির্দেশ

১. এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট লেখকের ইংরেজিতে লেখা প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে "SADT and the Politics of Subregionalism in South Asia." *The Daily Star* (12 May 1997) P.S ; "Growth Diplomacy or Shomanship?" *The Envoy*, No. 2 (1997) ; "Growth Structure : Politics of Subregionalism in Bangladesh," (paper presented at the ISAB Seminar, Dhaka, July 1997); "SAARC Subregionalism and Bangladesh Foreign policy, " *Spotlight on Regional Affaris* (Islamabad), (September 1997); *Regional studies* (Autumn 1997).

২. দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিকতা ও উপ-সিস্টেম সম্পর্কিত লেখকের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, "আঞ্চলিকতা, সিস্টেম তত্ত্ব ও দক্ষিণ এশিয়া" (দশম অধ্যায়) আবুল কালাম, *আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ঃ তত্ত্বীয় ও বাস্তব রূপ* (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯০).

৩. James H. Laue, "Contributions of the Emerging Field of Conflict Resolution, " in W. Scott Thompson, and Kenneth M. Jensen (eds), *Approaches to Peace : An Intellectual Map* (Washington, D.C. ; United institute of peace, (1991), পৃ. ৩০১

৪. Ernst B. Haas, The Uniting of Europe : Political Social and Economic Forces 1950-1957 (Stanford : Stanford University Press, 1985) : Ernst B. Haas and Philippe C. Shcmitter, "Economic and Differential Patterns of Political Integration : Projections About unity in Latin America, " *International Organization*, Vol. XXIII. No. 3 (Winer 1969); Roger D. Hansen, "Regional Integration : Reflections or a Decade of theoretical efforts, " *World Politics*, Vol. XXi, No. 2 (January 1969), পৃ. ২৪২-২৪৭; Philippe Scmitter, "Three Neo-Functional Hypothrses About International Intergration, " International Organization, Vol. 13, No. 4. (1964).

৫. The White House, *A National Security Strategy of Engagement and Enlargement* (Washington, D.C. U.S. Government Printing office, February 1996); also Estrella Solidum, *Bilateral Security in ASEAN* (Manila : Foreign Service Institute, 1983), পৃ. ১.

www.pathagar.com

৬. এ বিষয়ে বাংলাদেশের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য, Bangladesh Institute of International and Stratigic Studies, *ASEAN Experiences of Regional and Inter-regional Co-operation : Relevance for SARRC* (Dhaka : BIIss, September 1998) : Ashraful Hasan and Zius Shams, "Interdependent Development Bangladesh, SAARC and ASEAN, "

South Asian Perspective, No. 2 (May 1998), পৃ. ২৩-২৪.

৭. Hasan and Shams, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১; Bangladesh Institute of International And Strategic Studies, প্রাগুক্ত.

৮. Sridhar K. Khatri, SAARC and ASEAN, A Comparative Study. A paper presented at a seminar on 'SAARC : Refrospect and prospect', sponsored by the Centre for Nepal and Asian Studies, Tribhuvan University, Kathmandu (October, 19-20, 1987), পৃ ঃ ৫২-৫৩.

৯. *ASEAN Update* (1995), পৃ. ৪-৬, ১৫-১৬.

১০. V. Jayanath, "For Security and Growth : The Fifth ASEAN Summit, " *Frontline* (26 January 1996), also his " A Dialogue Partner," *Frontline* (26 January 1996) পৃ. ৪৩.

১১. *ASEAN Update* (1995), পৃ. ৫.

১২. R.A. Scalapino, Tang, Thant and Marty এবং The Economist London, নেয়া। দ্রষ্টব্য Mohammad Humayun Kabir, Research Paper on "Growt riangles in ASEAN : Relevance for Sub-regional Co-operation in South Asia, " Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, (October-December 1997) (Draft , mimeo), পৃ. ৮).

১৩. ঐ. পৃ. ১০.

১৪. N. Genesan, "Rethinking ASEAN as a Security Community in Southeast Asia, "Asian Affairs, An America, Review, Vol. 21, No. 4. (Winter 1996) পৃ. ২২০- ২২১) আসিয়ানের "উন্নয়ন ত্রিভুজ" সম্পর্কিত আরো কিছুকাল পূর্বের দৃষ্টিকোণ ব্যাখ্যার জন্য দৃষ্টব্য। Pushpa Thambibillai, "The ASEAN Growth Triangle" The Convergence of National and Sub-National Interest, Contemporary Southeast Asia. (December 1991).

১৫. দ্রষ্টব্য, B.G. Verghese, *Waters of Hope: Integrated Water Resource*

www.pathagar.com

Development and Regional Co-operation within the Himalayan-Ganga-Brahmaputra-Barak Basin (New Delhi ; Oxford and IBH Publication Co., 1993) ; Q.K. Ahamad, B.G, Verguhe, Ramaswamy R. Lyer, B.B. pradhan, S.K. Malla (eds) , *Converting Water Water into Wealth* (Dhaka : Academic Publishers, 1994); Q. K. Ahmad, Nilufar Ahmad and K.B. Sajjadur Rasheed (eds), *Resources, Environment and Development in Bangladesh : With particular Reference to the Ganges, Brahmaputra and Meghna Basins* (Dhaka : Academic Publishers, 1994).

১৬. Amanullah, "Controverses dog regional grouping idea," *Holiday* (Dhaka), (9 May 1997), পৃ. ৮.

১৭. উদ্ধৃত, "Environmentalism in South Asia : Building a Shared Water community in the Eastern Himalayan Region", BIIS Journal, Vol. 17, No. 4 (1996), পৃ. ৫৩৩.

১৮. Professor Muhammad Maniruzzaman Mia, "One Year of India-Bangladesh Relations, "Bhorer Kagaz (Bengali), (23, June 1997)

১৯. M. Anwarul Haq," Dhaka preparing concept paper or sub-regional grouping," *The Daily Star* (Dhaka) (6 February 1997), পৃ. ২.

২০. Hasian- Gowdajoint press Conference : Teesta next focus, JEC Takes up transit issue in March , "The Daily Star (8 January 1997),

২১. PM at graduation ceremony of dscsc : Govt wants sub-regional economic cooperation, " , "The Daily Star (30 January 1997), পৃ.১, "Primes Minister Warms Bye-elections if BNP MPs fail to return to Js in 90 days, "The Daily star (11 Janurary 1997); "Sub-regional grouping to boost trade among 4 SAARC States : PM. The Daily Stary (9 January 1997)

২২. "Sub-reginal grouping a move to destroy SAARC : Khaleda, "The Daily Star (8 January 1997)

২৩. "Plan for sub-regional grouping : Worse than 25 -year slavery treaty, says Khaleds, " *The Daily Star* (10 January 1997, পৃ.১, ১২; "Vow to resist' evil design' : Delhi to turn 3 countries into its provinces : BNP, "The Daily Star (9 January 1997).

www.pathagar.com

২৪. Kazi Ibra Shakoor, "WB has plans for the region," *Holiday* (17 April 1997), পৃ.১,৮

২৫. "ADB eager to promote growth qualdrangle ; Dhaka has potential to become financial sub of the sub-region," The Independent (Dhaka), (11 July 1997), পৃ.৭.

২৬. "A Year on the Road to Progress," *The Daily Star* (23 June 1997), পৃ.৭

২৭. Syed Badruddin Hussain, "Sub-regional Bloc, "Sangbad (19 January 1997) ; Munim Kumar Barain, "Co-operation through Regional Arrangement SAGQ and Answers to some Questions, "The Daily Star (10 June 1997); Shahed Latif, "Why we Must Have sub-regional Co-operation? "The Daily Star (8 April 1997); পৃ.৪; also his, "South Asian Growth duadrangle and Misplaced Nationalism, "THe Daily Star (24 April 1997), পৃ. ৪, Md. Nuruzzaman, "Subregional Co-operation and political Dynamism in Bangladesh, "Paper presented at the ISAB Seminar (August 1997); M. Shahiduzzaman, "South Asia Growth Duadrangle : Security and Transit Aspects, "Paper presented at the BIISS, Dhaka (18 August 1997)

২৮. Editorial, "Sub-regional grouping and relivance of Saarc, "Holiday (4 April 1997), পৃ.২; Sadeq Khan, "After a Chrade : AAGD," Holiday (April 1997), পৃ.১,৮ M. M. Rezaul Karim, "Sub-regional grouping in Eastum South Asia : Principles, Practice and Prognosis, " *The Daily Star* (30 January 1997), পৃ. ৮; also his "South Asian Growth duadrangel : Ties of a crordian Khot? "The Daily Star (10 April 1997) ; Mia, 1997, প্রাগুক্ত

২৯. Hassan Shahriar, "Trouble in the hills again?" *Holiday* (24 April 1998), পৃ.১,৮

৩০. Abul Kalam, "Facts belie claims, " *Holiday* (4,11 July 1997)

৩১. Amanullah, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮.

৩২. Suggestara Senadhira, "Chandrika to voice opposition to sub-regional groupings , "The Daily Star (13 May 1997), পৃ. ৫ ভারতে

www.pathagar.com

নতুন বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন সরকার শ্রীলংকার তামিলদের বিষয়ে "বন্ধুপ্রতিম আগ্রহ" প্রদর্শন করার কলম্বো নয়াদিল্লীর মধ্যে সম্পর্ক 'চমৎকার'থাকবে কিনা এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। দ্রঃ Faruq Chowdhury, "Srilannka and the BJP's Friendly Concern," *The Daily Star* (1 May 1998); Jehan Perera," The other side of the Jha. Doctrine," *Holiday* (1 May 1998)

৩৩. Amanullah, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

৩৪. প্রাগুক্ত

৩৫. দক্ষিণ এশীয় উপ-আঞ্চলিক সংস্থা সম্পর্কিত ভবিষ্যৎ পাকিস্তানী দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভর করছে প্রধানত পাক-ভারত সম্পর্কের ভবিষ্যতের ওপর। পাকিস্তানী সীমান্তে ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন, পাকিস্তানের মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র (ঘোরী)-'র পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ এবং বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারের পরিকল্পিত পারমাণবিক কর্মসূচি দুদেশের মধ্যে সুসম্পর্কের ইঙ্গিতবাহী বলে বিবেচনা করা যায় না।

৩৬. Jagat S. Mehta Rescuing the Future: Coming to terms with Bequeathed Misperceptions (Urbana Champaign, III." ACDIS Library, UIUC, 1995), পৃ.১৬৩-১৪

৩৭. ঐ, পৃ ১৯৮

৩৮. Hans H. Indorfs, Iddmpediment to Regionalism in Southeast Asia : Bilateral Constsraints Among ASEAN Member States (Singer Institute of Southeast Asian Studies, 1984), পৃ. ৯).

৩৯. M. Anwarul Haq, " Dhaka preparing concept paper on sub-regional grouping, "*The Daily Star* (6 February 1997), পৃ.১, ১২.

৪০. Abul Kalam, "Growth Diplomacy or Showmanship," প্রাগুক্ত, also his "D-8 : Diplomacy beyond the immediate corpflictual environment, "The Independent (27 June 1997), পৃ. ২; A. Husnain, "Can D-8 take off?", *The Daily Star* (23 June 1997), পৃ. ৮.

www.pathagar.com

চতুর্দশ অধ্যায়

বাংলাদেশের নিরাপত্তা ঃ তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ ও বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত[১]

"নিরাপত্তা" শব্দটি অনন্তকাল থেকে ব্যবহার হয়ে আসছে। এর ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিত হচ্ছে ভয়ভীতি বা হুমকি। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে একে নিরাপত্তাহীনতার সচেতন অনুধাবন বা প্রত্যক্ষজ অনুভূতিও বলা চলে। স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর বিশ্বব্যাপী ভয়ভীতি, হুমকি বা নিরাপত্তাহীনতার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। এসব পরিবর্তন প্রভাব ফেলে আন্তর্জাতিক সমাজে, আঞ্চলিক কাঠামোর ক্ষেত্রে, জাতীয় রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডে। বিভিন্ন দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ও নতুন নিরাপত্তা চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে আসছে। বলাবাহুল্য যে, ঐতিহ্যগত নিরাপত্তা চিন্তাধারা ছিল রাষ্ট্রকেন্দ্রিক বা ক্ষমতাভিত্তিক, কিন্তু সাম্প্রতিককালে নিরাপত্তা চিন্তাধারা বহুমাত্রিক ও বহু পর্যায়ের রূপ পরিগ্রহ করেছে।[২]

উল্লেখ্য, জাতীয় নিরাপত্তা, বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল রাষ্ট্র বা ক্ষুদ্রতর শক্তিসমূহের জাতীয় নিরাপত্তা সম্পর্কে খুব একটা লেখালেখি বা ধারণাগত গবেষণা হয় নি। তার মানে এ নয় যে, এসব রাষ্ট্র বা ক্ষুদ্রতর শক্তিসমূহের জাতীয় নিরাপত্তা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং এসব রাষ্ট্র বা শক্তির নিরাপত্তার বিষয় অধিকতর জটিল, এমন কি গুণগত দিক থেকে ক্ষুদ্রতর রাষ্টসমূহকে বৃহত্তর শক্তিগুলোর চাইতে তাদের নিরাপত্তা চাহিদা মেটাতে অধিকতর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রাখতে হয়। কেননা বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশে নিরাপত্তার বিষয় সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত।[৩]

এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন হতে পারে, বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্ররাষ্ট্র বা শক্তিসমূহের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে মুখ্য চাহিদা কি? বিশেষ করে যে ক্ষেত্রে অনেকের মতে এমন একটি প্রত্যক্ষজ অনুভূতি বিরাজমান যে, কর্তৃত্ববাদী প্রতিবেশী বৃহত্তর শক্তি তার (ক্ষুদ্রতর রাষ্ট্রের) অবস্থানকে হেয়প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট সে ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রশক্তির নিরাপত্তা বিধানে কি করণীয়? এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মতো একটি ছোট দেশ কি ধরনের রণনীতি ও রণকৌশল গ্রহণ করতে পারে?

www.pathagar.com

বাংলাদেশের সার্বিক নিরাপত্তাহীনতার পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করে কি ধরনের নিরাপত্তা রূপরেখা প্রাসঙ্গিক হবে এদেশের জন্য? প্রায়শ আধিপত্যবাদী শক্তি বলে বিবেচিত প্রতিবেশী বৃহৎ শক্তির প্রক্সি যুদ্ধের ছোবল থেকে নিজকে অবমুক্ত রাখার প্রয়াসে এবং নিজস্ব সার্বভৌমত্ব বজায়ে শত সমস্যা জর্জরিত বাংলাদেশ কি করতে পারে? আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের রূপান্তর বিবেচনা করে বাংলাদেশ তার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানে কি কি ধরনের বিকল্প পন্থা অবলম্বন করতে পারে, পররাষ্ট্র নীতি বা সামরিক-কৌশলগত ক্ষেত্রে কি ধরনের ব্যবস্থা বাংলাদেশের পক্ষে মঙ্গলকর হবে?[৪]

এ প্রবন্ধের প্রথম ভাগে নিরাপত্তা ধারণার তাত্ত্বিক দিক পর্যালোচনা করে একটি বিশ্লেষণী রূপরেখা প্রণয়নের চেষ্টা করা হয়েছে। এ রূপরেখা প্রণয়নের বিশ্লেষণে নিরাপত্তা ধারণা সম্পর্কিত সাম্প্রতিককালের বহুমাত্রিক ভাবধারা তুলে ধরা হয়েছে এবং সেই আলোকে জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যে ধারণাগত প্রভাব পড়ে তাও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রবন্ধের রূপরেখায় বর্ণিত বহুমাত্রিক ও জাতীয় নিরাপত্তা কাঠামো মনে রেখে বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা ও তার বিভিন্ন অভিব্যক্তি প্রবন্ধের দ্বিতীয় ভাগে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১. নিরাপত্তার তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ ও রূপরেখা

স্নায়ুযুদ্ধ পূর্বকাল ও স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে নিরাপত্তা ধারণা ছিল শক্তি বা ক্ষমতা ভিত্তিক সামরিক নিরাপত্তাই তখন ছিল প্রধান আলোচ্য বিষয়। বিশ্বব্যাপী নীতি নির্ধারক ও নেতৃবৃন্দ সামরিক নিরাপত্তার ওপরই জোর প্রদান করতো। নিরাপত্তার এ ধরনের সংজ্ঞায় প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্রই ছিল মুখ্য কারক। কেননা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত হলে ব্যক্তিবিশেষ বা সামাজিক গোষ্ঠীসমূহের নিরাপত্তার বিধানে কোনো ধরনের বাধা-প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে ন।[৫] দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক নিরাপত্তাও তখন একই ধারায় সম্পৃক্ত হয়। উভয় ক্ষেত্রেই জাতীয় সীমারেখার প্রতিরক্ষা ও জাতীয় ধন-সম্পদের নিশ্চয়তার বিধান ছিল নিরাপত্তার মূল লক্ষ্য।[৬] এটাই ছিল বাস্তববাদী চিন্তাবিদদের চিন্তা-চেতনার ফসল; আন্তর্জাতিক সীমানার সংরক্ষণ ও শৃঙ্খলা বিধান ছিল বাস্তববাদী নিরাপত্তা ধারণার প্রতিক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত। একইভাবে কর্তৃত্ব ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সিস্টেমের কাঠামো সংরক্ষণও ছিল বাস্তববাদী চিন্তাবিদদের চিন্তা-চেতনার মধ্যে। সামরিক হুমকি ছাড়াও এতে গুরুত্ব দেয়া হতো রাষ্ট্রের নীতি বা সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে ভয়ভীতিজাত বিষয়ের ওপর।[৭] রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব বিধান ও আন্তর্জাতিক সিস্টেমে রাষ্ট্রকে সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা ছিল বাস্তববাদী নিরাপত্তা দৃষ্টিকোণের লক্ষ্য। উনিশ শতক থেকে স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন প্রায় সমগ্র সময়কাল ছিল

www.pathagar.com

প্রধানত চিরায়িত শক্তিসাম্যনীতি ভিত্তিক।[৮] এ সময়ে প্রতিভাত হয় বাস্তববাদী নিরাপত্তা তত্ত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কে সমকালীন ব্যাপক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে অনেক চিন্তাবিদ বাস্তববাদী তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। অনেকে মনে করেন রাষ্ট্র বা জাতির নিরাপত্তার পাশাপাশি ব্যক্তি ও সামাজিক গোষ্ঠীসমূহের নিরাপত্তা, উপ-আঞ্চলিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা প্রভৃতি একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সামরিক ও রাষ্ট্রভিত্তিক নিরাপত্তা দৃষ্টিকোণকে তারা সংকীর্ণ মনে করেন।[৯] তাঁরা জোর দেন অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ওপর, উত্থাপন করেন পরিবেশগত নিরাপত্তার বিষয়। ব্যক্তিবিশেষের নিরাপত্তার বিষয়সহ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সমস্যাবলিও নিরাপত্তা দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়।[১০] ফলে উদ্ভব হয় নব্য-বাস্তববাদের। এ দৃষ্টিকোণ হচ্ছে সমাধান প্রয়াসী-সমস্যা সৃষ্টির চেয়ে সমস্যার সমাধানের ওপর জোর দেয়া হয়। সিস্টেম কাঠামোর উন্নয়নের পাশাপাশি এতে গুরুত্ব দেয়া হয় এতে নীতি প্রাসঙ্গিক তত্ত্বের ওপর।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন ও স্নায়ুযুদ্ধের পরিসমাপ্তির ফলে নব্যবাস্তবাদী চিন্তাধারার প্রসার ঘটে। ফলে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও সামরিক প্রস্তুতিভিত্তিক চিরায়ত নিরাপত্তা ধারণার উপযোগিতা, এমন কি প্রাসঙ্গিকতা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়। এ সময় থেকে নব্যবাস্তববাদী তাত্ত্বিক ছাড়াও অনেক শান্তি গবেষক ও শান্তিকর্মী নিরাপত্তার বহুমাত্রিক সংজ্ঞা ও বহু পর্যায়ের অভিব্যক্তি নিয়ে বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন। ক্রমান্বয়ে স্নায়ুযুদ্ধ-উত্তরকালীন অনেক বিশেষজ্ঞ ভবিষ্যতপন্থী নিরাপত্তার একটি নীল-নকশা প্রণয়নে প্রয়াসী হন। তাঁরা চেয়েছেন নিরাপত্তার এমন ব্যাখ্যা যাতে প্রত্যক্ষ সহিংসতা এড়ানোর পাশাপাশি জনগণের জাগতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা মোটানোও সম্ভব হয়। সংরক্ষিত হয় বিশ্ব ভ্রমাণ্ডের পরিবেশগত স্বাস্থ্য ও ভারসাম্য। তাঁরা গুরুত্ব আরোপ করেন অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যাবলির ওপর। বুঝাতে চান সামরিক আদর্শগত উদ্দেশ্যাবলির প্রতিযোগিতামূলক দিকগুলোর গুরুত্বহীনতা সম্পর্কে। বলা হয়, বর্তমান বিশ্ব সম্পর্কে মর্যাদার মূল সূত্র হচ্ছে জাতীয় সম্পদ সৃষ্টি, অর্থনৈতিক শক্তি ও প্রবৃদ্ধি, শিল্পজাত ক্ষমতা। বর্তমানে সরকারের প্রশাসনিক যোগ্যতা, দক্ষতা ও ভাগ্য জাতির নিরাপত্তার সঙ্গে অভিন্ন বলে বিবেচিত। কেননা সরকারের প্রশাসন ও কর্মকাণ্ড প্রায়শই রাষ্ট্রের প্রতীক ও অভিব্যক্তি হিসেবে দেখা হয়।[১১] মোট কথা, নিরাপত্তা এখন শুধু রাষ্ট্রিক কাঠামো ভিত্তিক নয়; রাষ্ট্রের নিরাপত্তাহীনতার পাশাপাশি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ উপাদান এবং বৈষয়িক সমস্যাবলিও নিরাপত্তা প্রসঙ্গে উত্থাপিত হচ্ছে। মাটি ও মানুষ, প্রকৃতি ও সকল জীবজন্তু, পরিবেশ-

www.pathagar.com

প্রতিবেশ ইত্যাদি এখন নিরাপত্তার বিশ্লেষণ পর্যায়ক্রমের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।[১২]

বহুমাত্রিক নিরাপত্তা

উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকে এটা প্রতীয়মান হওয়া স্বাভাবিক যে, নিরাপত্তা হচ্ছে বহুমাত্রিক, বহু পর্যায়ের দৃষ্টিকোণ সমন্বিত।[১৩] তার অর্থ, নিরাপত্তাকে বহু দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা চলে। যেমন, নারী দৃষ্টিকোণ, পারস্পরিক বা সহযোগিতামূলক নিরাপত্তা, ব্যক্তিবিশেষ বা জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা, "অভিন্ন নিরাপত্তা",[১৪] বিশ্ব নিরাপত্তা, "প্রতিবেশ নিরাপত্তা" অর্থনৈতিক ও পরিবেশ নিরাপত্তা, ব্যাপক-সমন্বিত বা সার্বিক নিরাপত্তা,[১৫] পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ইত্যাদি। নিরাপত্তা বিষয়ক সমস্যাবলিকে এভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করা হচ্ছে বটে, কিন্তু নিরাপত্তার ইতিবাচক নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে সকল দৃষ্টিকোণ প্রায় অভিন্ন। এসব দৃষ্টিকোণের দাবি ও মতামতের মধ্যে রয়েছে সামরিক, কৌশলগত-রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত হুমকি থেকে অব্যাহতি, রয়েছে জনসংখ্যা হারগতভাবে নারী ও শিশুর অধিকার নিশ্চয়তা, প্রাকৃতিক ক্ষয়ক্ষতি বা ধ্বংসলীলার আক্রোশ থেকে মুক্তিলাভ, সামাজিকভাবে গুণগত জীবন ধারণ ও সমান অধিকারের ভিত্তিতে মানুষের প্রয়োজনীয় মৌলিক ও জৈবিক অধিকার সুনিশ্চিতকরণ ইত্যাদি।[১৬]

বিশ্ব বাস্তবতা ও নমুনাগত রূপান্তর

স্নায়ুযুদ্ধ-উত্তরকালে বিশ্ব উত্তরোত্তর পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল হচ্ছে। ফলে জাতীয় সীমারেখা, স্বাধীনতা ও হস্তক্ষেপ সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা পূর্বের সংজ্ঞায় বিবেচনা করা কঠিন হচ্ছে। ঐতিহ্যগত এসব নীতি সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পুনঃনির্ধারিত হবার অপেক্ষা রাখে। সার্বভৌমত্বের নীতি পুনর্মূল্যায়নের তাগিদও আসছে যাতে রাষ্ট্রের অধিকারের পাশাপাশি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, প্রকৃতির অভিন্ন সৃষ্টি ও সুযোগসমূহ, জনমানুষের অধিকার, জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সম্পৃক্ত বৃহত্তর বিশ্বের স্বার্থ প্রভৃতির নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে সমতা বিধান করা যায়।[১৭]

এটা অবিদিত নয় যে, উপর্যুক্ত তত্ত্বগত পরিবর্তনের পাশাপাশি নিরাপত্তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নতুন নতুন মডেল বা নমুনা প্রণীত ও বাস্তবায়িত হয়। পরিবর্তন সূচিত হয় ১৯৭২ সনে স্টকহোম সম্মেলনের মাধ্যমে। ঐ সময়ে জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি প্রতিষ্ঠিত হয়, গুরুত্ব পায় পরিবেশ ও উন্নয়নের ধারণা। ১৯৭০-এর দশকেই ইউরোপে নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সম্পর্কিত আন্তঃজোটভিত্তিক মহাদেশীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, স্বাক্ষরিত হয় হেলসিংকি

www.pathagar.com

চূড়ান্ত চুক্তি (১৯৭৫ সন)। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সীমান্ত নিরাপত্তা, ব্যবসায়িক সম্পর্ক, মানবাধিকার ও পারস্পরিক-আস্থা ও নিরাপত্তা বিধানে কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে উত্তেজনা প্রশমনের পন্থা গৃহীত হয়। পরবর্তীকালে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে এ নমুনার অনুকরণে প্রায় একই ধরনের ব্যবস্থাদি গৃহীত হয়। অভিন্ন স্বার্থের নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা বিধান ছিল এ ধরনের সহযোগিতার লক্ষ্য। ১৯৮৭ সনের পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বিশ্ব কমিশন-এর রিপোর্ট[১৮] ১৯৯২ সনের ধরিত্রী সম্মেলন ও সম্মেলনে গৃহীত পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্পর্কিত ঘোষণা ও নীতিমালা, ১৯৯৭ সনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ধরিত্রী সম্মেলন এবং একই বছরে কিওটে'তে অনুষ্ঠিত আবহাওয়া পরিবর্তন সম্পর্কিত বিশ্ব সম্মেলন প্রভৃতি বিশ্ব পরিবেশ ও উন্নয়ন এবং একই সঙ্গে নিরাপত্তার সার্বিক বিষয়ে একটি নতুন মডেল-এর প্রচলন সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান করে। নতুন মডেলে উন্নয়নের নিশ্চয়তা বা নিরাপত্তার দাবি ওঠে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে যেমন সচেতনতা জাগে শিশু, নারী ও জনমানুষের অধিকার সম্পর্কে গুরুত্ব দেয়া হয় একটি সুশীল সমাজ গঠনে, প্রশাসনের দক্ষতা, জোর দেয়া হয় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ওপর। বৈদেশিক নীতি ও রাষ্ট্র ভিত্তিক ঐতিহ্যগত নিরাপত্তা মডেল এভাবে নানা ধরনের প্রশ্ন ও পরীক্ষার সমুখীন হয়।[১৯]

নিরাপত্তা চিন্তাধারার ক্ষেত্রে এবং বিশ্বের বাস্তব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত পরিবর্তন ঘটে স্নায়ুযুদ্ধকালীন দ্বি-মেরুভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থার বিপর্যয়ের মাধ্যমে। এ সময়ে বিশ্বে বহু মেরুকরণের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। বিশ্ব পরিমণ্ডলে, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে, শক্তিসমূহ অধিকতর যোগাযোগ, ভাবের লেনদেন ও আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। ফলে নিরাপত্তার বিবর্তন ঘটে দু'দিক থেকে–বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ও বিষয়গত পর্যায়ে। বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ধারণা সম্প্রসারিত রূপ পরিগ্রহ করে ব্যক্তিবিশেষ, সামাজিক সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী, জাতি, জোট ও মানব সমাজকে এর বিশ্লেষণের পরিমণ্ডলে অন্তর্ভুক্ত করে। অন্যদিকে বিষয়গত পর্যায়ে নিরাপত্তা ধারণ। উন্নততর রূপ ধারণা করে– এতে বেঁচে বা টিকে থাকা, কার্যকর ভূমিকা রাখা এবং উন্নয়নের প্রসার ঘটানোর মতো বিষয় হয় বিজড়িত।[২০]

বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ও বিষয়গত পর্যায়ে নিরাপত্তার এ ধরনের পরিবর্তন সত্ত্বেও রাষ্ট্র, জাতীয় শক্তি বা প্রতিপত্তি সম্পর্কিত ধারণাগত পুনর্মূল্যায়ন অব্যাহত রয়েছে। কিভাবে রাষ্ট্র তার প্রয়োজন মেটাতে পারে, কিভাবে রাষ্ট্রের নেতৃত্ব রাষ্ট্রের বিভিন্ন ধরনের হুমকির মোকাবিলা করতে পারে এবং কিভাবে সামরিক বাহিনীকে রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা, উন্নয়ন বা কূটনৈতিক প্রতিক্রিয়ার

www.pathagar.com

অনুকূলে ব্যবহার করা যায়–এ সকল বিষয় নিরাপত্তা বিতর্কে ও রূপরেখায় স্থান পেয়ে চলছে।[২১]

বহুপর্যায়গত দৃষ্টিকোণ ও জাতীয় নিরাপত্তার সংযোগ

নীতিগত ও সিদ্ধান্তগ্রহণ পর্যায়ে "জাতীয় নিরাপত্তা"-ই এক সময়ে একমাত্র নিরাপত্তা ধারণা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। বিভিন্ন বিশ্লেষণী দৃষ্টিকোণে এ ধারণাই প্রাধান্য বিস্তার করে। সাম্প্রতিককালে বিশ্লেষক ও নীতিনির্ধারক উভয় পক্ষই এ ক্ষেত্রে পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাঁরা ক্রমান্বয়ে অনুভব করছেন যে জাতীয় নিরাপত্তা বর্তমানকালে আন্তর্জাতিক আঞ্চলিক পর্যায়ে, জাতি-রাষ্ট্র ও ব্যক্তিবিশেষের নিরাপত্তার পর্যায়ে, উপ-আঞ্চলিক ও সামাজিক গোষ্ঠী পর্যায়ে নানাভাবে সম্পৃক্ত। ধারণাগত দৃষ্টিকোণ থেকে একমাত্র শক্তিসাম্য ব্যবস্থাভিত্তিক নিরাপত্তার ওপর নির্ভরশীল না হয়ে তাঁরা এর পাশাপাশি যৌথ নিরাপত্তা ও যৌথ প্রতিরক্ষার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করছেন। একই সঙ্গে তারা গুরুত্ব দেখছেন অভিন্ন, প্রতিবেশগত বা বিশ্বনিরাপত্তাসহ অন্যান্য নিরাপত্তা উপাদানের, কেননা এ ধরনের বিভিন্ন উপাদান বর্তমানকালে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে এক অভিনব রূপ ধারণ করে চলছে।

উল্লেখ্য, নিরাপত্তা ধারণার মতো জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও আজকাল শুধু শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর ওপর জোর দেয়া হয় না, যদিও সামরিক শক্তির আবশ্যকতা অস্বীকার করার উপায় নেই।[২২] কিন্তু একই সঙ্গে তাগিদ আসছে একটি বলিষ্ঠ অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিষয়ে। তদুপরি, অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে একটি গতিশীল প্রশাসন ও বলিষ্ঠ রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপরও জোর দেয়া হচ্ছে। অবশ্য ওপরে উল্লেখিত সকল বিষয় পারস্পরিকভাবে সংযুক্ত।[২৩] কেননা জাতীয় নিরাপত্তার কাজ হচ্ছে একটি স্ব-শাসিত জনগোষ্ঠীর জীবন ধারণের নিশ্চয়তা বিধান; এ নিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারা ও এ কাজে নিয়োজিত সংগঠন জোরদার করা, রয়েছে নিজস্ব কর্তৃত্বে জীবন যাপনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি।[২৪]

উপর্যুক্ত লক্ষ্য অর্জনে প্রায়শ জাতীয় নিরাপত্তাকে জাতীয় রণনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে ধরা হয়। জাতীয় রণনীতি প্রণীত হয় একটি দেশের ভূ-রাজনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের আলোকে এবং উভয়গত বিষয় বিবেচিত হয় আঞ্চলিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। একই সঙ্গে যে কোনো দেশের আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিত বিবেচিত হয় জাতীয় চাহিদা বা মূল্যবোধ, জাতীয় উদ্দেশ্যাবলি ও স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে। অনেক ক্ষেত্রে এসব বিষয়াদি জাতীয়

www.pathagar.com

উল্লেখিত হয়।[২৫] এছাড়া, জাতীয় ও আঞ্চলিক নিরাপত্তার সঙ্গে রয়েছে বহিঃনিরাপত্তার সংযোগ এবং এর সঙ্গে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার আন্তক্রিয়াজনিত সংযোগও রয়েছে, রয়েছে পররাষ্ট্র নীতি ও প্রতিরক্ষার বিষয়াদি। জাতীয় নিরাপত্তার নীতিমালা প্রণয়নের দেশের ইতিহাস, জাতীয় কৃষ্টি বা চরিত্র, ভৌগোলিক অবস্থান, ভূ-রাজনৈতিক ও ভূ-অর্থনৈতিক বাধ্যবাদকতা, অর্থনৈতিক শক্তি ও সামরিক সাধ্যক্ষমতা প্রভৃতিও বিবেচনায় রাখতে হবে। সম্ভাব্য শত্রুপক্ষের মোকাবিলায়, তাকে প্রতিহত করার মতো শক্তি না থাকলেও অবশ্য মনে রাখতে হবে কি করে সেই শত্রুর শক্তি সীমিত রাখা যায়, দেখতে হবে রাজনৈতিক, কূটনৈতিক বা সামরিক কর্মপন্থা গ্রহণের মাধ্যম কি করে প্রতিপক্ষ শত্রুর তৎপরতা নিষ্ক্রিয় করা যায়। জাতীয় নিরাপত্তার প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় এ সকল রাজনৈতিক সামরিক ও কূটনৈতিক বিষয় বিবেচনায় থাকতে হবে। মোট কথা, জাতীয় নিরাপত্তা বিবর্তনে ও জাতীয় রণনীতির নির্ধারণে একটি জাতির অবস্থান সংরক্ষণ করার মতো সম্ভাব্য বিভিন্ন নিরাপত্তার দিক বিচার বিশ্লেষণ করতে হবেঃ এর মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক, ভূ-রাজনৈতিক ও ভূ-অর্থনৈতিক, সামাজিক, সামাজিক-রাজনৈতিক, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কৌশলগত নিরাপত্তা প্রভৃতি বিষয়াদি।[২৬]

কৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে, সার্বিক নিরাপত্তার ধারণা জাতীয় নিরাপত্তার প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক মনে হবে। কেননা, দৈহিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির বিষয় ছাড়া নিরাপত্তা সম্পর্কিত অন্যান্য উপাদানও যে নিরাপত্তার বিষয়ে প্রাসঙ্গিক এতে সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। একটি সার্বিক নিরাপত্তার কর্মসূচি অর্থই হচ্ছে সামরিক সংগঠন ছাড়া কূটনীতি, তথা সরবরাহ ও পররাষ্ট্র নীতির অর্থনীতি সম্পর্কিত সংগঠনগুলোকেও তৎপর থাকতে হবে। বিদেশী শক্তির হুমকি হ্রাস করে জাতির নিরাপত্তা অবস্থান উন্নততর করতে হলে উপর্যুক্ত সকল পন্থা বা পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগ সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। প্রকৃত শত্রু বা সম্ভাব্য শত্রুর চরিত্র বা ধরন চিহ্নিত করা হচ্ছে একটি বড় কাজ। এ ক্ষেত্রে বড় দায়িত্ব হচ্ছে দেখা যাতে শত্রুপক্ষ তার অনুকূলে মৈত্রী সম্পর্কের সমাবেশ না ঘটাতে পারে বা অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তাবেদার গোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ হলে কৌশল হিসেবে বিরোধী শক্তির অভ্যন্তরে ভাঙন, এমন কি বিদ্রোহে ইন্ধন যোগানোর বিষয়ও বিবেচনায় রাখা যায়। কূটনৈতিক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পন্থা অবলম্বন করে সম্ভাব্য শত্রুর বিরুদ্ধে কৌশলগত প্রস্তুতি বা যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলার শক্তিশালী অবস্থান বজায় রাখা সমীচীন।[২৭]

www.pathagar.com

জাতীয় নিরাপত্তা ও জাতির মূখ্য চাহিদা

আপেক্ষিক সীমিত অর্থে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে একটি রাষ্ট্র যখন নিরাপত্তার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে রাষ্ট্রের তখন উদ্দেশ্য দাঁড়ায় তার অতি আবশ্যিক চাহিদা বা মূল্যবোধ সংরক্ষণ। বাস্তবিক অর্থে এ চাহিদা অর্থনৈতিক সামরিক, রাজনৈতিক, এমন কি সাংস্কৃতিক দিক থেকে হতে হবে অপরিহার্য। বিশ্লেষণের প্রয়োজনে এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা পরিকল্পনা রচিত করার কাজে এসব বিষয়সমূহ রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন প্রবাহ বলে প্রতীয়মান হতে পারে, কিন্তু আসলে এসব উপাদান পারস্পরিকভাবে সম্পৃক্ত এবং কার্যক্ষেত্রেও এসব পরস্পরের আন্তক্রিয়ায় সংযুক্ত।[২৮]

একটি রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় বা মৌলিক চাহিদা তার সার্বিক উদ্দেশ্যাবলির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে, রাষ্ট্রের প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে তার মর্যাদা সমুন্নত করা। এর মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস, রয়েছে বহিঃনির্দেশ থেকে নিজস্ব জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়াবলি নিজস্ব ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুযায়ী চালু রাখা, জাতীয় স্বাধীনতার ও সার্বভৌমত্ব বজায় রাখা।[২৯] সংজ্ঞায়িতভাবে এভাবে নিরাপত্তাকে দেখা হয় "যে কোনো জাতির নিম্নতম চাহিদার প্রতিরক্ষা ও সংরক্ষণ–সেই চাহিদাই হচ্ছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ভূ-সীমানাগত সংহতি।"[৩০] একটি জাতি "তখনি নিরাপদ বলে বিবেচিত হয় যখন যুদ্ধের হুমকির মুখেও মুখ্য চাহিদাগুলি বিপন্ন না হয় এবং যুদ্ধের হুমকির সম্মুখীন হলেও সম্ভাব্য যুদ্ধের নিশ্চিত বিজয়ের মাধ্যমে এসব চাহিদা বজায় রাখতে সক্ষম হয়।"[৩১]

এ পরিপ্রেক্ষিতে আরো মনে রাখা প্রয়োজন যে, একটি জাতির আদর্শিক প্রত্যাশা বা উদ্দেশ্যাবলি এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে সামঞ্জস্যহীনতা পরিলক্ষিত হতে পারে, কেননা আদর্শ ও বাস্তবতা প্রয়াশই সামঞ্জস্যতার সংকটের মুখোমুখি হয়ে থাকে। অবশ্য রাষ্ট্রের নিরাপত্তা চাহিদা বা মূল্যবোধ আত্মনিষ্ঠ হতে পারে, নির্ভর করতে পারে তার ওপর যিনি রাষ্ট্রের ভাগ্য নিয়ন্তা বা হর্তাকর্তা। তাঁর প্রত্যক্ষজ অনুভূতি বা ইচ্ছা-বৃত্তি কি, কোনো চাহিদাকে তিনি অপরিহার্য বলে মনে করেন বা কোনোটাকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন না। আত্মনিষ্ঠ দৃষ্টিকোণ যা-ই হোক না কেন বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নকামী ক্ষুদ্রশক্তির নিরাপত্তা চাহিদা ততোখানি ব্যাপক নয় বটে, কিন্তু এর নিরাপত্তা চাহিদা বৃহত্তর শক্তিগুলোর চেয়েও অধিকতর জটিল ও নৈপুণ্যের দিক থেকে অধিকতর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের অপেক্ষা রাখে।

www.pathagar.com

জাতীয় নিরাপত্তার রূপরেখা

একটি জাতীয় নিরাপত্তা রূপরেখার প্রণয়নে প্রথমে মনে রাখতে হবে নিরাপত্তা ধারণার ক্ষেত্রে বিরাজমান বিশৃংখলার বিষয়। এক্ষেত্রে শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে মুখ্য কাজ। এর পর মৌলিক উপাদানগুলো চিহ্নিত করতে হবে। দেখতে হবে শৃংখলার উত্তরণে কি কি কৌশলগত উপাদান প্রয়োজন হতে পারে। দু'টো উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত হয় জাতীয় শক্তি: এর একটি হচ্ছে জাতীয় সম্পদের বহর বা সীমাবদ্ধতা নির্ণয়, আরেকটি হচ্ছে জাতীয় রণনীতি নির্ধারণ–যা সম্পদ পরিচালনার ক্ষেত্রে দিক-নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। মনে রাখতে হবে যে, যুক্তিযুক্তভাবে যা কিছু অর্জন সম্ভব জাতীয় রণনীতি তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়; কৌশলগতভাবে যা' কিছু অভিলাষের পর্যায়ে আসে ইচ্ছা মাফিক ঐসব পূরণে রণনীতির প্রয়োগ সমীচীন নয়।[৩২]

আরো উল্লেখ্য, নিরাপত্তা নীতি বলতে বুঝানো হয় সরকারের এমন কিছু সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম যার দ্বারা জাতির অপরিহার্য স্বার্থ ও চাহিদার অনুকূলে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃক্ষেত্রে স্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করে। নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ বা নিরাপত্তা নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে যে সব বিষয় বিবেচিত হয় তার মধ্যে রয়েছে শাসকশ্রেণীর ধ্যান-ধারণা ও ভয়ভীতিজনিত প্রত্যক্ষজ অনুভূতি, সামরিক বাহিনীর শক্তির পর্যায়, অস্ত্রশস্ত্র ব্যবস্থা ও ভয়ভীতি সম্পর্কিত নীতিগত প্রত্যুত্তর দানের যোগ্যতা, দুর্বলতার শিকারের মানসে শত্রুর সম্প্রীতিমূলক আচরণ বা গৃহীত রণনীতি মূল্যায়নের ক্ষমতা, সম্পদের বরাদ্দ ও জনমতের সমাবেশ ঘটানো প্রভৃতি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর থেকে কয়েক দশকব্যাপী বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য কৌশলগত মতবাদ প্রসার লাভ করে, ফলে সৃষ্টি হয় অনিশ্চয়তা ও বিশৃংখলা। ঐতিহ্যগতভাবে রণনীতির কাজ ছিল যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়া এবং যুদ্ধ পরিচালনা করা। এসব ক্ষেত্রে যুদ্ধ রণনীতি সংশ্লিষ্ট, লড়াই হচ্ছে রণকৌশল প্রসূত, যদিও উভয় ধারণা প্রায়শ সংমিশ্রিত হয়। উভয় ধারণা আপেক্ষিকভাবে সম্পর্কযুক্ত। রণকৌশল হচ্ছে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর ব্যবহার সম্পর্কিত তত্ত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যুদ্ধের লক্ষ্য অর্জনে যুদ্ধ সম্পর্কিত তত্ত্বই হচ্ছে রণনীতি। অল্পকথায়, রণকৌশল হচ্ছে যুদ্ধের পদ্ধতি সম্পর্কিত, আর রণনীতি উদ্দেশ্যাবলি সম্পর্কিত। এ সঙ্গে আরো মনে রাখা সমীচীন যে, রণনীতি রাষ্ট্রের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে; অর্থাৎ যুদ্ধ ও শান্তি উভয় ব্যাপ্তিকালে জাতি বা রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যাবলির সঙ্গে রণনীতির সঙ্গতি থাকতে হবে– যাতে যুদ্ধই একেবারে জাতির উদ্দেশ্যের রূপ পরিগ্রহ না করতে পারে,[৩৩] যেন জাতি আত্মহননের প্রক্রিয়ায় নিপতিত না হয়।

www.pathagar.com

এভাবে রণনীতিকে আজকাল আর ধ্বংসযজ্ঞের বিজ্ঞান হিসেবে দেখা হয় না ; বরং রণনীতি তখন নিয়ন্ত্রণের কলাকৌশল হিসেবে বিবেচিত হয়। রণনীতির মাধ্যমে একটি জাতি দ্বন্দ্বপ্রবণ বিশ্বে তার নিরাপত্তা বজায় রাখতে প্রয়াসী হয়। রণনীতির কলাকৌশল বা পদ্ধতি ব্যবহার করে একটি জাতি তার সম্পদ, অস্ত্রশস্ত্র ও ক্ষমতা সংবরণ বা অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ করতে সচেষ্ট হয়। এর দ্বারা শত্রুপক্ষের সম্পদসামগ্রী ও নিয়ন্ত্রণ বা সীমিতকরণের প্রয়াসও মেলে–এক্ষেত্রে রণনীতির লক্ষ্য হচ্ছে হয় শত্রুর সম্পদ সামগ্রী বিনাশ করা বা এ সবের ব্যবহার লোকসানের শামিল রূপে দেখানো। পরিশেষে, রণনীতিকে বর্তমানকালে দ্বন্দ্ব পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের কলাকৌশল হিসাবেও দেখা হয়–এ ক্ষেত্রে প্রয়াস হচ্ছে দ্বন্দ্বকে নিজ স্বার্থের অনুকূলে প্রবাহিত করা।[৩৪] এ সকল কৌশলগত উদ্দেশ্য সাধনে যুদ্ধ ও শান্তি উভয়বিধ অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই রণকৌশলের পন্থাদি রণনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। অল্পকথায়, জাতীয় নিরাপত্তা নীতি নির্ধারণ করবে জাতির রণনৈতিক নীতিমালা বা কৌশলগত বিষয়াবলি, সেই নীতি চিহ্নিত করবে রণনীতি ও রণকৌশল উভয়ের গতিধারা।

এ প্রসঙ্গে আরো মনে রাখতে হবে যে, জাতীয় নিরাপত্তা আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক নিরাপত্তা থেকে অবিচ্ছিন্ন। একটি দেশের নিরাপত্তা আরো ক'টি দেশের নিরাপত্তাহীনতার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং এভাবে দীর্ঘকাল সময়ের মাপকাঠিতে স্থিতিহীনতার রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। এটা নিশ্চিত করে বলা চলে যে, স্থিতিশীল আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সিস্টেম গড়ে তুলতে হলে নিরাপত্তা যেমন আবশ্যক তেমনি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উপাদানসমূহের সমন্বয় সাধনও অত্যাবশ্যক। উভয়বিধ ক্ষেত্রে দেখতে হবে যাতে কোনো বহিঃশক্তি নিজস্ব স্বার্থ চরিতার্থে উপর্যুক্ত উপাদানসমূহকে স্বতন্ত্রভাবে উপস্থাপন করে কোনোরূপ চাল খেলতে না পারে। সুতরাং রাষ্ট্র পর্যায়ে নিরাপত্তা পরিকল্পনা প্রণয়নকারীদের অনুধাবন করতে হবে যেন নিরাপত্তা একপেশে ন হয়ে পারস্পরিকভাবে না সহযোগিতামূলক নিরাপত্তার পক্ষে যথার্থই অনুকূল হয়।

একই সঙ্গে একথাও ভুললে চলবে না যে, সামরিক-কৌশলগত নিরাপত্তা বিষয়াদি এখনো অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়াদির ওপর প্রাধান্য অব্যাহত রেখেছে। কেননা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে রাষ্ট্রসমূহ এখনো যখন মৈত্রী সম্পর্ক ও জোটের বন্ধন রূপান্তর করে তুলছে তখন তাদের পক্ষে ঐতিহ্যগত নিরাপত্তা বিষয়ে চোখ বুজে থাকা সম্ভব নয়। নিরাপত্তা সম্পর্কে ঐতিহ্যিক চিন্তাধারা এখনো আন্তর্জাতিক আন্তক্রিয়ায় যথেষ্ট প্রভাব রেখে চলছে, যদিও প্রয়াস হচ্ছে নিছক সহিংসতা যথাসম্ভব পরিহার করে নিরাপত্তার

www.pathagar.com

বৃহত্তর ও সূক্ষ্মতর দৃষ্টিকোণগুলো সম্পর্কেও যথাযথ অবহিত থাকা। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় পরিবর্তনশীল ভাবধারা সত্ত্বেও নিরাপত্তা ধারণা এখনো স্ববিরোধী চিন্তাধারায় আবিষ্ট বলে প্রতীয়মান হয়, কেননা সমস্যা বা সংকটাপন্ন অবস্থায় সকল দেশকেই মূলত "স্বনির্ভরশীল" ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। এভাবে জাতীয় নিরাপত্তা ধারণার সঙ্গে অব্যবহিতভাবে সম্পৃক্ত হয় রণনীতি ও রণকৌশল, প্রসঙ্গ আসে একই সঙ্গে ঐতিহ্যগত সেনা, নৌ, বিমান বাহিনীসমূহসহ অন্যান্য আধা-সামরিক ও সহায়ক বাহিনীগুলোর ভূমিকা কি হবে। কেননা এসব বাহিনীর মুখ্য কাজই হচ্ছে জাতির নিরাপত্তামূলক সকল দায়িত্ব নিরলসভাবে সম্পন্ন করা।

অবশ্য বিশ্ব পরিবেশ-প্রতিবেশ ও অভিন্ন নিরাপত্তার মতো নতুন নিরাপত্তা ধারণা ঐতিহ্যিক সামরিক নিরাপত্তার নীতিগত ধারণাসমূহকে অভিন্ন বিশ্ব হুমকির মোকাবিলায় মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা বলে মনে করে। এ কারণেই ব্যক্তি বিশেষ/জনমানুষের নিরাপত্তা, পারস্পরিক বা সহযোগিতামূলক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত নিরাপত্তা, সার্বিক নিরাপত্তা প্রভৃতি দৃষ্টিকোণ উত্থাপিত হয়। এসব দৃষ্টিকোণের মাধ্যমে যে-নীতির ওপর জোর দেয়া হচ্ছে তাহলো কোনো দেশ অন্যান্য দেশ ও জাতির নিরাপত্তার প্রতি অধিকতর হুমকি সৃষ্টি করে নিজস্ব নিরাপত্তার প্রসার ঘটাতে না পারে।[৩৫] উপর্যুক্ত ধারণাসমূহে সম্পর্কের ক্ষেত্রে পারস্পরিকতার একটি শক্তিশালী উপাদান লক্ষণীয় এবং সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহকে অবশ্যই তাদের পারস্পরিক স্বার্থের সম্পৃক্ততার বিষয় স্বীকৃতি দিতে হবে। তা' না হলে নিরাপত্তা নীতি প্রণয়নে ও কৌশলগত পন্থাদি অবলম্বনে তাদের মধ্যে সহমর্মিতা গড়ে ওঠবে না।

এটা অনস্বীকার্য যে, নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বহুবিধ নতুন দৃষ্টিকোণ এবং সমকালীন বিশ্ব, জাতীয় ও অন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে গতিময়তা সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক পণ্ডিত ও রাষ্ট্রনায়ক নির্বিশেষে সকলের জন্যই নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি করেছে।[৩৬] পদ্ধতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে নিরাপত্তা সার্বিক ও প্রকৃত অর্থে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচি গ্রহণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে থাকে। সরকারের নির্বাহী বিভাগের প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে নিরাপত্তা বিষয় সম্পর্কিত সার্বিক প্রশ্নাদি পর্যালোচনা করা। কিন্তু বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে রাষ্ট্রের অন্যান্য বিভাগ ও অঙ্গ সংগঠনের, বিশেষ করে প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত অঙ্গ সংগঠনের এবং আরো চূড়ান্ত দায়িত্ব রয়েছে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর।

পরিহাস হচ্ছে এই যে, জাতীয় নিরাপত্তার নামে প্রায়শ যেসব উপায় বা পন্থা প্রস্তাবিত হয় সেসবের ফলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে অনেক ক্ষেত্রেই পৌঁছানো যায় না। বিশেষ করে সতর্ক নজর রাখতে হবে যাতে অভ্যন্তরীণ নীতি থেকে

www.pathagar.com

বিচ্যুত জাতীয় নিরাপত্তা নীতিপ্রণয়নের কথা আদৌ ভাবা না হয়। একইভাবে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সজাগ থাকতে হবে যাতে অস্ত্রশস্ত্রের ওপর নির্ভরশীল প্রতিরক্ষা নীতির ভিত্তিপ্রস্তর না প্রতিষ্ঠিত হয় বা মৈত্রী সম্পর্ক বিবেচিত না হয় প্রতারণামূলক কৌশল হিসেবে। একটি জাতির নিরাপত্তার শ্রেষ্ঠতম বাহন নিহিত হচ্ছে পররাষ্ট্রনীতির সকল হাতিয়ারগুলোর সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের মধ্যে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হচ্ছে অস্ত্রশস্ত্র, কূটনীতি, তথ্যাদি ও অর্থনীতি—এসব কিছুর যথার্থ সমন্বয় বিধান করা এবং পররাষ্ট্র ও অভ্যন্তরীণ নীতির সকল কর্মকাণ্ডের মধ্যে প্রকৃত যোগসূত্র স্থাপন করা।

নিরাপত্তা বিষয়ে বহুমাত্রিক বিবর্তক এবং এর ফলশ্রুতিতে জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অব্যাহত ধারণাগত সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে একটি সমন্বিত বা সারগ্রাহী জাতীয় নিরাপত্তার রূপরেখা প্রস্তাবনা অনিবার্য। কেননা একমাত্র এ ধরনের রূপরেখার মাধ্যমেই জাতির নিরাপত্তা নীতি ও নতুন বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ প্রসূত কৌশলগত নীতিমালার মধ্যে সমন্বয় বিধান সম্ভব। একমাত্র এ ধরনের সংমিশ্রিত জাতীয় নিরাপত্তা কাঠামোর মাধ্যমেই স্বাধীনতা ও স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা বিধান সম্ভব। তা না হলে নিরাপত্তার গতিশীলতা নিশ্চিত হবে না; বরং নিরাপত্তা হবে অরক্ষিত। উভয় ধরনের সম্ভাব্য ভীতি থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে হলে নিরাপত্তা নীতির প্রণয়ন ও পর্যালোচনার কাজে নিয়োজিত সকলকে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে। পদ্ধতি বা পন্থা যাই-ই হোক না কেন দিক-নির্দেশনার নীতি হচ্ছে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিরিখে যে যে বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে রয়েছে নাগরিক অধিকার ও বেসামরিক কর্তৃত্বের নিশ্চয়তা, সভা সমিতি আয়োজন ও তথ্যাদি সংগ্রহ বা বিনিময়ের অধিকার, প্রশাসনের দক্ষতা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, একটি মুক্ত অথচ এরূপ নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি যাতে রাষ্ট্র ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীসমূহের বহুমাত্রিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।

২. নিরাপত্তার রূপরেখা ও বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা ঃ বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত

উপর্যুক্ত নিরাপত্তা রূপরেখার নিরিখে বাংলাদেশের নিরাপত্তা এখন পর্যালোচনা প্রয়োজন। লেখকের মতামত অবশ্য জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বিতর্কের অপেক্ষা রাখে। বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিষয়ের অনেক বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আশংকার উদ্রেক হয়। তাই এ নিয়ে অনেক ভাবনা-চিন্তার অপেক্ষা রাখে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, সাম্প্রতিককাল অবধি বাংলাদেশে নিরাপত্তা বিষয়ে দারুণ শৃংখলার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে; রণনীতি বা সামরিক কৌশলগত আঁচ থাকতে পারে এমন ধরনের সকল বিষয়ে মুক্ত

www.pathagar.com

আলোচনা প্রায় নিষিদ্ধ ছিল বলা চলে। এদেশে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ বা প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা সম্পর্কিত কোনো ধরনের সংস্থার অস্তিত্ব সম্পর্কে জনসাধারণের ধারণা রয়েছে বলে মনে হয় না। তাই এ বিষয়ে একজন বেসামরিক বিশ্লেষকের রূপরেখা প্রস্তাব ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনার সম্মুখীন হতে পারে। প্রকৃতঅর্থে বাংলাদেশের মতো নিরাপত্তা সমস্যায় জর্জরিত দেশের জন্য একটি সমালোচনামুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা উপস্থাপন অনেক কঠিন কাজ, কিন্তু যা সম্ভব তা হচ্ছে জাতীয় ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা নীতি প্রণয়নে এমন একটি রূপরেখা পরিবেশন করা যা নীতি নির্ধারকদের দিকনির্দেশনার ক্ষেত্রে চিন্তার খোরাক যোগাতে পারে।

স্বচ্ছতার অভাব ও নিশ্চিত স্বচ্ছতার প্রয়োজনীয়তা

দুঃখজনক মনে হলেও বাস্তবে সত্য যে, বাংলাদেশের তেমন বিঘোষিত সুস্পষ্ট কোনো নিরাপত্তা নীতি নেই। এদেশে নিরাপত্তা নীতির তেমন কোনো প্রকাশ্য মূল্যায়ন করা হয় নি বা সামরিক কলাকৌশল, রণনৈতিক বিষয়াদি সম্পর্কিত কোনোরূপ খোলাখুলি বিতর্কও অনুষ্ঠিত হয় নি। এও সত্য যে, প্রতিনিধিত্বশীল ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার পর গণতান্ত্রিক পরিবেশে সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ, সংগঠন বা বিভাগের সমন্বয়ে নিরাপত্তা নীতি সম্পর্কে আদৌ কোনো সমন্বিত পর্যালোচনা হয় নি। সরকারি বিভাগের কোনো পর্যায়ে দেশের বহিঃবন্ধন ও মৈত্রী সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা সমালোচনা এরূপ তথ্যও রয়েছে বলে জানা নেই।

এ পর্যায়ে বাংলাদেশের কূটনৈতিক ও পররাষ্ট্র নীতির অতীত কার্যক্রম কিছুটা পর্যালোচনার অপেক্ষা রাখে। দেশ স্বাধীন হবার পর বহুদিন যাবৎ দেশের জনগণ প্রতিবেশী শক্তি ভারতের সঙ্গে স্বাক্ষরিত একটি "বন্ধু প্রতিম" চুক্তির অস্তিত্ব সম্পর্কেই অবহিত ছিল না। সরকারের পক্ষ থেকে একটি বহিঃশক্তির সঙ্গে স্বাক্ষরিত এ ধরনের একটি চুক্তির অনুকূলে প্রয়োজনীয় সংসদীয় অনুমোদন নেয়ার প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হয় নি বা এ চুক্তির পক্ষে জনমতকে সংগঠিত করারও প্রচেষ্টা করা হয় নি। অথচ চুক্তির স্বাক্ষরের দিন থেকেই এটিকে কার্যকর করা হয়।

বেরুবারী ও তিনবিঘা বিনিময়ের ক্ষেত্রেও একই ধরনের কূটনৈতিক প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। দু'পক্ষের কূটনৈতিক দরকষাকষিতে প্রকৃত অর্থে জনগণকে বুঝতে দেওয়াই হয় নি যে, কি করে তিনবিঘার স্থায়ী ইজারার ব্যবস্থা নিশ্চিত না করে প্রতিবেশী দেশ ভারতকে বেরুবারী দিয়ে দেওয়া হয়। বহুকাল বাংলাদেশের জনগণ জানতো না যে কিভাবে এবং কোন্ পরিস্থিতির চাপের মুখে ১৯৭৪ সনে বাংলাদেশকে ফারাক্কা সংযোগ খাল খুলে দিতে হয়।

www.pathagar.com

অথচ এটা অবিদিত নয় যে, ভারত পাকিস্তান বৈরী সম্পর্কের প্রেক্ষাপটেই ফারাক্কা বাঁধের পরিকল্পনা গৃহীত ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলছিল। দেশের নেতৃবর্গ তাঁদের প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি সহকারে আদৌ কি কখনো ভেবেছিলেন যে এ বাঁধ দেশের জনগণের এক বৃহৎ অংশের জন্য কতখানি 'মরণ ফাঁদ' হিসেবে বিবেচিত হবে, ডেকে আনবে দেশের এক-তৃতীয়াংশের জন্য অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ভয়াবহতা। এমন কি দু'দেশের "বন্ধুপ্রতিম" সম্পর্কও এ বাঁধের ফলে বিষিয়ে ওঠে বিগত দু'দশককাল থেকে মুখ্যত এ বাঁধের সৃষ্ট কারণে।

অতি সাম্প্রতিককালে পর পর স্বাক্ষরিত দু'টো চুক্তি সম্পর্কেও একই ধরনের বক্তব্য প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হতে পারে। এর প্রথমটি ছিল ১৯৯৬-এর ডিসেম্বরে স্বাক্ষরিত 'গঙ্গা পানি চুক্তি'। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে অভ্যন্তরে খোলাখুলি বিতর্ক হয়েছে অতি সামান্যই। দু'দেশের মধ্যে পানি বিরোধের মধ্যে পটভূমি বাংলাদেশের পানির প্রয়োজনীয়তার ও জনগণের প্রত্যাশ্যা, সেই প্রত্যাশ্যা মেটানোর ক্ষেত্রে ভারতের সম্ভাব্য সাধ্য ও প্রক্রিয়াগত বিকল্প ব্যবস্থা, বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা ও এ নিয়ে বিরোধ দলগুলোর সঙ্গে মোটামুটি সমঝোতা--এ সকল বহুবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে গঙ্গা পানি চুক্তির সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা মূল্যায়নের অপেক্ষা রাখে। ১৯৯৭ সনের নভেম্বরে স্বাক্ষরিত 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি' সম্পর্কেও একই ধরনের বক্তব্য প্রযোজ্য। কেননা অভিযোগ রয়েছে যে ঐ এলাকায় বিদ্রোহী তৎপরতায় প্রতিবেশী ভারতের প্রত্যক্ষ সাহায্য ও ইন্ধন ছিল এবং এক্ষেত্রে স্বাভাবিক কারণেই ভারতের নিশ্চয়তা ছাড়া যথার্থই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে কিনা এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। আগে বিচার্য এক্ষেত্রে বিদ্রোহীদের মূল লক্ষ্য বা নীতিগত অবস্থান কি, কি তাদের রণনীতির বা রণকৌশল–তথাকথিত 'শান্তির' প্রক্রিয়া কি তাদের নীতিগত অবস্থানের পক্ষে না বাংলাদেশের বহু কষ্টার্জিত স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অনুকূলে? এসব বহুবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে খোলাখুলি বির্তক ও জাতীয় সমঝোতার মাধ্যমে কূটনৈতিক প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন হওয়া সমীচীন ছিল। তা কি হয়েছে? পক্ষান্তরে চুক্তি সম্পাদনের পরই শুধু বলা হয় সংসদে আলোচনা হয়ে, চুক্তি বাস্তবায়নে অন্যান্য প্রয়োজনীয় আইন সংসদ পাশ করবে। বস্তুত, সংসদে প্রায় একতরফা ভাবে সেই চুক্তি উপস্থাপিত হয় এবং প্রয়োজনীয় আইনও একই প্রক্রিয়ায় পাশ হয়। এ ধরনের প্রক্রিয়ায় দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ার চাইতে অধিকতর নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করে।

আরেকটি বক্তব্য যেটা সরকারের ধরন বা পরিবর্তন নির্বিশেষে প্রযোজ্য তা' হলো প্রতিরক্ষা খাত ও প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের ব্যয় নির্বাহের জন্য বাজেট বরাদ্দের বিষয়। নিরাপত্তার সার্বিক বিষয়ের মত এক্ষেত্রেও জনগণকে

www.pathagar.com

অন্ধকারে রাখা হয়। অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় সামরিক বাহিনীসমূহের খরচাদি ও প্রতিরক্ষা সম্পর্কে বাংলাদেশের কোনো সরকার জনগণের জনসমর্থন চায় নি এবং প্রসঙ্গে জনমতের আদৌ তোয়াক্কা করা হয় কিনা বলা মুশকিল।

উপর্যুক্ত বাস্তবতার নিরিখে এটা বলাই যথার্থ যে, যে কোনো নিরাপত্তা রূপরেখা প্রাসঙ্গিক হতে হলে নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে স্বচ্ছতা স্থাপন অপরিহার্য। নিরাপত্তা বিষয়াদি সম্পর্কে বাংলাদেশে প্রকাশ্য বিতর্ক ও আলোচনা নিষিদ্ধ ছিল। চিরদিনের মতো এ ধরনের পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে। জাতি নিরাপত্তার বিষয়ে নিরাপদ হতে হলে এটাই হবে প্রথম কাজ।

নিরাপত্তাহীনতার সংকট ঃ অস্তিত্ব ও দক্ষ প্রশাসন

স্বাধীনতার অব্যবহিত পর নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের অস্তিত্ব ও অবস্থান সম্পর্কে রাজনৈতিক-কৌলশলগত বিশ্লেষকদের ভবিষ্যদ্বাণী খুব একটা মধুর ছিল না। এ সম্পর্কিত সম্ভাব্য বিকল্প ধারণা ছিল এরূপ :[৩৭] বাংলাদেশকে হয় ভারতের কর্তৃত্ব গ্রাসে পড়তে হতে পারে, না হয় ভারতের মৈত্রীবন্ধনের বগলদাবায় আবদ্ধ হতে হবে, থাকতে হবে ভারতের ছত্রছায়ায়; অথবা আরেকটি বিকল্প হতে পারে ভারতীয় রাজ্য পশ্চিম বাংলার সঙ্গে পুনরেকত্রিত হওয়া অথবা বড় জোর ভারতের বাইরে বেরিয়ে এসে বৃহত্তর বাংলা নামে একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠন। এ ধরনের যে কোনো বিকল্প চিন্তাধারায় একটি জাতিরাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের অস্তিত্ব ও অবস্থান সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অবতারণা করে। এটা কিছুটা পরিহাস মনে হতে পারে, কেননা স্বাধীনতা অর্জনে বাংলাদেশের জনগণ বিশাল ত্যাগ ও বিসর্জন স্বীকার করে এবং এর জন্য এ জাতি অনেক গর্বও অনুভব করে। উপরন্তু, জাতিগত ও সাংস্কৃতিকভাবে বিশ্বে বাংলাদেশকে অন্যান্য দেশের চাইতে অনেক বেশি ঐক্যবদ্ধ বা সমরূপা গুণাবলী বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বলে প্রতীয়মান হবে।

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্নের অবতারণা সত্ত্বেও একটি জাতি-রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ এরই মধ্যে তার জন্মের পঁচিশ বছর পূর্তি উদযাপন করেছে এবং অতি শীঘ্রই এদেশ স্বাধীনতার দাবি নিয়ে আগামী শতক ও সহস্রাব্দীতে অনুপ্রবেশ করতে যাচ্ছে। কিন্তু উদ্বেগের কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের প্রায় বিপর্যস্ত অর্থনীতি, বিপন্ন পরিবেশ, বেড়ে চলা জনসংখ্যা, অস্থিতিকর রাজনীতি প্রভৃতি। এসব দিক থেকে জাতি এখনো গভীর সংকটের আবর্তে পতিত বলে মনে হয়, এবং এখনো নিদারুণ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

www.pathagar.com

নব স্বাধীনতা লব্ধ উন্নয়নকামী অনেক নতুন দেশের মতো বাংলাদেশের সমস্যাবলী আশঙ্কার উদ্রেক করে, এমন কি ভয়াবহ বলে প্রতীয়মান হতে পারে। ফলে যুক্তিতর্কের অবতারণা হতে পারে, দেখা দিতে পারে মতভিন্নতা। কিন্তু দেশের ভবিষ্যতের কথা ভাবতে গেলে মনে রাখতে হবে যুক্তিযুক্ত সমাধানের বিষয়। সমাধানের কিছু কিছু দিকনির্দেশনা এখানে দেয়া হয়েছে, আরো অনেকে হয়তো প্রস্তাবনা রাখতে পারেন। লক্ষ্য কিন্তু অভিন্ন হওয়া উচিত-যার মধ্যে থাকবে দেশের অখণ্ডতা ও জাতির সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সংরক্ষণ কিংবা থাকতে পারে জাতির মূল্য চাহিদা বা সুবিধা স্বচ্ছন্দের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য চিন্তাধারার প্রবর্তন।

জাতীয় নিরাপত্তাহীনতার মতো বিশদ ও ব্যাপকতর ধারণার ক্ষেত্রে আলোচনার প্রারম্ভেই উল্লেখ করতে হয় যে বাংলাদেশের প্রথম ও প্রধান সংকট হচ্ছে গণতান্ত্রিক প্রশাসনের নিশ্চয়তা। এ ক্ষেত্রে ব্যর্থতার উৎস হচ্ছে একটি জাতীয় সরকার হিসেবে সরকারের কর্মকাণ্ড ও আচরণ পরিচালনায় ব্যর্থতা। তারপর হচ্ছে আর্থনীতিক প্রশাসনে দক্ষহীনতা। এর পরিচয় মেলবে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর রিজার্ভ অবস্থা থেকে, শেয়ার বাজারের বিপর্যয়কর অবস্থা থেকে, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের দামের উর্ধ্বগতি থেকে, কর আদায়ে ব্যাপক ঘাটতি ও দুর্নীতি উপৎপাদন হ্রাস প্রভৃতি থেকে। এছাড়াও রয়েছে দ্বন্দ্বরত ও গভীরভাবে বিভক্ত আমলাতন্ত্র, রয়েছে আইন শৃংখলায় ক্রমঅবনতি, সন্ত্রাসমুখর শিক্ষাঙ্গন, নারী ও শিশুদের প্রতি অমানবিক, এমন কি নৃশংস আচরণ, বিপক্ষ রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সম্প্রীতি রক্ষা করে চলার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা।

এসব বহুবিধ বিপর্যয়কর অবস্থা ইঙ্গিত প্রদান করে যে বাংলাদেশের সরকার ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে দুর্বলতা কতখানি গভীর। এসব থেকে বেরিয়ে আসতে হলে প্রয়োজন জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ। একমাত্র সরকার ও প্রশাসন যন্ত্রের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের পক্ষেই সম্ভব দ্রুত কার্যকর পন্থা অবলম্বন করা যাতে সার্বিক নিরাপত্তাহীনতার সংকট থেকে অব্যাহতি মেলে, আস্থা সহকারে জাতীয় অস্তিত্বের প্রতি বহুমুখী হুমকি মোকাবিলা করা যায়।

এ প্রসঙ্গে আরো বলা প্রয়োজন যে, জাতির নিরাপত্তাহীনতার মোকাবিলা অবশ্যি হতে হবে গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে, যেখানে প্রতিটি স্থানে প্রতি কাজে সুশীল সমাজের গণতান্ত্রিক প্রত্যাশা সংরক্ষিত ও প্রতিফলিত হয়, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর থাকে। এ ক্ষেত্রে কাজ হচ্ছে নিশ্চয়তা প্রদান করা যাতে গণতান্ত্রিক সরকার যথার্থই জনগণের ইচ্ছার প্রতিনিধিত্বশীল হয়, একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের স্বার্থ-কোটর হিসাবে বিবেচিত না হয়। এ ধরনের নিশ্চয়তা প্রদান করতে হলে সরকারকে স্বচ্ছ হতে হবে, জবাবদিহি হতে হবে

www.pathagar.com

জনগণের কাছে, দৃঢ় প্রত্যয়ী হতে হবে জাতির চূড়ান্ত স্বার্থের সংরক্ষণ ও উন্নয়নে।[৩৮] এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য, তা'হলে দেশে বেসরকারি সংস্থাসমূহের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা। সরকারের ব্যর্থতা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার অভাবের ফলে, প্রায়শ আন্তর্জাতিক দাতাদেশ ও সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতায়, অসংখ্য বেসরকারি সংস্থা জন্ম লাভ করে। বর্তমানে এদের অবকাঠামো সারা দেশে বিস্তৃতি লাভ করেছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে এদের মধ্যেও সমস্যা প্রকট, কিন্তু ১৯৯৬ সনের নির্বাচন কালে এবং তার পূর্বে এদের সুবিশাল প্রভাব পরলক্ষিত হয়। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবে দেশের নিরাপত্তা বিষয়ে অনেকে শঙ্কিত, কেননা বিশেষত এদের রয়েছে বহিঃযোগসূত্র। তাই এদের কর্মকাণ্ডেরও স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতা সুনিশ্চিত করতে হবে।

নিরাপত্তা পরিবেশ ঃ বৃহত্তর পরিমণ্ডল

সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে, নিরাপত্তা ধারণা ঐতিহ্যিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ককে প্রভাবিত করে চলছে। এ অঞ্চলে নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি সম্পর্কের অন্তর্নিহিত ধারায় সম্পৃক্ত। এ ধরনের অনুভূতির উৎস হচ্ছে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুপ্ত অবিশ্বাস, আর এ অবিশ্বাসে ভিত্তি হচ্ছে পারস্পরিক আচরণের ধারা ও মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে নিজ নিজ প্রত্যক্ষজ অনুভূতি।[৩৯] এক্ষেত্রে এ অঞ্চলের রাজনীতি ও আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ককে প্রভাবিত করছে 'দারিদ্র্য-পরিবেশগত অবক্ষয়-দারিদ্র্যের' মতো এক দুষ্টচক্র। ফলে এ অঞ্চলে স্থিতিশীল সরকারের সম্ভাবনা কম, বিস্তার করছে উদাসীনতা, হতাশা ও নৈরাশ্য। এ সুযোগে স্বার্থান্বেষী ও শক্তিশালী ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠী এমন ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে চলছে যাতে তারা তাদের পেশি-শক্তি ও জোরজবরদস্তীমূলক পন্থা ব্যবহার করে, নিজেদের ইচ্ছা জাতির ওপর চাপিয়ে দেয়া যায়, প্রয়াসী হয় যাতে বিশেষ বিশেষ বিষয়সমূহের ভাগ্য নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী নির্ধারিত করা চলে।[৪০] ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির অন্তর্ধানের পর থেকে বাংলাদেশের জনগণ উপর্যুক্ত সকল পদ্ধতির শিকার হয়েছে। তাই বাংলাদেশ ও তার দক্ষিণ এশীয় প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে সৌহার্দ্য ও স্থিতিশীল সম্পর্ক স্থাপনে ঐতিহ্যিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার পরিবর্তে একটি সারগ্রাহী নিরাপত্তা রূপরেখা বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। সর্বদিকগত এই রূপরেখায় আদর্শিকভাবে গ্রহণযোগ্য নিরাপত্তা নির্ণয়ে জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে পারস্পরিক ও সহযোগিতামূলক নিরাপত্তা মডেল বা দৃষ্টিকোণ যথাযথ উপযোগী বা সংমিশ্রিত ভূমিকা রাখতে পারে।

www.pathagar.com

এটা বহুদিন থেকে স্বীকৃত যে, বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা সমস্যা কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। প্রয়োজন হচ্ছে যৌথ দৃষ্টিকোণ গ্রহণের পরবির্তে সহযোগিতামূলক কর্মপন্থা গ্রহণ করা। এ অঞ্চলে একটি মৌলিক সমস্যা সচ্ছল জাতি গঠন। জাতিগঠনের এ প্রক্রিয়ায় আশাহীন ও বিভক্ত নিরাপত্তা উপাদানের পরিবর্তে একটি আত্মরক্ষামূলক, অভিন্ন ও আশাপ্রদ গতিময়তা সঞ্চার করা হচ্ছে একটি বড় কাজ। এ অঞ্চলের সকল রাষ্ট্রের ভুললে চলবে না যে, বিশ্বের উঠতি পরাশক্তি চীন হচ্ছে এর অতি সন্নিকট। তাই উভয়ের অবস্থান সংবেদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। ঐতিহাসিক ও ভূ-রাজনৈতিক কারণে দক্ষিণ এশিয়ায় চীনাদের বিশেষ আগ্রহ রয়েছে এবং একই সঙ্গে অতি সাম্প্রতিক কৌশলগত কারণে সেই আগ্রহ হয়েছে গভীরতর।[৪১]

ঐতিহাসিক বিবর্তন ও ঐতিহ্যগত নিরাপত্তা দৃষ্টিকোণ

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বিগত আটাশ বছরকালব্যাপী এদেশের জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়ে আসছে। স্বাধীনতার অব্যবহতি পর পর বাংলাদেশের নিরাপত্তা ছিল বহিঃশক্তির সঙ্গে যোগসূত্রভিত্তিক প্রতিবেশী বৃহৎ শক্তির সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তিভিত্তিক ছিল এই মৈত্রী সংযোগ। সেই মৈত্রী বন্ধন বাংলাদেশকে কম্যুনিস্ট প্রাচ্যের জোটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ করে তোলে। অবশ্য কিছুকাল পরেই অন্তত আঞ্চলিকভাবে হলেও, বাংলাদেশ কিছুটা স্বতন্ত্র অবস্থান গ্রহণে প্রয়াসী হয়। ১৯৭৫ সনে সরকার পরিবর্তনের ফলে পূর্ববর্তী সময়ে নিরাপত্তা দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় সম্পূর্ণরূপে পরিবতির্ত হয়। স্পষ্টতই একটি মুসলিম বিশ্ব ও পশ্চিমা ঘেঁসা পররাষ্ট্র ও নিরাপত্তা নীতি পরিলক্ষিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই প্রতিবেশী মিত্রদেশ ভারত বাংলাদেশের এই মুসলিম মধ্যপ্রাচ্য ও পশ্চিমা ঘেঁসা নীতিকে দক্ষিণ এশিয়ার ভারতবিরোধী শক্তিসাম্য নীতি ভিত্তিক নিরাপত্তা প্রবণতা হিসেবে দেখে, রুষ্টও হয় এতে। বাংলাদেশ ভারত সম্পর্কে ১৯৭৫-এর পরবর্তী তিক্তধারা দু'দেশের ভিন্নতর নিরাপত্তা প্রত্যক্ষজ অনুভূতি প্রসূত ঃ বাংলাদেশ চায় দক্ষিণ এশিয়ায় ও বৃহত্তর বিশ্বে অধিকতর সক্রিয় ও স্বতন্ত্র নিরাপত্তা ভূমিকা গ্রহণ করতে, আর ভারত অবশ্যই চায় নি যে ক্ষুদ্রতর মিত্রদেশ বাংলাদেশ নয়াদিল্লীর বাহুবন্ধন থেকে বেরিয়ে এসে স্বতন্ত্র ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে।[৪২] উভয়ের নিরাপত্তা দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নিজ নিজ নিরাপত্তা স্বার্থজনিত, নিজ নিজ দেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারিরা তাদের স্বদেশের নিরাপত্তা স্বার্থকে দেখেছেন মুখ্যত নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে, স্বতন্ত্রভাবে। পারস্পরিকতা, সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি বা সমঝোতার অভাব ছিল উভয়ের ক্ষেত্রেই।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের পক্ষে এটা মনে রাখা সমীচীন যে, উপমহাদেশের ঐতিহ্যগত নিরাপত্তা ধারাপ্রবাহ বা অমোচিতনীতি পর্যায়ের অনুকরণে বাংলাদেশ কোনোক্রমেই ভারত-পাকিস্তানের আক্রমণমুখী-প্রতিরক্ষামূলক রণনীতি গ্রহণে প্রবৃত্ত হতে পারে না। আরো বোকামির শামিল হবে যদি বাংলাদেশ কখনো বড় ধরনের প্রতিরক্ষা বাজেট বরাদ্দ ও স্নায়ুযুদ্ধের প্রতিযোগী পারমাণবিক নিবারণের ধারাভিত্তিক চূড়ান্ত ধ্বংসযজ্ঞের অস্ত্র উন্নয়নের বিষয় নিয়ে ভাবনা-চিন্তায় প্রবৃত্ত হয়। অবশ্য বাংলাদেশের আর্থিক সীমাবদ্ধতার বিষয় অবিদিত নয় কিংবা এ ধরনের কাজে প্রবৃত্ত হবার মতো বাংলাদেশের একইরূপ উদ্দেশ্যগত কারণও নেই। তবু এমন কি বাংলাদেশের মতো দেশের ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক কূটনৈতিক পর্যায় হলেও, নিবারকের সার্বিক উদ্দেশ্যের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে, বিশেষ করে সম্ভাব্য শত্রুর আক্রমণমূলক পরিকল্পনা বানচাল করা বা প্রতিপক্ষকে নিবৃত্ত করা হতে হবে যে কোনো নিরাপত্তা নীতির লক্ষ্য।

এ প্রসঙ্গে আরো মনে রাখা বাঞ্ছনীয় যে, আন্তর্জাতিক রাজনীতির অনিশ্চিত অঙ্গনে সতত সতর্ক থাকা এখনো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটাই হচ্ছে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ এবং এই রক্ষাকবচ হিসেবেই সামরিক প্রতিরক্ষা এখনো অপরিহার্য বলে বিবেচিত। সামরিক বাহিনীর প্রয়োজন নেই–এ ধরনের বক্তব্যের অর্থ হতে পারে হাত জোড় করে আত্মসমর্পণ করা, অপ্রস্তুত হয়ে থাকা এমনিভাবে যাতে অপ্রতিসম শক্তির নির্দেশ বা ইচ্ছার কাছে নতজানু হওয়া যায়।

বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিতর্কে এ প্রশ্নটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার অপেক্ষা রাখে, কেননা কিছু কিছু মহল থেকে এ ধরনের বক্তব্য এসেছে যে, বাংলাদেশে জাতীয় সেনাবাহিনীর তেমন কোনো প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব নেই।

অবশ্যই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কূটনীতির ঐতিহ্যগত ভূমিকা বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। কূটনীতির কাজেই হচ্ছে সামরিক শক্তির প্রতিরক্ষা বা আক্রমণধর্মী রুক্ষ দিকগুলো পরিহার করে আন্তর্জাতিকভাবে বন্ধুপ্রতিম সমর্থন ও সহানুভূতি আদায় করা যাতে প্রতিকূল আঞ্চলিক প্রতিবেশে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বৃহত্তর পরিমণ্ডলে নিরাপত্তা স্বার্থের অনুকূলে অবস্থার সমাবেশ ঘটানো যায়। বাংলাদেশকেও এ বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার বিষয়

পরিবেশগত দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের মতো দেশ বর্তমানে প্রচণ্ড নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের নিরাপত্তাহীনতার কারণ বহুবিধ ঃ এর আয়তন, ভূ-প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য এবং আঞ্চলিক নদীর ভাটি বা নিম্নভাগে এর ভৌগোলিক অবস্থান। বিশ্বের বৃহত্তম নদীব্যবস্থার সংযোগস্থলে বাংলাদেশের অবস্থান, কিন্তু সম্প্রসারিত ব-দ্বীপ এদেশে সংশ্লিষ্ট এশীয় নদী ব্যবস্থার মাত্র আট ভাগ নদী অঞ্চল এর ভেতরে প্রবাহিত হয়। এই নদী ব্যবস্থার সুবিশাল উপরিভাগ বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণের বাইরে–ভারত, নেপাল ও ভুটানে। অথচ এসব দেশে বিগত কয়েক দশকে ব্যাপক হারে বন উজাড় হয়েছে। ফলে বাংলাদেশে পাললিক চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে মারাত্মক হারে এবং বহুবিধ প্রকৃতি-পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বাংলাদেশকে।[৪৩]

বাংলাদেশের আরো গভীরতর পরিবেশগত সমস্যা রয়েছে। এদেশে বর্তমান মাথাপিছু আয় আনুমানিক হচ্ছে ২৬৫ ডলার। এদিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বের দারিদ্র্য তালিকার শীর্ষভাগে। পৃথিবীর ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যেও বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে। এদেশের জনসংখ্যার পরিমাণ প্রায় ১১৫ মিলিয়ন। এ জনসংখ্যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার প্রায় আধাআধি, অথচ আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশ মাত্র নিউ ইয়র্কের আয়তনের মতো, ইংল্যান্ডের চাইতে তেমন একটা বড় নয়। বিশ্বব্যাংকের হিসেবে ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের জনসংখ্যা হবে ১৭০ মিলিয়ন এবং ২০২৫ সালে এ সংখ্যা দাঁড়াবে ২০৫ মিলিয়নে। এই সীমিত ভৌগোলিক এলাকায় ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলা জনসংখ্যার ভরণপোষণ যোগানো বিশাল কাজ। তদুপরি, দেশের পাঁচ ভাগের এক ভাগ নদীনালা ও প্রণালী নিয়ে গঠিত। বর্ষা মওসুমে নদী থেকে উপচেপড়া পানির বন্যায় সমুদ্রের প্রচণ্ডতা ও উপকূল ভাগের ঢেউ তরঙ্গ থেকে প্রতি বছর বাংলাদেশ উপর্যুপরি জলোচ্ছ্বাস ও বন্যার ফলে জনগণের ভোগান্তির অন্ত নেই।[৪৪]

অন্যদিকে বাংলাদেশ মারাত্মকভাবে পানি নির্ভরশীল এবং নদীগুলোর উপর ভাগে প্রাকৃতিক জলপ্রবাহে হস্তক্ষেপ এদেশের অর্থনীতির জন্য ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তার ব্যাপক নদী ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ করার অক্ষমতায় একটি হতাশাগ্রস্ত অনুভূমি বা চিত্র বিরাজ করছে। ফলে দেশের পানি ব্যবস্থাপনার নীতি কৌশল প্রণয়নের কাজ অত্যন্ত কঠিন বলে বিবেচিত। এসব ক্ষেত্রে ভারতকে প্রধান অন্তরায় হিসাবে দেখা হচ্ছে, কেননা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবাহিত ৫৭টি নদ-নদীর মধ্যে ভারত ও বাংলাদেশ ৫৪টি নদীর অংশভাগী। ভারত এসব নদীর উপরিভাগে অবস্থিত হওয়ায় তার পক্ষে এসব নদীতে বাঁধ দিয়ে শুষ্ক মওসুমে পানি প্রবাহ সরিয়ে

www.pathagar.com

নেওয়া সহজ হচ্ছে এবং অধিকভাগ ক্ষেত্রে ভারত বাংলাদেশের স্বার্থ বা মতামতের তোয়াক্কা করছে না।

এসব কারণে বাংলাদেশে ব্যাপক ক্ষোভ রয়েছে যে, ভারত বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করতে প্রয়াসী। বিগত পঁচিশ বছরব্যাপী দু'দেশের পানি কূটনীতির ইতিহাস কার্যত ছিল বাক-বিতণ্ডাপূর্ণ তর্ক-বিতর্কের শামিল।[৪৫] দু'দেশের পঁচিশ বছরের "বন্ধুপ্রতিম" সম্পর্কের কালে (১৯৭২-১৯৯৭) ভারত কর্তৃক পানিপ্রবাহ প্রত্যাহারের ফলে বাংলাদেশের ক্ষয়ক্ষতির তালিকায় রয়েছে লবণাক্ত, পলিজমা, মাটিক্ষয়, বন্যা, মরুকরণ ও বনউজাড়করণ প্রভৃতি। ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬ তারিখে দু'দেশের মধ্যে ত্রিশ বছর মেয়াদি গঙ্গা পানিচুক্তি সম্পাদিত হয়েছে বটে, কিন্তু ঐ চুক্তি বহুল প্রচারিত তার মেয়াদের প্রথম বছরেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বাংলাদেশকে পানির হিস্যা প্রদানে ব্যর্থ হয়।

বাংলাদেশ-ভারত পানির হিস্যা বা বন্টন সংক্রান্ত সমস্যা বাংলাদেশের পরিবেশ ও অর্থনৈতিক সমস্যার একটি দিক মাত্র। এর চেয়েও গুরুতর সমস্যা হচ্ছে 'গ্রীনহাউজ প্রতিক্রিয়ার' ফলশ্রুত সমুদ্রের পানি পর্যায়ের বাড়তি চাপ। ফলে বাংলাদেশে সমুদ্র উপকূলভাগস্থ জেলাগুলোতে ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও টাইফুনের প্রবণতা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং এর ফলে বিভিন্ন ধরনের ক্ষয়ক্ষতি দেশের অন্যান্য জেলাগুলোকেও প্রভাবিত করবে, বৃদ্ধি করবে জনগণের নিরাপত্তাহীনতার উদ্বেগ। বেঁচে থাকার সংগ্রাম করবে তীব্রতর।[৪৬] অনেক স্বতন্ত্র গবেষক ও ভবিষ্যতদ্রষ্টা পণ্ডিতদের মতে আগামী কয়েক দশকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ভূমি ও খাদ্যদ্রব্য সংক্রান্ত চাপ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে সংকটের রূপ পরিগ্রহ করবে। ফলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ থেকে জনসংখ্যার অভিপ্রয়াণ বা বিদেশগমনের হার অতীতের যে কোনো সময়ের চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ রূপ ধারণ করতে পারে।

বিশ্বে বাংলাদেশ ভয়াবহ দুর্ঘটনা ও বিপর্যয়ের দেশ হিসেবে পরিচিত। জনসংখ্যার চাপ, দারিদ্র্য, ভূমিহীন সমস্যা, আবহাওয়া পরিবর্তন, গ্রীনহাউজ প্রতিক্রিয়া-বিশ্বের তাপবৃদ্ধি এবং উভয়বিধ কারণে সমুদ্রের পানি পর্যায়ের উচ্চ চাপবৃদ্ধি–প্রভৃতিসহ পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহের অভাবের ফলে প্রতিবেশী ভারতের দিকে ব্যাপক হারে বাংলাদেশী উদ্বাস্তুদের যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে।[৪৭] বাস্তুহারা বাংলাদেশী জনমানুষের ভারতের দিকে এভাবে সম্ভাব্য যাত্রার প্রয়াস উভয় দেশের জটিল নিরাপত্তা সম্পর্ককে জটিলতর করে তুলতে বাধ্য।[৪৮] এসব পরিপ্রেক্ষিত উভয় দেশের নিরাপত্তা নীতি নির্ধারকদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে দৃষ্টি রাখতে হবে বাস্তবভিত্তিক নিজ নিজ নিরাপত্তা নীতি প্রণয়নের দিকে।

www.pathagar.com

অবশ্য উপর্যুক্ত পরিবেশগত ও মানবিক সমস্যাবলীর নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট ফলাফল প্রকৃতভাবে নির্ধারণ করা কঠিন, কেননা ব্যাপক আকারে দারিদ্র্য, অদক্ষ অর্থনীতি ও অসম সামাজিক ব্যবস্থার মতো অনেক প্রবহমান চলক পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখতে পারে। এসব চলকের যে কোনো একটি রাষ্ট্র ও সমাজের স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে এবং পরিবেশগত নিরাপত্তাহীনতার ক্ষেত্রে অধিকতর জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে।[৪৯]

এ ধরনের ব্যাপক ও গভীর সমস্যাবলির মোকাবিলায় বাংলাদেশ এককভাবে কি করতে পারবে কল্পনা করাও কঠিন। কেননা এ ধরনের ব্যাপক আকারের হুমকি, আঞ্চলিক ও বিশ্ব পরিমণ্ডল ব্যাপ্ত সমস্যাবলির মোকাবিলায় একটি জাতি-রাষ্ট্র অতি ক্ষুদ্র দৃশ্যপট মাত্র। বহুমাত্রিক ও বহুরূপা নিরাপত্তা হুমকির মোকাবেলায় দ্বি-পাক্ষিক, উপ-আঞ্চলিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমষ্টিগত প্রয়াস অত্যাবশ্যক।

বাংলাদেশ ও আঞ্চলিক নিরাপত্তার নিয়তি

বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা সম্পর্কিত আলোচনা এক্ষেত্রে পুনর্বার দৃষ্টি নিবদ্ধ করছে আঞ্চলিক নিরাপত্তা সমস্যাবলীর দিকে। এ প্রসঙ্গে নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট মনস্তাত্ত্বিক বা প্রত্যক্ষজ অনুভূতির বিষয়সমূহও উত্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, কেননা এসব সমস্যা বাংলাদেশ ও প্রতিবেশী দেশসমূহ উভয়ের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশের নিরাপত্তা সংক্রান্ত উপাদানগুলি জটিল ও বহু পর্যায়ে বিভক্ত। একথা বিশেষ করে ভারত ও পাকিস্তান–উপমহাদেশের দু'টি বৃহৎ শক্তির অবস্থান সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। পাকিস্তানের দৃষ্টিকোণ থেকে, ঐতিহাসিক কাল থেকে তার ওপর কিছুটা ভূ-কৌশলগত নিয়তি নির্ধারিত দায়িত্ব অর্পিত হয়। এ দায়িত্বের সূত্র হচ্ছে পুরনো ব্রিটিশ-ভারতীয় সাম্রাজ্যের পশ্চিম ও উত্তর দ্বারপ্রান্তে পাকিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থান। এখানেই সম্প্রসারণবাদী ব্রিটিশও রুশ সাম্রাজ্য দু'টি পরস্পরের মুখোমুখি হয়, বড় ধরনের সাম্রাজ্যের খেলায় মত্ত হয় 'কিম, কিপলিং ও কার্জন'। পরবর্তীকালে পাকিস্তান প্রাচ্য-পাশ্চাত্য স্নায়ুযুদ্ধের সংকটকালে 'বাগদাদ চুক্তি' ও 'কেন্দ্রীয় চুক্তি সংস্থা' বা সেন্টোতে যোগদান করে। আরো পরে পাকিস্তান আফগানিস্তানে সোভিয়েত হামলা মোকাবিলায় বিশেষ তাৎপর্যবহ ভূমিকা পালন করে। এসব ধরনের সকল কৌশলগত পর্যায় ও দ্বন্দ্বে বিজড়িত হতে গিয়ে সার্বিকভাবে পাকিস্তানীদের একটি মৌলিক প্রত্যক্ষজ অনুভূতি ছিল যে, উপমহাদেশে রুশ/ সোভিয়েত অগ্রাভিযান রোধে তাদের দেশের একটি বড় দায়িত্ব রয়েছে, নিজেদের তারা মনে করে খাইবার পাসের রক্ষক হিসাবে।[৫০]

www.pathagar.com

ভারতের কৌশলগত প্রত্যক্ষজ অনুভূতি ভিন্ন প্রকৃতির। ভারত পাকিস্তানকে দেখে একটি "নাশকতা প্রবণ" রাষ্ট্র হিসেবে অথবা, খুব ভালোভাবে বলতে গেলে, বড় জোর এ রাষ্ট্র হচ্ছে একটি "দুর্বল বাফার" মাত্র। ভারত নিজকে দেখে উপমহাদেশে কর্তৃত্ব হলো প্রধান ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের স্বাভাবিক উত্তরসূরি হিসেবে। নয়াদিল্লীর সমস্যা দাঁড়ায় স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ভারত গ্রেট বৃটেন হতে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ভারতের বৃহৎ শক্তিসুলভ স্বকীয় গুণাবলী বা মানদণ্ডেরও অভাব রয়েছে। তাই বৃহৎ শক্তির মর্যাদা লাভে ভারতকে বৃহত্তর শক্তির মুখাপেক্ষী হতে হয়। বিশেষ করে ভারত তার বৃহৎ শক্তির ভাবমূর্তি বৃদ্ধিকল্পে মস্কোর রাজনৈতিক ও সামরিক সাহায্য সমর্থন লাভে প্রয়াসী হয়। যদিও ভারত নিজকে একটি ঐতিহ্যিক মর্যাদাসম্পন্ন জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে উপস্থাপনেও তৎপর ছিল।[৫১]

এটা নিশ্চয় করে বলা চলে যে, দক্ষিণ এশিয়ার শক্তিদ্বন্দ্বে রত দু'টো আঞ্চলিক বৃহৎ শক্তি ক্ষমতার কাছাকাছি কোথাও বাংলাদেশের অবস্থান নেই। এ অঞ্চলের "সবচেয়ে নবজাত শিশুরাষ্ট্র"[৫২] হিসেবে বাংলাদেশের ন্যূনতম হলেও আত্মমর্যাদা থাকা সমীচীন। কেননা স্বাধীনতার জন্য এদেশের জনমানুষ অনেক রক্ত দিয়েছে, স্বীকার করেছে অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা ও বিসর্জন। উপরন্তু, দেশের জনগণ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সীমারেখার মধ্যে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে তাদের দেশকে অখণ্ড রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চায়। উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে ভৌগোলিক ও কৌশলগতভাবে বাংলাদেশকে পাকিস্তানের উত্তরসূরি রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে, কেননা সেই ঐতিহ্যিক সূত্রে বাংলাদেশ পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে উপকূলভাগস্থ সীমানা লাভ করেছে। একইসঙ্গে, বাংলাদেশ দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করেছে এবং এ কারণে এই দু'অঞ্চলের ঐতিহাসিক নিরাপত্তা সম্পর্কে বাংলাদেশ কিছুটা যোগসূত্র স্থাপন করতে পারে।

বাংলাদেশের নিরাপত্তা উদ্বেগের ক্ষেত্রে দু'টো বহিঃউপাদান গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত। দু'টোই সূত্রপাত হয় দুটি প্রতিবেশী দেশ থেকে। দক্ষিণ-পূর্ব কোণের দিকে বাংলাদেশের অভিন্ন সীমানা রয়েছে প্রতিবেশী দেশ মায়ানমার বা বার্মার সঙ্গে। বাংলাদেশের জন্য মায়ানমারের ভৌগোলিক অবস্থান কৌশলগতভাবে সুবিধাজনক, কেননা মায়ানমারের অবস্থানের কারণেই বাংলাদেশের পক্ষে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সেতুবন্ধন সম্ভব। কিন্তু প্রতিবন্ধক হচ্ছে মায়ানমারের নিপীড়নমূলক সামরিক সরকার। এ সরকারের নির্যাতনে অতীষ্ঠ হয়ে বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন মায়ানমারের আরাকান

www.pathagar.com

প্রদেশ থেকে দু'দুবার রোহিঙ্গা নামক প্রায় আড়াই থেকে তিন লাখ সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিবাসী বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। এদিক থেকে বাংলাদেশের প্রতি কোনো ধরনের নিরাপত্তা হুমকি আসতে পারে সম্ভবত ঢাকা তা' কখনো কল্পনাও করে নি। কিন্তু মায়ানমারের সামরিক শাসক গোষ্ঠীর শত্রু চেহারা যে কত নিষ্ঠুর হতে পারে তার পরিচয় মেলে ১৯৯১ সনে বাংলাদেশের সীমান্ত ঘাঁটিতে অতর্কিত হামলা থেকে। নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীগুলো যে কতখানি অপ্রস্তুত থাকে তার প্রমাণ হয়। সেই হামলার ঘটনা থেকে কেননা মায়ানমারের বাহিনীর সেই অতর্কিত আক্রমণের কোনোরূপ সদুত্তর প্রদানে তারা ব্যর্থ হয়।

অতি সম্প্রতি অবশ্য মায়ানমার বাংলাদেশের সঙ্গে একটি নতুন উপ-আঞ্চলিক জোটের সদস্য হয়েছে। এ জোটে বাংলাদেশ, মায়ানমার (প্রথমে আসে পর্যবেক্ষক হিসেবে, পরে সমস্যপদ গ্রহণ করে) ভারত, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড (বিমস্ট্যাক) যৌথভাবে অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। কিন্তু মায়ানমারের সামরিক সরকারের নিমন্তম আচরণের দৃষ্টান্ত রয়েছে অনেক। বিশেষকরে বাংলাদেশের সীমান্তের অভ্যন্তরস্থ অনেক তাবুতে হাজার হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থী এখনো মানবেতর জীবন যাপন করছে যারা সেই দেশের সামরিক জান্তার নিষ্ঠুরতার শিকার হয়ে এদেশে এসেছে এবং কিছুতেই আর ফিরে যেতে চাচ্ছে না সে দেশে। এসব অভিজ্ঞতার কারণে বাংলাদেশ তার পূর্বপ্রান্তের দিকে নিরাপত্তার বিষয়ে সজাগ না হয়ে পারে না।

বাংলাদেশের নিরাপত্তা প্রশ্নে আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে "ভারত প্রসঙ্গ"। বাংলাদেশের নিরাপত্তা নীতি প্রণয়নে ভারত প্রায়শ পূর্বাভাস হিসেবে কাজ করে। পশ্চিম, উত্তর ও উত্তর-পূর্ব-এ তিনদিক থেকে ভারত বাংলাদেশকে ঘিরে রয়েছে এবং দক্ষিণ দিকে উপকূল ভাগের পানির ওপার থেকে বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত ভারতীয় বাহিনী তাদের নৌ তৎপরতার দ্বারা বাংলাদেশকে প্রহরাধীন রাখছে। এভাবে নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ কার্যত "ভারতবন্দি" বলে বিবেচিত।[৫৩] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক ছিল অংশদারীত্বভিত্তিক। মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পর দু'দেশ মৈত্রী সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয় বটে, কিন্তু এই উভয়বিধ সম্পর্ক অচিরেই পারস্পরিকভাবে কঠোরতার বা বৈরীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গিতে রুপান্তরিত হয়। ফলে বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়া বেশ ব্যাহত হয়।

বাংলাদেশের প্রত্যক্ষজ অনুভূতিতে পরিবর্তনের কারণ বহুবিধ। গঙ্গায় ফারাক্কা বাঁধসহ অন্যান্য নদীতে বাঁধ দিয়ে পানি প্রত্যাহারের ফলে বাংলাদেশে এর প্রভাব ও জনমনে প্রতিক্রিয়া, চুক্তি স্বাক্ষর সত্ত্বেও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী

www.pathagar.com

শুকনো মওসুমে পানি নিশ্চয়তা প্রদানে ব্যর্থতা, বাংলাদেশের গোলযোগপূর্ণ অথচ কৌশলগতভাবে গুরুত্ববহ পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসমূহে ভারতের ইন্ধনে সৃষ্ট বিদ্রোহী তৎপরতা এবং সম্প্রতি (১৯৯৮) ভারতের উৎসাহে এমন একটি শান্তি চুক্তি সম্পাদন– যার ফলে দেশের বৃহত্তর জমানুষের মধ্যে দ্বিধা-বিভক্তির উদ্রেক ঘটে ইত্যাদি বিষয় বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে ভারতের ভূমিকা সম্পর্কে তিক্ত মনোভাব সঞ্চার করে। তদুপরি, বাংলাদেশের উপকূলভাগে নতুন জেগে ওঠা দ্বীপগুলো নিয়ে দু'দেশের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। অথচ ভারত একতরফাভাবে বিবদমান দ্বীপগুলোতে তার নৌবাহিনী পাঠিয়ে দখলদার হিসেবে অবস্থান গ্রহণ করে। বাংলাদেশে অনেকেই একে নিরাপত্তা হুমকি হিসেবে দেখছে। এছাড়া 'বঙ্গভূমি আন্দোলন' নামে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে ভারত থেকে ইন্ধন যোগান, বাংলাদেশের সীমানা প্রান্তে ভারতের বহুল-প্রচারিত কাঁটাতারের বেড়াস্থাপনের পরিকল্পনা এবং ভারতে তথাকথিত বসতিস্থাপনকারী বাংলাদেশীদের প্রায়শ নির্মমভাবে জোরসোর প্রচারণা সহকারে 'ফেরৎ পাঠানো অভিযান' প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশে অধিকতর ভয়ভীতি জনিত প্রত্যক্ষজ নিরাপত্তা অনুভূতি সঞ্চার হয়।

পরিশেষে, বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় প্রহরার কাজে নিয়োজিত বাংলাদেশ রাইফেল্‌স (বি.ডি.আর.) ও সীমান্ত এলাকায় বসবাসরত বেসামরিক জনগণের ওপর ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর (বি.এস.এফ) যখন তখন সূচালো রণকৌশল অবলম্বন, যা বাংলাদেশে ভারতের প্রতি বন্ধুপ্রতিম সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও অব্যাহত রয়েছে। ফলে দু'দেশের সম্পর্কে এখনো সন্দেহ, অবিশ্বাস ও নিরাপত্তাহীনতার ধারা অব্যাহত রয়েছে।

ভারত ছাড়া বাংলাদেশের আরো কতিপয় ক্ষুদ্রতর প্রতিবেশী দেশ রয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে ভূটান ও নেপাল। একই ধরনের প্রতিবেশ - প্ররিবেশগত সমস্যা, অভিন্ন নদী ও পানির সূত্র বন্ধন এবং একই ধরনের নিরাপত্তা সংক্রান্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশকে এ দু'টো দেশের কাছাকাছি এনেছে। রাষ্ট্র হিসেবে সিকিমের অদৃষ্টের বিপাক ও নিরাপত্তার পরিহাস এসকল ক্ষুদ্রদেশকে তাদের নিরাপত্তাহীনতা সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেয়া। এ অঞ্চলের বাইরে অথচ আঞ্চলিক সীমারেখার কাছাকাছি রয়েছে একটি বৃহৎ শক্তি চীন, "প্রতিবেশীর প্রতিবেশী" এবং মান্দালা তত্ত্বে নির্দেশিত নীতি অনুযায়ী অবশ্যই চীন বিবেচিত হবে বাংলাদেশীর বন্ধু হিসেবে। প্রকৃতঅর্থে দক্ষিণ এশিয়ায় চীন ও বাংলাদেশ উভয় দেশের অনেকটা একই ধরনের প্রত্যক্ষজ নিরাপত্তা অনুভূতি রয়েছে। ঐতিহ্যিকভাবে বাংলাদেশের পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল রণাঙ্গন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বস্তুত তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের

www.pathagar.com

অবস্থানের কারণেই যুক্তিযুক্তভাবে পাকিস্তান তৎকালীন (এখন অবলুপ্ত) 'দক্ষিণ পূর্ব এশীয় চুক্তি সংস্থা' বা সিয়াটোতে বিজড়িত হয়।

এভাবে বাংলাদেশের বর্তমান সীমারেখার ঐতিহাসিক ভূমিকা বিবেচনা করে এবং অতি সাম্প্রতিককালীন ভূ-রাজনৈতিক ও ভূ-অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এদেশের নিরাপত্তা পরিবেশও জটিল এবং বহুপর্যায় মন্ডিত বলে মনে হবে। একটি ক্ষুদ্রশক্তি হিসেবে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিকল্প মডেল এমন হওয়া সমীচীন যাতে কর্তৃত্ব ও আধিপত্যের সম্ভাব্য ছোবল থেকে নিজকে মুক্ত রাখতে কূটনীতি ও পররাষ্ট্রনীতির মনোরম কলাকৌশল ব্যবহার করে দেশ নতুন নতুন মৈত্রীবন্ধনের সংস্পর্শে আসতে পারে।

সম্প্রীতি-সতর্কতা সমন্বিত নিরাপত্তা রণনীতি ও মূল্যবোধ

ঐতিহ্যিক নিরাপত্তা চিন্তাধারার ক্ষেত্রে ভৌগোলিক ভয়ভীতিজনিত প্রত্যক্ষজ অনুভূতি, বিশেষত বাংলাদেশের "ভারতবন্দি" নিরাপত্তা অবস্থানের প্ররিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করে মনে হবে যে, নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত ভয়ভীতির মোকাবেলায় বাংলাদেশকে সংমিশ্রিত নিরাপত্তা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। নিরাপত্তা লক্ষ্য হতে হবে সম্প্রীতি ও সতর্কতার মধ্যে সমন্বয় ঘটানো। এক্ষেত্রে অভিন্ন নিরাপত্তা ধারণাকে ভুলভাবে দেখলে চলবে না। পক্ষান্তরে জাতির অভিন্ন নিরাপত্তা এভাবে নিশ্চিত করতে হবে যাতে আগ্রাসী কর্মকান্ডের মধ্যে সম্ভাব্য শান্তি বিনাশকারী শক্তির চাপিয়ে দেয়া সম্ভাব্য যড়যন্ত্রমূলক রাজনৈতিক ট্রাজেডী ও যুদ্ধের ধ্বংশলীলা থেকে জনগণ আত্মরক্ষা করতে পারে নিজেদের, নিবৃত্ত করতে পারে শত্রপক্ষেকে। জাতীয় নিরাপত্তা বলতে বোঝানো হয় নয় যে ভিন্নদেশের সরকার বা জনগণকে আদেশ নির্দেশ দিতে হবে,[৫৪] কিন্তু এর অর্থ এও নয় যে ভিন্ন দেশের তাবেদারী বা হুকুম তামিল করতে হবে।

এক কথায়, বাংলাদেশের নিরাপত্তা নীতির একটি মৌলিক লক্ষ্য হতে হবে "আইনানুগ ও সমরূপ পদ্ধতির কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে যুদ্ধ নাকচ করা, বিজয় ছিনিয়ে নেওয়া যুদ্ধ যখন চাপিয়ে দেওয়া হয়।" মনে রাখতে হবে জাতীয় সংবিধানের মৌলনীতি। নিরাপত্তার ভাষায় জাতির অভিলাষ বা আশা-আকাঙ্ক্ষা এতে প্রতিফলিত হয়-জাতীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও রাষ্ট্রীয় সংহতি প্রভৃতির সংরক্ষণ হচ্ছে জাতির মৌলিক চাহিদা বা কাঙ্ক্ষিত মূল্যবোধ।

জাতির মৌলিক চাহিদা ছাড়া বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আরো চাহিদা রয়েছে। নিঃসন্দেহে এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে অভিন্ন নিরাপত্তা। এর ইতিবাচক অর্থ

www.pathagar.com

হচ্ছে "জীবন, মুক্তভাবে বাঁচা ও স্বচ্ছন্দ্য জীবন অন্বেষণের" নিশ্চয়তা প্রদান। এছাড়া রয়েছে ব্যক্তিবিশেষের নিরাপত্তা অধিকার। এর নিশ্চয়তা বিধানে দেশের রাজনীতিতে গণতন্ত্রের নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে। মানবিক সম্পর্কের সকল ক্ষেত্রে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ থাকতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে ধর্ম, জাতি, বর্ণ, গোত্র, পারিবারিক অবস্থান বা অন্যান্য বিশেষ কারণে ভেদাভেদ না করা। অধিকারের ভিত্তি হবে ব্যক্তিগত গুনাগুন বা প্রমূল্য। ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ অধিকার বা ব্যবস্থার প্রয়োজন হতে পারে-যেমন নারীর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানে বিশেষ প্রয়াস প্রয়োজন। এক্ষেত্রে নারী-সমাজের বিরুদ্ধে উত্তরোত্তর বেড়ে চলা বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা প্রতিহত করতে হবে, ইতিবাচক সুবিধাদি প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও শিশুদের বাঁচা ও ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা প্রদানকল্পে একই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

রাজনীতির অঙ্গনে গণতন্ত্রকে সত্যিকার অর্থে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে যাতে জাতি লাভ করে স্থিতিশীলতার নিশ্চয়তা, রাষ্ট্রের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে থাকে অব্যাহত গতিধারা। এসবের নিশ্চয়তা বিধান করতে হলে প্রয়োজন হচ্ছে জালিয়াতিমুক্ত ভোট ব্যবস্থা কায়েম করা, প্রতিষ্ঠিত করা একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহি প্রশাসন, একটি প্রভাবমুক্ত বিচার ব্যবস্থা, একটি সুদক্ষ -জনসেবাধর্মী রাজনৈতিক আমলাতন্ত্র ও প্রযুক্তিক সম্প্রদায়, সামাজিক আন্দোলন সমর্থনপুষ্ট কিন্তু আইনগত প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়িত সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা, সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন, রাজনীতির কলুষ প্রভাব থেকে মুক্ত শ্রমিক শ্রেণী-যারা হবে উৎপাদনে অঙ্গীকারবদ্ধ ও স্বতঃপ্রবিদ্ধ। এসব বহুবিধ উদ্দেশ্য সাধনে বাংলাদেশকে নতুন করে তাকাতে হবে দক্ষিণ এশীয় নেতিবাচক প্রতিবেশের সংশোধন সম্পর্কে, চিন্তা করতে হবে রূপান্তরিত বাদবাকি বিশ্ব সম্পর্কে। বাংলাদেশকে তার নিরাপত্তা প্রয়োজন-অপ্রয়োজন পুনর্বার মূল্যায়ন করতে হবে, প্রকৃত প্রত্যক্ষজ অনুভূতি কি হতে পারে সে সম্পর্কেও পুনির্বার ভাবা উচিত এবং সে অনুযায়ী প্রণয়ন করতে হবে তার অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নীতি।

সাংস্কৃতিক পর্যায়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল-গোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি নিয়ে শব্দচয়ন বা ব্যবহারে প্রভেদ থাকতে পারে এবং থাকাই স্বাভাবিক, কিন্তু জাতি হিসাবে বাংলাদেশের জীবন ও জীবনধারা অনুসৃত অভিন্ন আদর্শ ও চিন্তাচেতনার প্রলেপ থাকতে হবে, বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের সঙ্গে এদেশের সুফি ঐতিহ্যের উদারনৈতিক মতবাদের প্রভাব ধারণ করতে হবে।

www.pathagar.com

জাতি হিসাবে দেশকে অভ্যন্তরীণভাবে পরিতৃপ্ত হতে হবে, সকল জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্পষ্টত সমঝোতা সৃষ্টির প্রয়াস থাকতে হবে, যে-সমঝোতার ভিত্তি হবে ক্ষমতা নয়, ভিত্তি হবে নিরাপত্তা পরিকল্পনা ও কৌশলগত নীতিমালা, দেখতে হবে যাতে দেশের বহিঃনিরাপত্তার মর্মবাণী বিদেশী শক্তির অপ্রতিসম চেতনা প্রসূত আধিপত্য ও কর্তৃত্বের ভারধারার সঙ্গে সংমিশ্রিত না হয়ে যায়। এক্ষেত্রে প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে নির্বাচিত সরকারের, জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার হিসাবে জনমতকে সরকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে, জনপ্রিয়তা ধারণ করতে হবে। এ সকল ক্ষেত্রে অনেক সময় অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি সংমিশ্রিত হয়, উভয়নীতি একই লক্ষ্যে মিলিত হয় যাতে জাতীয় স্বার্থের ব্যাঘাত না ঘটে, অথবা ইতিবাচক ভাষায় বলতে গেলে যাতে জাতীয় স্বার্থের প্রসার লাভ করে।

এসব কথার অর্থ হচ্ছে, জাতি সম্প্রীতির সঙ্গে কাজ করবে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে, আঞ্চলিকভাবে ও উপআঞ্চলিক স্বার্থলাভে। এসবের আরো অর্থ রয়েছে ঃ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেশের সমস্যাবলী চিহ্নিতকরণে সঞ্জনশীল হতে হবে, জাতির ভয়ভীতিজাত চেতনাকে ঐক্যবদ্ধ প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে, জাতির সমস্যা জটিল প্রকৃতির, বহু পর্যায়ের; সমাধানের পথও বন্ধুর, বহুমাত্রিক। ঐতিহ্যিক নিরাপত্তা ধারণা প্রসূত ভয়ভীতির সহজ ভাষায় শত্রুকে চিহ্নিত করা এখন তেমন একটা প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত নাও হতে পারে। এমন কি স্নায়ুযুদ্ধ উত্তরকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে এও বলা যায় যে, ঐতিহ্যিক ধারায় শত্রুমিত্র চিহ্নিতকরণ জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থীও হতে পারে।

জাতীয় প্রতিরক্ষার সংকীর্ণতর অর্থে নিরাপত্তা ঝুঁকির পরিবর্তনশীল প্রেক্ষিত এবং তার ফলে সৃষ্ট জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপান্তর-এসব মনে রেখে জাতিকে তার উদ্দেশ্যাবলী নির্ণয় করতে হবে, নির্ধারণ করতে হবে কৌশলগত স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি। দেশের প্রাপ্ত সম্পদ-সামগ্রি এতখানি অপ্রতুল যে, বহুমাত্রিক ও বহুপর্যায়ের নিরাপত্তা প্রয়োজনের দিক মনে রেখে দেশের সামরিক বাহিনীকে কিছুটা পুনর্গঠিত করার বিষয় ভাবা যেতে পারে। জাতীয় কৌশলগত প্রয়োজনের যৌক্তি দিক বিবেচনা করে প্রতিরক্ষা খাতের বরাদ্দও পুনর্বন্টন করতে হতে পারে।

এক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিবর্তনের সুপাঁরিশ রাখা হচ্ছে যা সামরিক বাহিনীর সনাতন ভূমিকায় বিশ্বাসী অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত নাও হতে পারে। প্রথম হচ্ছে বেসামরিক কাজেকর্মে সামরিক বাহিনীর নিয়োগ। এ কাজের সূচনা করতে হবে সামরিক বাহিনীকে বেসামরিক লোকজনের প্রতিরক্ষাধর্মী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে। এর প্রয়োজন রয়েছে বিশেষ করে

www.pathagar.com

যুব সম্প্রদায়কে শৃঙ্খলা ও দেশাত্মবোধ সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলাবোধের পাশাপাশি দৈহিক সুস্বাস্থ্য সম্পর্কেও এতে অভিজ্ঞতা সম্প্রসারিত করে জনসাধারণের মধ্যে জেলা পর্যায়ে এ ধরনের শিক্ষার অধিকার ও সুযোগ বিস্তার করতে হবে।

তৃতীয়ত, ১৯৮০-দশকের শেষপাদ থেকে সামরিক বাহিনী দেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বেশ দক্ষতা ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই অভিজ্ঞতাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান করতে হবে। চতুর্থত, দেশের সামরিক প্রকৌশল বাহিনীকে জোরদার করে জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তাদের গভীরভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে। বিশেষ করে দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সড়ক, রাস্তাঘাট, পুল প্রভৃতির বিনির্মাণ ও সংরক্ষণের কাজে তাদের নিয়োজিত করা যেতে পারে। পরিশেষে বাংলাদেশের শান্তির ভাবমূর্তি উজ্জ্বলকল্পে একটি স্বতন্ত্র শান্তিরক্ষী বাহিনী গঠন করার প্রস্তাব করা হচ্ছে। দেশের শান্তিরক্ষার কর্মকাণ্ড ও অভিযানজনিত অভিজ্ঞতাকে উন্নততরমানে আনা হবে এর লক্ষ্য যাতে এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সুনাম আরো বৃদ্ধি ও সুসংহত করা যায়। একমাত্র এ কাজই আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের শান্তিকামী ভাবমূর্তি অনেক বেশি উজ্জ্বল করবে এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে, দেশের ভৌগোলিক সংহতি বা সার্বভৌমত্বের প্রতি নিরাপত্তা হুমকির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও কূটনৈকিভাবে প্রতিহত করার কাজে এ ধরনের শান্তির অঙ্গীকার ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

এ ধরনের বহুমুখী নিরাপত্তা কৌশল "প্রতিরক্ষামূলক প্রতিরক্ষা", "বেসামরিক প্রতিরক্ষা"- এর মতো সমকালীন নিরাপত্তা ধারনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ ধরনের কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে, অতি ব্যয়বহুল ও প্রযুক্তি ভিত্তিক ঐতিহ্যিক সামরিক প্রতিরক্ষা এড়িয়ে গিয়ে প্রশিক্ষণ, শৃঙ্খলা প্রভৃতির মাধ্যমে সম্ভাব্য আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে জনগণের দেশাত্মবোধক চেতনা ও সতর্কতা সম্বলিত বেসামরিক প্রতিরক্ষা প্রয়াস জোরদার করা যেতে পারে।

নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নের নীতিকৌশল

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পক্ষে বিগত কয়েক দশকের সীমিত উন্নয়নের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব, কিন্তু বিশ্বের প্রতিযোগী পরিবেশ থেকে এ সম্ভাবনা ছিনিয়ে নিতে হবে। এ কাজে দেশের যেসব সামান্য সম্পদসামগ্রী রয়েছে সেসব সুচিন্তিতভাবে ব্যবহার করতে হবে, উৎপাদনের কাজে উন্নয়নমূলক বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।[৫৫] বিশ্বের অনেক শক্তিশালী রাষ্ট্র ঐতিহ্যগত ভাবে তাদের প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে বিশ্বশক্তির

www.pathagar.com

মর্যাদায় আসীন হয়। এ কাজে একদিকে তারা বহির্বিশ্বের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়, সৃষ্টি করে নতুন সুযোগ, কিন্তু অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তাদের বড় মূলধন ছিল আত্ম-প্রত্যয় ও অধ্যবসায়, ধৈর্য ও কঠোর পরিশ্রমের মতো সম্ভাবনাময় গুণাবলী।

পার্শ্ববর্তী দেশে, উপ-অঞ্চল ও অঞ্চলসমূহে যখন উন্নয়নের জোয়ার বইছে বাংলাদেশের পক্ষে তখন উন্নয়নের নিরবচ্ছিন্ন নীতি-কৌশল অবলম্বন ছাড়া আর কোনো রূপ বিকল্প নেই। বহির্বিশ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মুক্তবাজার অর্থনীতি গ্রহণের ফলে এতে সাময়িকভাবে কিছুটা ত্যাগ স্বীকার কারতে হতে পারে। কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে সম্পদের সমাবেশ ঘটিয়ে ইতিবাচক লাভের দিক সুসংহত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে মানব সম্পদ উন্নয়নের মত সুবিশাল দায়িত্ব সুম্পন্ন করা যাতে মানুষ সামাজিক বোঝা না হয়ে বিবেচিত হয় প্রকৃত সম্পদ হিসেবে, ধাবিত হয় কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের লক্ষ্যে।

বর্তমানে দেশের উন্নয়ন কর্মাকাণ্ড দাতাদেশগুলোর সহায়তায় অব্যাহত রাখা হচেছ, কিন্তু বিদেশী সাহায্যের ভবিষ্যৎ খুব একটা উজ্জ্বল নয়, কেননা এ ধরনের সাহায্য ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে বিদেশী সাহায্য দেউলে অবস্থায় পৌছতে পারে। ফলে বাংলাদেশের মতো বিদেশী সাহায্য নির্ভরশীল দেশগুলোর পক্ষে স্বনির্ভর হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। এছাড়া, বাংলাদেশ উত্তরোত্তর ব্যবসায়িক খাতে ঘাটতিরও সম্মুখীন হচ্ছে। বিশেষ করে এশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা সঙ্গীন। ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সংকটাপন্ন। এ ধরনের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বিকল্প পন্থা অবশ্যই হতে হবে কম খরচে, অতিশয় যোগ্যতা সহকারে উৎপাদন বাড়ানো যাতে বর্তমান প্রতিকূলতার মোকাবেলা করা যায়।

মনে রাখতে হবে যে, দেশের ফসল উৎপাদন হচ্ছে প্রকৃতি মুখাপেক্ষী, উত্তরাঞ্চলে খরার অবস্থা বিরাজমান। খাদ্য আমদানীর জন্য প্রতি বছর সরকারকে প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যায় করতে হয। দাতা দেশগুলোর অনেকে ইতিমধ্যেই খাদ্য সাহায্য কমিয়ে দিয়েছে। উপরন্ত, স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়ার প্রয়োজনেই সরকারকে দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করতে হয়। আরো মনে রাখতে হবে যে, দেশের নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন প্রয়াসের জন্য সামাজিক সম্প্রীতি প্রয়োজন, প্রয়োজন রাজনৈতিক সমঝোতা ও স্থিতিশীলতা।

www.pathagar.com

আঞ্চলিক নিরাপত্তা পুনর্মূল্যায়ন

বলা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশকে একার পক্ষে বা উন্নয়নের নিশ্চয়তা বিধান একেবারে কঠিন কাজ। এক্ষেত্রে প্রতিবেশী দেশগুলোর সহায়তা অবশ্যক। বরং এও বলা চলে যে, বাংলাদেশসহ প্রতিবেশী দেশগুলোর প্রয়োজন পারস্পরিক আন্তঃনির্ভরশীলতা। এজন্য এ অঞ্চলের প্রয়োজন নিরাপত্তা নীতির পুনর্মূল্যায়ন। এ কাজে এ অঞ্চলের সকল দেশের অভিজ্ঞতা ও স্বার্থের দিক মনে রেখে নিরাপত্তার ধারনা, এমনকি সংজ্ঞায়ন পুর্ননিধারন করতে হবে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর তাদের নিজ নিজ ভূমিকা পরিবর্তন করতে হবে, পাল্টাতে হবে মুখোমুখি রাজনীতির গতিধারা। স্নায়ুযুদ্ধ উত্তরকালে দক্ষিণ এশিয়াতেও কিছু কিছু ইতিবাচক পরিবর্তনের ভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলি স্নায়ুযুদ্ধকালের মতো অপ্রতিসম যোগসূত্র আধিপত্যবাদী বন্ধনে আবদ্ধ। এ অঞ্চলের নিজস্ব আঞ্চলিক সংগঠন গড়ে ওঠেছে। তদুপরি এ অঞ্চলের দেশগুলো মুক্ত বাজার ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার অঙ্গীকারে আবদ্ধ।

স্নায়ুযুদ্ধ উত্তরকালীন পরিবর্তনের ধারার সঙ্গে সংহতি রেখে দক্ষিণ এশিয়াতেও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। কেননা দক্ষিণ এশিয়ার বাস্তবতার দিকে তাকালে সুস্পষ্ট হবে যে, দারিদ্র্যের ঘনত্বের দিক থেকে বিশ্বে দক্ষিণ এশিয়ার স্থান শীর্ষে - দারিদ্র্য নিরসনের কথা সর্বত্র বলা হলেও, প্রকৃত দারিদ্র্য ক্রমশ এ অঞ্চলে বেড়েই চলছে, খোদ রাষ্ট্রের ভিত্তির প্রতি এ দারিদ্র্য হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাই এ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোকে "ভূরাজনীতির" সীমিত গন্ডী থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, প্রতিটি রাষ্ট্রের দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া উচিত আঞ্চলিক ফ্রেমে সংগঠিত "ভূ-অর্থনীতির" দিকে।[৫৬]

মনে রাখতে হবে যে সমগ্র বিশ্বব্যাপী জোর দেয়া হচ্ছে "সার্বিক নিরাপত্তার" ওপর। দক্ষিণ এশিয়াতেও এ নিরাপত্তা দৃষ্টিকোণকে যথাযথ প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হতে পারে। কেননা এর সঙ্গে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার পাশাপাশি জনমানুষের নিরাপত্তা ও মানুষের মৌলিক অধিকার সমূহের নিশ্চয়তার প্রসঙ্গও বিজড়িত-এসব অধিকারের মধ্যে রয়েছে উচ্চতর মানের শিক্ষা, খাদ্য, পরণের কাপড়, গৃহনিবাস, বিদ্যুৎ, পানি, সুস্থ পরিবেশ ইত্যাদি। সাম্প্রতিককালে ভারতের বহুল প্রচারিত "গুজরাল মতবাদে" আঞ্চলিক ভাবে সুপ্রতিবেশী সুলভ সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে, গুরুত্ব দেয়া হয়েছে অভিন্ন অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যাবলির ওপর, কিন্তু অতি প্রয়োজনীয় পরারস্পরিক লেনদেন, বিনিময় বা সামরিক-রাজনৈতিক অন্তর্নিহিত সমস্যাবলির সমাধানের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া প্রসঙ্গে এতে কিছু বলা হয় নি।

উপরন্তু, ভারতে সাম্প্রতিককালের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা বেশ নেতিবাচক প্রবণতা সৃষ্টি করতে পারে যা' অতি সহজে ইতিবাচক

www.pathagar.com

উপাদানসমূহকে নিশ্চল করে দিতে পারে। প্রসঙ্গত ভারতে ডানপন্থী ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকারের বিষয় উল্লেখ করা সমীচীন। নতুন ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচন প্রাক্কালে প্রচারিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু হলে সেই দেশের রাজনীতিতে ক্ষত-বিক্ষত পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে, আর এর প্রচন্ড প্রভাব সমগ্র অঞ্চলকে আন্দোলিত করতে পারে।

এ প্রসঙ্গে বাজপায়ী সরকারের পারমাণবিক আগ্রাসনের বিষয় উল্লেখ করা চলে। ১৯৯৮ সনের মে মাসে ভারতের নতুন পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচি ও ক্ষেপণাস্ত্র উন্নয়নের ধারা পাকিস্তানকে একই পথে ধাবিত করে, ঠেলে দেয় উপমহাদেশকে নিবারক ও সীমিত যুদ্ধের আওতায়।

উপর্যুক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে এটা বলতেই হবে যে, দক্ষিণ এশীয় রাষ্ট্রসত্তাসমূহ এখনো দ্বিধা-বিভক্ত এবং সে কারণেই শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের প্রয়োজন অনুসরণীয় দিকনির্দেশনা ও সমস্যা-সমাধানমূলক নতুন নতুন ভাবনা-চিন্তা। মনে রাখতে হবে অতীতের অদূরদর্শী নিরাপত্তা ও কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি যার ফলে সৃষ্টি হয় অসহযোগিতমূলক আচরণ। দক্ষিণ এশিয়ায় যদি সহযোগিতা যথার্থই জোরদার হতে হয় তাহলে বিশ্বধারার সঙ্গে তাল রেখে এ অঞ্চলেও একটি অভিন্ন, নিরবচ্ছিন্ন সহযোগিতামূলকা নিরাপত্তা রূপরেখায় অঙ্গিকারবদ্ধ হতে হবে।[৫৭] এর অর্থ স্বদেশধর্মী বা অপ্রতিসম অভিলাষ প্রসূত আত্মস্বার্থ সিদ্ধকল্পে রচিত দ্বি-পাক্ষিকতার পরিবর্তে বহুপাক্ষিকতাভিত্তিক নিরাপত্তা চিন্তাধারার প্রতি অঙ্গিকার। বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শক্তিগুলোর স্বার্থের সমন্বয় ঘটাতে হবে। আত্মনির্ভরশীলতার পরিবর্তে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ধারণার প্রসার ঘটাতে হবে।[৫৭] দু'পক্ষকেই ছাড় দিতে হবে পারস্পরিক নিরাপত্তার স্বার্থে।

এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে নেতৃত্বের বিষয় - আঞ্চলিক বৃহৎশক্তি ভারতকেই নেতৃত্ব দিতে হবে। ভারতের আচরণ হতে হবে "বৃহৎ শক্তি" সুলভ বৃহৎশক্তি হিসেবে ভারতকে মহান শক্তি-সুলভ উদার মনোভাব প্রদর্শন করতে হবে। এজন্য ভারতকে ঔপনেবেশিক ভাবধারাপুষ্ট উপমহাদেশভিত্তিক ঐতিহ্যগত নিরাপত্তা ব্যবস্থার ধারণা পরিত্যাগ করতে হবে, যে ধারণার কৌশলগত রূপরেখায় ভারতের প্রতিরক্ষা অবস্থান থাকবে অন্তরস্থানে, অস্ত্রপ্রতিরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হবে প্রতিবেশী দেশগুলো। এ ধরনের নিরাপত্তা চিন্তাধারা একরোখা, স্বদেশমুখী। প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে বৃহৎ-ক্ষুদ্র শক্তির অভিলাষে পারস্পরিকতার সমন্বয় থাকতে হবে। ভারতকে প্রতিবেশী ক্ষুদ্রতর শক্তিসমূহের প্রতিসাম্য এবং অর্থনৈতিক ও উন্নয়নমূলক আশা-আকাঙ্ক্ষার সমন্বয় বিধান করতে হবে।

www.pathagar.com

এসব ক্ষেত্রে পারস্পরিক নিরাপত্তা স্বার্থ ও কৌশলগত চিন্তধারার সমন্বয় বিধানে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, প্রকৃতিগত দিক থেকে, নৃতাত্ত্বিক ও জাতিগত বিবেচনায় দক্ষিণ এশিয়ার রয়েছে অভিন্ন সত্তা। শুধু ইতিহাসের এক দৈবিক পরিস্থিতিতে, অনুধান ধারায়, ব্যক্তিগত অভিলাষের কারণে, কায়েমি স্বার্থ ও শক্তির রাজনীতির প্রভাবের ফলে এ উপমহাদেশ একক রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে প্রাকৃতিক ধারায় বিবর্তিত হতে পারে নি। বর্তমানে দীর্ঘকাল থেকে দ্বন্দ্বরত ইতিহাসের পটভূমিতে এ অঞ্চলের প্রয়োজন অব্যাহত নিরাপত্তা সহযোগিতা, রাজনৈতিক ও কৌশলগত ক্ষেত্রে এবং একই সঙ্গে অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত বিষয়ে।

দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর জন্য স্বার্থের ক্ষেত্রে পারস্পরিকতা নির্ধারণ করার এখনই প্রকৃত সময়। প্রয়োজন হচ্ছে নিরাপত্তা উদ্দেশ্যাবলী পুনসংজ্ঞায়ন। রণনৈতিক-কৌশলগত পদ্ধতি হতে হবে "জয়-জয়" দৃষ্টিকোণ ভিত্তিক সকলের উন্নয়নের প্রত্যাশা পূরণে নিবেদিত। কাঠামো হতে হবে সহযোগিতার ফ্রেমে প্রণীত। লক্ষ্য হবে বহুমুখী নিরপত্তা সমস্যার মোকাবিলা। এসবের মধ্যে রয়েছে অনুন্নয়ন, রোগ-ব্যাধি, ক্ষুধা, অশিক্ষা, পরিবেশগত ঝুকি-ঝামেলা, আবাসের অভাব মেটানো প্রভৃতি। সহযোগিতামূলক পন্থায় এসবের মোকাবিলা করতে হলে "বিজয়ী পারেব সবকিছু" - এ ধরনের শূণ্যমান ভিত্তিক কৌশলগত পন্থায় একক স্বার্থসিদ্ধির স্বদেশধর্মী নিরাপত্তার অন্বেষণ পরিহার করতে হবে। দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলো যদি এখনো সহযোগিতার রূপরেখায় ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের কাচাকাছি আসতে ব্যর্থ হয় কালে তারা পুনর্বার বৃহৎ বহিঃশক্তিসমূহের যে-কোনো জুটির সম্ভাব্য লড়াইয়ে পক্ষাবলম্বনে প্রবৃত্ত হবে। হবে ক্ষত-বিক্ষত।

মনে রাখতে হবে আফগানিস্তান ও ইন্দোচীনের রাষ্ট্রগুলোর অভিজ্ঞতা। এ প্রসঙ্গে এও মনে রাখা সমীচীন যে, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় যে-কোন শক্তিদ্বন্দ্বে দক্ষিণ এশিয়া পূর্বের চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে বাধ্য। কেননা এ দ্বন্দ্ব সম্ভবত হবে চীনকে কেন্দ্র করে, আর দক্ষিণ এশিয়া হচ্ছে চীনের অতি সন্নিকট এবং ক্রমবর্ধমান হারে তেজী বিশ্ব বাণিজ্য চলাচল পথগুলোরও কাছাকাছি।[৫৮]

উপর্যুক্ত সকল বিষয়াদি নিরাপত্তার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। প্রশ্ন দাঁড়ায় দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারকবৃন্দ রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের দীর্ঘকাল স্থায়ী ঐতিহ্যের বেড়াজাল ছিন্ন করে কি বেরিয়ে আসতে পারবেন, পারবেন কি তাঁরা ঔপনিবেশিক শাসনের শেষকালে আপাতক অবস্থায় সৃষ্ট নিজ নিজ ভূসীমানাগত কাঠামোর বাইরে বেরিয়ে আসতে, সম্ভব হবে কি তাঁদের পক্ষে উপনিবেশ-উত্তরকালে

www.pathagar.com

উপমহাদেশীয় নেতৃবর্গের ভুলভ্রান্তির পরিধি অতিক্রম করে এ অঞ্চলের জন্য একক ও অভিন্ন নিয়তির বন্ধন গড়ে তুলতে? স্পষ্টতই এসব প্রশ্নের সঙ্গে বিজড়িত রয়েছে অনেক জটিল ও কঠিন বিষয়াদি। রাজনৈতিক বিশ্লেষক, নিরাপত্তা নীতিমালা নির্ধারক ও রাষ্টের নেতৃবর্গ-সকলকে এ ধরনের বিষয় নিয়ে অনেক ভাবনা-চিন্তা করতে হবে। নিরাপত্তার সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা পরিবর্তন করতে হবে শুরুতেই। পরিবেশ ও উন্নয়ন আঞ্চলিক নিরাপত্তার সংজ্ঞায় অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। এর পর আসবে নীতি, রণনীতি এবং এসবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রণকৌশল প্রণয়নের বিষয়, একই সঙ্গে সম্পদের বরাদ্দ - এসবের প্রতিটি ক্ষেত্রে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও দৃকশক্তির প্রয়োজন।[৫৯]

আঞ্চলিক পর্যায়ে ব্যবসায়িক প্রসার কিংবা সহযোগিতামূলক নিরাপত্তা জোরদার-প্রভৃতি যে কোনো ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে বিশ্বাসযোগ্য নেতৃত্ব দিতে হলে প্রথমে অভ্যন্তরীণভাবে তাকে সুরক্ষিত ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা লাভ করতে হবে; এই নিশ্চয়তা অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অর্জন করতে হবে যার জন্য প্রয়োজন দূরদৃষ্টি, ধৈর্যশীল ও উন্নয়নের এমন মানসচিত্র যাতে বাদবাকি দক্ষিণ এশিয়া আকৃষ্ট হবে বাংলাদেশের দৃষ্টান্ত অনুকরণে। মোট কথা, বাংলাদেশের নেতৃত্ব হতে হবে গতিশীল, সম্মুখীভিমুখী, ভবিষ্যতদর্শী ও অনুকরণীয়। তাহলেই বাংলাদেশ তার নিজস্ব নিরাপত্তা সুসংহত করতে সক্ষম হবে, সক্ষম হবে দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা কায়েমে ইতিবাচক ভূমিকা পালনে।

তথ্যনির্দেশ

১. বর্তমান প্রবন্ধে উপস্থাপিত অনেক তথ্য ও যুক্তি লেখক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে (আরবনা-শ্যাম্পেইন) ১৯৯৫-৯৬ সনে সিনিয়র ফুলব্রাইট স্কলার হিসেবে কাজ করার সময় লাভ করেছেন। এজন্য তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তথ্যকেন্দ্র ও ফুলব্রাইট কর্তৃপক্ষ 'কাউন্সিল অব ইন্টারন্যাশন্যাল এক্সচেঞ্জ অব স্কলারস'-এর নিকট কৃতজ্ঞ। প্রবন্ধটি বাংলাদেশ প্রতিরক্ষ সার্ভিসেস এ্যাণ্ড স্টাফ কলেজ, মীরপুরে 'বাংলাদেশ নিরাপত্তা' শীর্ষক একটি সেমিনারে উপস্থাপিত একটি ইংরেজি প্রবন্ধের পরিমার্জিত সংস্করণ।

২. Carolyn M. Stephenson, "New Approaches to International Peacemaking in the Post-Cold War World" in Michaal T. Klare (ed.), *Peace and Worla Security Studies : A Curriculum Guide*. Sixth Edition (Boulder : Lynne Reinner Publishers, 1994).পৃ. ১৬ -১৮

৩. Morton Berkwitz and E.G. Book, *American National Security : A Reader in Theory and Policy* (New York : The Free Press, 1965) পৃ. viii.

৪. এ ধরনের কিছু কিছু প্রশ্ন তালুকদার মনিরুজ্জামান তাঁর (*The Security of Small States in*

www.pathagar.com

the Third World (Dhaka : Academic Publishers, 1989), পৃ. ১) গ্রন্থে উত্থাপন করেন। কিন্তু ঐ গ্রন্থে বাংলাদেশের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে তেমন কোনো বিশ্লেষণ করা হয় নি প্রশংসা লাভের যোগ্য এ বিষয়ে একটি অভিসন্দর্ভ লিখেছেন রুমানা সমিরুদ্দিন খান পরবর্তীকালে তা *Non-Military Security of Bangladesh : External Determinants* শীর্ষক একটি গ্রন্থাকারে ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড থেকে ১৯৯৬ সনে প্রকাশিত হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে বহুমাত্রিক নিরাপত্তা দৃষ্টিকোণের উপর জোর দেয়া হয়েছে এবং সেই রূপরেখার আলোকেই প্রবন্ধে বাংলাদেশের নিরাপত্তার বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৫. Uday Bhaskar, "Post-Cold War Security, "*Strategic Analysis* (November 1997), পৃ. ১১৩৫-৩৬

৬. Mikhail Bezrukov and Andruw Kortunov, "Interdependence : A Perspective on Mutual Security, " in Richard Smoke and Andrew Kartunov (eds.), *Mutiual Security : An Approach to Soviet-Americal Relations* (New York : St. Martin's Press, 1991), পৃ. ১৮

৭. Bhaskar, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩৬; Donald M. Snow, *National Security : Defense Policy for a New International ordrer.* Second Edition (New York : St Martin Press, 1995), পৃ. ২১-২২

৮. Chetan Kumar, "Environmental Degradation and Security in South Asia, "In Marvin G. Weinbaum and Chetan Kumar (eds.), *South Asia Approaches the Millennium : Reexaminining Nation Security* (Boulder : Westivew Press, 1995), পৃ. ১৪৮. বাস্তববাদী চিন্তাধারার বিশ্লেষণের জন্য দ্রষ্টব্য, Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations.* 5th Edition (New York : Alfred A. knopf, 1972).

৯. Snow, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২

১০. Kenneth N. Waltz, "Realist Thought and Nco-realsit Theory, " in Robert L. Roths, *The Evolution of Theory in International Relations* (Columbia : Uiversity of Corolina Press, 1991), পৃ. ২৯

১১. J. Ann Tikner, "Re-visioning Security, "in Ken Both and Steve Smith (eds.) *International Relations Theory Today* (University Park, Pa : The Pennsylvania University Press, 1995), পৃ. ১৮৪-৮৭, ১৯৪

১২. Kumar, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-৪৯

১৩. D. Dunn, "Peace Research Versus Strategic Studies in Ken Booth (ed.), *New Thinking About Strategy and International Security* (London : Harper Collins,1991).

১৪. "অভিন্ন নিরাপত্তার" সমকালীন সংজ্ঞা প্রথম প্রদান করে নিরস্ত্রীকরণে ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত কমিশনের ১৯৮২- সনের রিপোর্টে। এতে পারমাণবিক অস্ত্রভিত্তিক কৌশলগত নিরাপত্তার

www.pathagar.com

নিশ্চয়তা আসে একমাত্র নাগরিকদের নিরাপত্তার বিনিময়ে। এতে ঐতিহ্যিক নিরাপত্তার সীমাবদ্ধতা তুলে ধরা হয়। Tickner, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮।

১৫. "সার্বিক নিরাপত্তার" ধারণা ১৯৮০ সনে প্রথমে জাপানে প্রচলিত হয়, পরে ১৯৮০- দশকের মাঝামাঝি গরবাচেবও এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করেন। ঐ. পৃ. ১৮২।

১৬. Barry Buzan, People, *States and Fear : An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era* (London : Harvester Wheastsheaf, 1991); Jes Mathews, "the Environment and International Security,"in M. Klare and D. Thomas (eds.), *World Security : Trends and Challenges at Century's End* (New York : St Martin Press, 1991); Richard K. Hermann, "Conclusions : the End of the Cold War - What Have We hearred?" in Richard Ned Lebow and Thomas Risse- Kappen (eds.), *International Relations' Theory and the End of the Cold War* (New York: Cloumbia University Press, 195).

১৭. *The World Commission on Global Governance, A Call to Action : Summary of Our Global Neighborhood, The Report of the Commission on Global Governance* (Geneva, 1995), পৃ. ২২

১৮. *World Commission on Environment and Development* (WECD), *Our Common Futur* (Oxford University Press, 1987), পৃ. ৩৫৬-৩৫৭.

১৯. Michael Grulb, Mathias Koach, Abby Manson, Francies Sullivan, Koy Thomson, *The Summit Agreement : A Guide and Assessment* (London : The Royal Institute of International Afffairs, 1993), পৃ. ৬.

২০. Cyrus Vance, "Preface," in Richard Smoke and Andre Kortunov (eds.), *Mutual Security : A New Approach to Soviet-Amerian Relations* (New York: (St Martin's Press, 1991), পৃ. xiv.

২১. Bhaskar, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩৯-১১৪৮; Anbalavanar Sivaraja, "International Security at the End of the Cold War," in George A. Cooray (ed.), *New Dimensions of Security after the Cold War.* (Colombo: Institute for International Studies, 1997), পৃ. ১৮-১৯

২২. S.J. Deitchman, *Beyond the Thaw : A New National Strategey* (Boulder : Westview Press, 1991), পৃ. ১১

২৩. Barry Buzan, "Peoples, States and Fear : The National Security Problem in the Third World," in Edward E. Azar and Chung-in Moon (eds.), *National Security in the Third World : The Management of Internal and External Threats* (Hants: Edward E#lgar Publishing Limited, 1988) পৃ. ১৬-১৭

www.pathagar.com

২৪. Col. Ravi Nanda, *National Security Perspective, Policy and Planning* (New Delhi : Lancer Books, 1991), পৃ. ix.

২৫. ঐ. পৃ. ৫.

২৬. ঐ. পৃ. ৪৩.

২৭. Mortion Berwitz and P.G. Bock, *American National Security : A Reader in Theory and Polity* (New York : the Free Press, 1965) পৃ. ৫২.

২৮. ভিন্নমতের জন্য দ্রষ্টব্য, James W. Morkey, "The Structure of Regional Security.," in James W. Morley (ed.), *Security Interdependence in the Asia Pacific Region* (Lexington, Mass. : D.C. Health and Company, 1986), পৃ. ৮

২৯. Armold Wolfers, *Discord and Collaboration : On International Politics* (Balfimore : The John Hopkins Press, 1962), পৃ. ৭৪-৭৫.

৩০. Horold D. Lasswell, *National Security and Individual Freedom* (New York: McGraw Hill Book Company, Inc., 1950). পৃ. ৫০

৩১. Gordon B. Turuer, "Clasic and Modern Strategic Concepts, "in Gordon B. Taruer and Richard D. Challenter (eds.), *National Security in the Nuclear Age : Basic Facts and Theories* (New York : Freedrick A. Prageer, Publishers, 1960), পৃ. ৩ - ৫; also his "Air and Sea Pouler in Relation to National Power," in *Ibid*., পৃ. ২২৭-২৮.

৩২. Edward A. Kolodziej and Robert E. Harkavy "Introduction," in Edward A. Kolodziej and Robert E. Harkavy (eds.), *Security Policies of Deveoping Countries* (Toronto : Lexington Books, D.c. Heath and Company, 1982) পৃ. ৯৬ -৯৭

৩৩. Abul Kalam, *Peacemaking in Indochina* (Dhaka: University of Dhaka, 1983), cahap., six; also Gordon B. turner, "Classic and Modern Strategic Concepts," in Turner and Challener, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১.

৩৪. Gordon B. Turner, "The Influence of Modern Weapons on Strategy.," in Gordon B. Turner and Richard D. Challener (eds.), *National Security in the Nuclear Age: Basic Facts and Theories* (New York: Frederick A. Praeger, Publishers, 1960), পৃ. ৬৮-৬৯

৩৫. Gareth Porter and Janet Welsh Brown, *Global Environmental Politics* (Bouldev: Westview Pres, 1991), পৃ. ১০৯.

৩৬. Edward A. Kolodziej and Robert E. Harkavy (eds.) "Developing States and Global Security, "in Kolodziej and Harkavy (eds.) প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৪.

www.pathagar.com

৩৭. *The Economist* (15 January 1972), পৃ. ১৫; also Trevor Ling," Creating a New State: The Bengalis of Bangladesh," *South Asia Review*, vol.5, No. 3 (April 1972), পৃ. ২২১ -২৩০.উদ্ধৃত, Ishtiaq Hossain, "Problems and Management of National Security of Bangladesh : The Political, Economic and Environmental Dimension, " A Paper Presented in the Seminar on Management of National Security in Bangladesh (mimco), Military Services Command and Staff Collee, Mirpur (5 February 1998), পৃ. ২

৩৮. এ ধরনের মতামতের জন্য দ্রঃ, Deitchman, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬.

৩৯. Leo E. Rose, "A Regional Subsystem in South Asia : roblems and Prospects, "in Robert P. Scalapino, Seizaburo Sato, Jusuf Wanand, and Sung- joo Han (eds.), *Asian Security Issues: Regional and Global* (Berkeley: Institute of East Asian Studies, University of California, 1988), পৃ. ৩৭৫.

৪০. Barbanoah Jancar, "The Environment, Population Growth and Resource Scarcity," Michael T. Klare (ed.), *Peace and World Security Studies: A Curriculumn Guide. Sixth Edition* (Bouldre: Lynne Rienner Publishers, 1994). পৃ. ৩০৬.

৪১. দ্রষ্টব্য, Abul Kalam, *Japan and South Asia : Subsystemic Linkages and Developing Relationships* (Dhaka : The University Press Limited, 1996) পৃ. ৯০ -৯২: D.E. Kennedy, *The Security of Southern Asia* (New York: Frederick A Pralger, 1965) পৃ. ২৪৮

৪২. Raja G.C. Thomas, "India," in edward A. Kolodzioj and Robert E.Harkavy (eds.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১ - ১২৩.

৪৩. Norman Myers, "Environmental Security :The Case of South Asia, "*International Environmental Affairs*, Val. 1, No.2 (1989), পৃ. ১৪৭.

৪৪. ঐ., Jodi L. Jacobson, "Environmental Refugees: A Yardstick of Rehabilit," *World Watch Paper*, No.86 (November 1988) পৃ. ৩২ -৩৩

৪৫. Rumana Samiruddin, "Security of Bangladesh : External Determinant (Dhaka : Unpublished M. Phil Thesis, Department of International Relations, University of Dhaka, 1995), পৃ. ১৫১ -১৫২.

৪৬. Myers, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯.

৪৭. সমুদ্রে পানির চাপ বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ২১০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশের ভূসীমানার ৩৫ শতাংশ পানির নীচে তলিয়ে যেতে পারে এবং ৩৮ মিলিয়ন জনসংখ্যা উদ্বাস্তু হতে পারে।

www.pathagar.com

৪৮. Myers, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০
৪৯. ঐ.
৫০. Stephen Philip Cohen, "Pakistan," in Edward A. Kolodziej and Robert E. Harkavy (eds.), পৃ. ৯৬ -৯৭
৫১. ঐ. পৃ. ৯৭.
৫২. Sir Michael Howard, "The External Powers and Indian Subcontinent, "in Hedley Bull (ed.), *Asia and the Western Pacific: Towards a New International Order* (London : Nelson, 1975), পৃ. ১৭৬
৫৩. Amena Mohsin, "Indo-Bangladeh Relations: Options and himitations in an Evalving Relationship," in Eajuddin Ahamed and Abul Kalam (eds.), *Bangladesh, South Asia, and the World* (Dhaka : Academic Publishers, 1992), পৃ. ৫৮
৫৪. Morton Berkwitz and P.G. Boo, *American National Security : A Reader in Theory and Policy* (New York : The Free Press, 1965), পৃ. ৫১
৫৫. Philip Bowring, "Khaleda's Opportunity to get the moving : A turning point," *Far Eastern Economic Review* (12 December 1991), পৃ. ২০
৫৬. Arun Ghosh, "An Agenda for the South," *Economic and Political Weekly* (April 1993), পৃ. ৭৩৪
৫৭. Zaraq Dian, "The Gareth Evans Proposal : Cooperation for Peace, "*Asia Defence* (December 1993), পৃ. ৬ -৭.
৫৮. Lt. Gen. Dr. M.I. Chibber, "India-Pakistan Reconciliation : Its Impact on International Security, " *Indian Defence Review* (April 1992), পৃ. ৬৭; Kalam, Japan and South Asia (প্রাগুক্ত), পৃ. ৯৬ - ১০০.
৫৯. আরো বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, Kalam, *Japan and South Asia*, পৃ. ৯৪ - ১০২, ২০৯ - ২১৪, ২১৭ -২২৩.

www.pathagar.com

পঞ্চদশ অধ্যায়

নারীর নিরাপত্তা ঃ তত্ত্বীয় সংযোগ ও বাংলাদেশের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত

'নিরাপত্তা' প্রত্যয়টি পুরনো, কিন্তু স্নায়ুযুদ্ধ-উত্তরকালে ধারণাগত দিক থেকে এ প্রত্যয়ের ব্যাপকতর পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এ প্রত্যয়ের ধারণাগত রূপান্তর প্রতিফলিত হয়েছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণে আঞ্চলিক রণনৈতিক কৃষ্টিতে, এমন কি এর প্রভাব পড়ে জাতীয় আচরণে বা কর্মকাণ্ডে।

বস্তুত, 'নিরাপত্তা' ধারণা বর্তমানকালে বহুবিধ অর্থের সমাবেশ ঘটায়। ভয়ভীতি জনিত পরিস্থিতি অথবা নিরাপত্তাহীনতার প্রত্যক্ষ অনুভূতির সঙ্গেই নিরাপত্তা ধারণা অনন্তভাবে সম্পর্কযুক্ত। তার মানে, 'নিরাপত্তা' মূলত একটি মনস্তাত্ত্বিক ধারণা এবং এ ধারণা হচ্ছে ভয়ভীতি সম্পর্কিত প্রত্যক্ষজ অনুভূতিপ্রসূত বা চেতনা সম্পর্কিত। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ ধরনের অনুভূতি বা চেতনা পরিবর্তনশীল। সাম্প্রতিককালে এ ধারণার ব্যবহারে বিশ্লেষকমাত্র শুধু আন্তর্জাতিক সিস্টেম ও আঞ্চলিক সমাজের কাঠামো বা জাতীয় রাষ্ট্রের নীতি-রণনীতি সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকে না; বরং প্রতিটি জাতি-রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সামাজিক কাঠামো, এমন কি দেশের ব্যক্তি বা জনমানুষের ভয়-ভীতিজনিত প্রত্যক্ষজ অনুভূতি সম্পর্কেও নিরাপত্তা ধারণা ব্যবহৃত হয়। সাম্প্রতিককালের নিরাপত্তা সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা বহুলাংশে ব্যতিক্রমধর্মী। কেননা ঐতিহ্যগতভাবে নিরাপত্তা ধারণা ছিল রাষ্ট্রকেন্দ্রিক, ছিল শক্তিভিত্তিক। কিন্তু আজকাল এসব ধারণা সেকেলে বলে বিবেচিত। নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিতর্কে এখন বহুমাত্রিক ভয়-ভীতিজনিত দৃষ্টিকোণ এসে পড়ে; বিতর্ক চলে বহু পর্যায়ে–তত্ত্বে, তত্ত্বীয় নমুনা প্রণয়নে এবং এসবের প্রায়োগিক ক্ষেত্রেও।[১]

এ অধ্যায়ে নারী নিরাপত্তার ধারণা ও দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত হয়েছে। দুটো বিষয়ই বিশ্লেষণ করা হয়েছে সাম্প্রতিককালের ধারণাগত ও তত্ত্বীয় উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করে। বাংলাদেশের নারী সমাজের নিরাপত্তা ও অধিকার সম্পর্কিত বাস্তবতা ও সমস্যাবলি এতে আলোচিত হয়েছে সেই বিশ্লেষণ রূপরেখার নিরিখে। পরিশেষে এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের নারী সম্প্রদায়ের

www.pathagar.com

অধিকার ও নিরাপত্তার নিশ্চিত বিধানকল্পে কিছু বাস্তবধর্মী কর্মপন্থা ও পরিকল্পনার প্রস্তাবও রাখা হয়েছে। লেখক মনে করেন যে, স্নায়ুযুদ্ধ-উত্তরকালীন বিশ্ব বাস্তবতার পাশাপাশি তত্ত্বীয় ধারণার ক্ষেত্রে উন্নয়নের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে এ দেশের পুরুষদের সঙ্গে নারী সম্প্রদায়েরও অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে তাদের অংশদারিত্ব ও নিরাপত্তা। তাহলেই নারী ও পুরুষের সম-অধিকারের ভিত্তিতে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হবে।

নারী নিরাপত্তা ধারণা

প্রকৃতপক্ষে, নারীর নিরাপত্তা বা জাতীয় নিরাপত্তায় নারীর অবস্থা বিশ্লেষণ সম্পর্কিত দৃষ্টিকোণ উৎসারিত হয়েছে নিরাপত্তা বিতর্কে সাম্প্রতিককালী বহুমাত্রিক বা বিভিন্নতর পর্যায়ের বিতর্ক থেকে। ঐতিহ্যগতভাবে জাতীয় নিরাপত্তা ও সামরিক রণনীতি বিষয়গুলো ছিল পুরুষ সমাজের কর্তৃত্বাধীন। এমন কি পূর্বেকার দশকগুলোতে শান্তির অধ্যয়ন ও দ্বন্দ্বের নিরসন সম্পর্কিত বিষয়গুলোতেও নারীর অধিকার ও নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিছক মামুলিভাবে বিশ্লেষণ আলোচনায় স্থান পায়। এ ধরনের গবেষণা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নারীর অধিকার বা নিরাপত্তার মতো বিষয়সমূহ তত্ত্বীয় ধারণা বা বিশ্লেষণে তেমন প্রাসঙ্গিক বিষয় বলে বিবেচিত হয় নি। জাতীয় জীবনে কিংবা আন্তর্জাতিক সংগঠনের ক্ষেত্রে হোক পুরুষ ও নারী যে ভিন্ন ধরনের অথচ অসম ভূমিকায় অবতীর্ণ এবং তাদের এ ভিন্ন ধরনের ভূমিকা পালনের কারণে যে ধরনের জটিলতা হতে পারে সেই সকল বিষয়ে আন্তর্জাতিক সিস্টেমে রাষ্ট্রের আচরণ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নারীর অবস্থান বিশেষভাবে পর্যালোচনা আদৌ প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হয় নি।

এ প্রসঙ্গে শান্তি গবেষণা ক্ষেত্রের প্রসঙ্গ বিশেষভাবে উল্লেখ করা চলে। যুদ্ধের কারণে, কাঠামোগত সহিংসতার ফলে এবং পরিবেশ-প্রতিবেশ সম্পর্কিত ভারসাম্য বিনষ্ট হলে নারীর অধিকার বা নিরাপত্তা কিভাবে ক্ষণ্ন হয় তা' নিয়ে তেমন কোনো সমীক্ষা হয় নি। অথচ শান্তি গবেষণা আন্দোলন শুরু হয় ১৯৫০-এর দশক থেকে। এমন কি এ আন্দোলনের পুরোভাগে উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের কয়েকজন বেশ নামকরা মহিলা-বিশেষজ্ঞের নামও যুক্ত ছিল। কিন্তু নারীর নিরাপত্তা বিষয় তাঁদের বিশ্লেষণ গুরুত্ব পায় নি।[২]

সমাজে পুরুষের অবস্থান ও নারীর দুরবস্থার অভিজ্ঞতা সাম্প্রতিক নয়, বহুকাল থেকেই এ অবস্থা বিরাজ করে আসছে। একমাত্র অভিজ্ঞতার পর্যালোচনার মাধ্যমে পুরুষের কর্তৃত্বাধীন সমাজের বাস্তব রূপ ধরা দেবে। বাস্তব অবস্থার দিকে তাকালে মনে হবে যে, কাঠামোগত সহিংসতার ফলে

www.pathagar.com

নারী যে কতখানি নির্যাতনের শিকার হয় এবং নারী-পুরুষের অসম অধিকার বন্টনের কারণে নারী শ্রেণীকে প্রবঞ্চনার শিকার হতে হয়। ব্যয়বহুল যুদ্ধের ফলে সামাজিক কল্যাণ খাতে ব্যয়নির্বাহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফলে শিশুদের সঙ্গে নারী সমাজেরও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। উচ্চহারে সামরিক বাজেট ব্যয়বরাদ্দ করা হলে সামাজিক গৃহ কর্মসূচিতে ব্যয় হ্রাস পায়। এর বিশেষ প্রভাব পড়তে বাধ্য সংসারে– মহিলাদের ওপর, কেননা গৃহখাত দেখাশোনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পড়ে তাদের ওপর-ই এবং আপেক্ষিকভাবে মহিলারা-ই দারিদ্র্যের শিকার হয় অধিকতর।[৩]

এছাড়া নারীদের অধিকার ও নিরাপত্তার সঙ্গে আরেকটি বিষয় প্রাসঙ্গিক– তা হলো আন্তর্জাতিক সিস্টেমের ওপর পরিবেশগত হুমকি। এ ক্ষেত্রে বিশ্লেষকদের অনেকেই মনে করেন যে, খোদ আন্তর্জাতিক সিস্টেমের কাঠামোগত পুনর্গঠন সম্পর্কে ভাবা যেতে পারে। সম্ভবত প্রয়োজন হবে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক সমাধানের পরিবর্তে বিশ্বভিত্তিক চুক্তি সম্পাদন যাতে পরিবেশগত নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয়। পরিবেশগত নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নারী নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ সংযোজনের ফলে এ ক্ষেত্রে নতুন নতুন ভাবনা-চিন্তা প্রবর্তিত হতে পারে। পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার উর্ধ্বে কতিপয় নারী নিরাপত্তা বিষয়ক বিশ্লেষক এমনও প্রস্তাব করবেন যে, মানব সমাজের উচিত প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক পুনর্বিবেচনা করা, উচিত এ সম্পর্ক সুনিবিড় করা।

এ ধরনের যুক্তির পেছনে যৌক্তিক কারণও রয়েছে। পরিবেশগত ভারসাম্য বিনষ্ট হলে মহিলাদেরকে মারাত্মকভাবে বিপন্ন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। কেননা বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে মেয়েদেরকেই গ্রামাঞ্চলে জ্বালানি কাঠ কুড়াতে হয়, যোগাতে হয় খাবার পানি। পরিবেশগত হুমকি যতই সৃষ্টি হয় ততই এসব কাজে অধিকতর বিঘ্নের সৃষ্টি হয় এবং অতিরিক্ত ঝামেলার বোঝা বইতে হয় মেয়েদেরকেই। উপরন্তু, বিষাক্ত দূষণ ও পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি মেয়েদের পুনর্জনন ক্ষমতার ওপর প্রভাব ফেলে বলে অনেক বিশ্লেষক মনে করেন।[৪]

নারী দৃষ্টিকোণ

নারী নিরাপত্তা সম্পর্কিত নতুন দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে ভাবতে হবে উপর্যুক্ত প্রয়োজনীয়তার দিক বিবেচনা করা। এ দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে বিশ্লেষকেরা ভাবতে পারেন সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের উর্ধ্বে উপ-আঞ্চলিক, আঞ্চলিক ও বিশ্বের নিরাপত্তা সম্পর্কে। পুরুষদের মতো মেয়েরা রাষ্ট্রের সংকীর্ণ স্বার্থ বা রাষ্ট্রীয় অঙ্গসংগঠন সম্পর্কিত নিছক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকে না। এর প্রধান কারণ হলো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুর সঙ্গে মেয়েদের যোগাযোগ আপেক্ষিকভাবে কম। একইভাবে, যে ধরনের নাগরিকত্ব ও দেশপ্রেম সমন্বিত

www.pathagar.com

গুণাবলি যুদ্ধকে বৈধতা প্রদান করে, দেখে ঐতিহ্যগত জাতীয় নিরাপত্তার শৌর্যের প্রতীক হিসেবে সেই ধরনের সমাজ নারী অধিকার বা তাদের নিরাপত্তার পক্ষে অনুকূল নয়। স্বাভাবিক কারণে নারী সমাজ ও তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এসব কাম্যও হতে পারে না। বরং নারী দৃষ্টিকোণ সুনাগরিকত্বের নতুন ও বৃহত্তর সংজ্ঞা সম্পর্কে ভাবতে সাহায্য করতে পারে–নাগরিকত্ব সম্পর্কিত যে-জ্ঞান মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে ধরিত্রীর সুস্বাস্থ্য সম্পর্কে, সচেতন হতে শেখাবে কিভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল জীব ও জীবন সম্পর্কে যত্নবান হতে হয়।

রাষ্ট্র ও সমাজের নিম্নতর পর্যায়ে নারী দৃষ্টিকোণের প্রয়োজনীয়তা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী। এ পর্যায়ে প্রতিটি সমাজে প্রচলিত নারীর অসম অধিকারের বৃত্তান্ত সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা যায়, একত্রীভূত করা যায় মেয়েদের অভিজ্ঞতার ব্যাপকতর দিক। এসব কারণে নিরাপত্তা বিষয়ক বিশ্লেষণে নারী দৃষ্টিকোণ সাম্প্রতিককালে বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে।

উল্লেখ্য যে, মেয়েদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ অপরাধ ও সহিংসতা , মহিলাদের মধ্যে অধিকতর বেকারত্ব ও আপেক্ষিকভাবে তাদের কম বেতন প্রদান, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও বসনিয়ার গৃহযুদ্ধে ব্যাপকভাবে সংঘটিত নৃশংস ধরনের ধর্ষণ বা বলাৎকার এবং অর্থনৈতিক ও পরিবেশ বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে মেয়েদের অধিকতর দুর্গতি–এসব বহুবিধ কারণে ঐতিহ্যগত রাষ্ট্র-মুখাপেক্ষী সামরিক নিরাপত্তার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক সচেতন অনুভূতি সৃষ্টি হয়; কেননা এ ধরনের দৃষ্টিকোণের মূলে কাজ করে পুরুষ-শাসিত সমাজের শক্তি ও কর্তৃত্বের চেতনা।[৫]

উপর্যুক্ত বহুবিধ কারণে নারী অধিকার চেতনার পাশাপাশি প্রসার লাভ করছে নারী দৃষ্টিকোণ। সাধারণত মহিলারা নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বহুমাত্রিক ধারণাগত সমকালীন কাঠামো রূপায়ণের অনুকূলে। তারা আগ্রহী নিরাপত্তার এমন ধরনের সংজ্ঞায়নে যা হবে জনগণভিত্তিক, ছাড়িয়ে যায় রাষ্ট্রের সীমারেখার সীমিত গণ্ডী, এমন কি আঞ্চলিক গণ্ডীর মধ্যেও সীমিত থাকবে না। মোটকথা, নারী দৃষ্টিকোণ সামরিক সহিংসতা ও সকল ধরনের হিংস্রতার বিপক্ষে। কেননা পেশী ও প্রযুক্তি ভিত্তিক সামরিকীকৃত সমাজে মেয়েদের বিরুদ্ধে সহিংসতা অধিকতর লক্ষণীয়। এতে সন্দেহের কোনোরূপ অবকাশ নেই যে, যুদ্ধ ও সমরবাদের শিকার হয় মহিলা সম্প্রদায় বিশেষভাবে। অনেক ক্ষেত্রে সাধারণত মেয়েদেরকে রণাঙ্গনের ভূমিকা থেকে দূরে রাখা হয় এবং ক্ষেত্রবিশেষ তাদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক রূপেও বিবেচনা করা হয়। প্রকৃতঅর্থে, এ জাতীয় কারণেই মহিলা সম্প্রদায় নিরাপত্তা ধারণাটিকে রাষ্ট্রীয় শক্তিভিত্তিক রূপরেখা মাপকাঠি থেকে বিচ্ছিন্ন দেখতে আগ্রহী যাতে নিরাপত্তা

www.pathagar.com

তার ঐতিহ্যগত বেড়াজাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে পারে বৃহত্তর মানব সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধনে।[৬]

নারী নিরাপত্তা ধারণাটি ব্যক্তিবিশেষের নিরাপত্তা, এমন কি তৃণমূল পর্যায়ে সম্প্রসারিত নিরাপত্তা চিন্তা-চেতনার সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ; কেননা এর সঙ্গে এমন একটি প্রত্যয়ের অনুভূতি সঞ্চার হয় যে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার মতো জনগণের নিরাপত্তা বিধানও একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ রূপে বিবেচিত। এর অর্থ হচ্ছে, নিরাপত্তার ধারণা হতে হবে এমন ব্যাপকতর যাতে ব্যক্তি জনমানুষের নিরাপত্তার সঙ্গে নিষ্কলুষ পরিবেশ -প্রতিবেশেরও নিশ্চয়তা মেলে?[৭]

বস্তুত, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নিরাপত্তা বিশ্লেষণে নারীর অবস্থান ও অধিকার সম্বলিত বিষয় নিয়ে তত্ত্বীয় নমুনার প্রবর্তন দেখা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্পর্কিত কায়রো সম্মেলনে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নারীর যথাযথ ভূমিকা নিশ্চিত করার ওপর জোর দেয়া হয়। অনেকে একে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার অনুকূলে একটি বিরাট পদক্ষেপ বলে মনে করে। সম্মেলনে নারীর ক্ষমতায়নে কর্মসূচি প্রণয়নের পক্ষে কর্মসূচি গৃহীত হয় এবং এ ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিশ্বব্যাপী প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ প্রদানেরও আহ্বান জানানো হয়।[৮] ১৯৯৫ সনে বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে নারীর অধিকার অর্জনে বিশ্বব্যাপী নারী আন্দোলনে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করে। ঐ মহা সম্মেলন আনুষ্ঠানিকভাবে নারীর নিরাপত্তা উন্নয়নে একটি কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করে।[৯]

এ সম্পর্কে ১৯৯৫ সনের বিশ্ব প্রশাসন সম্পর্কিত কমিশনের রিপোর্টের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা চলে। এতে গুরুত্ব দিয়ে বলা হয় যে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার মতো জনগণের নিরাপত্তা বিধানও একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং সকল রাষ্ট্রের মতো সকল ব্যক্তিমানুষ জনগণেরও স্ব স্ব নিরাপত্তার নিশ্চিত অধিকার রয়েছে এবং ঐসব অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করার দায়িত্ব রয়েছে রাষ্ট্রের।[১০] এসব বিবর্তমান সুচিন্তিত রূপরেখা ও কাঠামো বিবেচনায় রেখে এখন বাংলাদেশের বাস্তব অভিজ্ঞতার দিক পর্যালোচনা করা সমীচীন।

বাংলাদেশে নারীর নিরাপত্তার বাস্তব দিক

আমাদের দেশে নারীর নিরাপত্তাহীনতার ক্ষেত্রে এক নিষ্ঠুর ও কঠোর বাস্তবতা বিরাজমান। এ ক্ষেত্রে দেশের পুরুষ সমাজ প্রায়শ প্রতিপক্ষ বলে বিবেচিত। সত্যিকার অর্থে নরপক্ষ থেকে নারীদের নিরাপত্তাহীন অবস্থা সম্পর্কে তেমন ধরনের অকপট ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে বলে জানা নেই। প্রতিদিন সকাল বেলার পত্রিকা খুললেই চোখে পড়ে নারী হত্যা ও ধর্ষণের অনেক নির্মম কাহিনী। অনেক ক্ষেত্রে এসব কাহিনী বিভীষিকাময়, হৃদয়-বিদারক। শংকিত হবার আরো কারণ হলো এই যে, এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি দিন

www.pathagar.com

দিন বেড়েই চলেছে। পুলিশ সূত্রের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৯৮ সনে জানায়ারি-মে'র সময়ে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও এসিড নিক্ষেপের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৫১৫, ৯৭৪ ও ৪৩ ; কিন্তু ১৯৯৯ সনের জানুয়ারি-মে'তে তা বেড়ে যথাক্রমে দাঁড়িয়েছে ৩২০৩, ১২৬৪ ও ৫৩টিতে (সূত্র : The Daily Star (17 July 1999)। বস্তুত বলা চলে, বাংলাদেশে নারী নির্যাতন অনেকটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ধারণ করেছে।

বাংলাদেশে ইয়াসমিন ও সীমা চৌধুরীর পালাক্রমে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা দেশে, এমন কি বিদেশেও ব্যাপকভাবে প্রচার পেয়েছে। এগুলো ছিলো দ্বৈত-অপরাধ। কিন্তু এ অপরাধের জঘন্যতম দিক হচ্ছে যে, "নিরাপদ" পথযাত্রায় ও "নিরাপদ" আশ্রয় প্রদানের জন্য রাষ্ট্রের যে নিরাপত্তা বাহিনী দায়িত্বপ্রাপ্ত তাদের হাতেই এ দুই রমণীকে সম্ভ্রম ও প্রাণ দুটোই বিসর্জন দিতে হয়। বাংলাদেশে নারীদের নিরাপত্তাহীনতার এর চেয়ে নিষ্ঠুরতা বা প্রকৃষ্ট উদাহরণ সম্ভবত আর হতে পারে না। এ দুটো নৃশংস ঘটনার প্রতিনিয়ত জাতিকে বার বার স্মরণ করিয়ে দেয় নারীর প্রাণ ও ইজ্জত কিভাবে সঙ্গবদ্ধ লম্পটদের হাতে ভূলুণ্ঠিত হতে পারে। খোদ নিরাপত্তাবাহিনীর লোকজনও যে কতখানি উচ্ছৃঙ্খল ও পশুবৃত্তির পরিচয় দিতে পারে ইয়াসমীন ও সীমা চৌধুরী ঘটনা সম্বন্ধে বিবেকবান মানুষের কাছে নানাভাবে প্রশ্ন রাখে। রাষ্ট্রের প্রশাসনযন্ত্র, এমন কি বিচার বিভাগও সম্পূর্ণ বিচারের প্রক্রিয়া যে এ "নিরাপত্তা বাহিনীর" প্রভাব বলয়ের দৌরাত্ম্য থেকে মুক্ত হতে পারে নি এ দুই ঘটনার পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সীমা হত্যার বিচারের নামে প্রহসন, সংশ্লিষ্ট আইনজীবী এলেনা খানের আইনগত হয়রানি, খোদ ঢাকার কোর্ট প্রাঙ্গণে তিন বছরের শিশুর বলাৎকার এবং এক্ষেত্রেও একইরূপ বিচারের প্রহসন প্রক্রিয়া প্রভৃতি এদেশের 'গণতান্ত্রিক প্রশাসনের' ভাবমূর্তি হেয়প্রতিপন্ন করে।

বস্তুত, আমাদের সমাজে নারী সম্প্রদায়ের মত আর কোনো সামাজিক সম্প্রদায় এতখানি বৈষম্যের শিকার হয় না; অথচ দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হচ্ছে নারী। বাংলাদেশে মেয়েদের সামাজিক অবস্থার লঙ্ঘন শুরু হয় জন্মলগ্ন থেকে। কেননা অনেক ক্ষেত্রে মেয়ে শিশুর জন্মটাকেই ভালো চোখে দেখা হয় না। তাদের অধিকার লঙ্ঘনের প্রক্রিয়া চলতে থাকে শৈশবকাল থেকে বয়োপ্রাপ্তি অবধি। প্রশ্ন হতে পারে, আমাদের সমাজে কি শিক্ষা ও জীবনের অন্যান্য প্রয়োজন মেটাতে মেয়েদের ছেলেদের মতো একই ধরনের সমান সুযোগ লাভ করে? প্রায় ক্ষেত্রে এর উত্তর হবে নেতিবাচক।

অবশ্যি এর চেয়েও জঘন্য অপরাধের শিকার হয়ে চলেছে বাংলাদেশের সমাজের মেয়েরা। অনেক ক্ষেত্রে লিঙ্গ-লালসায় বাতিকগ্রস্থ পুরুষের আক্রমণের শিকার হয় মেয়েরা; অথচ স্ব-নিয়োজিত ফতোয়াবাজ অশুভ চক্রের

www.pathagar.com

নীতিবাগিশ ফতোয়ার লক্ষ্যস্থল হয় মেয়েরা। বৈষম্য চলে পারিবারিক অধিকারের ক্ষেত্রে ও সামাজিক পদমর্যাদায়, সম্পত্তির অধিকারের ক্ষেত্রে ও পছন্দসই পেশা বা জীবিকা বাচাইয়ের বিষয়ে, রাজনীতি ও প্রশাসনিক দায়িত্ব লাভের ব্যাপারে। বাংলাদেশে এমন কি অনেক ক্ষেত্রে মহিলাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রেও বাধার সম্মুখীন হতে হয়।

অবশ্যি এও সত্য যে, পদমর্যাদার ক্ষেত্রে সমগ্র বিশ্বব্যাপী মেয়েরা নানাভাবে হয়ে থাকে লাঞ্ছিত ও বৈষম্যের শিকার, কিন্তু এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান একেবারে নিচের দিকে। অথচ এটা নিতান্ত পরিহাস বলে মনে হবে, কেননা বাংলাদেশের মতো বিশ্বে কমই ভাগ্যবান দেশ রয়েছে যেখানে রাজনৈতিক অঙ্গনের দুপাশেই রয়েছে নারী নেতৃত্ব। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে বলা সমীচীন যে আমাদের সমাজের কোনো স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণে মেয়েদের তেমন ভূমিকা রয়েছে বলে মনে হয় না।

এছাড়া আরো উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের নারী সমাজ যথেষ্ট অধিকার সচেতন বলেই পরিচিত এবং এখানে নারী অধিকার আন্দোলনও যথেষ্ট জোরদার রয়েছে বলেই অনেকের ধারণা। এ দেশের নারী সমাজ হচ্ছে মহীয়সী রমণী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। সেই ঐতিহাসিক-ঐতিহ্যগত উপাদান ছাড়াও এদেশের সমকালীন নারী আন্দোলনে বেসরকারি সংস্থা ও আন্তর্জাতিক সাহায্যসেবী সংস্থাসমূহেরও বেশ সমর্থন রয়েছে। তবু এদেশে নারীর মুক্তি সুদূরপরাহত, চূড়ান্ত লক্ষ্যস্থলের ধারের কাছেও তারা পৌঁছতে পারে নি। এককথায় বাংলাদেশের নারী এখনো পেশীশক্তির বন্ধন ও শৃঙ্খলায় আবদ্ধ। এদেশে নারীর নিরাপত্তা এখানে স্বপ্নের মতো।

ভবিষ্যৎ কর্মসূচি ও পরিকল্পনা

বিশ্বব্যাপী সভ্যতার উন্নয়নের পাশাপাশি প্রতিটি দেশে সরকার ও জনগণ প্রয়াসী হচ্ছে কি করে নারী ও শিশুদের অধিকার ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা যায়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমাদের দেশে নারী সম্পর্কিত অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পেলেও অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশে নারীর অধিকার সুনিশ্চিত করার ওপরও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে যে বিষয়গুলো নিয়ে সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থার কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে নারীর ভোটাধিকার, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলোসহ জাতীয় সংসদ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠনসমূহে তাদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা, বিভিন্ন সরকারি সংগঠন ও সংস্থাসমূহে মহিলাদের চাকুরীর অধিকার সংরক্ষণ এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায় অবধি মেয়েদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদানকল্পে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদি। এসব উদ্যোগ নিঃসন্দেহে

www.pathagar.com

প্রশংসনীয় ; কিন্তু পরিবর্তনশীল চিন্তাচেতনা ও বিশ্বব্যাপী বাস্তবতার নিরিখে বাংলাদেশের নারী সম্প্রদায়ের অধিকার ও নিরাপত্তার বিষয় গভীরভাবে পর্যালোচনার অপেক্ষা রাখে।

যে-কাজ সর্বাগ্রে করণীয় তা' হলো বাংলাদেশে নারী সমাজের অধিকার ও নিরাপত্তা বিষয় সম্পর্কে ধারণাগত মূল্যায়ন এবং একই সঙ্গে প্রয়োজন দেশের নিরাপত্তা দৃষ্টিকোণ্ পূর্ব নির্ধারণ– যাতে প্রচলিত আইন ও কার্যকর নীতির ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যায়। ঐ সম্পর্কে বলতে দ্বিধা থাকা উচিত হবে না যে, বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্রতর শক্তিগুলোর জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়গুলো সম্পর্কে খুব কমই সমীক্ষা হয়েছে ; অথচ আমাদের দেশের মতো এ ধরনের ছোট দেশগুলোর নিরাপত্তা বিষয়ক সমস্যা বৃহত্তর শক্তিগুলো চাইতে অনেক বেশি জটিল। পক্ষান্তরে গুণগতমানের দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের মতো দেশেগুলোর সমস্যার সমাধান অধিকতর শ্রেষ্টত্বের প্রমাণ দাবি রাখে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নকামী দেশের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করে এটা বলা সমীচীন যে, এসব দেশের জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়কে দেখতে হবে "উন্নয়নের সার্বিক প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত ফলশ্রুতি" হিসেবে। মোদ্দাভাবে এর অর্থ হচ্ছে, সার্বিক জনগোষ্ঠীর অর্ধেককে অন্ধকারে ঢেকে রেখে সত্যিকার অর্থে কোনো জাতির উন্নয়ন হতে পারে না।

এটা অবশ্য সত্য যে, বিগত প্রায় নয় বছর অবধি বাংলাদেশের সরকার প্রধান হিসেবে দেশের জনগণ নারী নেতৃত্বের জন্য ভোট প্রদান করেছে। নারীদের ক্ষমতায়নে এটা কম সাফল্যের কথা নয়। প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশের মতো একটা উন্নয়নশীল দেশের রক্ষণশীল সমাজে এটা কম ভাগ্যের কথা নয় বটে; কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সার্বিকভাবে নারী সম্প্রদায়ের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়েছে কি? উত্তর হবে সম্ভবত নেতিবাচক। নারীর অধিকার, নারীর নিরাপত্তা বা নারী মুক্তি এসব এখনো শ্লোগান সর্বস্ব, ফাঁকা বুলিমাত্র বলে বিবেচিত হতে পারে।

মহিলাদের আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কিত নিরাপত্তা বাহিনী বা পুলিশ বাহিনীতে নিয়োগের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে। এ নিয়োগ শুরু হয়েছিল ১৯৭০-এর শেষপাদ থেকে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে মেয়েদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি চোখে পড়ার মত নিশ্চয়-ই নয়। এর চাইতেও বড় কথা হলো, মহিলা পুলিশ নিয়োগের পরও নারীর নিরাপত্তা যে পূর্বের চেয়ে অধিকতর নিশ্চয়তা লাভ করেছে এমন বলা যায় না। 'পুলিশি হেফাজতে' নারীর লাঞ্ছনা ও সম্ভ্রম হানির উপর্যুপরি ঘটনা তার-ই প্রমাণ বহন করে।

একই প্রক্রিয়ায় সরকারের বিভিন্ন দফতর ও সংস্থায় মহিলাদের জন্য চাকরীর আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট করে বিশেষ বিধান (কোটা পদ্ধতি) পাশ করা হয়েছিল, কিন্তু এ ধরনের আইনগত অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন হয় অতি কদাচিৎ। এমন দৃষ্টান্ত থেকে এটাই মনে হয় যে, আইনগত বিধান-ই যথেষ্ট নয়। বস্তুত

www.pathagar.com

১৯৯৮ সনে বাংলাদেশ তার জন্মের রজত জয়ন্তী পালন করে। খুব শীঘ্র বাংলাদেশের জনগণ বাদবাকি বিশ্বের সঙ্গে একুশ শতক ও তৃতীয় সহস্রাব্দীতে অনুপ্রবেশ করতে যাচ্ছে। অতীতের ব্যর্থতার মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যতের আশাব্যঞ্জক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের শপথ গ্রহণের সময় এখনই। দেশের নারী সমাজের বর্তমান অবস্থা পুনর্মূল্যায়ন করে এখন দেখতে হবে এ যাবত আইনগত বিধান করে আমাদের দেশের মেয়েদের ভাগ্যের ক্ষেত্রে কোনোরূপ গুণগত পরিবর্তন এসেছে কিনা।

সম্ভবত এখনই সময় যে, দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে আলোক-প্রাপ্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উচিত হবে দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটানো। যা না হলে উন্নয়নের নিরবচ্ছিন্ন ধারা অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে না। স্পষ্টতই বলা চলে, উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে বা অবহেলা করে, বাংলাদেশের মতো দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে না। অন্যকথায়, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারী সম্প্রদায়ের যথাযথ অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে হবে এবং এ কাজ যত দ্রুত করা যায় ততই মঙ্গল।

নারী সম্প্রদায়কে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন নারী সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন, প্রয়োজন দেশের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সংখ্যানুযায়ী নারীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা। এ বিষয় নিয়ে প্রতিবেশী দেশ ভারতসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশেও বিতর্ক চলছে–কি করে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় মহিলাদের অংশগ্রহণ অধিকতর সহজসাধ্য করা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রস্তাব রাখা হচ্ছে যে জাতীয় সংসদ ও অন্যান্য প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠনসমূহে মেয়েদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন বরাদ্দ করা।[১১]

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশে একটি জাতীয় সমোঝতা প্রয়োজন। বর্তমানে আমাদের দেশে জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য মাত্র ৩০ (ত্রিশ) টি আসন নির্দিষ্ট রয়েছে এবং তারা নির্বাচিত হয়ে থাকে জাতীয় সংসদ সদস্যদের দ্বারা পরোক্ষ ভোটে। মহিলাদের ক্ষমতায়ন বা প্রতিনিধিত্বশীলতার অনুকূলে প্রকৃত পন্থা নিশ্চিত করতে হলে মহিলাদের জন্য জাতীয় সংসদে অন্ততপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ আসন নির্দিষ্ট রাখতে হবে- যাতে তারা প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হতে পারে এবং প্রতিনিধিত্বশীলতার প্রকৃত মাপকাঠি নিয়ে তারা নারীদের অধিকার সুনিশ্চিত করতে পারে।

এছাড়া, খোদ মন্ত্রীসভার মহিলাদের প্রতিনিধিশীলতার প্রশ্নও বিজড়িত। স্বাধীনতা উত্তরকালের মন্ত্রীসভাসমূহে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব ছিল অনেকটা প্রতীকী, সংখ্যানুযায়ী পদ বহু দূরের কথা, মহিলা মন্ত্রীদের তেমন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীত্ব দেয়া হয়েছে বলে মনে হয় না। নারীদের সংখ্যার দিক মনে রেখে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের প্রতিনিধিত্বশীলতার গুরুত্ব বিবেচনা করে

www.pathagar.com

মন্ত্রীসভারও তাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ মন্ত্রীত্বের পদ নির্দিষ্ট করে রেখে দেওয়া সমীচীন হবে। চাকুরীর ক্ষেত্রেও একই ধরনের সংখ্যার বিষয় মনে রাখতে হবে এবং কঠোরভাবেই সেই বিধানের বাস্তবায়ন করতে হবে। এমন ক্ষেত্রে মহিলাদের অধিকার বাস্তবায়ন করতে হলে প্রশাসনিক-প্রহরী সংস্থার যেমন প্রয়োজন তেমনি সংসদীয় কমিটিতেও পর্যালোচনা আবশ্যক হতে পারে।

বর্তমানে আমাদের নারীশিক্ষার ওপর যে-জোর দেয়া হচ্ছে তা' অবশ্যই ইতিবাচক। প্রয়োজন হচ্ছে একে আরো জোরদার করা। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের রূপ দেয়া। আরো মনে রাখতে হবে, মেয়েদের জন্য যে কোনো ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা করলেই হবে না– তাদের ফলপ্রসূ শিক্ষার প্রয়োজন, যে–শিক্ষা তাদের উৎপাদনমুখী ও আত্মনির্ভরশীল করার সুযোগ প্রদান করবে। পুলিশ বাহিনীতে মহিলাদের অধিকতর হারে নিয়োগের সুযোগ রয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীতে তাদের অধিকতর হারে নিয়োগের অর্থ হবে সমরূপ মর্যাদা ও নিরাপত্তা প্রয়োজনের স্বীকৃতি। একইভাবে, প্রতিরক্ষা বাহিনীগুলোতেও মেয়েদের নিয়োগের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রেও সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদাবোধের সঙ্গে নারীদের নিরাপত্তার বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এসব ক্ষেত্রে নতুন নিয়োগনীতি এরূপ মানের হওয়া বাঞ্ছনীয় যে, "নারী-পুরষ শ্রেণীর সম-অধিকারের সুযোগ থাকবে।" এমন কি ক্ষেত্রবিশেষ মেয়েদের পক্ষে ইতিবাচক বা অনুকূল সুযোগ সৃষ্টির লক্ষে, তাদের ব্যতিক্রমধর্ম বিশেষ অধিকারও দেয়া যেতে পারে।

যে বিষয়ে অবিলম্বে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন তাহলো মেয়ে শ্রেণী বা মহিলাদের সহিংস অপরাধ প্রবণতার ছোবল থেকে মুক্ত করা। সাম্প্রতিককালে মহিলারা উত্তরোত্তর হারে নানা ধরনের সহিংস অপরাধ প্রবণতার শিকার হচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশে মেয়েদের নানাভাবে ও বিভিন্ন পর্যায়ে-পাচার করা হচ্ছে, হচ্ছে ধর্ষিত, এসিড দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে, নিক্ষিপ্ত হচ্ছে দেহবিক্রির ব্যবসায়, এমন কি ধর্ষিত হবার পর খুন-খারাবির শিকারও হয়ে চলছে। কারা দায়ী এসবের জন্য? বলতে হবে, আমাদের সমাজ, বিশেষ এক শ্রেণীর বখাটে পুরুষ সমাজ। অবশ্য সমাজ তো রাতারাতি বদলাবে না, কিন্তু ভাগ্যাহত নারীরা কি এসব সহিংস অপরাধের শিকার হয়েই চলবে? মেয়েদেরকেই প্রথমে এগিয়ে আসতে হবে এসব সংঘবদ্ধভাবে প্রতিহত করতে। সমাজের সকল পর্যায়ে নারী সংগঠন গড়ে তুলতে হবে, হতে হবে তাদেরকে প্রতিবাদমুখর। উপস্থাপন করতে হবে তাদের উন্নয়নের কর্মসূচি ও পরিকল্পনা। মেয়েদের মধ্যে আত্মত্যাগমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। দেশের বেসরকারি সংস্থাসমূহ, বাংলাদেশ জাতীয় ক্যাডেট কোর

www.pathagar.com

(বি.এন.সি.সি.) স্কাউটস, এবং গার্ল গাইড্‌সহ মেয়েদের বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনসমূহ এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

এছাড়া, সরকারি পর্যায়ে অনেক কিছু করণীয় কাজ রয়েছে। একটা বড় কাজ হচ্ছে গ্রাম ও মহল্লা পর্যায়ে ফতোয়াবাজি বেআইনী ঘোষণা করা। শুধু তাই নয়, একে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচনা করতে হবে যাতে মনোবৈকল্য পুরুষদের অপরাধের জন্য অসহায় মেয়েদের অমানবিক শাস্তির শিকার না হতে হয়। আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে নারীর অধিকার ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত সার্বিক বিষয়াদিসহ সমাজের অপরাধ প্রবণতার কারণ ও পরিপ্রেক্ষিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা এবং সে অনুযায়ী করণীয় নির্ধারণ করা। এজন্য তথ্য সংগ্রহ, জরিপ, পর্যবেক্ষণ, গবেষণা–এ ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। মূল লক্ষ্য হবে সমাজে পুরুষ ও নারী উভয় সম্প্রদায়ের সমান উন্নয়ন সুনিশ্চিত করা। কেননা, উভয় সম্প্রদায়-ই প্রকৃতির সৃষ্টি এবং প্রকৃতিদত্ত সম্পদে উভয়ের-ই রয়েছে সমান অধিকার।

এসব ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হলে সমাজের সকল বিবেকবান মানুষ ও সংগঠনসমূহকে তৎপর ও সক্রিয় হতে হবে, এগিয়ে আসতে হবে গণমাধ্যমসমূহকে, বেসরকারি সংস্থা ও সরকারি সংগঠনসমূহকে, সর্বোপরি– মেয়েদের অধিকার ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানে তাদেরকেই সংঘবদ্ধ হতে হবে, সজাগ হতে হবে তাদের প্রাপ্য অধিকার সম্পর্কে, গঠন করতে হবে সচেতন প্রহরী গোষ্ঠী। প্রয়োজনবোধে তারা সংবেদনশীল পুরুষদেরও তাদের সংগ্রামের সহযোগী হিসেবে জড়াতে পারে। দেখতে হবে যাতে সমাজের প্রতিটি পর্যায়ে নারীদের অতি প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানে চেতনা ও বিবেকসম্পন্ন সতর্ক গোষ্ঠীমাত্রই তৎপর থাকে। ভাবতে হবে যে, নারীর অধিকার, নিরাপত্তা, অংশদারীত্ব ও সার্বিক সমাজের উন্নয়ন প্রভৃতি একই যুক্তিযুক্ত ধারায় সম্পৃক্ত। দেশ ও সমাজের উন্নয়নের নিশ্চয়তা কাম্য হলে অবশ্যই দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীর অধিকার ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। মনে রাখতে হবে একটি উন্নততর প্রজন্মের যথার্থ উত্তরাধিকারের প্রধান উৎস হচ্ছে সুস্থ ও অধিকার সচেতন নারী সম্প্রদায়।

তথ্যনির্দেশ

১. স্নায়ুযুদ্ধ-উত্তরকালীন বহুমাত্রিক ও বহুপর্যায়ের নিরাপত্তা বিতর্ক সম্পর্কে দ্রষ্টব্য, Carolyn M. Stephenson, "New Approaches to International Peacemaking in the Post-Cold War world", in Michael T. Klare (ed.) *Peace and World Security Studies : A Curriculum Guide.* Sixth Edition (Boulder : Lynne Rienner

www.pathagar.com

Publishers. 1994); Uday Bhaskar, "Post-Cold War Security, " *Stratigie Analysis* (November 1997); Kemeth N. Waltz, " Reality Thought and Neorealist Theory," in Robert L. Roths (ed.), *The Evolution of Theory in International Relations* (Columbia : University of Carolina Press, 1991); J. Ann Tickner, "Re-visioning Security," in Ken Booth and Steve Smith (eds.), *International Relations Theory Today* (University Park, Pa. : The Pennsylvania University Press, 1995); Ambalavanar Sivaraja, " International Security at the End of the Cold War," in George A. Cooray (ed.), *New Dimensions of Security after the Cold War* (Colombo : Institute for International Studies, 1997).

২. স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালে শান্তি গবেষণা আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্র ও শক্তিভিত্তিক সামরিক কলাকৌশল ও কৌশলগত চিন্তাধারার মোকাবিলা করা। সেই কারণে রাষ্ট্রের অভ্যন্তীরণ সমস্যাবলি, বিশেষ করে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সমস্যা বা নিরাপত্তা নিয়ে ভাবনার তেমন কোনো অবকাশ ছিল না। দ্রষ্টব্', D. Dunn "Peace Research Versus Strategic Studies," in Ken Booth (ed.), New Thinking About *Strategy and International Security* (London, Harper Collins, 1991); Thickner প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

৩. Thickner, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৪৯.

৪. ঐ, পৃ. ৫০.

৫. ঐ, পৃ. ৫০-৫১.

৬. ঐ, পৃ. ৫১.

৭. ঐ, পৃ. ১৯০-১৯৩.

৮. Philip Flood, "Sustainable Development : The Way Ahead," *BIISS Journal*, Vol. 16, No. 1 (1995), পৃ. ৪০-৪১.

৯. *The Bangladesh Observer* (17 September 1995), *The Daily Star* (16 September, 1995).

১০. *The World Commission on Global Governance. Our Global Neighbourood : The Basic Vision* (Geneva, 1995).

১১. বাংলাদেশে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও তাদের ভূমিকা সম্পর্কে বিশ্লেষণের জন্য দ্রষ্টব্য, "Women in Bengladesh Politics", in Abul Kalam (ed.), Bangladesh : Internal Dynamies and External Linkags (Dhaka : The University Press Limited, 1996), পৃ. ৩২-৪৮

www.pathagar.com

ষোড়শ অধ্যায়

জাতীয় ভাবমূর্তি, মহিমান্বিত ঐতিহ্য, কৌশলগত দর্শন ও বাস্তবতা : বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

ব্যক্তি মানুষের মতো জাতিরও ভাবমূর্তি থাকে। বস্তুত, যে কোনো দেশের জাতীয় ভাবমূর্তি থাকা অপরিহার্য। সমকালীন আন্তর্জাতিক সিস্টেমে প্রায় সকল দেশ তাদের জাতীয় ভাবমূর্তি উদ্ভাবন করতে সমর্থ হয়েছে, সক্ষম হয়েছে ভাবমূর্তি প্রদর্শনে।[১] এটা খুব একটা সহজ প্রক্রিয়া নয়, এ প্রক্রিয়ার প্রায়শ যে কোনো জাতি ক্ষত-বিক্ষত হয়। কেননা এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে আত্মজ অনুভূতি, স্ব-পরিচয়, স্বীয় উপলব্ধি মূল্যায়ন ও পুনর্মূল্যায়ন – এসব বহুবিধ প্রক্রিয়াগত প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। অনেক সময়, প্রশ্ন আসে – আমরা কে বা জাতি হিসেবে কি আমাদের পরিচয়, কিভাবে জাতি-রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের আপন সত্তা লাভ হয়েছে, কি আমাদের উদ্দেশ্য এবং কিভাবে এসব উদ্দেশ্য সাধনে আমরা আত্মনিয়োগ করবো? বিশ্বের অনেক দেশ এ ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছে, উত্তরও খুঁজে বের করেছে। এসব প্রশ্নের সঙ্গে বিজড়িত কৌশলগত আদর্শের বিষয়াদি সম্পর্কযুক্ত কর্ম-কৌশল সম্বলিত নীলনকশা জাতির ভাবমূর্তি সম্পর্কিত মৌলিক প্রশ্নগুলো উত্থাপিত হয় নেতৃত্ব ও নীতিগত বিষয়গুলোকে ঘিরে।

জাতি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় অতি সাম্প্রতিক। কিন্তু উপর্যুক্ত প্রশ্নগুলোর জরুরি গুরুত্ব বিবেচনা করে যথার্থ আন্তরিকতা সহকারে জাতীয় পর্যায়ে কখনো এসব প্রশ্ন আমাদের দেশে উত্থাপিত হয় নি, প্রয়োজন অনুভূতি হয় নি এসবের প্রকৃত উত্তরের সন্ধান বা কাঙ্ক্ষিত সমাধানের। আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের পরিচয় হচ্ছে একটি দুর্যোগপূর্ণ, বিবদমান ও দারিদ্র্যক্লিষ্ট দেশ হিসেবে। এ দেশের নাম শুনলে মানুষ ভাবে প্রকৃতি ও মানুষ-সৃষ্ট বিপর্যয়ের কথা, বার বার যে দেশে এ ধরনের বিপর্যয়ের শিকার হয়ে চলেছে, ভাবে সেই 'তলাবিহীন ঝুড়ির কথা' যাকে নিয়ে হেনরী কিসিঞ্জার এক সময় বিদ্রুপাত্মক ভাষা ব্যবহার করেন। সময় সময় বাংলাদেশকে 'উন্নয়ন-অনুন্নয়নের গবেষণা ক্ষেত্র' বলেও বিবেচনা করা হয়, কেননা মনে করা হয় যে এ দেশ চিরন্তন আন্তর্জাতিক সাহায্য-সমর্থনের ওপর

www.pathagar.com

নির্ভরশীল, এদেশে কোনো গতিশীল নেতৃত্ব নেই, নেই কোনো সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতিগত দিকদর্শন, মনে হয় যেন দেশটি অনেক পথভ্রষ্ট ও লক্ষ্যহীন। এসব দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বলতে হয় যে, বাংলাদেশের কোনো সম্মানজনক ভাবমূর্তি নেই।[২] জাতি হিসেবে আমরা নিদারুণভাবে ক্ষত-বিক্ষত, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের প্রয়োজনীয় দৃষ্টিশক্তির অভাব রয়েছে– যে দৃষ্টিশক্তি ছাড়া কোনো জাতির পক্ষে জাতীয় সত্তা বা অনুগত্য নির্ধারণ সম্ভব হয় না, সম্ভব হয় না জাতি গঠনের প্রকৃত পন্থা অবলম্বন।

নেতাজী শতবার্ষিকী

সাম্প্রতিক কিছু ঘটনাপ্রবাহ উপর্যুক্ত বিষয়াদিতে আমাদের চিন্তার খোরাক যোগাতে পারে; ভাবতেও পারি আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের বর্তমান কালের অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথ শেষে কিভাবে আলোর সন্ধান করা যেতে পারে, অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি সহকারে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করে কি প্রক্রিয়ায় আমরা জাতীয় ভাবমূর্তির রচনা ও জাতির ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা বিধানে একটি কর্মমুখর নীলনকশা প্রণয়ন করতে পারি।

সাম্প্রতিক উল্লেখ্য ঘটনা প্রবাহের সূত্রপাত হয় ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবী পুরুষ সুভাষ চন্দ্র বোসের (১৮৯৭–১৯৪৫) জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে। অতি শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি ভক্তদের দ্বারা জনপ্রিয়ভাবে "নেতাজী" খেতাবে অভিষিক্ত হন, প্রায়শ তাকে "ভারতীয় বিপ্লবের জনক" বলে অভিহিত করা হয়। বস্তুত তিনি ছিলেন উপমহাদেশের এক অসাধারণ চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব। উপনিবেশবাদ-বিরোধী আন্দোলনে ১৯৩০-এর দশক থেকে তিনি অতি সক্রিয় আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করেন। সেই আন্দোলন ১৮ আগস্ট ১৯৪৫ তারিখে এক মারাত্মক দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু অবধি অব্যাহত থাকে। এ উপমহাদেশের স্বাধীনতা তিনি দেখে যেতে পারেন নি, কিন্তু যে বিপ্লবী আন্দোলন এ স্বাধীনতা প্রকৃত অর্থে সম্ভব করেছিল সে আন্দোলনের তিনিই ছিলেন একজন প্রধান হোতা। সুভাষ বোস তাঁর বিপ্লবী আদর্শ, কর্মকাণ্ড ও সংগঠনের মাধ্যমে সমকালীন বাঙালি নেতৃত্বকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।[৩] তাঁর অনুপ্রেরণায় উদ্দীপ্ত নেতৃবর্গের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের জননায়ক এবং এদেশের মুক্তি আন্দোলনের স্থপতি মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান স্বয়ং। ১৯৯৭ সনের ২৩ জানুয়ারিতে পশ্চিম বাংলার কোলকাতায় নেতাজী শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে নেতাজী গবেষণা ব্যুরো শেখ মুজিবকে মরণোত্তরভাবে প্রখ্যাত 'নেতাজী' পদকে পুরস্কৃত করে। বোস ও মুজিবের আদর্শিক বন্ধনের এ ছিল আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি।

www.pathagar.com

বলা প্রাসঙ্গিক যে, আন্তর্জাতিক নেতাজী শতবার্ষিকী কমিটি সুভাষ বোসের জন্মশতবার্ষিকী পালন উপলক্ষে সমগ্র ভারতে সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু আনুষ্ঠানিকভাবে নেতাজী পদক শেখ মুজিবের কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানার নিকট হস্তান্তর করেন। এটা ছিল বেশ একটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কেননা এ পদক প্রদানের মাধ্যমে শুধু মুজিব স্বয়ং বা তাঁর পরিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয় নি; বরং এর মাধ্যমে ভারত-বাংলাদেশ রাজনৈতিক ভিন্নতা সত্ত্বেও মুজিবকে দু'বাংলার অভিন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। দু'বাংলার এ সীমান্তে অসংখ্য বাঙালির কাছে এটা ছিল অনেক আনন্দ, গর্ব ও গৌরবের বিষয়। কেননা এর মাধ্যমে খোদ বাংলাদেশের একজন বীর ও সংগ্রামী সন্তানকে ওপার বাংলার বাঙালিরা একজন নেতার বীরত্বের প্রতীক স্বরূপ স্বীকৃতি প্রদান করে।

নেতাজী জন্ম শতবার্ষিকীর আরো তাৎপর্য রয়েছে। কেননা এই প্রথম বারের মতো সমগ্র ভারতে সুভাষ বোসকে স্বসম্মানে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন বীর হিসেবে সম্পূর্ণরূপে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। এটা সম্ভব হয় কংগ্রেসের দীর্ঘকালীন শাসনের একচ্ছত্র কর্তৃত্বের অবসানের ফলে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস এখন থেকে ক্রমশ পুনর্লিখিত হতে চলছে। সুভাষ বোসের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে এই প্রথমবারের মতো ভারতে জাতীয়ভাবে তাঁর জন্মদিনটি জাতীয় দিবস হিসেবে পালিত হয়। ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শংকর দয়াল শর্মা লোকসভা ভবনে সুভাষ বোসের মূর্তি উন্মোচিত করেন। তৎকালীন উপ-রাষ্ট্রপতি এবং বর্তমান রাষ্ট্রপতি কে.আর. নারায়ণ সুভাষ বোসকে 'সকল দেশপ্রেমিকদের মধ্যে সেরা দেশপ্রেমিক' বলে অভিহিত করেন। ভারতের একজন সেরা মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী নেতা পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সুভাষ বোস সম্পর্কে তাঁর চিরাচরিত মত পরিবর্তন করে আরো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। তিনি প্রকাশ্যে জানান যে, ভারতীয় কম্যুনিস্টরা সুভাষ বোস সম্পর্কে তাদের "ভুল মূল্যায়ন" পরিবর্তন করেছে। আগে ভারতীয় কম্যুনিস্টরা সুভাষ বোসকে ফ্যাসিবাদের সহযোগী বলে মনে করতো, কিন্তু এই প্রথমবারের মতো তারা তাঁকে "নেতাজী" ভুষণে সম্বোধন করে সম্মান প্রদর্শন করে।[৪] এসবে প্রতীয়মান হয় যে, সুভাষ বোসের মহিমান্বিত প্রবাদ তার পুরো মোহমায়া ও ঐশ্বর্য সহকারে পুনরাবির্ভূত হয়েছে। তবু এটা প্রায় পরিহাস বলে মনে হবে যে, স্বাধীন ভারতে তার সবচেয়ে গতিশীল নেতা ও মুক্তিযুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ বীরকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন ও প্রকৃত আসনে আসীন করার জন্য পাঁচ দশকেরও অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়।

www.pathagar.com

প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকে এক্ষেত্রে শিক্ষণীয় বাংলাদেশ আমাদের অনেক কিছু রয়েছে। ভারত তার সবচেয়ে মহিমান্বিত ও মুক্তিযুদ্ধের আত্মবিসর্জনকারী বীরকে তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য সম্মান থেকে প্রবঞ্চিত করে কার্যত বিশ্বমঞ্চে নিজকে বঞ্চিত করে একটি ইতিবাচক জাতীয় ভাবমূর্তি থেকে। কেননা সুভাষ বোসের আত্মত্যাগ শুধু নিজের জন্য ছিল না, তাঁর সংগ্রাম ছিল ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে, সমগ্র উপমহাদেশের স্বাধীনতা, মুক্তি ও আত্মমর্যাদার জন্য। তাই সুভাষ বোসের আত্মত্যাগসুলভ নেতৃত্বের স্বীকৃতি শুধু নেতৃত্বের প্রসঙ্গই বিজড়িত ছিল না, বিজড়িত ছিল উপমহাদেশের নীতি প্রাসঙ্গিক বিষয়াদিও। তবে সম্প্রতি ভারতে অতীত ভুলের স্বীকৃতি এবং সুভাষ বোসকে ভারতের ইতিহাসে তার ন্যায্য সম্মানে অধিষ্ঠিত করে যে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তার ফলে সেই দেশ তার প্রকৃত ভাবিষ্যৎ নির্ধারণে যথাযথ সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

মাত্র বিছুকালপূর্বে বাংলাদেশ তার স্বাধীনতার রূপালী জয়ন্তী উদ্‌যাপন করে। এদেশের মানুষ ১৯৪৭ সনেও একবার স্বাধীনতা লাভ করেছিল দু'দুবার স্বাধীনতা লাভ করেও এদেশের মানুষ এখনো ভাগ্যাহত, এদেশে এখনো স্থির নীতি বা কোনো নীতি আদৌ রয়েছে কিনা সন্দেহ সংকট অত্যন্ত প্রকট বিভিন্ন পর্যায়ে। দেশে নেতৃত্বের পরিচয় গতিশীলতায়। নীতি ও নেতৃত্ব উভয়বিধি সংকট থেকে অব্যাহতি লাভকল্পে বাংলাদেশকে ভারতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। ভারত স্বাধীনতার এতোকাল পরে অতীতকে ঘিরে নতুন ভাবে বাস্তবতার স্বীকৃতি প্রদানে সজাগ হয়। দু'দুবার বাস্তবতার স্বীকৃতি প্রদানে সজাগ হয়। দু'দুবার স্বাধীনতা লাভ করতে গিয়ে এদেশের মানুষ অনেক ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে, কিন্তু নেতৃত্ব ও নীতির প্রশ্নে অব্যাহত সংকটের ফলে এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী স্বাধীনতার সুফল থেকে বঞ্চিত। তাই নেতৃত্বে ও নীতি প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলোর উত্তরের অনুসন্ধান করে আমাদের প্রকৃত জাতীয় ভাবমূর্তি কি হওয়া উচিত সেই বিষয়ে নজর দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

এটা অবশ্যি পুনর্বার জোর দিয়ে বলা প্রয়োজন যে, যে কোনো জাতির ভাবমূর্তি নির্ধারণে নেতৃত্ব ও নীতির প্রশ্ন-ই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের জন্য এ সম্পর্কিত সমস্যাবলি চিহ্নিতকরণ ও সমস্যার সমাধান অপরিহার্য হয়ে পড়েছে, কেননা আন্তর্জাতিক সমাজে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি অত্যন্ত ম্লান, অমর্যাদাকর। দেশের মর্যাদা পুনর্বাসনকল্পেই জাতীয় ভাবমূর্তির বিষয়াদি সমাধান হওয়া অত্যাবশ্যক। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জাতীয় ভাবমূর্তির বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত। যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবিত উন্নয়ন ও প্রযুক্তিক বিপ্লবের ফলে সমগ্র বিশ্ব এখন ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত, উপমা হিসেবে একে বলা হয় বিশ্ব গ্রাম। কিন্তু ব্যবসায়িক লেনদেন, বিনিয়োগ, প্রযুক্তির

www.pathagar.com

সংযোগ, তারের যোগাযোগ এবং সার্বিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে জাতীয় ভাবমূর্তি বিশেষ আকর্ষণের কারণ বলে বিবেচিত।

প্রবন্ধের প্রথম ভাগে প্রাসঙ্গিক ধারণাগত বিষয়গুলি, যেমন জাতীয় ভাবমূর্তি, কারিশমা বা ব্যক্তি-মহিমা ও রণনীতি বিশ্লেষণের প্রয়াস মেলে। লক্ষ্য হচ্ছে একটি বিশ্লেষণী রূপরেখা দাঁড় করানো। সেই রূপরেখাই ব্যবহৃত হয়েছে প্রবন্ধের দ্বিতীয় ভাগে। উদ্দেশ্য হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার অভিন্ন মহিমান্বিত ঐতিহ্যকে তুলে ধরা। এতে বিশ্লেষণ বিশেষভাবে নিবন্ধ হয়েছে সুবাষ বোস ও শেখ মুজিবের ওপর। পরিশেষে, প্রবন্ধের তৃতীয় ভাগে বাংলাদেশের জন্য একটি জাতীয় ভাবমূর্তি এবং দেশের কৌশলগত দিকদর্শন ও কর্মকাণ্ডের প্রকৃত গতিধারা নির্ধারণে একটি রূপরেখা বা নীলনকশা প্রণয়নের প্রয়াস মেলে।

১. জাতীয় ভাবমূর্তি, ব্যক্তি-মহিমা ও রণনীতি ঃ ধারণাগত যোগসূত্র

'জাতীয় ভাবমূর্তি' খুব একটা সহজে ব্যাখ্যা করার মতো বিষয় নয়; কেননা প্রতিটি জাতির ভাববমূর্তি হচ্ছে বেশ জটিল-যে সব ব্যক্তি মানুষ বা নেতৃবর্গ জাতির ক্ষমতায় আসীন হন কিংবা জাতির নেতৃত্বের বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা করেন তাঁদের সেই ভাবনার সমন্বয়ে গঠিত হয় জাতীয় অভিব্যক্তি। তাই জাতীয় ভাবমূর্তি কোনো বিশেষ একটি মাত্রাভিব্যক্তি নয়, অনেক কিছুর সমন্বয়ে সংগঠিত হয় জাতীয় ভাবমূর্তি।[৪] মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করে বলা যায়, "ভাবমূর্তি হচ্ছে যে কোনো বিষয় সম্পর্কে ব্যক্তি-মানুষের চিন্তা-চেতনা বা অবধারণ বোধের সংঘবদ্ধ অভিব্যক্তি মাত্র,......... ব্যক্তিবিশেষের চেতনাবোধ সেই বিমূর্ত ভাব যেভাবে ধরা দিচ্ছে।"[৫] মনোবিজ্ঞানীরা প্রায়শ জাতীয় ভাবমূর্তি ধারণার বিশ্লেষণে "প্রক্ষেপণ" প্রত্যয়টি ব্যবহার করে থাকেন। এতে প্রতিফলিত হয় এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে অন্য জাতি সম্পর্কে মানুষের কিছু কিছু সুনির্দিষ্ট প্রত্যক্ষণ অনুভূতির সঞ্চার করে যা চালিত হয় সেই দেশ সম্পর্কে ঐতিহ্যগত ইতিহাস বোধ-চেতনা বা ধারণা সঞ্চারিত হয়ে থাকে জ্ঞান ও শিক্ষণ প্রক্রিয়ায়, গণ-যোগাযোগের মাধ্যমে, রাজনৈতিক কৃষ্টিসহ অন্যান্য সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া।

জাতি-রাষ্ট্রসমূহের আচরণের অভিব্যক্তি অত্যন্ত জটিল। এটা অবিদিত নয় যে, জাতি-রাষ্ট্র সত্তার আচরণের ক্ষেত্রে এই জটিলতার কারণ হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত থেকে এমন একটি অবস্থান চিহ্নিত বা বাছাই করা যাতে কার্যত নেতৃত্ব বা নীতি নির্ধারককারীর নিজস্ব ভাবমূর্তিই প্রতিফলিত হয়। এটাও অবিদিত নয় যে, নেতৃত্বে থাকেন আপেক্ষিকভাবে

www.pathagar.com

কতিপয় শক্তিধর ব্যক্তিত্ব যারা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করে থাকেন। এতে সাধারণ মানুষ বা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভূমিকা তেমন একটা থাকে না বললেই চলে। গণতান্ত্রিক পরিবেশে ব্যাপারটি কিছুটা ভিন্ন হতে বাধ্য, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও জনগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে–নেতৃত্বের পিছনে শামিল হয়ে। এভাবে যে কোনো জাতির "গণ" বা "সমষ্টিগত ভাবমূর্তি" কার্যত প্রায়শ চালিত হয় একটি ক্ষমতাধর গোষ্ঠী দ্বারা। অবশ্য এও সত্য যে, বৃহত্তর জনসমষ্টি ও এই শক্তিধর গোষ্ঠী ঘনিষ্ঠভাবে আন্তক্রিয়ায় সম্পৃক্ত এবং উভয়ে জাতীয় ভাবমূর্তির গঠনে পাস্পরিকভাবে সহযোগী ভূমিকা পালন করে।[৬]

এটা সুস্পষ্ট বলে প্রতীয়মান হবে যে, নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য, নেতার ব্যক্তিত্ব অথবা তাঁর ব্যক্তি-মহিমা-এ সকল কিছুই জাতীয় ভাবমূর্তির গঠনে বিশেষ প্রভাব রাখে। তাই কারিশমা বা ব্যক্তি-মহিমা বিষয়টিও এ প্রসঙ্গে বুঝতে হবে, ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে এর পরিপ্রেক্ষিত। ব্যক্তি-মহিমার ধারণার প্রধান উপস্থাপক হচ্ছে মার্কস ওয়েভার চিন্তাবিদ গোষ্ঠী। এ চিন্তাধারা মতে, ব্যক্তি-মহিমা নেতৃত্বের তিনটি দিকের ওপর নির্ভরশীল ঃ ব্যক্তিত্বের প্রতি রহস্যময় আকর্ষণ, ঐতিহ্যগত সমর্থন এবং আদর্শ নীতিমালাকে একটি দৃশ্যমান ক্রিয়াশীল কর্মসূচিতে রূপান্তরিত করার মতো ক্ষমতা ও দক্ষতা।[৭] মহিমাসুলভ আবেদনের কটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো নেতা কর্তৃক দিকদর্শন উপস্থাপনা বা "প্রক্ষেপণ"-যাতে অনুসারীদের সচেতন/অবচেতন প্রয়োজন, মূল্যবোধ ও ভাব বা অনুভূতি প্রতিফলিত হয়। এক্ষেত্রে নেতা ও অনুসারীদের সংযোগ বা সম্পৃক্ততা প্রতীক, উপমা, রূপক যা ঘটনার নাটকীয় শৈলী দ্বারা পরিপুষ্ট হয়। এও মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই সম্পৃক্ততার সর্বদা যে যৌক্তিক ভিত্তি থাকবে এমনও নয়; বরং একই আদর্শিক লক্ষ্যে পৌছার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব ও অনুসারীদের বন্ধন প্রায়শ হয়ে থাকে স্বতঃস্ফূর্ত, অনেকটা হৃদয়ের আবেগ দ্বারা পরিচালিত।[৮]

বহু ধরনের মহিমান্বিত ব্যক্তিত্ব ও চরিতের বিশ্লেষণে ইতিহাস পরিপূর্ণ। সকল মহিমান্বিত ব্যক্তিত্বই উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাঁর অনুসারীদের তাঁর আপন কৌশলগত আদর্শ, দর্শন-নীতিমালা, এমন কি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করতে প্রয়াসী হন। অবশ্য সব ব্যক্তি-মহিমা একই ধরনের হয় না। এদের মধ্যে কিছু শ্রেণী ভেদাভেদ পরিলক্ষিত হয়। বিশ্লেষণী দৃষ্টিকোণে তিন ধরনের ব্যক্তি-মহিমার বিষয় উল্লেখ কার হয়; নেতিবাচক, ইতিবাচক ও নিষ্ক্রিয় বা নিরপেক্ষ শ্রেণী। নেতিবাচক মহিমান্বিত ব্যক্তিত্ব আদর্শের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে গুরুত্বারোপ করে তাঁর ব্যক্তিসত্তার ওপর, পক্ষান্তরে ইতিবাচক নেতৃত্ব তাঁর প্রতি আকৃষ্ট না করে আদর্শের প্রতি অনুরক্ত করতে প্রয়াসী হন। নিষ্ক্রিয়

www.pathagar.com

নেতৃত্বের অবস্থান দু'মেরুর মাঝামাঝি, কেননা আদর্শ বিচ্যুত বলে তিনি ব্যক্তি পূজায় অনুরাগ সৃষ্টিতে প্রয়াসী হন, অনুসারীদের মধ্যে আত্মোসর্গ প্রবণতা, এমন কি তোষামোদসুলভ উন্মত্ত প্রবণতা সৃষ্টিতেও দ্বিধা করেন না।[৯]

মহিমান্বিত ব্যক্তিত্ব, বিশেষ করে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যারা মহিমান্বিত, তাঁদের ওপর লেখালেখি বেশ কঠিন কাজ কেননা জাতীয় ভাবমূর্তি সৃষ্টিতে তাঁদের অবদান বা ভূমিকা অপরিসীম, তাঁদের স্বদেশের ইতিহাস নতুনভাবে, ভিন্নতর ধাঁচে লিখনে তাঁদের প্রভাব অপরিমেয় এবং তাঁদের জাতীয় বিবর্তনে যে নৈসর্গিক শক্তির ক্রিয়া তাঁরা রেখে যান তা যুগ যুগ ধরে প্রভাব বিস্তার করে চলে। বিশ্লেষকদের জন্য কাজটি অধিকতর জটিল হয় যদি সেই মহিমান্বিত ব্যক্তিত্ব তৃতীয় বিশ্বের কোনো দেশের হয়, কেননা এই তৃতীয় বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে জাতি-রাষ্ট্র গঠন অসম্পূর্ণ এবং প্রকৃত অর্থে সেই প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। ধারণাগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষকদের কাজ কঠিনতর হবার কারণ হচ্ছে নেতৃত্বে "ব্যক্তি পূজার" আরোপ এ ক্ষেত্রে প্রায়শ মৌলিক বাস্তবতাও অস্বীকার করা হয় যে, নেতামাত্রই অবতার নয়, এরাঁও মানুষ এবং অন্য যে কোনো মানুষের মতোই এঁদের বিচার বুদ্ধিতে ভুলত্রুটি স্বাভাবিক-অন্যান্য যে কোনো মানুষের মতো এঁদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ব্যক্তি-মহিমার ক্ষেত্রে শ্রেণী ভেদাভেদ রয়েছে। "ইতিবাচক মহিমান্বিত ব্যক্তিত্ব'কে" ভিন্নতর ইতিবাচক আলোকে দেখা হয়। কেননা দিকদর্শন ও ভাবাদর্শের দিক থেকে এ ধরনের নেতার ব্যক্তিত্বের সৃজনশীল ক্ষমতা অসাধারণ, যে ক্ষমতা ব্যবহৃত হয় জাতির পুনর্জাগরণে, যোগ্যতা পরিলক্ষিত হয়, এ ক্ষেত্রে আদর্শের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টিতে এবং এই প্রক্রিয়ায় নেতা লাভ করেন জাতির সার্বিক আনুগত্য। পক্ষান্তরে " নেতিবাচক মহিমান্বিত নেতা"কে দেখা হয় অনেকটা নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে কেননা নেতা এক্ষেত্রে আদর্শের চেয়ে নিজের প্রতি আনুগত্যের ওপর জোর দেন। কিছুটা ভিতর কিন্তু প্রায় একই শেষোক্ত শ্রেণীতে পড়ে " নিষ্ক্রিয় মহিমান্বিত নেতা"। এক্ষেত্রে নেতা আপন ব্যক্তিত্বের বা আদর্শের প্রভাব সৃষ্টির চেয়ে জোর দেন ব্যক্তি-পূজার ওপর পরিবারিক সামন্তবাদী এমন কি সমবংশোদ্ভূত উপজাতিমূলক মন-মানসিকতা বা কৃষ্টি এতে বলিষ্ঠভাবে ইন্ধন যোগায় আনুগত্য এ ক্ষেত্রে অনেক সময় গোঁড়ামীর রূপ পরিগ্রহ করে ধর্মীয় চেতনা জনিত আনুগত্যের রূপও ধারণ করে।[১০]

মহিমান্বিত ব্যক্তিত্বের শ্রেণী পরিচয় তাঁর কৌশলগত দিকদর্শন এবং এসবের বাস্তবায়নে তাঁর পছন্দসই পদ্ধতি থেকেও ধরা পড়ে। কৌশলগত বিজ্ঞানে রণনৈতিক প্রত্যয়টি রাষ্ট্রকারকদের আচার-আচরণ বা তাঁদের দিকদর্শন ও কর্মকাণ্ডের প্রতিফলিত বিভিন্ন পর্যায় চিহ্নিতকরণের কাজে

www.pathagar.com

ব্যবহৃত হয়। নীতি রণনীতি ও রণকৌশল হচ্ছে এ ধরনের কয়েকটি চিহ্নিত পর্যায়-যার মাধ্যমে রাষ্ট্রকারকদের দিকদর্শন ও কর্মকাণ্ডের সম্যক পরিচয় মেলে। এসব পর্যায় অবশ্য অনেক সময় ভিন্ন ভিন্নভাবে চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে পড়ে, কেননা এসব পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং অনেক ক্ষেত্রে একে অপরের সঙ্গে সম্মিলিত হয়। সর্বোচ্চ পর্যায়ে হচ্ছে 'নীতি'-এর ভিত্তিতেই প্রণীত হয় রণনীতি ও রণকৌশল। নীতিগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে পদ্ধতি বা উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয় রণনীতি। এর কারণ হচ্ছে আন্তর্জাতিক রণনীতি প্রক্রিয়া হিসেবেও ব্যবহৃত হয়, যে প্রক্রিয়ায় মূল্যায়ন ও পুনর্মূল্যায়ন চলে রাষ্ট্রের বা জাতির সার্বিক স্বার্থ সম্পর্কে, দেখা হয় এ ক্ষেত্রে স্বার্থজনিত পরিকল্পনা, সংগ্রামের পর্যায়, চিহ্নিত হয়, রূপরেখা/নীলনকশা, বিকল্পপন্থা প্রণয়নের দিক নিয়েও ভাবা হয়-এসব ক্ষেত্রে নীতি ও উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতি উভয়ে একযোগে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সামরিক অভিযান চলা কালে রণনীতি কার্যকর ভিত্তি নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়, চিহ্নিত করে যোগাযোগের গতিদিক ও সম্ভাব্য গতি পরিবর্তন। এর অর্থ এ নয় যে, রণনীতি শুধুমাত্র যুদ্ধ সম্বন্ধীয় বরং সমকালীন বিশ্বে রণনীতি যুদ্ধের পাশাপাশি গঠনমূলক কাজ বা শান্তির সম্ভাব্যতা নিয়েও ব্যাপৃত থাকে। উভয় ক্ষেত্রে রণকৌশল প্রায়োগিক ক্ষেত্রে রণনীতির নিম্নতর পর্যায়ে কার্যকর ভূমিকা রেখে চলে। অবশ্য প্রায়শ উভয় ধারণা সম্মিলিত হয়ে যায়–তত্ত্বগতভাবে যদিও রণকৌশলের সূচনা হয়, রণনীতির সমাপ্তিতে।[১১]

জাতীয় ভাবমূর্তি মহিমান্বিত নেতৃত্ব ও রণনীতি উপরে আলোচিত এ ধারণা তিনটি যথাক্রমে তিনটি জ্ঞান গবেষণা ক্ষেত্র থেকে নেয় সামাজিক মনোবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও কৌশলগত বিজ্ঞান। অবশ্য ধারণা তিনটি, তাদের মৌলিক ভবিতব্য বিষয়ের মতোই, একে অপর থেকে বিচ্যুত নয়; তিনটি ধারণা-ই পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত, মানবিক আচরণের তিনটি দিকের প্রতীক স্বরূপ এবং এ সবের আন্তক্রিয়াজনিত সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২. অভিন্ন মহিমান্বিত ঐতিহ্য ঃ দক্ষিণ এশীয় পরিপ্রেক্ষিত

উপর্যুক্ত ধারণাগত কাঠামো ও যোগসূত্রের আলোকে দক্ষিণ এশিয়া ও বাংলাদেশের কৌশলগত দিকদর্শন ও কর্মকাণ্ডের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত পর্যালোচনা করা হবে। বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মতো দক্ষিণ এশিয়াতেও বেশ কয়েকজন মহিমান্বিত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে। তাঁদের দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। প্রথম শ্রেণী ব্রিটিশ জ্ঞানোদ্দীপ্ত ঐতিহ্যে লালিত হন। এঁদের মধ্যে ছিলেন মহাত্মা গান্ধী, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, জওহরলাল নেহেরু,

www.pathagar.com

এ.কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি এবং জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রমুখ। অন্য শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হন মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ও মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর মতো মহিমান্বিত ব্যক্তি। এঁরা ছিলেন দেশজ ঐতিহ্যে, স্বদেশী কৃষ্টিতে লালিত।[১২]

উপর্যুক্ত ধারণাগত দৃষ্টিকোণ থেকে, সুভাষ বোস ও শেখ মুজিবকে দু'টি ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে, কেননা শেখ মুজিব লালিত হন দেশজ ঐতিহ্যে ও স্বদেশী কৃষ্টিতে; পক্ষান্তরে সুভাষ বোস ব্রিটিশ শাসনবিরোধী হলেও প্রকৃত অর্থে লালিত হন ব্রিটিশ ঐতিহ্যে। কিন্তু উভয় বাঙালি নেতার-ই ব্যক্তিত্ব ছিল সমরূপ মহিমান্বিত আবেদন এবং উভয় নেতাকেই মহিমান্বিত ব্যক্তিত্ব বলা চলে। সম্ভবত মুজিবকে সম্মানসূচক "নেতাজী পদক" প্রদান থেকে দু'জনের যে অভিন্ন সূত্রের বন্ধন রয়েছে তা স্মরণ করিয়ে দেয়।[১৩] স্বাভাবিকভাবেই বাংলার দুই যমজ সন্তানের সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনায় আগ্রহের সঞ্চার হয় তাঁদের উভয়ের কৌশলগত দর্শন ও অভিন্ন নিয়তির বন্ধনের ক্ষেত্রে কোনো সুদূরপ্রসারী যোগসূত্র ছিল কিনা। এসব পর্যালোচনার মাধ্যমে বুঝা যেতে পারে, যে সীমান্তের দু'পারের বাঙালিদের উদ্দেশ্যে বাংলার এ দুই নেতা কোনোরূপ ঐতিহ্য বাংলাদেশের জাতীয় ভাবমূর্তি গঠন ও সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় এক অভিন্ন নিয়তির বন্ধন গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

বাংলার অভিন্ন ঐতিহ্য

সুভাষ বোস ও মুজিব-দুজনকেই মনে হবে একক ও অভিন্ন বাংলার মহিমান্বিত ঐতিহ্যের উত্তরসূরি, দু'জনের ক্ষেত্রেই প্রভাব পরিলক্ষিত হয় বাংলার কয়েকজন মহান ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের। এঁদের মধ্যে রয়েছেন বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম, যাঁর বিপ্লবী কবিতা ও গান-সুর উভয়ের বিপ্লবী সত্তাকে উদ্দীপ্ত করে, রয়েছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যাঁর বিশ্বখ্যাতি বাংলা ভাষাকে বিশ্বের সাংস্কৃতিক মানচিত্রে স্থায়ী আসন দান করে এবং যাঁর সাহিত্য ও কবিতার বাংলায় রোমান্টিক স্বদেশ চেতনা ও ভাবাবেগ সঞ্চার করে। রাজনৈতিক অঙ্গনে উভয়ে ছিলেন ঐ যুগের সুমহান ব্যক্তিত্ব চিত্তরঞ্জন দাসের আদর্শের বন্ধনে আবদ্ধ। জনপ্রিয়ভাবে বাংলার এই মহিমান্বিত নেতা, বিবি সি.আর. দাস নামে সমধিক পরিচিত, পেশায়ও ছিলেন একজন সুদক্ষ ও প্রথিতযশা আইনজ্ঞ, বাংলার জনগণের প্রাণপুরুষ-সবাই তাঁকে সমাদরে বলতেন 'দেশবন্ধু'। কট্টর দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণী নির্বিশেষে সমগ্র বাংলায় তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল এত শীর্ষে যে মহাত্মা গান্ধীর জনপ্রিয়তা ও আপোষকামিতা তাঁর কাছে হার মানতো।

www.pathagar.com

সুভাষ বোসের ঐতিহ্যগত বন্ধন ও আনুগত্য প্রসঙ্গে আরো বিশদ জানা সমীচীন। তাঁর "সমগ্র জীবন", তিনি স্বয়ং লিখেছেন "হচ্ছে এক সুদীর্ঘ, নিরন্তর, আপোষহীন সংগ্রামের ইতিহাস--যে সংগ্রাম ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রামে আমার সবোৎকৃষ্ট অকৃত্রিম আনুগত্যের পরিচয় মেলে।"[১৪] এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, সুভাষ বোস ছিলেন কট্টর জাতীয়তাবাদী, কিন্তু তাঁর জাতীয়তাবাদ কোনোরূপ সংকীর্ণ গণ্ডি দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল না; তাঁর দেশপ্রেমও সংকীর্ণতায় অভিন্ন ছিল না। তাঁর দেশপ্রেমের মধ্যে ছিল একটি ধারণাগত যোগসূত্র-এর সীমারেখার ব্যাপ্তি শুরু হয় তাঁর নিজ প্রদেশ, বাংলা থেকে; স্বাভাবিক কারণে এ দেশপ্রেমের পরবর্তী ধাপ হচ্ছে ভারতীয় মাতৃভূমি এবং একই যৌক্তিক ধারায় পরবর্তী পর্যায় হচ্ছে এশিয়ার স্বার্থের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা এবং পরিশেষে বিশ্ব মানবতার বন্ধনকে আলিঙ্গন করা।

এসব ক্ষেত্রে তিনি দারুণভাবে প্রভাবিত হন সি. আর. দাস ও রবি ঠাকুর দ্বারা। দু'জনকেই তিনি গভীরভাবে ভক্তি করতেন এবং তিনি স্বয়ং দু'জনেরই স্নেহ-সান্নিধ্যে আসেন উভয়ের পরম স্নেহ লাভ করেন। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের হাতিয়ার, 'ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস'; থেকে পদত্যাগ করার পর সুভাষ বোস বৃটেন থেকে একই জাহাজ যোগে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বদেশে ফিরে আসেন। এ সময় থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রাক্কালে ভারত থেকে অন্তর্ধান অবধি এ দুই মহিমান্বিত ব্যক্তির বন্ধন ছিল অনন্য সাধারণ- সুভাষ বোসের অন্তর্ধান কালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্নেহাশীষ পাঠান বোসের বিপ্লবী অভিযানের উদ্দেশ্যে। সমসাময়িক বিদ্রোহী কিন্তু জনপ্রিয় কবি নজরুলের 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার' ছিল সুভাষ বোসের প্রিয় কবিতা/ গান যা তিনি আবৃত্তি করতে/গাইতে ভালোবাসতেন।

সুভাষ বোসের জীবনে সংগ্রামী পর্যায় আসে কিছুটা নাটকীয়ভাবে। ইংল্যান্ডের ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে প্রথম শ্রেণী লাভের পর প্রায় একই সময়ে তিনি 'ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস' চতুর্থ স্থান লাভ করে ব্রিটিশ ভারতীয় আমলাতন্ত্রের জন্য নির্বাচিত হন। সেই চাকুরীতে যোগদান করার পর পর তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে পরাধীনতার হাতিয়ার তিনি হবেন না। ১৯২১ সনে তিনি ভারতীয় রাজনীতিতে যোগ দেন। এর থেকেই সূচনা তাঁর কর্মতৎপর এক দুর্দান্ত রাজনৈতিক জীবন। আচরণে রাজনৈতিক শৈলীতে, আদর্শে ও কর্মকাণ্ডে-এর পর থেকে তাঁর জীবন ছিল রাজনৈতিক নাটকের অংকে বিরচিত, দুঃসাহসী ঘটনাবহুল আলেখ্যে ভরপুর। এ ধরনের রাজনৈতিক চরিত্রের তুলনা সমকালীন ইতিহাসে মেলা ভার। ভারতের জাতীয়তাবাদী

www.pathagar.com

আন্দোলনে তিনি এক অনন্য সাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন এবং সত্যিকার অর্থে তাঁকে মহিমান্বিত প্রবাদ পুরুষ বলে মনে হয়। রবি ঠাকুর তাঁকে 'জন নায়ক/দেশনায়ক' বলে অভিহিত করেন এবং তাঁর সকল কৌশলগত কর্মকাণ্ডে পুরোপুরি আশীর্বাদের বাণী প্রেরণ করেন।

সুভাষ বোসের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় চিত্তরঞ্জন দাসের রাজনৈতিক শিক্ষানবিশ হিসেবে। বলা প্রয়োজন যে, বাংলা ও ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে চিত্তরঞ্জন দাস যথার্থ-ই ছিলেন এক অসাধারণ অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। একজন প্রথিতযশা আইনজীবী হওয়া সত্ত্বেও তিনি আপেক্ষিক দারিদ্র্য জীবন অবলম্বন করেন, বেছে নেন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও বিক্ষোভের পথ। এসব উদ্দেশ্য সাধনে তিনি এমন কি তাঁর অতি লাভজনক আইন ব্যবসাও ছেড়ে দেন। সুভাষ বোস চিত্তরঞ্জন দাসের আত্মোৎসর্গসুলভ দৃষ্টান্ত দ্বারা মোহিত হন, অনুপ্রাণিত হন তাঁর জাতীয় চেতনা ও দেশাত্মকবোধ, যে চেতনাবোধের ভিত গড়ে ওঠে বাংলাকে ঘিরে।[১৫] চিত্তরঞ্জন দাসের জাতীয় ও রাজনৈতিক চেতনা পরিস্ফুট তাঁর লেখায়। "হিন্দু মুসলমান কিংবা খ্রিষ্টান-যাই-ই হোক না কেন বাংলার বাঙালিমাত্র বাঙালি বলেই বিবেচিত" তিনি লিখেছেন, তাদের নিজস্ব সুনির্দিষ্ট ভাবাবেগ রয়েছে, রয়েছে তাদের নিজ নিজ স্পষ্ট ধর্ম বিশ্বাস। বিশ্ব মানচিত্রে তাদের চিহ্নিত অবস্থান রয়েছে, রয়েছে তাদের নির্দিষ্ট অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করার মানস। "বাঙালিমাত্রই অবশ্য হতে হবে প্রকৃত বাঙালি।"[১৬] এতে প্রতীয়মান হয় যে চিত্তরঞ্জন দাসের জাতীয়তাবাদ ছিল বাংলা ভিত্তিক ছিল তা ধর্মীয় প্রভাব বলয় মুক্ত।

তাঁর এ ধরনের উদার জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা, ধর্মীয় কলুষমুক্ত চিন্তা-চেতনা সুভাষ বোসের রাজনৈতিক জীবনে দারুণ প্রভাব ফেলে। শীঘ্রই তিনি চিত্তরঞ্জন দাসের আস্থাভাজন হন এবং কোলকাতায় ভারতীয় কংগ্রেসের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত হবার সুযোগ লাভ করেন। এ সময়ে তিনি চিত্তরঞ্জন দাসের পৃষ্ঠপোশকতার কারণে কংগ্রেসের কোলকাতাস্থ বেশ কিছু সংস্থার উচ্চপদস্থ দায়িত্বে আসীন হন। এ সময়ে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে একত্রে ঝাপিয়ে পড়েন এবং এ কারণে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু। চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণের অজুহাতে উভয়কে আটক করা হয় এবং ১৯২১ সনের ডিসেম্বর থেকে ছয় মাসের মতো একত্রে তাঁদের কারাবরণ করতে হয়। বন্দী অবস্থায় উভয়ে প্রায় একত্রে জেলে সময় কাটান এবং দেশের রাজনীতির বৃহত্তর অঙ্গন সম্পর্কে ভাব বিনিময় করেন। ১৯২২ সনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক আইন অমান্য আন্দোলন থেকে সরে পড়ায় উভয়-ই অসন্তোষভাব প্রকাশ করেন এবং কংগ্রেসের সার্বিক নীতির প্রতিও তাদের উষ্মাভাব ব্যক্ত করে। ফলে দু'নেতাই কংগ্রেসের সঙ্গে সম্প্রীতি

www.pathagar.com

বজায় রেখে কাজ করা কঠিন হিসেবে দেখেন। জেলে থাকাকালীন উভয় নেতা তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়েও ভাবনা-চিন্তা করেন। দু'জনেই একমত হন যে প্রথমে বাংলায় বৃহত্তর ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং সেটাই সুযোগ ও দিক-নির্দেশনা দেবে ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের ভবিষ্যৎ গতিধারায় তাদের করণীয় ও কর্মপন্থা কি হবে।

১৯২৪ সানে মাত্র সাতান্ন বছর বয়সে সুভাষ বোস কোলকাতা করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী অফিসার পদে নির্বাচিত হন। একই সময়ে চিত্তরঞ্জন দাস এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি যথাক্রমে মেয়র ও ডেপুটি মেয়র পদে নির্বাচিত হন। তিন জনেই ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে একযোগে কাজ করেন। কোলকাতার অনেক নাটকীয় পরিবর্তন প্রবর্তনে তাঁরা তিনজন একযোগে কঠোর পরিশ্রমে ব্রতী হন। এসব পরিবর্তনের মধ্যে ছিল তাঁদের নিজেদের বেতন ভাতাদি কমানো জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বীরদের নামানুসারে জনসমাবেশমূলক স্থানসহ রাস্তাঘাটের নাম পরিবর্তন, দেশে বানানো খদ্দর পোশাকাদির জনপ্রিয়তা দান, বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন, উন্নততর সমাজ কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড ও জনসাধারণের সেবায় স্বাস্থ্য কর্মসূচি প্রবর্তন প্রভৃতি।[১৭]

সুভাষ বোস কোনোরূপ নিরাপদ তত্ত্বগত দর্শনে আস্থাবান ছিলেন না, এড়িয়ে যেতে চান নি তিনি জীবনের কঠোর বাস্তবতার দিকগুলি। বাস্তব প্রয়োজনের কারণে তিনি জন বিপ্লবী-"দেশপ্রেম ও মানবপ্রেম-ই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে রাজনীতির অঙ্গনে"।[১৮] তাঁর জাতীয়তাবাদী পরিচয় তাঁকে বেশি দিন মুক্ত থাকার অবকাশ দেয় নি। শীঘ্রই তাঁকে জেলে ঢুকতে হয় এবং ১৯২৭ সনের মে মাসঅবধি তাঁকে ব্রিটিশদের কারাবন্দি হিসেবে জীবন কাটাতে হয়। কার্যত কারাবাস-ই তাঁর দ্বিতীয় আবাস বলে বিবেচিত হয়। কারাজীবন যাপন অবস্থায় প্রায়শ তিনি অসুস্থ থাকেন এবং অসুস্তার কারণে ১৯২৭ সনের মে মাসে তাঁকে জেল থেকে ছাড়া হয়। নভেম্বরের দিকে তিনি সুস্থতা লাভ করে রাজনৈতিক জীবনে ফিরে আসেন। শীঘ্রই তিনি বাংলা কংগ্রেস প্রদেশ কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁর দার্শনিক বিনম্রতা ও মরমিবাদ অচিরেই বিলীন হয়, সেই স্থান দখল করে নেয় অনমনীয় বাগ্মীতা ও প্রখর বিস্ফোরণমুখী রাজনৈতিক বক্তব্য। তাঁর জনসভা ভরপুর হতে থাকে অতন্ত্র উৎসাহ মুখরিত ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে উদ্দীপ্ত জনমানুষের উপস্থিতিতে। এই জনমানুষের মধ্যে সঞ্চারিত উৎসাহ-উদ্দীপনা তাঁর কানে বাজে উত্তল জনসমষ্টির অন্তরভরা সমর্থনের মতো। এদের মুহুর্মুহু করতালি ও উল্লাস সানন্দের অভিব্যক্তি তাঁকে আরো যোগায় শক্তি বাগ্মীতা ও পরম আত্মবিশ্বাস। গর্জে ওঠে তাঁর কণ্ঠ "একটি পরাধীন জাতির রাজনীতি ছাড়া আর কিইবা

www.pathagar.com

থাকতে পারে। পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নাই যে শক্তি পরিয়ে রাখতে পারে ভারতকে দাসত্বের শৃঙ্খল।[১৯]

১৯৩২ থেকে ১৯৩৮ সন অবধি প্রায় পুরো সময় সুভাষ বোস ব্রিটিশ কারগার কিংবা ইউরোপ কাটান। তবু একজন আত্মত্যাগকারী মহিমান্বিত নেতা হিসেবে তাঁর ব্যক্তি-মহিমা উত্তরোত্তর বেড়ে চলে অব্যাহত ধারায়। দু'দুবার তিনি নির্বাচিত হন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদে। আরো অভাবিত বিষয় হলো দ্বিতীয় বার এ পদে তিনি পরাজিত করেন মহাত্মা গান্ধীর মনোনীত ব্যক্তিকে। পরবর্তীকালে তার কঠোর ব্রিটিশবিরোধী বক্তব্যের কারণে তিনি কংগ্রেস থেকেও বহিষ্কৃত হন। তবু তিনি ভারতকে সাম্রাজ্যবাদের গ্রাস থেকে মুক্ত করা তাঁর চূড়ান্ত অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা সম্পর্কে এতোখানি দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন যে নাটকীয়ভাবে তিনি দেশের অন্তরীণ অবস্থায় থেকে পালিয়ে চলে যান বিদেশে। তিনি জানতেন যে বিদেশ থেকেও তাঁর পক্ষে তাঁর নিজ প্রদেশ বাংলা, এমন কি সমগ্র ভারতের বৃহত্তর জনমানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন অর্জন সম্ভব হবে, সম্ভব হবে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সমর্থন লাভ।

কৌশলগত রূপরেখা

সুভাষ বোস ছিলেন একজন স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী বীর, যিনি তাঁর বিপ্লবী সংগ্রামের উদ্দেশ্য সাধনের বাংলাকে ব্যবহার করেন বিপ্লবের ভিত্‌ বা ঘাঁটি হিসেবে তাঁর নীতিগত লক্ষ্য ছিল ভারতের ঐক্য ও স্বাধীনতা। তাঁর রণনীতি ছিল প্রত্যক্ষ সংগ্রাম যে সংগ্রাম চলবে রাজনৈতিক কূটনৈতিক এবং সামরিক পর্যায়ে। তাঁর রণকৌশল ছিল বহুমুখী-সর্বপর্যায়ে, সংগঠন ও প্রয়োগের দিক থেকে যখন যে সুযোগ আসে তার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারের সুদৃঢ় প্রত্যয়ে। উপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রামের সময়ও তিনি এমনিভাবে বেছে নেন যে ঐটাই তিনি মনে করেন সবচেয়ে সময় উপযোগী যখন বাংলার ও ভারতে জনগণই উপনিবেশিক শাসনের দুঃসহ চাপে নিষ্পিষ্ট হচ্ছিলো, বিশ্বের যুদ্ধদ্বন্দ্বময় পরিবেশও ছিল ভারতের স্বাধীনতা লাভের অনুকূলে।[২০]

সংগ্রামের ভিত-বাংলা

সুভাষ বোসের জাতীয়তাবাদ বরীন্দনাথের মতো তাঁর নিজ প্রদেশ বাংলা থেকে শুরু হয়-যাকে তিনি সাদরে বলতেন "আমার স্বপ্নের বাংলা" বলে।[২১] তাঁর চেতনায় এ বাংলায় ঘটে অনেক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সম্মিলন। এ বাংলার কাব্যময় দৃশ্যাবলি, সুবিশাল বিস্তৃত নদনদী ও বিস্তৃত সবুজ প্রান্তর তাঁকে গভীরভাবে বিমুগ্ধ করে।[২২] বাংলাকে ঘিরে দেশাত্মবোধক অনুভূতি ও

www.pathagar.com

উত্তেজনা তাঁকে অনুপ্রাণিত করে, এ যেন তাঁর জীবনে এক পরম উদ্দেশ্য। তাঁর স্বপ্ন ছিল একক ও অভিন্ন বাংলা যে বাংলা নিয়োজিত হবে ভারত ও মানবতার সেবার -যে-বাংলাকে তিনি দেখেছেন ধর্মীয় মতবাদ ও সম্প্রদায়গত দলাদলির উর্ধ্বে; এ বাংলা হচ্ছে মুসলিম, হিন্দু, খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধ সকলের অভিন্ন আপন আবাসভূমি।"[২৩] বৃহত্তর বাংলার সমন্বয়ের গঠিত এই অঞ্চলে পরিলক্ষিত এক অনন্য সাধারণ সমন্বয়- এক অভিন্ন বন্ধনের সম্মিলন ঘটেছে। এখানে প্রকৃতি সৌন্দর্য, জনগণের দৈহিক শৌর্য, জ্ঞানোদ্দীপ্ত ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের যোগসূত্রে। তাই বাংলার মতো ভারতের অন্য কোনো প্রদেশ জাতীয় কর্মকাণ্ডে এতোখানি উদ্দীপনার ব্যাপকতা প্রদর্শন করতে পারবে না।[২৪] আন্তঃএশীয় সাংস্কৃতিক আন্দোলন বা ভারতীয় রেনেসাঁস'র ক্ষেত্রে গতি সঞ্চারিত হয় বাংলা থেকে এসব ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের লেখা ও জ্ঞানের বিস্তৃত পরিসর, তাঁর বিদেশ সফর এবং তাঁর লেখালেখি সার্বজনীন আবেদন প্রভৃতি প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট।[২৫] বাঙালি চেতনাবোধ ছাড়াও এসব স্বাভাবিক কারণে বাংলাকে তিনি তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ও কৌশলগত পরিকল্পনা ভিত হিসেবে চিহ্নিত করেন।

নীতিগত লক্ষ্য ভারতের ভাগ্য-নিয়তি

যৌক্তিক ধারায় তিনি তার জাতীয়তাবাদী উদ্দীপনাকে উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যান, কেননা রবীন্দ্রনাথের মতোই তিনি ভারতের ভবিষ্যৎ ভাগ্য নিয়তিতে এক প্রবল আস্থা স্থাপন করেন। তাই ভারতের স্বাধীনতার বিষয়টিকে একটি আধ্যাত্মিক লক্ষ্য ও ন্যায্য প্রাপ্য বিষয় এর স্বপক্ষে তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে তৎপর হন। এ ক্ষেত্রে ভারতীয় জাতীয় চেতনা সম্পৃক্ত হয় বাংলার গৌরবোজ্জ্বল সাংস্কৃতিক সাফল্যে সঙ্গে। ফলে বহির্বিশ্বের প্রতি সৃষ্টি হয় একেবারে উন্মুক্ত মনোভাব-বাংলা ও ভারতের স্বাধীনতার স্বার্থে তিনি যে কোনো বহিঃশক্তির সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে কুণ্ঠাবোধ করবেন না। তিনি ছিলেন এমন এক আজন্ম বিপ্লবী যিনি নিজের অদৃষ্ট বা সম্ভাব্য দুর্গতি কি হতে পারে তা নিয়ে মাথা ঘামান নি, কেননা নিজকে তিনি দেখেন "ভারতের নিছক একজন সেবক হিসেবে"। এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভারতীয় মাতৃভূমিকে তিনি যৌগপদিক ধারায় তুলে ধরেন এক অনন্য সাধারণ সুবিশাল অভিব্যক্তিরূপে যা প্রতিফলিত হয় তাঁর দর্শনে ইতিহাসে রাজনীতিতে সামাজিক ব্যাপ্তিতে ও ভৌগোলিক প্রকাণ্ডতায়।"[২৬]

এভাবে সুভাষ বোসের চিন্তা চেতনায় ভারত ধরা দেয় শুধু একটি ভৌগোলিক সীমারেখা হিসেবে নয়, বরং বিবেচিত হয় এটি একটি আধ্যাত্মিক সত্তা হিসেবে, দেখেন তিনি একে একটি জীবন্ত সত্তা বলে। এ হচ্ছে মাতৃসম

www.pathagar.com

যার মধ্যে অঙ্কুরে মানুষ বিচরণ করে, লাভ করে তার জীবন।"[২৭] এতে সন্দেহের কোনোরূপ অবকাশ নেই যে ভারতের মুক্তি আর স্বাধীনতা ছিল তাঁর রাজনৈতিক অভিলাষের উচ্চতম অভীষ্ট লক্ষ্য, নীতিগত ভাগ্যনিয়তি বা চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষা। এটাই উপনিবেশবাদ বিরোধী তাঁর সংগ্রামে সমগ্র কৌশলগত আচরণের রূপরেখা নির্ধারণ করে।

সুভাষ বোস স্বয়ং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নির্যাতনের শিকার হন প্রচণ্ডভাবে। সেই সাম্রাজ্যবাদী "নির্যাতন ছিল মানবতা ও বিবেচনাজ্ঞান বিবর্জিত"। নেহেরু লিখেছেন এভাবে সুভাষ বোসের ওপর ব্রিটিশ নির্যাতন সম্পর্কে যদিও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে তিনি বোসকে দেখেন তাঁর প্রতিযোগী হিসেবে।[২৮]তবু বোস সংকল্পবদ্ধ ছিলেন যে, তিনি "আত্মদানে প্রস্তুত থাকবেন যাতে ভারত তার জীবন সত্তা ফিরে পায়। লাভ করে তার স্বাধীনতা ও হৃত গৌরব।" ভারতের তৎকালীন কোনো জাতীয়তাবাদী নেতা স্বাধীনতা ও মুক্তির বিষয়ে তাঁর মতো এতোখানি দৃঢ় সংকল্প ও বাগ্মীতা প্রদর্শন করেন নি। এভাবে সুভাষ বোস তাঁর সুবিশাল ব্যক্তি-মহিমার ছাপ সহকারে ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে আবির্ভূত হন। তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন এমন এক কৌশলগত দায়িত্ব সম্পন্ন করতে যাতে ভারত তাঁর মুক্তি ও স্বাধীনতার সম্মানে নিয়তির নির্ধারিত পথ বেছে নিতে পারে। শুধু তাই নয়, তিনি চেয়েছেন এমন এক ভারতবর্ষ যা, জাতি রাষ্ট্র হিসেবে হবে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত-এ ধরনের লক্ষ্য অর্জনের বিপক্ষে উপনিবেশবাদের যে কোনো হীন চক্রান্ত তিনি বানচাল করতে দৃঢ় সংকল্প ছিলেন।[২৯]

রণনীতি ঃ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম

সুভাষ বোস ছিলেন উপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রামে দৃঢ়ভাবে প্রত্যয়ী। তিনি এও বিশ্বাস করতেন যে এ সংগ্রামে সাফল্যের জন্য বিদেশী সাহায্য অপরিহার্য। এসব কারণে তিনি উপস্থাপন করেন জঙ্গিসুলভ রণনীতি। এটা ছিল প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। ফলে তিনি বেছে নেন চরম ও উগ্রপন্থী মতবাদ, বিপ্লবের পথ। পক্ষান্তরে, 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস'-পূর্বে যে সংগঠনের তিনি ছিলেন দু' দু'বার নির্বাচিত সভাপতি-সুপারিশ করে 'সাংবিধানিক' পন্থা ভিত্তিক নমনীয়তা। অথচ সংবিধান-ই ছিল ঔপনিবেশিক শক্তির সৃষ্টি ; কাজে কাজেই সাংবিধানিক যে কোনো পন্থা প্রকৃত জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী না হয়ে পারে না। তাই বোস চেয়েছেন ভারতীয় জনগণের নিজস্ব শক্তিবোধ সম্পর্কে সচেতন করতে সজাগ করতে যাতে ধর্মযুদ্ধের' জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে-ন্যায্য কাজে আত্মোৎসর্গ করতে এগিয়ে আসে। তাঁর প্রত্যক্ষ সংগ্রামের রণনীতি, শক্তি ও সহিংসতার ওপর জোর দেয়ার কারণ ছিল ভারতের মুক্তিপথে

www.pathagar.com

তৎকালীন প্রতিবন্ধকগুলো। তিনি স্পষ্টত দেখতে পান যে অপ্রতিসম ঔপনিবেশিক শক্তির শোষণের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা ও মুক্তি-অর্জন করতে হলে সকল প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলা হবে একমাত্র প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মাধ্যমে সম্ভব। এদিক থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল তাঁর কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁর এই কৌশলগত দৃষ্টিকোণ ১৯৩০-দশকের শেষ থেকে ১৯৪০-দশকের শেষাবধি ভারতীয় রাজনীতিতে তিক্ত বিতর্কের বিষয়বস্তুতে পরিণত করে।[৩০]

সুভাষ বোসের কূটনৈতিক দর্শন ও বিদেশী সাহায্য

সুভাষ বোসের কূটনৈতিক দর্শন বা দৃষ্টিভঙ্গি উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামের আদর্শ দ্বারাই পরিচালিত হয়। এটা ছিল তাঁর প্রত্যক্ষ সংগ্রাম রণনীতি-ই অবিচ্ছেদ্য অংশবিশেষ। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন স্বচ্ছ ও স্পষ্টবাদী। পক্ষান্তরে তৎকালীন ভারতীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে ভারতীয় কংগ্রেসের কার্যত অধিপতি মহাত্মা গান্ধী উপস্থাপন করেন। 'রাম রাজ্যের' মতো রাজনীতি ও ধর্ম সংমিশ্রিত অতীন্দ্রিয়বাদে, যাতে উৎসুক্যমূলক সংমিশ্রণ ঘটে ঐতিহাসিক রাম প্রবাদের ধর্মীয় মরমি উপাদান ও রাজনৈতিক কর্তত্ববাদের-এতে ঔপনিবেশিক কর্তৃত্বের প্রতি পরোক্ষ সমর্থন মেলে। এছাড়া ছিলো জওহরলাল নেহেরুর অক্ষশক্তি বিরোধী পররাষ্ট্র নীতির নিছক ভাবপ্রবণতা। গান্ধীজী ও নেহেরুর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের চিন্তাধারা থেকে তাই সুভাষ বোসের কূটনৈতিক পন্থা ও পদ্ধতি ভিন্নতর হতে বাধ্য।

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ও সহিংসতায় আস্থাশীল সুভাষ বোস চেয়েছেন যুদ্ধ চলাকালে ব্রিটেনের অসুবিধের পুরো সুযোগ গ্রহণ করতে এবং এ সুযোগে ব্যাপকতর আন্দোলন-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তিনি চান ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করতে।[৩১] তিনি দৃঢ়ভাবে মনে করেন যে ত্যাগ ও সংগ্রাম ছাড়া বিশ্বের কোনো দেশই স্বাধীনতা লাভ করে নি এবং এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সমর্থন ও বিদেশী সাহায্য ছিল একটি বিশেষ উপাদান। তাঁর মধ্যে কোনোরূপ সংশয় ছিল না যে ভারতবর্ষের জনগণ ও নেতৃবর্গ "শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাদের মুক্তি অর্জনকল্পে সকল প্রকার ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়।"[৩২]

বোসের মতে, বৃটেন ভারতের দারিদ্র্যক্লিষ্ট জনগণের স্কন্ধের ওপর ঔপনিবেশিক শাসনের এক অসহনীয় শোষণের বোঝা চাপিয়ে রেখেছে। এ ধরনের কঠোর দায় বোঝা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে ভারতের প্রয়োজন এমন এক সার্বিক বেপরোয়া পরিকল্পনা যাতে যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে ভারত অব্যাহিত লাভ করে। যাতে ব্রিটিশ শাসকদের নির্বিচার ধ্বংসাত্মকতা থেকে ভারতকে উদ্ধার করা যায়। এজন্যই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম অপরিহার্য হয়ে পড়ে,

www.pathagar.com

আর কূটনৈতিক সংগ্রামকেও অঙ্গাঙ্গিভাবে এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়।[৩৩] বোসের কূটনীতির এই গতিধারা ভারতের ঐতিহ্যিক ধ্রুপদী সমর তত্ত্ব 'মান্দেলা মতবাদের' সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। যে তত্ত্বে 'শত্রুর শত্রুকে মিত্ররূপে' চিহ্নিত করা হয়, যে তত্ত্বে চিহ্নিত শত্রুরা কৌশলগত চালের বিরুদ্ধে। পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে যে কোনো কূটনৈতিক কৌশল অবলম্বনের অধিকার প্রদান করা হয়ে থাকে। অবশ্য সুভাষ বোসের কূটনৈতিক প্রয়াস ১৯৩৪ সানে প্রণীত তাঁর রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ। ঐ মতবাদ ছিল সাম্যবাদ'। এ মতবাদকে "মানবিক বিষয়াবলিতে একটি নতুন নৈতিক ধারণা" হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। কেননা এ ধারণায় সকল বিদেশী শক্তির সঙ্গে সমপর্যায়ে, বন্ধুপ্রতিম সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, বিশেষ করে যে সকল দেশ ভারতের স্বাধীনতার প্রতি অনুকূল মানোভাব ব্যক্ত করে, যদিও ঐসব দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি বা সরকারের ধরন ভিন্ন রূপ হতে পারে।[৩৪]

দু'ধাপ সংগ্রাম

সুভাষ বোসের বিপ্লবী সংগ্রাম ছিল ভারতের মুক্তির সংগ্রাম, কিন্তু এ সংগ্রামই শুধু উপনিবেশবাদী বিরোধী সংগ্রাম ছিল না। এ সংগ্রাম ছিল বৃহত্তর লক্ষ্য ভিত্তিক, ছিল এ সংগ্রাম দু'পর্যায়ের প্রথম পর্যায়, জাতীয়তাবাদী পর্যায়, ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত; দ্বিতীয় পর্যায় ছিল অভ্যন্তরীণ আন্তঃশ্রেণী সংগ্রাম, যা কার্যত পরিচালিত হয় "সকল বিশ্লেষাধিকার, ভেদাভেদ, কায়েমি স্বার্থান্বেষীদের বিরুদ্ধে" ছিল নিরক্ষরতা ও তীব্র দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে।[৩৫] দু'ধাপে এভাবে চিহ্নিত করা হলেও দু'ধাপ সংগ্রামে-ই পাশাপাশি চলে। এভাবে সুভাষ বোসের উদ্বেগ শুধু ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ঐক্য ও ভৌগোলিক সংহতির জন্য ছিল না, দেশের সামাজিক সম্প্রীতি ও জাতীয় সংহতি বলতে প্রকৃত অর্থে যা বুঝায় সেসব বিষয়েও তাঁকে কর্ম তৎপর বলে মনে হয়।

যুদ্ধদ্যোমী কৌশল

সুভাষ বোস সচেতন ছিলেন যে তাঁর কাজ হচ্ছে ব্যাপকতর, বিশদভাবে জটিল। এর মধ্যে রয়েছে গণ সচেতনতা সৃষ্টি, জনগণের একাত্মতা লাভ এবং বিপ্লবের পতাকাতলে সকলকে সমবেত করা। এ ধরনের বিশাল দায়িত্ব পালনে তিনি চান জনগণের মধ্যে বিপ্লব ও যুদ্ধ সম্পর্কে উদ্যম সৃষ্টি করতে যাতে শত্রুর বিরুদ্ধে পরিচালিত ভারতের স্বার্থ উত্তমরূপে অর্জন সম্ভব হয়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এমন যে জনপ্রিয় সমর্থনের স্রোতধারায় বিপ্লবের সকল

www.pathagar.com

বাধা-প্রতিবন্ধকতা থেকে উত্তরণ সম্ভব হয়।[৩৬] স্পষ্টতই এ ক্ষেত্রে কাজ হচ্ছে জনগণকে বিপ্লবের আদর্শ-উদ্দেশ্যে প্রকৃতরূপে অনুপ্রাণিত করা।

এক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বারোপ করেন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ওপর। এর সঙ্গে তিনি বিপ্লবী সংগ্রামে বিজয়ের জন্য জনসমর্থন ভিত্তিক রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ডের ওপর জোর দেন। এজন্য তিনি যুবক শ্রেণী, ছাত্র সমাজ, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের জাতীয় জীবনের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে একাত্ম করতে তৎপর হন যাতে জাতীয় আন্দোলন বিপ্লবী সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করে। এটা ছিল তাঁর গণসচেতনতামূলক রণকৌশলের একটি বিশেষ দিক। ভারতে সুভাষ বোস-ই প্রথম বিক্ষোভমুখী সংগঠন সৃষ্টি ও এ সবকে জনপ্রিয় করে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এসব সংগঠনের মধ্যে ছিল যুবক ও ছাত্র সংগঠন, ছিল শ্রমিক সংগঠন ও শিক্ষক সমিতি, ছিল রাজনৈতিক হয়রানির শিকার প্রাপ্তদের সম্মেলন ও জাতীয় রক্ষীবাহিনীর সমাবেশ এবং সর্বোপরি ছিল তাঁর জঙ্গিসুলভ বিপ্লবী শ্লোগান ও সংগ্রাম মুখরিত শব্দগুচ্ছ।[৩৭]

'অহিংস গেরিলা যুদ্ধ-নিগ্রহ' ও সক্রিয় প্রতিরোধ

ভারতীয় জাতীয় কংগেস কর্তৃক 'ভারত ছাড় আন্দোলন' চলাকালে (১৯৪২ সনে) সুভাষ বোস ভারতের অভ্যন্তরে ব্রিটিশবিরোধী গোলযোগ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে অহিংস গেরিলা যুদ্ধবিগ্রহের' ধারণা প্রচলিত করেন। এর মাধ্যমে তিনি ঔপনিবেশিক শক্তিকে বর্জন ও পরোক্ষ প্রতিরোধ তত্ত্বে বিশিষ্ট অবদান রাখেন। এ ধরনের তত্ত্ব তিনি কার্যকর করেন দু'পদের উদ্দেশ্য সাধনে ভারতে ব্রিটিশদের যুদ্ধ সামগ্রি উৎপাদন যন্ত্র বিনাশ এবং এদেশে ব্রিটিশ প্রশাসন নিষ্ক্রিয় করার যাবে।[৩৮] তিনি তাঁর সংগ্রামের কর্মসূচি এভাবে প্রণয়ন করেন যাতে রণনীতির বাস্তবায়ন ও কার্যকর প্রয়োগে ভারতের জাতীয় গণআন্দোলন নতুন নতুন দিকে প্রসার লাভ করে। খাজনা ও কর সংগ্রহে বাধা প্রদান, শ্রমিকদের কর্মবিরতি যাতে উৎপাদন ব্যাহত হয়, ব্রিটিশ ও ব্রিটিশপন্থীদের ভারতীয় সামাজিকভাবে বর্জন, ব্রিটিশ প্রশাসন ও তাদের সামরিক স্থাপনা-অবকাঠামোর ওপর নাশকতামূলক আঘাত হানা, এ ধরনের নাশকতা কাজে সাহায্য করার জন্য গোপন গেরিলা দল সৃষ্টি করা এবং অপপ্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করার জন্য সত্যিকার প্রয়াস চালানো ছিল তাঁর সক্রিয় প্রতিরোধ ধারণাগত অংশবিশেষ।[৩৯]

সাম্যবাদ ঃ সমন্বয় মতবাদ

সুভাষ বোসের দু'ধাপ সংগ্রাম ছিল প্রচলিত দু'টো ধারণাগত ধারা থেকে ভিন্নতর। এর একটি ছিল ঔপনিবেশিক কর্তৃত্বের ধারা, আর দ্বিতীয়টি ছিল

www.pathagar.com

গান্ধীজীর প্রস্তাবিত 'রাম রাজ্যের' ধারা। দু'টোই ছিল অপ্রতিসম শ্রেণীর। বোসের ধারণাগত ধারা 'সাম্যবাদ' নামে পরিচিত ছিল। এ মতবাদ তিনি ১৯৩৪ সনে উপস্থাপন করেন। এতে সামাজিক অর্থনীতিক ও রাজনৈতিক আদর্শের সমন্বয় ঘটনা। প্রকৃত অর্থে এটা ছিল সমন্বিত মতবাদ অথবা সমান অধিকার নীতি ভিত্তিক প্রতিসাম্য ব্যবস্থা। তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের অন্যান্য সকল উপাদানের মতো তাঁর সাম্যবাদের ধারণাও ছিল স্বদেশজাত। 'সাম্য' বলতে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন বহুস্তরভিত্তিক এমন গণতন্ত্র যার মাধ্যমে জনগণপাবে তাদের অধিকার, সকল পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হবে সামাজিক সম্প্রীতি।[৪০]

সমাজতন্ত্র ঃ সংগ্রামের হাতিয়ার

সুভাষ বোসের দ্বিতীয় পর্যায়ের সংগ্রাম, অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম ছিল তাঁর সাবলীল মতবাদ সাম্যবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তিনি সমাজতন্ত্রে সম্পূর্ণ আস্থা রাখেন। সাম্য ভিত্তিক এই সমাজতন্ত্রের ছিল বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে স্বাধীনতা আন্দোলনে সম্পৃক্ত করার সার্বিক রণনীতিরই অংশবিশেষ। এজন্য তিনি জোর দেন ধনসম্পদ, ধর্মবর্ণ, নারী-পুরুষসহ সকল ধরনের ভেদাভেদ, বৈষম্য ও প্রতিবন্ধকতা সমূলে উৎপাটন করতে। বাস্তব প্রয়োজন ছাড়াও সমাজতন্ত্রের "মানবিক ও সাম্যবাদ আদর্শ ছিল তাঁর নিকট বড় আবেদনের বিষয়।"[৪১]

ইতিবাচক ধর্মানুসারী

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী নেতৃত্বের মধ্যে সুভাষ বোসের ধর্মীয় চেতনা ছিল আপন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তাঁকে নিছক ধর্মনিরেপেক্ষ না বলে ইতিবাচক ধর্মানুসারী এ অর্থে বলা চলে যে তিনি গভীরভাবে ধার্মিক ছিলেন, গভীরতর ছিল তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনা। সময় পেলেই তিনি আরাধনা-উপাসনা করতেন। এমন কি তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জিনিসপত্রের সঙ্গে সর্বদা মসৃণ চামড়ার মড়কে বাঁধাই করা ক্ষুদ্র গীতাসহ জপমালা বয়ে নিতেন। কিন্তু তাঁর আচার-আচরণে তিনি ছিলেন কঠোরভাবে ধর্মনিরপেক্ষ মানুষকে তিনি যাচাই করেন তার মানবিক গুণাবলির জন্য- তার ধর্মের কারণে নয়।"[৪২] তাঁর পূর্বপুরুষবর্গ বিভিন্ন উচ্চপদে আসীন থেকে ভারতের বিভিন্ন মুসলিম রাজবংশের সঙ্গে কাজ করেন। তাঁর নিজের দিক থেকেও মুসলিম রাজবংশসমূহকে সত্যিকার ভারতীয় বলে গ্রহণ করতে তাঁর কোনো রূপ দ্বিধা ছিল না। সম্রাট বাহাদুর শাহকে স্বাধীন ভারতের শেষ সম্রাট হিসেবে তিনি সম্মান প্রদর্শন করেন। পূর্বেই বলা হয় যে, বিদ্রোহী মুসলিম

www.pathagar.com

কবি কাজী নজরুল ইসলামের "দুর্গম গিরি কান্তার মরু" ছিল তাঁর প্রিয় গান। হিন্দু, মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে তিনি কোনোরূপ ভেদাভেদ করতেন না।

বরং তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের উচিত তাদের সংখ্যালঘু মুসলিমদের পৃষ্টপোষকতা করা। তাঁর এই ধর্মনিরপেক্ষ অনুভূতি তাঁর অনুসারী ও অমুসলিমদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। বস্তুত, সুভাষ বোসের ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর ভ্রাতৃত্ববোধ এমন কি মুসলিম উলেমাদের সঙ্গেও উঠাবসায় তাঁর কোনোরূপ উন্নসিকতা পরিলক্ষিত হয় নি। কোলকাতায় "গণযোগাযোগ আন্দোলন" চলাকালে তিনি মুসলিম ধর্মীয় নেতৃবর্গের সঙ্গে সম্প্রীতিমূলক বৈঠকে বসেন।[৪৩]

উপর্যুক্ত সকল বিষয়ে তিনি তাঁর রাজনৈতিক "গুরু নেতা ও তত্ত্বাবধায়ক" চিত্তরঞ্জন দাস দ্বারা প্রভাবিত হন। ঐ সময়কার হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গের মধ্যে তিনি-ই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি সমগ্র বাংলা ও ভারতবর্ষে মুসলমানদের সম্পূর্ণ আস্থাভাজন হন।[৪৪] সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, চিত্তরঞ্জন দাসের মতো, ধর্মীয় বিষয় ও ভেদাভেদ সম্পর্কে তাঁর সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি একই নীতিগত উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হয় তাহলো হিন্দু-মুসলিম বা ধর্মীয় ভেদাভেদ নির্বিশেষে সকলের অভিন্ন মাতৃভূমি ভারতবর্ষের ঐক্য ও স্বাধীনতা অর্জনে কাজ করে যাওয়া।[৪৫]

'সন্নিকট ঘাঁটি' থেকে আক্রমণাত্মক অভিযান

বৈদেশিক সাহায্য চাওয়ার পেছনে সুভাষ বোসের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য ছিল। তিনি চান আরাকানে এমন একটি 'সন্নিকট ঘাঁটি' স্থাপন করতে যেখান থেকে ভারতে ব্রিটিশ কর্তৃত্বকে হেয়প্রতিপন্ন করে পরে বাংলার দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। বাংলা যেহেতু তাঁর নিজস্ব প্রদেশ যেহেতু এখানেই তিনি প্রথমে তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব বলয়। প্রতিষ্ঠা করা সহজ হবে বলে মনে করেন। এ কারণে বার্মা সীমান্ত সন্নিকট ঘাঁটি থেকে বিজয় অর্জন করে ভারতের মুক্তির পথ সুগম করতে চান যাতে এ বিজয় তাঁকে ভারতে বিজয়ীবেশে অনুপ্রেবেশে সাহায্য করে। তাঁর পরিকল্পনা মতে, সম্মিলিত ভারতীয় ও জাপানী বাহিনী ও রিজার্ভ সেনাদল বার্মা থেকে অগ্রগামী হয়ে "যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে চট্টগ্রামের অভিমুখে আর চট্টগ্রাম দখল মানে পূর্ব বাংলার প্রবেশদ্বার দখল"। কেননা চট্টগ্রাম শুধু বন্দর অবস্থিত নয়, একে ভারতীয় উপমহাদেশ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সেতুবন্ধন রূপেও দেখা হয়। ফলে চট্টগ্রামে দখল তাঁকে ভূ-রাজনৈতিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকার কর্তৃত্ব প্রদান করবে অধিকার পাবেন তিনি স্বদেশের ঘাঁটির দিকে এগিয়ে যাবার বিরাট সুযোগ।[৪৬]

www.pathagar.com

এ ধরনের অভিযানে সুভাষ বোসের ছিল এক কৌশলগত মহা পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় তিনি ভারতের অভ্যন্তরে ও বাইরের সকল জাতীয়তাবাদী শক্তিসমূহকে একক সহযোগিতার ভূমিকার সম্পৃক্ত করতে প্রয়াসী হন। তিনি চেয়েছেন সকল দেশপ্রেমিক শক্তিকে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক রূপরেখার কর্মকাণ্ডে জড়াতে সকলে অংশগ্রহণ করবে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে, সক্রিয় হবে সবাই বহুমুখী রণকৌশলে। এ ভাবে ব্রিটিশ বিরোধী মুক্তি সংগ্রাম এক মহান জাতীয় আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করবে এবং প্রবল শক্তির চাপের মুখে ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির দাপট উচ্ছেদ হবে, চূড়ান্ত পর্যায়ে ভারতবাসী তাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীন দেশের সত্তা লাভ করবে।

সুভাষ বোসের প্রণীত কৌশলগত রূপরেখা বাস্তবায়নে বাধা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে উল্লেখ করা চলে তাঁর নির্ধারিত সময়নুযায়ী জাপানীদের সহযোগী মিত্রশক্তির ভূমিকা পালনে ব্যর্থতা এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নেতৃবর্গ কর্তৃক তাঁর পরিকল্পনার প্রত্যাখ্যান। এসব সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মী' ও জাপানী যৌথ মিত্রবাহিনীর আত্মসমর্পণ ও পরাজয় ছিল নিছক সাময়িক বিপর্যয়মাত্র। এ যুদ্ধে জাপানের হেরে যাওয়া বা 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মীর' লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থতা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তরকালে ভারত থেকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানে সুভাষ বোসের নেতৃত্বাধীন সেই বাহিনীর প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত জনসমর্থনের প্রভাব-ই পরিলক্ষিত হয়।[৪৭]

সুভাষ বোসের নীলনকশার পুনর্মূল্যায়ন

সুভাষ বোসের ইতিহাস হচ্ছে ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস এবং তাঁর সংগ্রামের শিক্ষাই হচ্ছে এই উপমহাদেশের প্রকৃত শিক্ষা। তাঁর সংগ্রাম ছিল একটি রাষ্ট্রের জন্য যে রাষ্ট্র তার প্রকৃত স্বাধীন রাজনৈতিক সত্তা হারায়, যে রাষ্ট্র বিশ্বের জাতি সমাজে হারায় তার নিজস্ব ভাবমূর্তি। এর কারণ ছিল একটি ঔপনিবেশিক শক্তির জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়া অপ্রতিসম বন্ধন।[৪৮]

তাঁর যৌবনের স্বপ্ন ছিল, তিনি লিখেছিলেন তাঁর মাকে, শুধু কোনোরূপ "রোমাঞ্চকর" ভূমিকায় অবতীর্ন হওয়া।[৪৯] কিন্তু কালে অনেক ভারতীয় বিপ্লবীর চোখে তিনি দেখা দেন "যুগ মানব" হিসেবে। ভক্তরা তাঁকে ডাকেন "নেতাজী" বলে। অতি শ্রদ্ধাভাজন নেতা- যে নেতার আবির্ভাব ঘটে ভারতীয় জাতিকে তার হৃত মুক্তি, স্বাধীনতা ও জাতীয় ঐক্য ফিরিয়ে দিতে। শুধু তাই নয়, তাদের দৃষ্টিতে তিনিই একমাত্র ভারতের উন্নয়ন, সাম্য ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, বিশ্ব সমাজে ভারতের হারানো জাতীয় ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারেন।[৫০]

www.pathagar.com

সুভাষ বোস ছিলেন এক মহান কৌশলগত চিন্তাবিদ। তিনি ছিলেন একজন সুচিন্তিত রণকৌশলবিদ। তিনি স্বপ্ন দেখেন এমন এক ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ যে-দেশ লাভ করবে মুক্ত ও স্বাধীন সত্তা সকল সম্প্রদায়ের জনগণের সম্মিলিত সংগ্রামের ফসল হিসেবে। তাঁর প্রণীত সম্পূর্ণ কৌশলগত নীলনকশা ভারতবর্ষ ছিল সকল ভাবনা-চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু এবং এর মুক্তি-ই ছিল তাঁর নীতিগত অবস্থান। এই নীলনকশায় অন্তর্ভুক্ত ছিল একগুচ্ছ কৌশলগত আদর্শ। এসবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বিপ্লবী অভিযান পরিচালনার ঘাঁটি বা ভিত রয়েছে নীতিগত উদ্দেশ্য ও সন্নিকট ঘাঁটি, উপনিবেশবাদ বিরোধী প্রত্যক্ষ সংগ্রামের রণনীতি, একটি সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ, একটি অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে জাতীয় স্বার্থে কাজে লাগানো, একটি বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলা এবং এ সংগঠনে তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত নারী-পুরুষকে সমবেত করা যারা তাঁর প্রণীত রূপরেখা পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ হবে। এছাড়াও তিনি একগুচ্ছ আদর্শিক কর্মসূচিও প্রণয়ন করেন এবং উপনিবেশকবাদ-বিরোধী সংগ্রামে জাতিকে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধকরণে বহুবিধ রণকৌশল উদ্ভাবন করেন।[৫১]

এছাড়া, বিদেশের মাটিতে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল আর্মী' গঠনের বিষয়টিও ছিল তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা এটি সংগঠিত হয় জাপানের হাতে ভারতীয় যুদ্ধ-বন্দিদের নিয়ে এবং সুভাষ বোসের গতিশীল নেতৃতে তারা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। অথচ পশ্চিমা একজন লেখক এদের পথভ্রষ্ট বা দলত্যাগী বাহিনী বলে অভিহিত করে।[৫২] কিন্তু সুভাষ বোসের নেতৃত্বে এই বাহিনী অপরিসীম প্রভাবের স্বাক্ষর রাখে। তারা দেখাতে সক্ষম হয় যে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী হতবাক হয়ে বুঝতে পারে ভারতে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য ভারতীয় সৈন্যদের ওপর আর নির্ভরশীল হওয়া যাবে না। একটি প্রকৃত মুক্তিবাহিনী কর্তৃক বিদেশী শক্তির শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ফল জনগণের দেশপ্রেমজনিত চেতনায় যে কতখানি প্রভাব রাখতে পারে তা অনুমান করা কঠিন। তাৎপর্যের বিষয় হলো, এই বাহিনী যতই দুর্বল বলে বা অকার্যকর হোক না কেন তারা যুদ্ধ করে বিশ্বের সেরা ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে। দ্বিতীয়ত এই বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করেন একজন বাঙালি। অথচ ঐতিহ্যিক ব্রিটিশ চিন্তাচেতনায় ভারতীয় জাতি, গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে বাঙালিদের সামরিক স্পৃহা নিম্নতম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তরকালে ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নেতৃত্ব সমঝোতায় পৌছার জন্য আগ্রহী হয়। এটা ছিল ব্রিটিশদের নবচেতনার ফলশ্রুতি ঃ পূর্বে ভারতীয় বাহিনীর

www.pathagar.com

আনুগত্য অবধারিত বলে মনে করা হত। যুক্তিযুক্ত কারণে তাদের মধ্যে সচেতনতা জাগে যে সেই আনুগত্য এখন আর স্বতঃসিদ্ধ নয়।[৫৩]

তদুপরি, আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যেগুলোর ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। এর মধ্যে ছিল 'অস্থায়ী আজাদ হিন্দু সরকারের' গঠন, সুভাষ বোসের বিদেশ সফর-এর মধ্যে কিছু ছিল রুটিনমাফিক আর কিছু ছিল দুঃসাহসিক- যে সব সফরে তিনি সার্বভৌম মর্যাদা বিশিষ্ট কূটনৈতিক সম্মান দাবি করেন। এবং সম্মানসূচক স্বীকৃতি পান। আরো উল্লেখযোগ্য ছিল আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জের ওপর তার সার্বভৌমত্ব লাভ। বাস্তিলের পতনের মতো ঔপনিবেশিক ভারতে এটার গুরুত্বও ছিল অপরিমেয়।[৫৪] দু'শত বছরের গোলামীর জিঞ্জিরের পর এসব ঘটনাবলি ভারতকে প্রথম বারের মতো তার স্বাধীনতার আমেজ প্রদান করে।

সুভাষ বোসের নিজের জীবন ছিল সেরা ও ত্যাগতিতিক্ষার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। অনেকে তাঁর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হন যে কি করে ভারতীয় জাতিকে ঔপনিবেশিক দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভকল্পে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। একইভাবে ব্রিটিশরাজের প্রতি কি ধরনের অনমনীয়তা প্রয়োজনী তার উজ্জ্বল স্বাক্ষরও তিনি রাখেন। দেশের এবং জাতির শত্রুকে চিহ্নিত করতে তিনি কোনো রূপ ভুল করেন নি। যে রাজনৈতিক গতিধারা তিনি চিহ্নিত করেন এবং যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের রণনীতি তিনি অবলম্বন করেন চূড়ান্ত বিশ্লেষণে সেটাই ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে সহায়ক হয়। সম্ভবত সেটাই ভারতকে পরে যুদ্ধ কবলিত হতভাগ্য দেশ ভিয়েতনামের মতো দুর্ভাগ্য ও দুর্দশা থেকে উদ্ধার করে।

ব্রিটিশ আধিপত্যবাদের ভিত্তিমূলে আঘাত হেনে এবং ব্রিটিশ কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য চুরমার করে বিপ্লবী সরকারের প্রতি তিনি গড়ে তোলেন নতুন আনুগত্যের ভিত। এতে উপনিবেশিক শাসনের ভিত ভেঙ্গে পড়ে। তাঁর কৌশলগত ভাবভঙ্গি শুধু চীনা বা ভিয়েতনামীদের মতো চিরায়িত ধারা থেকে ভিন্নতর ছিল না, ছিল অভিনব। কেননা তাঁর বিপ্লবী কর্মকাণ্ড সংগঠিত হয়েছিল এমন একটি "সন্নিকট ঘাঁটি" থেকে যেটি ছিল শত্রু শাসিত দেশ, চূড়ান্ত রাজনৈতিক কর্তৃত্ব যেখানে অর্পিত ছিল শত্রু শক্তির হাতে।

সুভাষ বোস তাঁর সুললিত তত্ত্ব, সাম্যবাদ মতবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এমন একটি আন্তর্জাতিক সিস্টেম প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেন যার ভিত্তি হবে "স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার, পারস্পরিকতা।"[৫৫] তাঁর বিপ্লবী নীলনকশা ও সাংগঠনিক দক্ষতার মাধ্যমে তিনি দক্ষিণ এশিয়ার অভ্যন্তরে ও বাইরের ঘটনা প্রবাহে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব রেখে যান।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে এটাও বলা সমীচীন যে, সুভাষ বোস চেয়েছিলেন উপনিবেশবাদ -বিরোধী সকল শ্রেণীর জনগণকে একটি "যুক্তফ্রন্টে" সংঘবদ্ধ করতে। তাঁর এই উদার দৃকশক্তি ভারতের ভাঙ্গন রোধ করতে পারতো এবং ভাঙ্গনের প্রাক্কালে যে সব ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছিল সে সবও এড়াতে পারতো। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহে নিয়তি তাঁর সেই লক্ষ্য অর্জনে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়, পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি যা করতে চেয়েছিলেন তা সম্পূর্ণ করতে সমর্থ হন নি।[৫৬] এতদসত্ত্বেও সুভাষ বোস তাঁর উদ্দেশ্যাবলি আত্মউৎসর্গ, আন্তরিকতা ও স্বদেশ প্রেমের জন্য যে-একক প্রত্যয়ী মনোভাব প্রদর্শন করেন তিনি তাঁর স্বদেশে ও এ অঞ্চলের সকল শ্রেণীর জনগণের অকৃত্রিম ভালোবাসার পাত্র হিসেবে অমর হয়ে থাকবেন।

মুজিবের মহিমান্বিত ব্যক্তিত্ব

মুজিব ছিলেন বাংলার আরেকজন "মহিমান্বিত বাঙালি ব্যক্তিত্ব" স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে যার অবদান অসামান্য।[৫৭] এ জন্যে অনেকে তাঁকে বাংলাদেশের জনক/স্থপতি বলে জানেন। মুজিবের নেতৃত্বের অনন্য প্রশংসিত গুণাবলির মধ্যে ছিল তাঁর "চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ভাবভঙ্গি, দৃকশক্তি-এবং দুঃসাহস। এসব সমন্বিত গুণাবলি ছাড়াও তিনি তাঁর জনগণের মুক্তির জন্য, দেশের আভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদ করাল গ্রাস জাতির স্বাধীনতার জন্য তাঁকে অপরিমেয় ভোগান্তি পেতে হয়। প্রখ্যাত "ছয় দফা" দাবি উত্থাপনের মাধ্যমে মুজিব বৃহত্তর বাঙালি জনসমষ্টির বাঁচার ও প্রাণের দাবির সমাবেশ ঘটান, সমন্বয় করেন জনগণের বিক্ষুব্ধ অনুভূতির। এ কাজে মুজিবের সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও দূরদর্শিতার পরিচয় মেলে। এর মাধ্যমেই তিনি একজন সাধারণ রাজনীতি থেকে একজন অসাধারণ রাষ্ট্রনায়করূপে আবির্ভূত হন এবং ক্রমান্বয়ে মহিমান্বিত নেতার আবেদন সঞ্চার করেন।[৫৮] নীরোধ চৌধুরীর ভাষার সঙ্গে ভাব মিলিয়ে এও বলা চলে যে, সুভাষ বোসের মতো মুজিবও একজন অনমনীয়, চরমপন্থী মনোভাব সম্পন্ন জাতীয়তাবাদী নেতা ও বিপ্লবী দেশপ্রেমিক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।[৫৯]

স্কুল জীবনেই সুভাষ বোসের রাজনৈতিক আদর্শের দীক্ষা লাভ করেন মুজিব। কোলকাতায় থাকাকালে মুজিব প্রত্যক্ষ করেন সুভাষ বোসের আন্দোলন মুখর রাজনীতির ধারা এবং ঔপনিবেশবাদ-বিরোধী সেই আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণও করেন। শীঘ্রই মুজিব পরিচিত হন বোসের অগ্নিদীপ্ত বাগ্মীতা ও জ্বালাময়ী ভাষার সঙ্গে, শিক্ষালাভ করেন কি করে তাঁর অনুকরণে জনগোষ্ঠী কেন্দ্রিক রাজনৈতিক গণসংগঠন গড়ে তোলা সম্ভব। ১৯৪৭ সনে ভারত-বিভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টির পর মুজিবের প্রথম কাজগুলির

www.pathagar.com

একটি ছিল 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ' সংগঠনটির সৃষ্টি। এটি ছিল তাঁর উদ্যোগে গঠিত রাজনৈতিক সংগঠন। যেটি পরে নাম পরিবর্তন করে 'আওয়ামী লীগ' নাম গ্রহণ করেন। এই আওয়ামী লীগই পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালিদের ন্যায়সঙ্গত দাবি-দাওয়া গণআন্দোলন সৃষ্টিতে বিশাল ভূমিকা রাখে। প্রচারণা চালায় স্বয়ং সুভাষ বোসের আদর্শের অনুরূপ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতা। বোসের অনুকরণে মুজিব আওয়ামী লীগকে সত্যিকার অর্থে জনমানুষের ধর্মনিরপেক্ষ দল হিসেবে দাঁড় করান এবং সেই বাঙালি মহান নেতার আদর্শ অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক আদর্শও গ্রহণ করেন।

সুভাষ বোসের ব্রিটিশবিরোধী রণনীতি ও রণকৌশলের অনুকরণে মুজিবও পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর শোষণের বিরুদ্ধে পরোক্ষ প্রতিরোধ বা রাজনৈতিক আন্দোলন ছাড়া সক্রিয় সংগ্রামের ডাক দেন, এমন কি সমগ্র প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানান। উল্লেখ্য, পূর্ব বাংলায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা ঘটে ১৯৪৭ সনের স্বাধীনতার পর পর বাংলা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূত্র ধরে। এতে মুজিবসহ অন্যান্য সমকালীন বাঙালি নেতৃবৃন্দ অনেক ধরনের রণনীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। এসবের মধ্যে একটি মুখ্য অস্ত্র ছিল সুভাষ বোসের মতো আত্মত্যাগের মহিমান্বিত দৃষ্টান্ত যা' প্রতিফলিত হয় বিচ্ছিন্ন বন্দিকক্ষে দীর্ঘকালীন অন্তরীণ জীবনযাপনে। ফলে বাঙালিদের মনে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে অব্যাহত গতিতে। বাঙালিদের দাবি-দাওয়া আদায়-কল্পে বোসের "অহিংস গেরিলা যুদ্ধ বিগ্রহের" মতো একই ধারায় মুজিবও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করেন। পাকিস্তানের সামরিক জান্তা ১৯৭১ সনে মুজিবকে আটক করে পাকিস্তানে অন্তরীণ রাখে, কিন্তু নিঃসন্দেহে মুজিব ছিলেন বাংলাদেশের সংগ্রামের প্রতীক, আর তাই বাঙালিদের সশস্ত্র সংগ্রামের পরিণতিতে ভারত ও পাকিস্তান জড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশকে ঘিরে এক বড় ধরনের যুদ্ধে।

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের নায়ক হিসেবে মুজিব প্রকৃতই দেশের ক্ষমতাধর সম্প্রদায় ও সাধারণ মানুষ নির্বিশেষে সকলের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করেন। পাকিস্তানী রাজনীতির বৃহত্তর পরিসরে মুজিবকে বিদ্রোহী নেতা বলে অভিহিত করা যেতে পারে, কিন্তু বিদ্রোহ পরিচালনার প্রক্রিয়ার সত্তর তিনি বিপ্লবী নেতার আসন লাভ করেন। যিনি বৃহত্তর বাঙালি জনগোষ্ঠীর সচেতন ভাবাবেগকে বেগবান করেন। তাদের মানবিক স্পৃহা ও জাগতিক সম্পদকে স্বতঃস্ফূর্ত ধারায় ধাবিত করেন উচ্চতর পর্যায়ে। চূড়ান্তে তাঁর লক্ষ্য হয় পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সহযোগিতা ও আইন অমান্য আন্দোলনের সমন্বয় ঘটিয়ে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন দেশ ও জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার

www.pathagar.com

মূর্ত প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।[৬০] সুভাষ বোসের মতো তাঁরও রাজনৈতিক দরকষাকষি ছিল অনমনীয়। ফলে ১৯৭০-এর পাকিস্তানের নির্বাচনে পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী 'এক ব্যক্তি-এক ভোট' ও প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার নীতির ভিত্তিতে ভোটের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়, আরো বাধ্য হয় পাকিস্তান জাতীয় সংসদের সর্বমোট ৩১৩ টি আসনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানকে ১৬৯টি আসন প্রদান করতে। মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ অতি সহজে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্র ভেঙ্গে যায়। [৬১]

মুজিবের মহিমান্বিত ব্যক্তিত্বের আরো অভিব্যক্তি ঘটে তাঁর ভাষার ভাব ও স্পৃহায়। ভাবাবেগ সন্নিবিষ্ট তাঁর বাংলা ভাষার বক্তৃতায় অকপট ও জনপ্রিয় জাতীয় নেতার ভাবমূর্তি পরিস্ফুট হয় সেই ভাষা ও বক্তৃতায় তিনি বাংলাদেশের জনমানুষের অজানা দুঃখকষ্টের বিষয় সমগ্র বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে আনতে সমর্থ হন। এদেশের জনগণকে তিনি উদ্বুদ্ধ করেন এক সোনালি সুন্দর ভবিষ্যতের প্রত্যাশায়।[৬২] এটা আর অজানা নয় যে, এদেশের জনমানুষের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে মুজিব ৭ মার্চ ১৯৭১ সনের সেই ঐতিহাসিক ১৮ মিনিটের সংক্ষিপ্ত ভাষণে সুভাষ বোসের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম রণনীতির মতো বাংলাদেশের মানুষকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক দেন। সেই বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন যেন "প্রতিটি বাড়ি দুর্গে পরিণত হয়।" প্রতিটি গ্রাম, ওয়ার্ড ও ইউনিয়নে গড়ে তোলা হয় সংগ্রাম কমিটি এবং যাদের যা কিছু রয়েছে তা নিয়ে যেন মুক্তি ও স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।[৬৩]

এভাবে মুজিব পাকিস্তানী শাসক সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করেন। জাগিয়ে তোলেন তাদের জাতীয় সত্তা যাতে তারা মুক্তি সংগ্রামের জন্য যথার্থ প্রস্তুতি নিতে পারে। মুজিবের ৭ মার্চের বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত হলেও ছিল উদ্দীপনামূলক। পাকিস্তানের আগ্রাসন বাহিনীর বিরুদ্ধে নয় মাসব্যাপী স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে সেই বক্তৃতা ছিল প্রেরণা ও শক্তির উৎস। বাঙালির রাজনৈতিক নেতৃত্বের শীর্ষে সেই বক্তৃতাই মুজিবকে এক মহান আসনের মহিমা প্রদান করে। বস্তুত, এ এক ধ্রুব সত্য যে দৈহিক উচ্চতা - কাঠামোর দিক থেকে মুজিব ছিলেন যে কোনো সাধারণ বাঙালির চেয়ে অনেক বড় এবং তাঁর যোগাযোগগের ভাষা ছিল ভিন্নধর্মী। সব কিছু মিলে মুজিবের মহিমান্বিত ব্যক্তিত্ব ও অবদান তাঁর জীবনের চেয়েও অনেক বেশি বড় বলে প্রতীয়মান হয়। [৬৪]

সুভাষ বোসের মতো মুজিবের নেতৃত্ব ছিল মহিমান্বিত, কেননা তিনি তাঁর নিজ ও তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মহিমা দ্বারা তাঁর অনুসারীদের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে সূক্ষ্ম অথচ গভীর বন্ধন সৃষ্টি করেন। এসব প্রতিফলিত হয় বাঙালিদের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবাবেগ ও অভিব্যক্তিতে। এর মধ্যে রয়েছে 'জয় বাংলা' শ্লোগান,

www.pathagar.com

যা হচ্ছে সুভাষ বোসের 'জয় হিন্দ' অভিবাদন ও শ্লোগানের অনুরূপ, রয়েছে 'আমার সোনার বাংলা 'যা' রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে নেয়া।[৬৫] দু'টো শ্লোগানই বাংলাদেশের জনগণের ওপর নিদারুণ প্রভাব ফেলে, তাদের অনুপ্রাণিত করে রাষ্ট্রের অধিকার ও স্বাধীনতার সংকল্পে। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের মুক্তি ও স্বাধীনতার দাবি অর্জনকল্পে দু'টো শ্লোগানই ব্যবহৃত হয় পুরো সংগ্রাম চলাকালে। সেই সময় থেকে আজো দু'টো শ্লোগান জনপ্রিয়তা রক্ষা করে চলেছে।●

সুভাষ বোসের সম্পর্কে যে মূল্যায়ন করা হয়েছে সম্ভবত তারই ভাষার পুনর্বিন্যাস করে মুজিবের কৌশলগত শৈলী ও সাফল্য সম্পর্কে এভাবে বলা চলে ঃ তাঁর কর্মকাণ্ড ও দৃষ্টান্ত, দৃষ্টিভঙ্গি ও কল্পমানস দ্বারা তিনি প্রমাণ রাখতে সক্ষম হন যে তিনি ছিলেন "এক অসামান্য পুরুষ, অসামান্য ছিলেন তিনি পুরাপুরি মানুষ হিসেবে --- তাঁর অন্তর থেকে উৎসারিত হয় প্রজ্বলিত বহ্নিশিখার মতো দুঃসাহস ও কর্মস্পৃহা, কেননা তিনি জানতেন সেই পরম সত্য যে সাফল্যের গৌরব তাঁরাই লাভ করেন যাঁরা দুঃসাহস ও কর্মস্পৃহার অধিকারী।"[৬৬]

এসব দিক থেকে বিবেচনা করলে এটা প্রতীয়মান হয় যে 'দেশবন্ধু' থেকে 'বঙ্গবন্ধু' পর্যন্ত যেন এদেশ এক ঐতিহ্যগত বন্ধনের সূত্রে আবদ্ধ, রাজনৈতিক মাধ্যম হিসেবে সেই বন্ধন জুগিয়েছেন সুভাষ বোস স্বয়ং। কেননা দেশবন্ধু ছিলেন সুভাষ বোসের রাজনৈতিক গুরু, আর বোসও তাঁর গুরুকে বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে নিদারুণ ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে এটা স্বাভাবিক মনে হবে যে দেশবন্ধুর খেতাবের অনুকরণে মুজিবের ভক্ত ও রাজনৈতিক অনুগামীরা পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীদের চাপিয়ে দেওয়া 'আভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদের' বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলাকালে একইরূপ রাজনৈতিক খেতাবে ভূষিত করেন।

একই পক্রিয়ায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে রত মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানী বাহিনীর নৃশংসতার জবাবে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম রণনীতির অংশবিশেষ হিসেবে অনেকটা 'ইণ্ডিয়া ন্যাশনাল আর্মীর' ধারায় প্রায় রাতারাতি জন্মলাভ করে। এক্ষেত্রে সুভাষ বোসের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের মতো মুজিব ও তাঁর সহযোগিরা দ্রুতই বুঝতে সক্ষম হন যে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে পরোক্ষ সংগ্রামের পর্যায় পরিবর্তন করতে হবে, একে পুরোদম সংগ্রাম বা বিপ্লবী যুদ্ধের রূপদান করতে হবে। এভাবে মুজিব জাতীয়তাবাদী বাঙালি লেখক সৈয়দ ওয়াজেদ আলীর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ প্রদানে সমর্থ হন, যিনি ১৯৩০ সনে একজন বাঙালি যুগ মানব বা মহিমান্বিত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হবে বলে

www.pathagar.com

ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যার নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার উর্বর ভূমিতে সৃষ্টি হবে প্রথম প্রকৃত বাঙালি রাষ্ট্র।[৬৭]

এ সকল দৃষ্টিকোণ থেকে মুজিবকে প্রকৃতই সুভাষ বোসের উত্তরসূরি বলে প্রতিভাত হয়। এ কারণে কোনো কোনো বিশ্লেষক উপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রামের জন্য স্বয়ং বোসের প্রণীত বিপ্লবী মডেলের সম্ভাবনা পূর্ণতা লাভ করে মুজিবের মধ্যে বলে মনে করেন। মুজিবের পরোক্ষ/অসহযোগ আন্দোলনসহ তাঁর আত্মত্যাগে সেই বিপ্লবী প্রক্রিয়াই- প্রতিফলিত হয়, যাকে বোস বলেন 'অহিংস গেরিলা যুদ্ধ বিগ্রহ'। পরবর্তীকালে পাকিস্তানী সামরিক জান্তার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ বা সশস্ত্র সংগ্রামে বোসের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের রণনীতি পুরোপুরি প্রতিফলিত হয়। এসব ক্ষেত্রে মুজিবের সাফল্য গান্ধীর স্বপ্ন -কল্পনার বাইরে বলে বিবেচিত।[৬৮]

বস্তুত, আমাদের মুক্তযুদ্ধ ছিল একটি স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য। মুজিব সেই উদ্দেশ্যে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন - গান্ধীর 'রামরাজ্য' ধারণীর চেয়ে তা' ছিল স্পষ্টতর। এদিক থেকে বিচার করলে মনে হবে যে, একটি স্বাধীন বাংলদেশ প্রতিষ্ঠা করে মুজিব যে সাফল্য অর্জন করেন তা ইতিপূর্বে কোনো বাঙালি নেতার পক্ষে সম্ভব হয় নি।[৬৯]

সুভাষ বোসের মতো মুজিবও তাঁর পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়নে ও কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে পরিচয় দেন। তিনি স্পষ্টতই বুঝতে পরেছিলেন যে পাকিস্তানে বাঙালিদের আভ্যন্তরীণ সংগ্রামে 'আন্তঃউপনিবেশবাদের' করাল গ্রাস থেকে এককভাবে সফলতা অর্জন কঠিন করে তুলতে পারে। তিনি যথার্থ-ই ভেবেছিলেন যে, কোনো না কোনো ভাবে বিদেশী সমর্থন লাভ না করলে বাঙালিদের পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানে নিজস্ব একটি দেশ গঠন সহজ হবে না। বস্তুত, বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনের আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' সম্পর্কিত পাকিস্তানী অভিযোগ যে মুজিব আগরতলায় ভারতীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে আসছিলেন সেই অভিযোগের সত্যতা ছিল[৭০]। এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই যে মুজিবের রাজনৈতিক ও আদর্শগত উদ্দেশ্যাবলির সঙ্গে ভারতের সহানুভূতিসুলভ একাত্মতা, ভারতে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীকে নিরাপদ আশ্রয় প্রদান এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে বাংলাদেশের অনুকূলে ভারতের হস্তক্ষেপ প্রভৃতি না হলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আরো অনেক দীর্ঘায়িত হতো।

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধ উত্তরকালীন বাংলাদেশ

স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার প্রধান হিসেবে মুজিব বোসের অনুসৃত জাপানী সংযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হন। এ উদ্দেশ্যে ১৯৭৩ সনে তিনি সরকারিভাবে জাপান সফর করেন এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রয়াসে জাপানি সাহায্য কামনা করেন। সুভাষ বোসের প্রতি মুজিবের অধিকতর সুনির্দিষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধার অভিব্যক্তি ঘটে যখন তিনি জাপানি লিয়াজোঁ অফিসার ও বোসের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ফুজিয়ারা ইওচী'কে[৭১] স্বাধীন বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে বাংলাদেশে সফরে আমন্ত্রণ করেন।[৭২] সেই বিশেষ ঘটনা এটাই ইঙ্গিত বহন করে যে ঐহিহাসিক স্মৃতির রোমন্থন ও পুনর্জাগরণের মাধ্যমে কি করে বাংলাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর ভাব ও সহানুভূতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে জাপানকে উদ্বুদ্ধ করা যায় সেই বিষয় মুজিব কতখানি গভীর ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা করেছিলেন।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর অনেকটা সুভাষ বোসের অনুকরণে মুজিবের প্রাথমিক কাজগুলোর মধ্যে একটি ছিল দেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শমালা সংযোজন। উল্লেখ্য, মুজিবের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশই, ভারত নয়, ছিল দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম দেশ যার সাংবিধানিক দলিলে ধর্মনিরপেক্ষতার মতবাদ রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে সংযোজিত হয়।

সুভাষ বোসের মতো মুজিবও ছিলেন একজন রাজনৈতিক ঝুঁকিবাজ খেলোয়ার বা মূল্যমান খেলোয়ার-যার মর্মকথা হলো 'পাবো তো সবই পাবো না হয় মোটেই না পাবো। 'এভাবে তিনি যা' সঠিক বলে মনে করেন তাঁর সপক্ষে তিনি নিজের জীবনসহ সকল কিছুর ঝুঁকি নেন। বোসের অনুকরণে মুজিব তাঁর জীবনের চৌদ্দটি বছর জেলে কাটান এবং এই প্রক্রিয়ায় তিনি আত্মত্যাগী সুপুরুষ হিসেবে তাঁর ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রসঙ্গে এও বলা হয় যে, 'মুজিবের ভাবমূর্তি ছিল তাঁর আদর্শের সঙ্গে সম্পৃক্ত' এবং তাঁর ভাবমূর্তি ও আদর্শ দুটোই মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের পুনর্গঠন ও উন্নয়নে একত্রিতভাবে ব্যবহার করা হয়।[৭৩]

সুভাষ বোস ও মুজিবের পার্থক্য

এটা সম্ভবত বলা সঠিক হবে না যে, দু'জন বাঙালি মহিমান্বিত ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য ছিল না। বস্তুত, বোস ও মুজিবের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষা, পরিবেশ - পারিপার্শ্বিকতা ও অভিজ্ঞতার দিক থেকে বড় ধরনে পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। বোস ছিলেন ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ ও নির্যাতনের সৃষ্টি, আর মুজিব ছিলেন পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর "অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদ ও

www.pathagar.com

শোষণের সৃষ্টি।" প্রাথমিক জীবন গঠন ও রাজনৈতিক পটভূমি ও দূরদর্শিতা প্রভৃতি দিক থেকে বোস ছিলেন অনন্য সাধারণ, কিন্তু তবু তিনি ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ ও তার সহযোগীদের নির্যাতন ও প্রতিহিংসার শিকার হন, বিশ্ব ইতিহাসের এক অতি ক্রান্তিলগ্নের বিদেশ ভূমিতে বোস এক নির্মম দুর্ঘটনার কবলে পতিত হন এবং চমৎকারভাবে প্রণীত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অনেক আদর্শ ও উদ্দেশ্যাবলি বাস্তবায়নে তিনি ব্যর্থ মনোরথ হন। জীবন গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে ও শিক্ষায়, রাজনৈতিক পটভূমি ও দূরদর্শিতার দিক থেকে সুভাষ বোস ছিলেন অসাধারণ। তবু তিনি ব্রিটিশ নির্যাতনের শিকার হন, বিশ্বের ইতিহাসের এক দারুণ ক্রান্তিকালে এক দূরদেশে স্বদেশকে সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন থেকে মুক্ত করতে গিয়ে স্বয়ং দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। ফলে চমৎকার আদর্শ ও উদ্দেশ্যাবলির প্রবক্তা হওয়া সত্ত্বেও স্বয়ং তিনি সেসব অর্জনে ব্যর্থ হন।

পক্ষান্তরে, শিক্ষাদীক্ষার দিক থেকে মুজিব ছিলেন আপেক্ষিক অর্থে সাধারণ, স্বদেশেই তাঁকে প্রাণ দিতে হয়। কারণ হিসেবে তাঁর জীবনের শেষের দিকের ব্যর্থতার পাশাপাশি হীনচক্রান্তের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা চলে অথচ সেই মুজিব তাঁর দূরদর্শী রাজনৈতিক দৃকশক্তি। আত্মত্যাগ ও দুঃসাহসমূলক কর্মকাণ্ড তাঁর অব্যবহিত লক্ষ্য সাফল্যের সঙ্গে অর্জন করতে সক্ষম হন। কিন্তু সেই দেশকে উন্নয়নের মাধ্যমে সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করার তাঁর স্বপ্নও অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন অসম্পূর্ণ রেখে যান।

দক্ষিণ এশিয়ার অতীত ঐতিহ্য

সুভাষ বোস ও মুজিব -উভয় ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে সাফল্য ও ব্যর্থতায় বৈপরিত্য থাকা সত্ত্বেও দু'জনেই দক্ষিণ এশিয়ার জন্য আসার আলোর দিশারী বলে বিবেচিত হতে পারেন। কেননা তাঁরা উভয়েই কৌশলগত কর্মকাণ্ড ও আদর্শিক পরিকল্পনার মাধ্যমে এমন এক মহিমান্বিত ঐতিহ্য রেখে গেছেন যাতে দক্ষিণ এশিয়ার জনগণ এ অঞ্চলের জন্য এক উন্নততর ভবিষ্যৎ কল্পনা করতে পারেন, পুনরায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হতে পারেন যে তাদের সত্যিকার আত্মা ও ভারমূর্তির বন্ধন কোথায় নিহিত। প্রয়াসী হতে পারেন পারস্পরিক সংহতির পথের সন্ধানে এবং বিশ্ব সমাজে নিজেদের জন্য একক ও অভিন্ন নিয়তির বন্ধন গড়ে তুলতে এগিয়ে আসতে পারেন।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সুভাষ বোস ও মুজিব দুজনেই স্বাধীনতা ও ঐক্যের স্বপ্ন দেখিয়েছেন, বলেছেন মানবিক মর্যাদা ও সোনালি সৌন্দর্যমণ্ডিত ভবিষ্যতের কথা। বর্তমান বাস্তবতা রুক্ষও বেদনাদায়ক ঃ দক্ষিণ এশিয়া তার একক রাজনৈতিক সত্তা হারিয়েছে, রণনৈতিক দিক থেকে এ অঞ্চলের

www.pathagar.com

দেশগুলো পরস্পরের মুখোমুখি, সমকালীন ইতিহাস তাদের বিপরীত ধারামুখি এবং একক সাংস্কৃতিক বন্ধন ও বিচ্ছিন্ন হবার পথে। সুভাষ বোসের 'স্বপ্নের বাংলা' বা রবি ঠাকুরের 'সোনার বাংলা'ও আজ দু'ভাগে বিভক্ত, কিন্তু আজো দু'বাংলার সাধারণ মানুষ সংস্কৃতি ও মনের দিক থেকে পরস্পরের অনেক কাছাকাছি। এসব বাস্তবতার নিরিখে ন্যূনতম যা কিছু প্রস্তাব করা যেতে পারে তাহলো দু'বাংলার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকতর সাংস্কৃতিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা এবং বাংলার সীমান্তের দু'পারে শিক্ষা ও গবেষণার কেন্দ্রগুলোর মধ্যে শিক্ষা ও ভাবের লেনদেন সৃষ্টি করা। এর মাধ্যমে সুভাষ বোস, রবি ঠাকুর ও মুজিবের স্বপ্ন ও কল্পনার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা যেতে পারে।

অনুতাপের বিষয় হলো, উপনিবেশবাদ-উত্তর দক্ষিণ এশিয়া শুধুমাত্র রাজনৈতিক-ভৌগোলিক দিক থেকে ক্ষত-বিক্ষত হয় নি, এ অঞ্চলের প্রতিটি দেশ কুশাসনেও ভুগে চলছে, দেশ-পরিচালনায় দিক-নির্দেশনা ও নীল-নকশার অভাবে অভ্যন্তরীণভাবেও এ অঞ্চলের সব কয়টি দেশ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে চলেছে। স্পষ্টতই এটা প্রতীয়মান হবে যে, তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্বের আধিপত্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বা মুসলিম লীগের বিকল্প সাম্প্রদায়িক নীতি কোনোটাই জনগণের কাম্য স্থিতিশীলতা ও উন্নয়ন বা প্রগতির নিশ্চয়তা প্রদানে সক্ষম নয়, কেননা এ ধরনের নীতির বা দৃষ্টিভঙ্গির ফলশ্রুতিতেই এ উপমহাদেশ বিভক্ত হয়। যুগের দাবির সঙ্গে সুর মিলিয়ে এটা বলা সঙ্গত যে একমাত্র সুভাষ বোসের উত্থাপিত সাম্যবাদের রূপরেখা এবং এর অন্তর্নিহিত সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নীতিমালার ভিত্তিতে দক্ষিণ এশিয়াকে তার বর্তমান দ্বন্দ্ব-কলহের দুষ্ট আবর্ত থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হতে পারে।

রবি ঠাকুর ও সুভাষ বোসের অতি কাঙ্ক্ষিত বাংলার বন্ধনকে সামনে রেখে বাংলা সীমান্তের দু'প্রান্তে গণযোগাযোগ ভিত্তিক মানুষ - মানুষের সম্পর্ক গড়ে তোলা যেতে পারে যাতে বাংলার ঐতিহ্যিক আত্মিক বন্ধন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায়। একাধিক যোগসূত্র স্থাপনের বিষয়ও ভাবা যেতে পারে। এক্ষেত্রে গণসংগঠন, বেসরকারি সংস্থাদি ও সামাজিক শ্রেণীসমূহের সানুগ্রহে অভিন্ন মানবিক কল্যাণ সাধনে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। এটা গুরুত্ব সহকারে পুনরায় উল্লেখ করা চলে যে, ভারতের মুক্ত সংগ্রাম চলাকালে সুভাষ বোস স্বয়ং উপমহাদেশের বৃহত্তর জন সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা সৃষ্টিতে একই ধরনের সংগঠন-সংস্থা প্রয়োগ করেন। তাই প্রয়াত সেই মহান নেতার আদর্শের উদ্দীপনায় এ ধরনের সংগঠন-সংস্থার উচিত হবে বিভক্ত বাংলার দু'পারে বোসের কৌশলগত আদর্শ ও রাজনৈতিক ভাবধারার প্রসার ঘটানো এবং সেই আদর্শ-ভাবধারাপুষ্ট বাংলার মডেল সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায়

www.pathagar.com

অনুকরণ করা যেতে পারে যাতে এ অঞ্চলের জনগণের মধ্যে ঐতিহ্যিক ভ্রাতৃত্বসুলভ ও সংহতিপূর্ণ সম্পর্ক পারস্পরিকভাবে গড়ে উঠতে পারে। দক্ষিণ এশিয়ায় বর্তমান উচ্চতম অভিলাষ হচ্ছে এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুনরায় সংহতি প্রতিষ্ঠা করা। রাজনৈতিক আন্তক্রিয়ার ক্ষেত্রে একটি অধিকতর খোলামেলা রূপরেখা তৈরি করা। এসব একমাত্র তখনই সম্ভব হতে পারে যখন পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে কাঠামোগত পরিবর্তনের সুস্থ আবহাওয়া বয়ে আনবে দীর্ঘমেয়াদি সুসম্পর্কের সম্ভাবনা।

৩. বাংলাদেশের ভাবমূর্তি কৌশলগত আদর্শ ও কর্মকাণ্ডের নতুন গতিধারা নির্ণয়

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এদেশের জনমানুষ প্রকৃত অর্থে জাতীয়তাবাদের সম্ভাবনা ও শক্তি যে কতখানি প্রবল তা প্রদর্শন করে। সেই মুক্তিযুদ্ধ নিঃসন্দেহে ছিল জনযুদ্ধ। মুজিব স্বয়ং তা তাঁর ১৯৭১ এর ৭ মার্চের প্রখ্যাত বক্তৃতায় জনযুদ্ধের এক রূপরেখা প্রদান করেন। সেই ঐতিহাসিক বক্তৃতায় তিনি স্পষ্টতই বলেছিলেন যে বাঙালিরা শুধু মাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে না, তাদের সংগ্রাম হচ্ছে গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এবং জনমানুষের অর্থনৈতিক মর্যাদা অর্জন করা। এভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উদ্দেশ্যাবলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় গণতান্ত্রিক অধিকারের নিশ্চয়তা। এর অর্থ দাঁড়ায় দু'ধরনের রাজনীতি ও অর্থনীতির উভয়বিধ দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক অধিকারের পাশাপাশি অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা প্রদানে সম-অধিকারের নিশ্চয়তা।[৭৪] পরিতাপের বিষয় হচ্ছে রাজনৈতিক অভিলাষ বা প্রতিশ্রুতি বাস্তবে প্রতিফলিত হয় নি ঃ সোনার বাংলা গড়ার পরিকল্পনা স্বপ্নের ভাবমূর্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশের জন্মের পর পঁচিশ বছর পূর্তি উদযাপনও পেরিয়ে গেলে কিন্তু এত বছর পর দেশে শুধু গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথাই সগৌরবে বলা হচ্ছে, অথচ দেশের অজস্র মানুষ দারিদ্র্যের কাঠাগোড়ায় নিক্ষিপ্ত; প্রশাসনে সর্বত্র অরাজকতা ও বিশৃঙখলা বিরাজমান এদেশের মহিমা হচ্ছে 'বিশ্বের বৃহত্তম দারিদ্র্যক্লিষ্ট দেশ' বলে আপন পরিচয়' যেন এদেশের মানুষ সত্যিকার অর্থে নিয়তি নির্ধারিত উন্নয়ন প্রতিস্থল জাতি।[৭৫]

নীতি ও নেতৃত্বের বিষয় নিয়ে বিতর্ক বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সমাজ জীবনকে বিষিয়ে তুলছে-এমন কি দেশকে অসুস্থকর পঙ্গুত্বের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বিতর্কের আরেকটি অমঙ্গলকর দিক হচ্ছে খোদ জাতীয়তাবাদের বিষয়টিকেও টেনে আনা। অথচ এ ভাবা একান্ত সমীচীন যে, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমেই সিদ্ধান্ত হয় যে, বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের ভিত কোথায় নিহিত। বাঙালি ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ নিয়ে যে বিতর্ক চলে

www.pathagar.com

আসছে এদেশে তা অনাহুত ভেদাভেদের বিষ ছড়াচ্ছে এবং বাংলাদেশের একটি মর্যাদাসম্পন্ন জাতীয় ভাবমূর্তি গঠনে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

জাতি গঠনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হচ্ছে বা হওয়া উচিত সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি রাজনৈতিক-পারিপার্শ্বিক আচার আচরণের ক্ষেত্রে গুণগত উন্নয়ন। বাঙালি মাত্রই নিজেদের সংস্কৃতি নিয়ে গর্ভ অনুভব করে থাকে এবং এটা যথার্থ সত্য যে রাজনৈতিক-ধর্মীয় ব্যবধান সত্ত্বেও বাঙালিদের সংস্কৃতিতে অসহনশীল উপাদানের অভাব নেই।[৭৬] বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত মতানৈক্যের বিষয়ে দেশের জনসমষ্টি আদৌ অবহিত রয়েছে কিনা সন্দেহ। এ পরিপ্রেক্ষিতে এটা বলা সমীচীন যে দেশের ভাবমূর্তি গঠনে যা প্রয়োজন তাহলো বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এ সম্পর্কে সমঝোতা গড়ে তোলা।

বাংলাদেশের মতো একটি অনুন্নত দেশে কৌশলগত দৃকশক্তি ও কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে একটি নতুন গতি সঞ্চার করতে হলে সার্বিক প্রয়োজন ব্যাপক আলোড়ন। এ ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর বাস্তবতা হচ্ছে উৎপাদন জীবনের নিম্নমান, অব্যাহত জনসংখ্যার বিস্ফোরণ উত্তরোত্তর বিদেশী ঋণের বোঝা বৃদ্ধি, শিশুমৃত্যুর উচ্চ হার, নিম্ন পুষ্টির মান, উচ্চ শিক্ষিত বেকার সংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধি, ব্যাপকতর গ্রামীণ দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা এবং অপরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি। দ্রুত বেড়ে চলা দেশের অগণিত নিষ্ক্রিয় জনসংখ্যাকে উৎপাদনের হাতিয়ার এবং কার্যকর জাতীয় পরিসম্পদে রূপান্তরিত করতে হবে। দেশের সুবিশাল মানব সম্পদ এবং নবলব্ধ গ্যাস, কয়লা প্রভৃতি দ্রুত পরিসরে জাতীয় পুনর্গঠনে প্রয়োগ করা যেতে পারে যদি আলোকিত নেতৃত্বের উদ্ভব ঘটে। যদি রাজনৈতিক ফ্যাসাদ ও দলীয় কোন্দলের উর্ধ্বে সুস্থ কৌশলগত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

এটা নিশ্চিত করে বলা চলে যে, বাংলাদেশেকে 'সোনার বাংলা' হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মুজিবের ছিল রোমান্টিক পরিকল্পনা ও দৃকশক্তি। এতে ছিল যথেষ্ট ভাবাবেগ প্রসূত আবেদন, উচ্ছ্বাসও হয়তো ছিল, কিন্তু স্পষ্ট রূপরেখার অভাব ছিল দেশগড়ার জন্য। তিনি স্বয়ং সমালোচনার উর্ধ্বেও ছিলেন না। বিশেষ করে ১৯৭২-এর গণতান্ত্রিক সংবিধান সংশোধন করে রাতারাতি বাকশাল ব্যবস্থা প্রবর্তন করার জন্য তিনি কঠোর সমালোচনার মুখোমুখি হন। বলা হয় যে এ ছিল এক বিভ্রান্ত বীরপুরুষের বিপরীতমুখী স্বগতোক্তি স্বরূপ। শুধু তাই নয়, আজীবন গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তির ধারক-বাহক হওয়া সত্ত্বেও ও দেশের মহানায়ক হিসেবে দেশ পরিচালনার সেই ক্রান্তিলগ্নে প্রতিক্রিয়াশীল ও হীনউদ্দেশ্য স্বার্থ প্রয়াসী কিছু কিছু লোক তাঁকে ঘিরে রাখে, বিনষ্ট করে তাঁর গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তি।[৭৭] অথচ সেই মুজিব স্বয়ং পাকিস্তানী

www.pathagar.com

স্বৈরশাসনের যাতাকলে নিগৃহীত হন বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হন। তবু মুজিবের সেই স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' দারিদ্র্য প্রপীড়িত দেশের জনগণের জন্য নীতিগত ক্ষেত্রে বাস্তব আবেদন রেখে চলছে, যদিও দেশের বিগত সাতাশ বছরের ইতিহাস হচ্ছে সেই স্বপ্নের সাধ সোনার বাংলা গড়ার প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গার ইতিহাস। সোনার বাংলা কথাটি সবকিছু নৈরাশ্য সত্ত্বেও শ্রুতিমধুর। কেননা এতে নিহিত রয়েছে ঐশ্বর্যের স্বাভাবিক অভিলাষ যা উন্নয়নকামী অন্যান্য দেশের জন্য লক্ষ্য অর্জনের মডেল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এখন যা প্রয়োজন তা হলো নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজে প্রবৃত্ত হবার উদ্দেশ্য ও প্রবণতা এবং এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এমন কৌশলগত কর্মকাণ্ডে ব্যতিব্যস্ত হওয়া যাতে কাঙ্ক্ষিত সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়।

একুশ শতকের দ্বারপ্রান্তে এসে আগামী শতাব্দীর চাহিদার কথা মনে রেখে বাংলাদেশকে অবশ্যই সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে, দেশের উন্নয়নের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে একটি নতুন উন্নয়ন নীতি-কৌশল প্রণয়ন করতে হবে - এ নীতিকৌশল অবশ্যই হতে হবে নিরবচ্ছিন্ন প্রবৃদ্ধি। এ নীতি-কৌশল অর্জনের জন্য সকল পর্যায়ে বহুমুখী কৌশলমূলক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড জোরদার করতে হবে। দেশের বিভিন্ন স্তরে সংস্কারমূলক কর্মসূচি ত্বরান্বিত করতে হবে। দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে দেশকে ব্যাপক নিরক্ষরতার অভিশাপ ও গ্লানি থেকে অবমুক্ত করতে হবে। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা সামাজিক আন্দোলনের পাশাপাশি আইনগতভাবে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার স্বাধীনতা উত্তর সব সরকারই যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে দিয়ে আসছে, কিন্তু আজো তা স্বপ্ন বলেই বিবেচিত।

অবশ্য সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে জরুরি ভিত্তিতে ঢেলে সাজাতে জাতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজন একই রূপ শিক্ষা ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থায় জাতীয়তাবাদী আদর্শের পাশাপাশি প্রগতিপন্থী চিন্তাধারাও সন্নিবিষ্ট হবে। বর্তমানে প্রচলিত ইংরেজি, দেশজ/বাংলা ও মাদ্রাসা শিক্ষার মতো ত্রিমুখী শিক্ষার পরিবর্তে একটি সুসংহত আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে, গুরুত্ব প্রদান করতে হবে পেশাধর্মী ও কারিগরি শিক্ষা । সকল ক্ষেত্রে দৃষ্টি রাখতে হবে মানব সম্পদ উন্নয়নের বিষয়। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হিসেবে মনে রাখতে হবে একটি শিল্পজাত অর্থনীতি প্রয়োজনের বিষয়। দারিদ্র্য বিমোচনে কার্যকর ও বাস্তবমুখী কর্মপন্থা গ্রহণও অপরিহার্য। জনসংখ্যা বৃদ্ধি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নামিয়ে আনতে হবে। বিদেশী প্রযুক্তি ও বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে হবে - তা'না হলে বর্তমান প্রবৃদ্ধির হার বাড়ানো সম্ভব হবে না। কৃষি প্রধান দেশের কৃষিজাত শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের দিকও যুক্তিযুক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনায় রাখতে হবে

www.pathagar.com

যাতে রাস্তা-ঘাট ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে দেশের বৃহত্তর উৎপাদক শ্রেণী সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। এ সকল ক্ষেত্রে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হলে দেশের আমলাতন্ত্রের ভূমিকা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন হবে। কেননা উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে আমলাতন্ত্র অনাহুত জটিলতা সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকল্প বিলম্বিত করে বলে অভিযোগ রয়েছে। প্রয়োজনবোধে দুর্নীতিগ্রস্ত ও অদক্ষ আমলাতন্ত্রের অংশবিশেষ কাটছাঁট করে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে।[৭৮]

প্রকৃতপক্ষে, বিগত কয়েক দশকের নিম্নতর পর্যায়ের প্রবৃদ্ধির আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ এখনো বাংলাদেশের রয়েছে। এজন্য প্রয়োজন হচ্ছে দেশের যা কিছু স্বল্প সম্পদ রয়েছে তা প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে উন্নয়নের ভিত প্রতিষ্ঠা করা। উন্নয়নমূলক খাতকে উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা। বাংলাদেশকে শিখতে হবে জাপানসহ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে। প্রতিকূল পরিবেশ থেকেই সে সব দেশ শিক্ষা গ্রহণ করে এবং ঐতিহ্যিকভাবে তাদের অসামান্য অর্থনৈতিক সাফল্য প্রতিকূলতার মধ্যেই নিহিত ছিল। এক্ষেত্রে যা' অপরিহার্য তা হলো বহির্বিশ্বের সঙ্গে অভিযোজন বা খাপখাওয়ানো। এর অর্থ হচ্ছে বহির্দেশীয় সম্ভাব্য হুমকি সম্পর্কে সচেতন হওয়া। নতুন সুযোগের সন্ধানী হওয়া- সুযোগ গ্রহণ করা। এসবের সঙ্গে সংযোজন করতে হবে অভ্যন্তরীণ সৃজনশীলতা, অধ্যবসায় ও কঠোর শ্রম, ধৈর্য ও মননশীলতা।[৭৯] বিশ্বের সফলকামী দেশগুলো এসব প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সাফল্যের শিখরে আরোহণ করেছে। বিশ শতকের শেষে স্নায়ুযুদ্ধ উত্তরকালের এ পর্যায়ে প্রতিবেশী অঞ্চল, উপ-অঞ্চল ও অনেক দেশে চলছে নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নের প্রয়াস। স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের পক্ষেও উচিত হবে জাপান ও চীনসহ পূর্ব এশীয় শিল্পোন্নত দেশগুলোর উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির মডেলকে ধারণ করে একই লক্ষ্যে এগিয়ে চলা।

এটা অজানা নয় যে, বাংলাদেশের বর্তমান অনেক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড প্রধানত দাতাদেশগুলোর সাহায্যে অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু ভবিষ্যতে এ ধরনের সাহায্য লাভের প্রত্যাশা খুব উজ্জ্বল বলে মনে হচ্ছে না। কেননা দাতাদেশগুলো ক্রমবর্ধমান হারে সাহায্যের হাত সঙ্কোচন করে আসছে এবং ফলে অদূর ভবিষ্যতে বিদেশী সাহায্য যেহেতু নিঃশেষ হয়ে আসতে পারে সেহেতু বাংলাদেশের মতো দেশকে অভ্যন্তরীণ সম্পদের ওপর নির্ভরশীল হতে হবে। দেশের উত্তরাঞ্চলে খরার অবস্থা বিরাজ করছে; বিগত কয়েক বছর দেশে শস্যের উৎপাদন আশানুরূপ হয় নি। ফলে খাদ্য আমদানি খাতে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার এক বিরাট অংশ ব্যয় করতে হয়। এর বিশেষ কারণ

www.pathagar.com

হলো বিদেশী দাতাদেশগুলো খাদ্য সাহায্যের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে কমাচ্ছে। উপরন্তু, স্বনির্ভরতার প্রয়োজনের কারণেই অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য বাংলাদশকে অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়। সামাজিক সম্প্রীতি, রাজনৈতিক সমঝোতা ও স্থিতিশীলতা প্রভৃতি ছাড়া নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন প্রয়াস সম্ভব নয়, এও মনে রাখা প্রয়োজন।

এ সকল বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এটাই মনে হবে যে, বাংলাদেশের নীতিগত বিকল্প একটিই নিরবচ্ছিন্ন প্রবৃদ্ধি বা উন্নয়ন। এর অর্থ হচ্ছে সর্বোত্তম যোগ্যতা ও দক্ষতা সহকারে অব্যাহত ধারায় উৎপাদন বাড়ানো যাতে বর্তমানকালের প্রতিকূলতার বেড়াজাল ছিন্ন করা যায়। বিবেচনায় থাকতে হবে যে বিদেশী সাহায্যের বহর কমে আসছে প্রতিনিয়ত। নিত্যনতুন ব্যবসায়িক প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি হয়ে চলছে - বিশেষ করে এশীয় প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্যের ভারসাম্যতা ক্রমশ বাংলাদেশের প্রতিকূলে বেড়ে চলছে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে দক্ষতা বাড়াতে হলে শুধু কাঠামোগত অভিযোজন, অর্থনীতির উদারনীতিকরণ বা ব্যক্তিমালিকানার শ্লোগানই যথেষ্ট নয়। জাপান, চীনসহ পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশ থেকে বাংলাদেশকে অর্থনীতির উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে অনেক কিছু জানতে ও শিখতে হবে। বিশেষ করে অর্থনীতির উন্নয়ন ক্ষেত্রে ব্যক্তিমালিকানা খাতের উন্নয়ন বা কিভাবে এতে উদ্দীপনা সঞ্চার করা যায়, কিভাবে বেসরকারি খাতকে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান সংগঠনসমূহের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে সম্পৃক্ততা বাড়ানো যায়, কিভাবে বিদেশে দেশের দূতাবাসগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়। কিভাবে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা চলে এবং কিভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারকল্পে বিভিন্ন ধরনের বাধা-প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে দেশকে নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নের পথে ধাবিত করা যায়।

নেতৃত্ব

বাংলাদেশে নেতৃত্বের বিষয়ে প্রচলিত বিতর্কের দু'টো দিক প্রচ্ছন্ন ঃ এর একটি হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালের নেতৃত্ব সম্পর্কিত, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে নেতৃত্বে উত্তরাধিকার বা বিবর্তন সম্পর্কিত। এ দু'টোর একটির সম্পর্কেও প্রলম্বিত বিতর্কের কোনোরূপ সুযোগ রয়েছে বলে মনে হয় না; এমন কি সমগ্র বিতর্কের ধারাই অযৌক্তিক বলে বিবেচিত হতে পারে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুজিবের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা অমূলক কেননা তিনি তাঁর কালজয়ী ,দুঃসাহস, সংকল্প ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে সমগ্র বাঙালি জাতিকে জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করেন। অবশ্য একই সঙ্গে এও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, স্বাধীন বাংলাদেশের সৃষ্টি মুজিবের

www.pathagar.com

একক অবদানের ফসল নয়। এদশের লক্ষ কোটি মানুষ মুজিবের ডাকেই সাড়া দিয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে, নানাভাবে আত্মত্যাগ করে, ভোগান্তির শিকার হয়, অনেকে আপন ও প্রিয়জনকে হারায়।

এছাড়া অনেকে বীরদর্পে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। এদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য জিয়াউর রহমানের নাম। তিনি ঐ সময় পাকিস্তানের পদাতিক বাহিনীতে মেজর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। মুজিবের ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁরই নামে তিনি বাংলাদেশের একটি স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রও পাঠ করেন ২৫ মার্চে রাতে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর আগ্রাসনের পরবর্তী পর্যায়ে। পাকিস্তানীদের নৃশংসতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার জন্যও তিনি আহবান জানান।

বাংলাদেশের ব্যাপক সংখ্যক জনগণ জিয়ার সাহসেরও অনুরাগী। কেননা স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক মুজিব যিনি পাকিস্তানী শোষণের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান করেন তাঁকে যখন আটক করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে, জেলখানার মৃত্যু - প্রকোষ্ঠে ধরে রাখা হয় তখন বাঙালি জাতি অনেকটা দিশেহারা হয়ে পড়ে। সেই মুহূর্তে জিয়ার সাহসিকতা ও পাকিস্তানী সামরিক নেতৃত্বের প্রতি অবাধ্যতামূলক আচরণ ও মুক্তিযুদ্ধের অনুকূলে দুঃসাহসী পদক্ষেপসমূহ যথার্থ উচ্ছসিত প্রশংসার দাবি রাখে। জিয়ার বীরোচিত অবদান পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১৯৭১-এর যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদানকারী সেনানায়ক জগজিৎ সিং অরোরারও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করে।[৮০]

বাংলাদেশের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এদেশের দলীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে বিভাজন ও মতভেদ চরমে; রাজনৈতিক দলাদলিতে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বের প্রশ্ন নিয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক, এমন কি দেশের রাজনীতি বিষিয়ে তোলা হচ্ছে। দেশের রাজনীতির বিভাজনের দু'প্রান্তেই পারস্পরিকভাবে এটা স্বীকার করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের পুরোভাগে শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মত্যাগী ভূমিকা না থাকলে জিয়াউর রহমানের মুক্তিযুদ্ধে লড়াই করার মতো প্রসঙ্গ বা পরিস্থিতি হতো না। তেমনি জিয়ার মতো বীরদর্শী ও দুঃসাহসী সৈনিক মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বে এগিয়ে না এলে বাংলাদেশের মাটিতে আরো অনেক বাঙালির রক্তক্ষয় হতো। দেশের স্বাধীনতা অর্জন আরো অনেক বিলম্বিত হতো। প্রসঙ্গটি আরো সরাসরি এভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের কৌশলগত দৃশ্যপটে মুজিবের অবস্থান হচ্ছে জনকসুলভ, আর জিয়া ছিলেন তাঁরই সেনানী। তাঁদের পরস্পরের ভূমিকা ছিল পরিপূরক, নেতৃত্বের প্রসঙ্গে পারস্পরিকভাবে অবজ্ঞা করার বা একে অপরকে হেয়-প্রতিপন্ন করার

www.pathagar.com

বিষয় নয়। প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর জিয়া সেনাবাহিনীতে ফিরে যেতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি এবং মুজিব সরকারের অধীনে আপন দায়িত্ব পালনেও তিনি কোনোরূপ অনীহা প্রকাশ করেন নি। পক্ষান্তরে, এটা অজানা নয় যে, মুজিব স্বয়ং জিয়া ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে পরম কোমল ও স্নেহের সম্পর্ক বজায় রাখেন।

সেই সম্পর্কের মোড় নেয় ১৫ আগস্ট ১৯৭৫-এর রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। মুজিব ও তাঁর পরিবারের সদস্যবর্গের নৃশংস প্রাণহানির পর। সেই ঘটনা থেকে নভেম্বরের তুমুল কোলাহল ও হাঙ্গামামুখর ঘটনা প্রবাহের পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সরকার ও প্রশাসনের দায়িত্ব জিয়ার ওপরে অর্পিত হয়। জিয়া অচিরেই বহুদলীয় গণতন্ত্র ও বেসামরিক রূপ প্রশাসনের প্রবর্তন করেন। যদিও সামরিক বাহিনীতে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিরা উপর্যুপরি ক্ষমতা দখল করে তাঁর সরকারকে অস্থিতিশীল করতে প্রয়াসী হয়। বীর মুক্তিযোদ্ধা, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও ব্যক্তিগতভাবে সৎ হিসেবে খ্যাতি লাভ সত্ত্বেও জিয়া সমালোচনার উর্ধ্বে ছিলেন না। বহুদলীয় রাজনীতির পুনরুদ্ধার সত্ত্বেও দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে উপদলীয় কোন্দল সৃষ্টির জন্য অনেকে তাঁকে দোষারোপ করেন। এ ছাড়াও বেসামরিক প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর গোষ্ঠী বিশেষকে সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্যও তাকে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। তদুপরি, তিনি সামরিক বাহিনীকে রাজনীতিতে আসক্ত করেন বলেও মনে করা হয় এবং তিনি স্বয়ং এর শিকারও হন। এসব সত্ত্বেও জাতীয় নেতা হিসেবে জিয়া ছিলেন অনেক কৃতিত্বের অধিকারী। এদেশের লক্ষ-কোটি মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের অভিলাষে নতুন জোয়ার সঞ্চার ও প্রাণদানে তিনি অশেষ অবদান রাখেন। জনগণের আস্থাভাজন হন, আন্তর্জাতিকভাবে দেশের ভাবমূর্তি, উজ্জ্বলতর করা, ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ ও সম্মান বৃদ্ধির জন্য তিনি নিরলসভাবে কাজ করে যান। তাঁরই নেতৃত্বে বাংলাদেশের পক্ষে প্রথমবারের মতো জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য পদ লাভ সম্ভব হয়। এতে অনেকেই চমৎকৃত হন। কেননা বাংলাদেশ জাপানের মতো একটি শক্তিধর রাষ্ট্রকে পরাজিত করতে সমর্থ হয়। এ ধরনের সাফল্য অর্জনে প্রকৃত অর্থে জিয়া বাংলাদেশকে মুজিবের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যের দিকেই এগিয়ে নিয়ে যান।

দেশের ভাবমূর্তি বাড়াতে হলে বর্তমান রাজনৈতিকভাবে শক্তিমান গোষ্ঠীসমূহ ও নেতৃত্বকে পারস্পরিকভাবে তাদের ঐতিহ্য সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। একই সঙ্গে তাঁদের ভুললে চলবে না যে, তাদের নিজ নিজ দলীয় ও নেতৃত্বের প্রসঙ্গে যেমন গর্বের বিষয় রয়েছে তেমনি রয়েছে লজ্জিত হবার বিষয়ও। তাই জাতীয় ভাবমূর্তি ও মহিমান্বিত ঐতিহ্য গঠনের পেছনের চেয়ে

www.pathagar.com

দেখতে হবে বর্তমান বাস্তবতার দিক। ভাবতে হবে আসন্ন ও অনাগত ভবিষ্যতের কথা।

এক্ষেত্রে জাতি তাকিয়ে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের দিকে ইতিমধ্যে হাসিনা উন্নত বিশ্বের তিনটি প্রধান দেশ থেকে তিনটি সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছেন [৮১]। ডিগ্রি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে আমেরিকার একটি নামকরা বিদ্যাপিঠ বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়। এখান থেকে তিনি ডিগ্রি লাভ করেন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় তাঁর সংগ্রামী অবদানের জন্য। ডিগ্রি প্রদান প্রাক্কালে স্বউদ্ধৃতি বলা হয় যে তিনি হচ্ছেন "সুমহান পিতার গুণবতী কন্যা, একটি কীর্তিমান জাতির উদারমতি নেত্রী।" এর মাধ্যমে হাসিনা স্বয়ং লাভ করেছেন ইতিবাচক ভাবমূর্তি। গণতন্ত্রের স্বপক্ষে তাঁর প্রলম্বিত সংগ্রাম এবং ভাত ও ভোটের অধিকার সম্পর্কিত তাঁর প্রচারণা বাংলাদেশের সরকার প্রধান হিসেবে তাঁকে এক অসামান্য সম্মানের অধিকারী করে[৮২]। একই সঙ্গে এ ধরনের প্রচারণা ও শ্লোগান নিষ্ঠা দেশের জনগণের জন্য তাঁর সরকারের লক্ষ্যও নির্ধারণ করে।

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখযোগ্য যে, বিগত দু'বছরের মধ্যে অন্যান্য খেতাব পদকের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পশ্চিম বাংলা কংগ্রেস প্রদেশ কমিটি কর্তৃক নেতাজী স্মৃতি পদকও লাভ করেন। উপমহাদেশে শান্তি, গণতন্ত্র ও ভ্রাতৃত্ববোধের উন্নয়নে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে সেই পদক প্রদান করা হয়।[৮৩]

উপর্যুক্ত সকল প্রকারের ডিগ্রি ও পদক এরূপ তাৎপর্য বহন করে যে, শেখ হাসিনা স্বয়ং এখন মহিমান্বিত ভাবমূর্তির অধিকারী। স্বাভাবিক কারণেই এটা বলা সমীচীন যে, এখন তাঁর ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করার জন্য তাঁর প্রয়াত পিতার প্রবাদ ব্যবহার নিষ্প্রয়োজন। বরং তা করা হলে তাঁর নিজস্ব ভাবমূর্তিকে হেয়প্রতিপন্ন করা হয়। কেননা এ ধরনের প্রয়াসের ফলে কালে এক নিষ্ক্রিয় শ্রেণীর ভাবমূর্তির সঙ্গে তাঁর কর্মতৎপর ভাবমূর্তিকে সম্পৃক্ত করা বস্তুত এও মনে রাখা প্রয়োজন যে বহুদলীয় গণতন্ত্র ও বাজার অর্থনীতির প্রতি শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুত সমর্থনের বিষয় বিবেচনা করলে শেখ হাসিনাকে আদর্শগত দিক থেকে তাঁর প্রয়াত পিতার চিন্তা-চেতনা থেকে প্রায় সম্পূর্ণ ভিন্নতর বলে মনে হয়। এমন কি বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য শেখ হাসিনার বহুমুখী কর্ম পরিকল্পনা তাঁর প্রয়াত পিতার আদর্শগত ভাবধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা অপ্রাসঙ্গিক বলেও মনে হতে পারে। জনপ্রিয় ভোটে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর দলের প্রকৃত কাজ হচ্ছে দেশকে নিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে সঠিক পথে পরিচালনা করা। তাঁর পিতার স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ে

www.pathagar.com

তোলা এবং স্নায়ুযুদ্ধ উত্তরকালের প্রয়োজনের সঙ্গে খাপখাওয়ানো একটি সম্মানজনক জাতীয় ভাবমূর্তি গড়ে তোলা।[৮৪]

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও বর্তমানে জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী, বেগম খালেদা জিয়ারও ইতিবাচক ভাবমূর্তি রয়েছে। এ ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে দেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে তাঁর ভূমিকা থেকে। একজন সাধারণ গৃহিনী থেকে দেশের রাজনীতির শীর্ষপদে তাঁর উত্থান হচ্ছে অনেকটা উল্কার মতো কিন্তু অভাবিত এ সম্মান তিনি রাজকীয় ধারায় বা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন নি। তিনি প্রথমে খ্যাতি লাভ করেন একটি সামরিক জান্তা কর্তৃক নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে অনমনীয় মনোভাব গ্রহণের মাধ্যমে। পরে তাঁর সেই খ্যাতি আরো বেড়ে চলে স্বৈরাচার-বিরোধী প্রলম্বিত সংগ্রাম চলাকালে এবং আরো পরে তিনি যখন একটি প্রকৃত দল নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন জনপ্রিয় ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন তখন তাঁর ভাব মূর্তি উজ্জ্বলতর হয়।

বলা প্রয়োজন যে, খালেদা সরকারের আমলে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, যদিও এ গণতন্ত্রের গতিধারা তাঁর সরকার- এমন কি দেশের জন্য কন্টকাকীর্ণ বলে বিবেচিত হয়। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর খ্যাতি হচ্ছে অনমনীয় বলে। কিন্তু এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই যে, প্রকৃতপক্ষে তিনি সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনসহ সংসদীয় গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়া তদারক করার জন্য দেশে নির্বাচন-পূর্ব অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করেন। উভয় ক্ষেত্রেই তিনি দেশের বিরোধী দলীয় প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের দাবির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সাংবিধানিক পরিবর্তন সাধন করেন, যদিও দু'টোর একটিও তাঁর নিজস্ব দলীয় রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তিনি বাংলাদেশকে একটি 'বাড়ন্ত বাঘ' বলে অভিহিত করেন। এ ক্ষেত্রেও তাঁর দূরদর্শিতার পরিচয় মেলে। কেননা এ ধরনের বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশকে মুজিবের কাঙ্ক্ষিত নীতিগত 'সোনার বাংলা'র কাছাকাছি পৌঁছাতে প্রয়াসী হন। বর্তমানে সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী হিসেবে তিনি বাংলাদেশের বিরোধী দলীয় রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আনতে স্বয়ং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন এবং ইতিমধ্যে রাজনৈতিক মতভিন্নতা সত্ত্বেও তিনি দেশের অর্থনীতি ও উন্নয়নে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে এ ধরনের অব্যাহত কর্মসূচি পরিহার করে চলছেন। সর্বোপরি, পূর্বকালীন ধারার পরিবর্তে তিনি বিদেশী অতিথিবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে দেশের নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে ব্যবহৃত আন্তর্জাতিক সাহায্য প্রদানের আহবান জানিয়ে আসছেন।

www.pathagar.com

এ সকল বিষয়ে খালেদা জিয়ার মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁর রাজনৈতিক জ্ঞানবুদ্ধি, দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার পরিচয় মেলে। এসব কারণে এটা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে বেগম খালেদা জিয়াও ইতিবাচক ভাবমূর্তির অধিকারী হন এবং যথার্থই তিনি স্বয়ং তাঁর অবদান ও কৃতিত্বের জন্য মহিমান্বিত ব্যক্তিত্বের গৌরবের দাবিদার। সুতরাং এখন তাঁর বা তাঁর দলের পক্ষ থেকে তাঁর নেতৃত্বে জোরদারকল্পে জিয়ার প্রবাদ ডেকে আনার কোনো সঙ্গত কারণ রয়েছে বলে মনে হয় না বরং এ ধরনের প্রয়াসের মাধ্যমে তিনি এবং তাঁর দল অনাহুত তাদের রাজনীতির ধারাকে অতীতের নেতিবাচক বা নিষ্ক্রিয় ভারমূর্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে।

এভাবে এটা প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থা দু'ভাগেই - সরকার এবং বিরোধী দলে - মহিমান্বিত নেতৃত্ব বিরাজমান। এ নেতৃত্ব নিজ নিজ আলোয় উদ্ভাসিত, আপন মহিমায় গৌরবান্বিত। তাই তাঁদের পক্ষে অতীত গৌরবের প্রবাদ ডেকে এনে সেই আলোকিত গৌরবে প্রজ্জ্বলিত হওয়া নিষ্প্রয়োজন। বরং তাঁদের নিজ নিজ পূর্বসূরিদের মহিমান্বিত গৌরবের ছায়ায় আচ্ছন্ন হতে গিয়ে তাঁদের সেই প্রবাদমূলক ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তি পূজা মণ্ডিত ভাবমূর্তির নিকট নিজেদের অনাহুত হেয় বা খাটো করতে পারেন।

এটা অবশ্য কোনোক্রমেই বুঝানো হচ্ছে না যে, অতীত ঐতিহ্য বাংলাদেশের মতো জাতির পক্ষে নিষ্প্রয়োজন; বরং জাতির অতীত ও ঐতিহ্য আমাদের অভিন্ন উত্তরাধিকারের অংশবিশেষ। শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার কারণে অতীতের গৌরব গাঁথা, ব্যক্তিত্ব ও ভাবমূর্তি অবশ্যই প্রাসঙ্গিক, কিন্তু এ সকল ঐতিহাসিক উপাদান জাতি গঠনে তখনই বাধা হয়ে দাঁড়ায় যখন ঐ সবের স্মৃতি সগৌরবে ডেকে আনে বর্তমানকালের রাজনৈতিক গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে মতভিন্নতা সৃষ্টি করার কাজে। অথচ বর্তমান নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়সমূহের কাজ হবে অতীতকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি নয়, সমাসন্ন ক্রান্তিলগ্ন থেকে জাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করা যাতে দেশ ভাবীকালের উন্নয়ন ও স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা লাভ করে। একমাত্র এ ধরনের প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ একটি নতুন জাতীয় ভাবমূর্তি লাভ করতে পারে। এ লক্ষ্যে সর্বোপরি প্রয়োজন হচ্ছে সমঝোতা, যে সমঝোতা প্রয়োজন হবে ক্ষমতার ভাগাভাগি ক্ষেত্রে নয়, হবে নীতিগত মতৈক্য ক্ষেত্র। এতে হতে হবে সংশ্লিষ্ট নেতৃত্বসহ রাজনৈতিক গোষ্ঠীসমূহ; দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী স্বার্থ ও মতামত এতে অবশ্যই প্রতিফলিত হতে হবে দেশ ও জাতির জন্য এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক বিষয় যে, উপর্যুপরি দু'দুটো গণতান্ত্রিক নির্বাচন সত্ত্বেও উচ্চতর রাজনৈতিক পর্যায়ে দেশ এখনো সংকটের কবলে নিপতিত জাতি এতে প্রায় পঙ্গুত্বের পর্যায়ে ধাবিত হচ্ছে।

www.pathagar.com

এটা পুনর্বার জোর দিয়ে বলা সমীচীন যে, বাংলাদেশের পক্ষে প্রলম্বিত প্রক্রিয়ায় আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক গোষ্ঠীসমূহকে ঘিরে সরকার ও প্রশাসনের সমস্যাবলি নিয়ে সংকটের আবর্তে পড়ে থাকা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এটা দেশের জন্য অঙ্গলকর — দেশের ভাবমূর্তি এতে ক্ষুণ্ন হয়ে চলছে। কাঠামোগত দিক থেকে অর্থাৎ সংগঠন ও রাজনৈতিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করলে এমন কি আদর্শিক বিষয়াদি যেমন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচির দিক থেকে দেশের দু'টি বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের মধ্যে তেমন কোনো বড় ধরনের পার্থক্য রয়েছে বলে মনে হয় না। বলা চলে যে, একমাত্র দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ে দু'দলের মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব চলে আসছে। দেশের বৃহত্তম স্বার্থে দু'দলের উচিত পারস্পরিকভাবে কাছাকাছি আসা। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে দু'দলই গৌরবের দাবিদার। কেননা দু'দলের প্রতিষ্ঠাতাই ভিন্নভাবে হলেও সেই সংগ্রামে বিশিষ্ট ভূমিকা রাখেন। এই পটভূমি বিবেচনা করে জোর দিয়ে প্রশ্ন রাখা চলে যে দু'দলই কেন একটি নতুন জাতীয় ভাবমূর্তি গঠনে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে এগিয়ে আসতে পারবে না? একমাত্র উভয় দলের পারস্পরিক সম্প্রীতিমূলক সহযোগিতার মাধ্যমেই দেশে গড়ে উঠতে পারে বহু কাঙ্ক্ষিত 'সুশীল সমাজ।'

সুভাষ বোস, মুজিব ও জিয়া ঃ নতুন দক্ষিণ এশিয়ার স্বপ্ন

সুভাষ বোসের কৌশলগত স্বপ্ন ও ঐতিহ্যের প্রসঙ্গে পুনর্বার আসতে হয়। কেননা সেই স্বপ্ন ও ঐতিহ্য দক্ষিণ এশিয়া ও বাংলাদেশের স্বপ্ন ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। দক্ষিণ এশিয়া ও বাংলাদেশ বর্তমানে যথার্থ-ই এক ক্রান্তিলগ্নে উপনীত। এই ক্রান্তিলগ্নে সম্ভবত বোসেব ঐতিহ্য অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে। বস্তুত, সুভাষ বোসের প্রতি অতি উত্তম শ্রদ্ধা প্রদান করা হবে যতি তাঁর আদর্শ ও লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়। যার জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছিলেন, দিয়েছিলেন নিজের প্রাণ। বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার নেতৃবর্গের কাজ হবে তাঁর সেই 'অসম্পূর্ণ কাজ' সম্পূর্ণ করা। তাঁর 'রাজনৈতিক উইলে' সুভাষ বোস সেই দিক-নির্দেশনাই রেখে গেছেন। তিনি চেয়েছিলেন স্বাধীনতা ও সামাজিক ন্যায় বিচার, বর্ণ, শ্রেণী, ধর্ম, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য। তিনি চান এমন একটি দেশ ও সমাজ যেখানে সংখ্যালঘিষ্ঠরা লাভ করবে সংখ্যাগরিষ্ঠদের পৃষ্ঠপোষকতা, চান তিনি আন্তঃআঞ্চলিক সহযোগিতা এবং সর্বোপরি তাঁর 'সাম্যবাদ' ধারণাসূত্রে উপস্থাপিত এক সর্বব্যাপী সম-অধিকার ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা ছিল তার আজীবন লালিত স্বপ্ন-সাধনা।

www.pathagar.com

বর্তমানকালে যা প্রয়োজন তা হলো অতীত ও ভবিষ্যৎ - বিগতকালের শিক্ষা ও অনাগত ভবিষ্যতের সম্ভাবনা উভয়বিধ দিক থেকে ভাবনা-চিন্তা করে, অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি সহকারে সযত্নে জল্পনা-কল্পনা করে এমন একটি বিকল্প নীতিগত কাঠামো বা ভিন্নতর রূপরেখা দাড় করানো যা উপমাহাদেশের অতীতের ব্যর্থতার গ্লানি থেকে অবমুক্ত করবে। দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে অনাগত এক সুন্দর ভবিষ্যতের । দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশের জনগণও নেতৃবর্গকে মনে রাখতে হবে অতীতের ভারতীয় কংগ্রেস-এর ধারার উপ-মহাদেশীয় রাজনীতি। এতে ছিল অপ্রতিসম ভাবধারা, আধিপত্যবাদ ও কর্তৃত্বের ধারা, যে ধারার রাজনীতি উপমহাদেশের জন্য প্রমাণিত হয়েছে অমঙ্গলকর। সুভাষ বোস সেই আধিপত্যবাদ ও কর্তৃত্ব ভিত্তিক উপমহাদেশীয় রাজনীতিকে মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন, যে কারণে তাঁকে নির্বাসিত জীবনের পথ বেছে নিতে আত্মাহুতি দিতে হয় বিদেশের মাটিতে। সেই পরিপ্রেক্ষিত মনে রেখে সামাজিক সমঝোতা ও সম্প্রীতি। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও প্রতিসম মানবিক সম্পর্কের ভিত্তিতে উপমহাদেশীয় রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে নতুন ধারার যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তা না হলে স্নায়ুযুদ্ধ উত্তরকালীন জনগণের নবলব্ধ অভিলাষের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক পর্যায়ে সম্প্রীতি ও উন্নয়নের ধারা সূচিত হবে না।

দক্ষিণ এশিয়ার বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতাকে রাতারাতি উচ্ছেদ বা অপসারণ করতে হবে এ ধরনের প্রস্তাব করা আদৌ সমীচীন নয়। এমন কি এ ধরনের প্রস্তাবনা নিছক বাতুলতা বলে বিবেচিত হতে পারে। কেননা এ উপমহাদেশ থেকে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের পরিসমাপ্তির পর থেকে বিগত পঞ্চাশ বছরব্যাপী গড়ে ওঠা রাষ্ট্রিক কাঠামো ইচ্ছামাফিক ভেঙ্গে ফেলা যায় না। কিন্তু এটা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার অপেক্ষা রাখে দক্ষিণ এশিয়া কি বাংলাদেশের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বাস্তবধর্মী কূটনৈতিক উদ্যোগ ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতামূলক নতুন আঞ্চলিকতার ভাবধারা নিয়ে সম্প্রীতির পথে এগিয়ে যাবে? জিয়াউর রহমানের নিজস্ব খ্যাতির সূচনা ১৯৭১ সনের বাংলাদেশের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ থেকে, যখন তিনি পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর নৃশংসতার বিরুদ্ধে খোদ পাকিস্তানী বাহিনীর অভ্যন্তরে থেকেই সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান করেন - যে ধরনের ভূমিকা সুবাষ বোস স্বয়ং উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন। পরবর্তীকালে দেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে জিয়াউর রহমান আঞ্চলিকতার ধারণা উত্থাপন করেন এবং দক্ষিণ এশিয়ায় একটি যৌথ সত্তা সৃষ্টির আন্দোলনের পুরোভাগে নেতৃত্ব প্রদান করেন; চূড়ান্তে সেই আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সংস্থা বা সার্ক জন্ম লাভ করে। এ সকল দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে জিয়াউর রহমানকে

www.pathagar.com

বাংলাদেশের সৈনিক - রাষ্ট্রনায়ক বলে অভিহিত করা চলে, যে- রাষ্ট্রের সংগ্রামী জননায়ক ও স্থপতি ছিলেন মুজিব স্বয়ং; কিন্তু জিয়া ও মুজিব উভয়েই ছিলেন সুভাষ বোসের উত্তরসূরি। বলা চলে দুজনেই ছিলেন বোসের আদর্শ ও উদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত।

সার্ক আঞ্চলিক সত্তা হিসেবে একটি পুরোপুরিভাবে বিকাশিত ও প্রকৃত অর্থে কর্মকাণ্ডের দিক থেকে বেশ কার্যকর সংস্থা রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সমর্থ হয় নি। একটি দক্ষ আঞ্চলিক সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে সার্কের প্রয়োজন কর্তৃত্ব ও আনুগত্য হস্তান্তর — এসব রাষ্ট্র থেকে আঞ্চলিক সত্তার, এমন প্রক্রিয়ায় হস্তান্তরিত হবে যাতে সুভাষ বোসের উপস্থাপিত সাম্যবাদ ও সহযোগিতার নীতি-আদর্শমালা অনুযায়ী দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশে পারস্পরিকতা ও প্রতিসম সম্পর্কের ভিত গড়ে ওঠে। দক্ষিণ এশিয়ায় মুক্ত ব্যবসায়িক অঞ্চল, একটি আঞ্চলিক অর্থনৈতিক গোষ্ঠী বা সাম্প্রতিকতম ধারণা দক্ষিণ এশীয় উন্নয়ন চতুর্ভুজ - বিভিন্ন সময়ে এসব উত্থাপিত সহযোগিতামূলক অভিব্যক্তি মূলত একটি প্রতিসম রূপরেখার ভিত্তিতে জিয়া যে আঞ্চলিকতার আদর্শ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সার্কের কাঠোমোর মধ্যে বা সেই কাঠামোর বাইরেই হোক, এটা নিঃসন্দেহে বলা সমীচীন যে দক্ষিণ এশিয়ার একটি সুশীল সমাজের ভিত গড়ে তুলতে হলে তা অবশ্যি হতে হবে সুভাষ বোসের আদর্শ ও দৃকশক্তির রূপরেখার ভিত্তিতে, কেননা তিনি যথার্থ-ই ছিলেন সেই কাঙ্ক্ষিত সমাজের অগ্রপথিক বা রূপকার। তাই এ অঞ্চলে যথার্থ একটি সুশীল সমাজ গড়ে তুলতে হলে সর্বোপরি প্রয়োজন সুভাষ বোসের আদর্শ ও নীতিমালা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হওয়া। প্রতিবেশী সুবিশাল দেশ ভারতের নেতৃত্বের পক্ষে সুভাষ বোসের নেতৃত্বের গুণাবলি, নীতিগত দৃকশক্তি ও আত্মত্যাগী ভাবমূর্তির স্বীকৃতি প্রদানে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর প্রয়োজন হয়, কিন্তু সার্বিকভাবে সমকালীন ভারত কতখানি যথার্থ বোসের আদর্শের দীক্ষা লাভ করেছে বলা কঠিন। বাংলাদেশের পক্ষে কিন্তু ভারতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা লাভ করতে হবে এবং কিছুতেই এতো দীর্ঘকাল অপেক্ষা করা চলবে না। সুভাষ বোসের নেতৃত্ব ও আদর্শের পাশাপাশি বাংলাদেশকে আগামী সহস্রাব্দীতে গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে ভাবতে হবে কিভাবে দেশের ভবিষ্যৎ নিয়তি নির্ধারিত হবে, রাজনীতির মানচিত্র কি ধরনের হবে, নেতৃত্ব কি নিরবচ্ছিন্নভাবে পরস্পরে মুখোমুখি হয়ে চলবে। টানাহেচড়া করবে অতীতকে নিয়ে-নাকি অতীত মহিমান্বিত নেতৃত্বের পারস্পরিক স্বীকৃতির মাধ্যমে এগিয়ে চলবে, যথার্থ-ই এক সোনালি সুন্দর জাতীয় ভাবমূর্তির সম্প্রতি পূর্ণ ও

www.pathagar.com

স্থিতিশীল বাংলাদেশ-ই একমাত্র সম্প্রীতিপূর্ণ ও স্থিতিশীল দক্ষিণ এশিয়া গড়ার কাজে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে। এজন্য বাংলাদেশের নেতৃত্ব ও রাজনীতির অঙ্গনে প্রয়োজন পারস্পরিক সহনশীলতা, সমঝোতা, ইতিবাচক ও গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি। তবেই বাংলাদেশ অনুকরণীয় ও অনুপ্রেরণামূলক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে।

তথ্যনির্দেশ

১. দ্রঃ Abul Kalam, 'Chinas' Self-Image in the Post - Cold War Era, ' *The Daily Star* ' (3 January 1997)
২. বাংলাদেশ সফররত একদল ব্রিটিশ বিনিয়োগকারী সদস্যের মতামতের জন্য দ্রঃ, Staff Correspondent "Dhaka should improve its image abroad". UK investors for its venture in aviation, power, energy sectors," *The Daily Star* (27 January 1997).
৩. "We have corrected ourselves, " বলেন জ্যোতি বসু, "and given him the recognition he deserves." "Subhas Bose rehabilitated in Indian history, " *The Bangladesh Observer* (25 January 1997), পৃ. ১,১২
৪. James E. Dongherty and Robert H. Jazgraff, Jr. *Contending Theories of International Relation* (Philadelphia: J.B. Hippincott Company, 1971), পৃ. ১, ১২.
৫. Herbert C. Kelman, :"Socio-psychological Approaches to the Study of International Relations, "in Herbert C. Kelman (ed.), *International Behaviour* (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1965), পৃ. ২৪
৬. দ্রঃ Kenneth E. Boulding, The Image (Ann Actor: University of Michigan Press, 1956): আরো দ্রষ্টব্য তাঁর "National Images and International System." প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০-১৩১.
৭. Zillur R. Khan, *The Third World Chairmat: Shaikh Mujib and the Struggle for Freedom* (Dhaka: the University Press Limited, 1996), পৃ. ২১৫ ।
৮. ঐ, পৃ. ৮
৯. S.J. Musser, উদ্বৃত, ঐ.
১০. Kenneth E. Boulding, "National Images and International Systems," *Journal of Conflict Resolution*, III (June 1959), পৃ. ১২০-১৩১ ।
১১. Abul Kalam, Peacemaking in Indoclina, 1954 - 1975 (Dhaka : University of Dhaka, 1983), পৃ. - ২৯২ - ২৯৩; Major S.K. Bhakari, *Indian Warfare: An Appvaisal of strategy and Tachics of War in Early Medical Period* (New Delhi: Munshiran Monoharlal Publishers Private Limited, 1981),পৃ. ১৩৮ - ৩৯
১২. Khan, প্রাগুক্ত, পৃ. ১, ১০.

www.pathagar.com

১৩. সুভাষ বোস ও মুজিব সম্পর্কিত ভিন্নতর ও সমালোচনামূলক বক্তব্যে জন্য দ্রঃ এবনে গোলাম সামাদ , 'শেখ মুজিব ও সুভাষ চন্দ্র বসু' দৈনিক ইনকিলাব (৭ ফেব্রুয়ারি), পৃ. ৬
১৪. উদ্বৃত, High Toye, the Springing, Tigher: Subas Chandra Bose (Bombay: Jaico Publishing House, 1984), পৃ. ৬
১৫. J.H. Broomfield, Elite Conflict in a plural Society: Twentiett Centurey Bengal (Berkeley: University of California Press, 1968), পৃ. ২০৮
১৬. উদ্বৃত, ঐ, পৃ. ২২০
১৭. সুভাষ চন্দ্র বসু, সমগ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড (কোলকাতা ঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৩), পৃ. ৫৪-৫৫; Toye প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯.
১৮. Hari Hara Das, *Subhas Chandra Bose and the Indian National Movement* (New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, 1963), পৃ. ৩১২ - ৩১৩
১৯. Toye, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
২০. Abul Kalam, Subhas Bose: Strategic Concepts and Diplomatic Thought (Dhaka and New Delhi: the University Press Limited and Manohar, 1992).
২১. Sisir Kumar Bose and Birendra Wath Sinha, Netaji: A Pictorial Biogrphy (Calcutta: Ananda Publishers, Limited. 1979), পৃ. ২৮ ।
২২. Subhas Chandra Bose, "Speed at the Celebration of Golden Jubilee of the Provisional Government of Azad Hind , 24 November 1943, "The Ovracle, Vol. xvi, No. 1 (January 1994), পৃ. ৪৭ ।
২৩. Bose and Sinha, প্রাগুক্ত , পৃ. ২৮
২৪. সুভাষবোস উদ্ধৃত, Leonard A. Gordon, Bengal: The Nationalist Movement 1876 - 1940 (New Delhi : Mabnohars, 1979), পৃ. ২৩৫
২৫. Johannes H. Voight, India in the Second World Ear (New Dhelhi: Arnold-Heineman, 1987), পৃ. ২৪ ।
২৬. Sisir Kumar Bose, "Speech of the Ulbration of the Golden Jubilee." প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮
২৭. Das, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩
২৮. Jawaharlal Nehru, Jawaharlal Nehru: An Auto Biogaphy (London : Oxford University Press, 1982), পৃ. ৫৭০
২৯. Anand প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬
৩০. Das প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪-১৭, ৩৪০
৩১. Bose and Sinha, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২; Das, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮; Satyapal Anand, Great Testaments of India's Freedom Struggle (Chandiagarh : Sameer Prakashan, 1985), পৃ. ১৪৮
৩২. Subhas Chandra Bose, "to Mahatma Gandhi : Broadcast address over the Rangoon Radio, 6 July 1944," The Oracle, vol. xvi, No. 1 (january, 1994), পৃ. ১৪
৩৩. ঐ, পৃ. ১৪
৩৪. বসু, প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২১৭; Subhas Chandra Bose, *Through Congress Eye* (Allahabad : Kitabirtan, u.d. পৃ. ৪৪; , Bose and Sinha, প্রাগুক্ত, Foreword, Das, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩

www.pathagar.com

৩৫. Ghosh, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪, Das, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬
৩৬. উদ্ধৃত, Toye, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৩৫
৩৭. Das, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪০; Broomfield, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১-৩০২
৩৮. Das, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪-৫৫
৩৯. ঐ, পৃ. ৩২২-২৪
৪০. একই ধরনের বক্তব্যের জন্য দ্র: Dr. Sisir Kumar Bose, "Celebration of Golden Jubilee of the Provisional government of Azad Hind, " *The Oracle*, vol. xvi, No. 1, (January 1994), পৃ. ৪৯১
৪১. Das, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১
৪২. আরো বিশদ বক্তব্যের জন্য Abul Kalam, Strategic Cencips, প্রাগুক্ত
৪৩. দ্রঃ Nirad C. Chaqudhuri, *Thy Hand, Great Anarch: India 1921 - 1952* (Reading : Addison - Wesley Publishing company, Inc., 1987), পৃ. ৪৬৯
৪৪. Leonard A. Gordon, *Bengal : The Nationalist Movement 1876 - 1940* (New Delhi: Manhar, 1979), পৃ.১৯৫-২২০, ২৩৩। একজন বাস্তববাদী জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে সি.আর. বুঝতে পেরেছিলেন যে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলায় মুসলমানদের সহযোগিতা না পেলে কার্যকর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না। 'বেঙ্গলপ্যাক্ট' (১৯২৩) স্বাক্ষর করে মুসলিমদের সংখ্যানুপাত চাকুরীতে প্রতিনিধিত্ব প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। কোলকাতা করপোরেশনে তিনি নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে মুসলিমদের শতকরা আশিভাগ চাকুরীর সুযোগ প্রদানেও অঙ্গীকার করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে জনজীবন ও সেবার ক্ষেত্রে মুসলমানরা তাদের সংখ্যানুযায়ী সুযোগ লাভ না করলে বাংলায় গণতন্ত্র কায়েম হতে পারে না। এ ধরনের বক্তব্যে বাংলাসহ সমগ্র ভারত চমৎকৃত হয়। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ উদ্ধৃত, ঐ, পৃ. ১৯৫; Sinha প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০ সুভাষ বোস সি.আর. দাসের বক্তব্য ও প্যাক্ট শুধু সমর্থন করেন নি, ভারতীয় কংগ্রেস কর্তৃক এসব প্রত্যাখ্যানের তিনি নিন্দা করেন। পরে তিনি কোলকাতার নির্বাচিত নেতা হিসেবেও সি.আর. দাসের আদর্শের শিক্ষা প্রজ্জ্বলিত রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। দ্র: Sinha, প্রাগুক্ত পৃ. ১৩০; Gordon প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬.
৪৫. সুভাষ বোস ও তাঁর ভাই শরৎ চন্দ্র বোস বাংলার প্রাদেশিক বিধান সভায় মুসলিম নেতৃবর্গের সঙ্গে সমঝোতা প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হন যাতে এ.কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন প্রজা পার্টির সঙ্গে সংগ্রেসের কোয়ালিশন সরকার গঠন সম্ভব হয়। কিন্তু ঘনশ্যামদাস বিরলার নেতৃত্বাধীন মারওয়ারীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মহাত্মা গান্ধী এর বিরোধিতা করেন। মারওয়ারীদের ভয় ছিল এতে বাংলায় তাদের অর্থনৈতিক আধিপত্য ক্ষুণ্ন হবে। শ্রী নীরোধ চন্দ্র চৌধুরী, "মহাত্মা গান্ধী ও সুভাষ চন্দ্র বসু," দেশ (শারদীয়, ১৪০১), পৃ. ১৪৯ - ৫০
৪৬. K.K. Ghosh, *The Indian National Army : Second Front of the Indian Independence Movement* (Meerut : Meenakhi Prakashan, 1969), পৃ. ১৭৮-৭৯; Voight, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১.
৪৭. Joyee C. hebra, Japanese Trained Armees in Southest Asia : Indepencence and Volunteer Forces in World War II (New York : Columbia University Press, 1977), পৃ. ৩৭।
৪৮. Dr. Ravindra Kumar (Chief Editor), The Selected Works of Subhas Chandra Bose, Vol. 1 (1936 - 1946), পৃ. viii
৪৯. সুভাস চন্দ্র বসু, পত্রাবলী ১৯১২ - ১৯৩২ (Calcutta : M.C. Sarkar and Sons, 1964), পৃ. ২৬৪।

www.pathagar.com

৫০. Toye, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪; Das প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪

৫১. দ্র:, "Document No. 1: Biography A.C.C.N. 1506757 (Papers Received from U.S.S.R.) in Kumar (ed.) প্রাগুক্ত, পৃ. ২ - ৩ (vol. iv)

৫২. Louis Allen, "Mutaguachi Renya and the invasious of India, 1944," in Brian Bond (ed.) *Fallen Stars : Eleven, Studies of Twentteeth Century Military Disastars*, 1991,) পৃ. ২১৯।

৫৩. Sinha, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩; Sumit Sarkar, *Modern India 1885-1947* (Delhi : Macmillan India Limited, 1983), পৃ. - ৪১১

৫৪. Bose and Sinha, প্রাগুক্ত, Foreword: কৃষ্ণা বসু, 'চরণ রেখা তব,' (কোলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮২) পৃ. ১, ২১১

৫৫. K.K. Glosh, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫

৫৬. Col. P.K. Sahgal, "The Indian National Army, "the Oracle, vol. xv, No. (January 1993), পৃ. ২৪

৫৭. Khan, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭

৫৮. Khan, ঐ, পৃ. ৩.

৫৯. Chaudhury, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৩

৬০. Khan, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

৬১. Serajul Islam Choudhury, "Nationalism of the Bengalis," (the "Foundation Day" talk given at the Asiatic Society of Bangladesh." 5 January 1995), পৃ. ১১

৬২. Khan, পৃ. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১- ২০২

৬৩. "Our Struggle This Time is a Struggle for Independence," in Ramenjda Majumdar (ad.), Sheikh Mujibur Rahman: Bangladesh, My Bangladesh (Dacca : Muktadhara, 1972), পৃ. ৯৭ - ৯৯

৬৪. ঐ, পৃ. ২০১ - ২০২

৬৫. ঐ, পৃ. ১৫

৬৬. Dr. Sitaramayya, Bose's opponent in the race for congress President during his second term, quoted in Sinta, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

৬৭. 'S. Wazed Ali Rachamabali, Part II, 1989, প্রাগুক্ত cit. in Sirajul Islam Chowdhury, পৃ. ২০

৬৯. Chowdyhury, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৭০. Abul Kalam, "Zillur r. Khan, the Third World Charismat : Sheikh Mujibur Rahman and the Struggle for Freedom " (Book Review), Journal of the Asiatic Socity of Bangladesh vol. 41), No. 2 (December 1996). For details of the Agartala Conspiracy, See Maudud Ahmad, Bangladesh: Constitutional Quest for Autoomy 1950 - 1971) Dhaka : University Press Limited, 1979), পৃ. ৯৯ - ১৩১

৭১. ফুজিওয়ারা ইওচী ছিলেন ৩৩ বছর বয়স্ক একজন জাপানি মেজর। ঐ সময়ে তিনি জাপানি রাজকীয় সামরিক সদর দফতরের ৮ নম্বর বিভাগে দ্বিতীয় ব্যুরোর সঙ্গে জাপানি গোয়েন্দা ও প্রচারণা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিলেন। জাপানি রোমান্টিক আদর্শবাদীদের মধ্যে তিনিও ছিলেন একজন শীর্ষ ভাগের কর্মকর্তা যিনি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মীকে একটি যথার্থ

www.pathagar.com

বিপ্লবী বাহিনী বলে মনে করতেন। তাই তিনি উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে জাপানি সাহায্য প্রদানের বিষয়ে সহানুভূতিশীল ছিলেন। এসব কারণে ফুজিওয়ারা ও বোসের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও মৈত্রী বন্ধনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। Narasimha Murthy, *India and Japan : Dimennion of their Relations* (New Delhi : ABC Publishing House, 1986), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-৩৮.

৭২. কৃষ্ণা বসু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

৭৩. Khan, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১

৭৪. Chowdhury, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৭৫. Khan, প্রাগুক্ত, পৃ. XI.

৭৬. Chowdhury, প্রাগুক্ত পৃ. ১৪

৭৭. ঐ, পৃ. ১৯

৭৮. ঐ

৭৯. Abul Kalam, *Sapan and South Asia : Subsystemic himkays and Developing Relationships* (Dhaka : University Press Ltd., 1996) পৃ. ২১৪।

৮০. M. Anwarul Haq, "Encountering Aurora," *Star Weekend Magazine* (27 December 1996), পৃ. ১৪

৮১. Gemimi Wahnaj and Nurul Kabir, : "Will the June 12 Parliamentary elections be free and fair?" *Star Weekend magazine* (1996), পৃ. ৮।

৮২. "Boston University Confess honorary DL on Hasina," *The Daily Star* (8 February 1997), পৃ. - ১, ১২

৮৩. "Netagi Award Conferre on Hasina, " The Daily Star (23 February 1997), পৃ. ১, পশ্চিম বাংলা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক নেতাজী জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সম্মান প্রদর্শনের বিষয় অনেকের কৌতূহল উদ্রেক করতে পারে। এমন কি এরূপ সন্দেহের ভাবও উদ্রেক করতে পারে যে কংগ্রেস এর উদ্দেশ্য কি আগের কালের মতো লেজুড় সৃষ্টি করার প্রয়াসের অঙ্গ কিনা; অথচ সুভাষ বোস স্বয়ং প্রচণ্ডভাবে বিশ্বাসী ছিলেন প্রতিসাম্য ভিত্তিক মানবিক সম্পর্কে এবং দারুণভাবে ঘৃণা করতেন লেজুড়ে সম্পর্ক।

৮৪. সুভাষ বোসের আদর্শ-নীতিমালা ও দৃকশক্তি সম্পর্কিত বিশদ আলোচনার জন্য দ্রঃ Kalam Subhas Bose, প্রাগুক্ত.

www.pathagar.com